নদীয়া জেলার খেলাধুলা ও ক্রীড়া সংগঠন: একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষা (১৯৬৭-২০১৭)

[Nadiya Jelar Kheladhula O Krira Sangathan: Ekti Aitihasik Samiksa (1967-2017)]

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ইতিহাস বিভাগে পিএইচ.ডি উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ

গবেষক

সন্তু হালদার

ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

রেজিস্ট্রেশন নম্বর: AOOHI0200420

তত্ত্বাবধায়ক

ড. সুদীপ সুন্দর দাস

অধ্যাপক, শারীর শিক্ষা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা- ৭০০০৩২

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

২০২৫

Certificate

Certified that the thesis entitled **"নদীয়া জেলার খেলাধুলা ও ক্রীড়া সংগঠন: একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষা (১৯৬৭-২০১৭)" [Nadiya Jelar Kheladhula O Krira Sangathan: Ekti Aitihasik Samiksa (1967-2017)]** submitted by me for the Award of 'Doctor of Philosophy in Arts' at Jadavpur University is based upon my work carried out under the supervision of Professor Sudip Sundar Das, Department of Physical Education, Jadavpur University; and that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/ elsewhere.

Sudip Sundar Das 11.7.2025

Countersigned by the Supervisor

Dr. Sudip Sundar Das

Professor

Prof. Sudip Sundar Das
Department of Physical Education
Jadavpur University
Kolkata - 700 032

Department of Physical Education

Jadavpur University

Kolkata 700032

Dated-

Santu Halder

Candidate

Santu Haldar

Dated- 11/07/2025

সূচিপত্র

মুখবন্ধ	**i-v**
সংকেতাবলী (Abbreviation)	**vi-viii**
পারিভাষিক শব্দাবলী (Glossary)	**ix-xiv**
সারণি সূচি	**xv**
মানচিত্র সূচি	**xvi**
প্রথম অধ্যায়:	
• **ভূমিকা**	১-৪৭
১.২. গবেষণার সমস্যা নির্বাচন ও নির্ধারিত সময়ের যৌক্তিকতা	২
১.৩. সাহিত্য পর্যালোচনা	৩
১.৪. গবেষণার অনুমান ও সম্পর্কিত প্রশ্নাবলী	৪
১.৫. গবেষণার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য	৬
১.৬. গবেষণার পদ্ধতি	৬
১.৭. গবেষণা সন্দর্ভের অধ্যায় বিন্যাস	৭
টীকা ও সূত্র নির্দেশ	৪০
দ্বিতীয় অধ্যায়:	
• **খেলার সংজ্ঞা, ইতিহাস চর্চা ও সমাজের সাথে সম্পৃক্ততা**	৪৮-৯৬
২.২. ক্রীড়া বা খেলার সংজ্ঞা	৫০
২.৩. ইতিহাস চর্চার বিবর্তন	৫৯
২.৪. খেলার ইতিহাস চর্চা	৭৩
২.৫. ভারতে খেলার ইতিহাস চর্চা	৭৭
২.৬. খেলা ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক	৮১
২.৭. ভারতে খেলা ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক	৮৩
২.৮. পর্যবেক্ষণ	৮৫

টীকা ও সূত্র নির্দেশ	৮৬
তৃতীয় অধ্যায়:	
• **ভারতে খেলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস**	৯৭-১৩৬
৩.২. প্রাচীন যুগ	৯৮
৩.৩. মধ্যযুগ	১০৭
৩.৪. আধুনিক যুগ	১১১
৩.৫. পর্যবেক্ষণ	১২৫
টীকা ও সূত্র নির্দেশ	১২৭
চতুর্থ অধ্যায়:	
• **জেলা রূপে নদীয়া ও তার ক্রীড়া পরিমণ্ডল**	১৩৭-১৮৯
৪.২. নামকরণের আলোকে নদীয়া	১৩৯
৪.৩. নবদ্বীপের অবস্থান সংক্রান্ত বিতর্ক	১৪২
৪.৪. ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে নদীয়া	১৪৪
৪.৫. জেলার ভৌগোলিক পরিমণ্ডল	১৫৬
৪.৬. বর্তমানে নদীয়ার ভৌগোলিক সীমানা	১৫৮
৪.৭. জেলার অর্থনৈতিক পরিমণ্ডল	১৫৯
৪.৮. জেলার সামাজিক পরিমণ্ডল	১৬০
৪.৯. জেলার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল	১৬১
৪.১০. স্বাধীনতা সংগ্রামে নদীয়া	১৬৪

৪.১১. স্বাধীনতা উত্তর কালে জেলার রাজনৈতিক পরিমণ্ডল	১৬৫
৪.১২. জেলার ক্রীড়া পরিমণ্ডল	১৬৬
৪.১২.১. কৃষ্ণনগর	১৬৭
৪.১২.২. শান্তিপুর	১৭৩
৪.১২.৩. রানাঘাট	১৭৪
৪.১২.৪. অন্যান্য অঞ্চল	১৭৫
৪.১৩. পর্যবেক্ষণ	১৭৬
টীকা ও সূত্র নির্দেশ	১৭৭
পঞ্চম অধ্যায়:	
• **নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা বা নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের ইতিহাস**	১৯০-২৪৪
৫.২. প্রতিষ্ঠা ও নামকরণ	১৯২
৫.৩. জেলা স্টেডিয়ামের নির্মাণ	১৯৪
৫.৪. নিয়ম সংহিতা রচনা ও সেই সংক্রান্ত জটিলতা	১৯৬
৫.৫. বাংলাদেশের সঙ্গে মিত্রতার অনন্য নজির	২০১
৫.৬. গুরুত্বপূর্ণ খেলা ও প্রতিযোগিতার আয়োজন	২১৪
৫.৭. খেলাধুলার প্রসারের ক্ষেত্রে ভূমিকা	২২৪
৫.৮. সামাজিক সচেতনতার দৃষ্টান্ত	২৩০
৫.৯. সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অবদান	২৩২
৫.১০. পর্যবেক্ষণ	২৩৪

টীকা ও সূত্র নির্দেশ	২৩৬
ষষ্ঠ অধ্যায়:	
• **জেলার বিশিষ্ট খেলোয়াড়, ক্রীড়া সংগঠক ও ক্রীড়া ক্লাব**	২৪৫-২৯৪
৬.২. জেলার বিশিষ্ট খেলোয়াড়গণ	২৪৬
৬.৩. জেলার বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠকগণ	২৬৯
৬.৪. জেলার বিশিষ্ট ক্রীড়া ক্লাব	২৭৫
৬.৫. পর্যবেক্ষণ	২৮১
টীকা ও সূত্র নির্দেশ	২৮২
সপ্তম অধ্যায়:	
• **জেলায় খেলার আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট ও আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে খেলা**	২৯৫-৩২৯
৭.২. খেলাধুলার বিবর্তন	২৯৭
৭.৩. অ্যাথলেটিক্সের প্রাধান্য	৩০৪
৭.৪. নারী অ্যাথলিটদের সাফল্য	৩০৯
৭.৫. অঞ্চলগত সম্প্রসারণ ও বৈশিষ্ট্য	৩১২
৭.৬. খেলাধুলা ও সংগঠনে প্রতিনিধিত্বগত অসামঞ্জস্যতা	৩১৭
৭.৭. সামাজিক ও অর্থনৈতিক সচলতা	৩২০
৭.৮. পর্যবেক্ষণ	৩২১
টীকা ও সূত্র নির্দেশ	৩২৩
অষ্টম অধ্যায়:	
• **উপসংহার**	৩৩০-৩৪৪

টীকা ও সূত্র নির্দেশ	৩৪৪
সারণি	৩৪৫-৩৪৮
মানচিত্র	৩৪৯-৩৫২
সংযোজনী	৩৫৩-৪০১
সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী	৪০২-৪৩৪

মুখবন্ধ

নদীয়ার অধিবাসী হিসেবে জেলার ইতিহাস সম্পর্কে একটি আগ্রহ সর্বদাই আমার মধ্যে বর্তমান ছিল। পরবর্তীতে ইতিহাস বিষয় নিয়ে যখন উচ্চশিক্ষায় অগ্রসর হই তখন এই জেলার ইতিহাস সম্পর্কে আগ্রহ আরও বৃদ্ধি পায় এবং জেলার ইতিহাস কিভাবে ইতিহাস সম্মত পদ্ধতিতে জানতে হয় সেই বিষয়টি সম্পর্কেও ধারণা তৈরি হয়। স্নাতকোত্তরের পড়াশোনা শেষ করার পর যখন গবেষণার জন্য বিষয়বস্তু নির্বাচন করার জন্য চিন্তাভাবনা শুরু করেছি, তখন নদীয়া জেলার ইতিহাস বিষয়ে গবেষণা করব বলে মনস্থির করি। নদীয়া জেলার ইতিহাস সম্পর্কিত পূর্বকার বিভিন্ন গবেষণা পত্র পর্যালোচনা করতে গিয়ে লক্ষ করি যে নদীয়া জেলায় উদবাস্তুদের আগমন, নদীয়া জেলার অর্থনীতি, জেলার ধর্মীয় ধারা, জেলার তাঁত শিল্প ইত্যাদির মতো বিষয়গুলি নিয়ে গবেষণা হলেও জেলার খেলাধুলার ইতিহাস নিয়ে কোনো গবেষণা পত্র এখনও পর্যন্ত রচিত হয়নি। ফলে নদীয়া জেলার খেলাধুলার ইতিহাস কে নিজের গবেষণার বিষয়বস্তু করব বলে চিন্তাভাবনা শুরু করি। কিন্তু এই সময় সংবাদপত্রে খেলাধুলার প্রতিবেদন পাঠ করা ছাড়া খেলাধুলার ইতিহাস সম্পর্কে আমার কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। এই একই সময়ে অধ্যাপক কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের “খেলা যখন ইতিহাস” গ্রন্থটি পাঠ করে খেলাধুলার ইতিহাস সম্পর্কে প্রথম ধারণা লাভ করি। এর পরবর্তীতে জে.এ. ম্যাঙ্গান, এলান গাটম্যান, রিচার্ড হোল্ট, রামচন্দ্র গুহ, বোরিয়া মজুমদার প্রমুখদের খেলাধুলার ইতিহাস সংক্রান্ত রচনা পাঠ করে খেলাধুলার ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা আরও গভীর হয়। খেলাধুলার ইতিহাস সংক্রান্ত বিভিন্ন রচনা পাঠ করে উপলব্ধি করতে পারি যে ভারতে খেলাধুলার ইতিহাস প্রধানত সর্বভারতীয়, রাজ্য অথবা কলকাতা বা বোম্বের মতো বৃহত্তর শহরকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে এবং এক্ষেত্রেও ক্রিকেট ও ফুটবলের মতো খেলা গুলির প্রাধান্য অধিক লক্ষ করা যায়। খেলাধুলার জেলা কেন্দ্রিক ইতিহাস সেই অর্থে রচিত হয়নি। সামগ্রিক চিন্তাভাবনার পরে স্বাধীনতা উত্তর পর্বে নদীয়া জেলার খেলাধুলার ইতিহাস কে গবেষণার বিষয়বস্তু হিসেবে নির্বাচন করি।

বিষয়বস্তু নির্বাচনের পর যখন গবেষণা কার্যে অগ্রসর হয় তখন উপলব্ধি করতে পারি যে আঞ্চলিক ও খেলাধুলার ইতিহাস রচনা করার ক্ষেত্রে উপযুক্ত ইতিহাস সম্মত তথ্য লাভের ক্ষেত্রে কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সরকারি দলিল পত্রের অভাবে আঞ্চলিক ও খেলার ইতিহাস রচনা করার ক্ষেত্রে ইতিহাস রচনার বিকল্প পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। মহাফেজখানায় সংরক্ষিত তথ্যের অভাবে আমাদের ব্যবহার করতে হয় তথ্য সংরক্ষণের বিকল্প ক্ষেত্র গুলিকে। সমগ্র জেলায় ব্যাপক ক্ষেত্র সমীক্ষার মাধ্যমে এই গবেষণা কার্যের জন্য প্রয়োজনীয় ইতিহাস সম্মত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা, আঞ্চলিক ক্রীড়া সংস্থা ও বিভিন্ন ক্রীড়া ক্লাবগুলিতে ক্ষেত্র সমীক্ষার মাধ্যমে সংরক্ষিত নথিপত্র থেকে তথ্য গুলি সংগ্রহ করা হয়েছে এবং জেলার বিশিষ্ট খেলোয়ার, ক্রীড়া সংগঠক, ক্রীড়া পরিচালক ও ক্লাব কর্তৃপক্ষের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমেও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের প্রতিবেদন থেকেও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

গবেষণার সন্দর্ভটির মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতা উত্তর কালে নদীয়া জেলায় প্রচলিত পাশ্চাত্য খেলাধুলার ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। প্রথমে খেলাধুলার সংজ্ঞা নির্ধারণ সংক্রান্ত জটিলতার কথা উল্লেখ করে, ইতিহাস চর্চার বিষয়বস্তু সম্প্রসারণ এর মাধ্যমে কিভাবে খেলাধুলার ইতিহাস চর্চার সূচনা ঘটল তার এবং খেলাধুলা ও সমাজের মধ্যে যে গভীর সংযোগ বর্তমান তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত ভারতবর্ষে প্রচলিত বিভিন্ন খেলাধুলার ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে এবং বিশেষত ভারতে পাশ্চাত্য খেলাধুলার প্রচলন ও তার বৈশিষ্ট্যগুলির ওপর গুরুত্ব দান করা হয়েছে। নদীয়া জেলার খেলাধুলার ইতিহাস জানার আগে নদীয়া জেলার প্রাথমিক ইতিহাস সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করা একান্ত আবশ্যক। তাই নদীয়া জেলার নামকরণের ইতিহাস, অতীত ইতিহাস, জেলার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল এবং জেলায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর সূচনায় কিভাবে পাশ্চাত্য খেলাধুলার প্রচলন ঘটল তার সুচারু বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। জেলার প্রধান ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসেবে নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার ইতিহাস বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশের সাথে

সুসম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার ভূমিকা, জেলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে জেলা ক্রীড়া সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং সর্বোপরি খেলাধুলার প্রসারের ক্ষেত্রে এই ক্রীড়া সংস্থার ভূমিকার কথা গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়েছে। জেলার বিশিষ্ট খেলোয়াড়, ক্রীড়া সংগঠক ও পরিচালকদের যথার্থ বর্ণনা ছাড়া জেলার ক্রীড়া ইতিহাস কখনওই সম্পূর্ণ হতে পারে না। তাই জেলার বিশিষ্ট খেলোয়াড়, ক্রীড়া সংগঠক ও পরিচালকরা জেলার বাইরে সফলতার যে নজির রেখেছেন তার তথ্যসমৃদ্ধ বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে। জেলার আর্থ-সামাজিক পটভূমিকার সাথে খেলাধুলার যে গভীর সংযোগ বর্তমান তা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়েছে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে জেলায় প্রচলিত খেলাধুলা গুলির জনপ্রিয়তার তারতম্য, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, অ্যাথলেটিক্স- এর প্রাধান্য, নারী অ্যাথলিটদের উজ্জ্বল ভূমিকা, খেলাধুলা ও ক্রীড়া সংগঠনের প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে লিঙ্গগত ও সম্প্রদায়গত অসামঞ্জস্যতার দিক গুলিও তুলে ধরা হয়েছে।

যে কোনো গবেষণা কার্যই একাধিক ব্যক্তির সহায়তায় সম্পন্ন হয়ে ওঠে। এই গবেষণা সন্দর্ভটির রূপায়ণের জন্য যারা আমাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলের প্রতি রইলো আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। সমগ্র গবেষণাকর্মটি অধ্যাপক সুদীপ সুন্দর দাস মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে। তিনি আমাকে এমন একটি বিষয় নিয়ে গবেষণা করার উৎসাহ দিয়েছেন এবং একই সঙ্গে এই বিষয়ে গবেষণা করার যে ভয় ভীতি ছিল তাতে সাহস জুগিয়েছেন। গবেষণায় যেখানেই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি সেখানেই অধ্যাপক সুদীপ সুন্দর দাস তার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। অধ্যাপক মহাশয়ের যাবতীয় সাহায্যের জন্য আমি তার কাছে চিরকৃতজ্ঞ। বিশেষ ধন্যবাদ জানাই আমার রিসার্চ এডভাইসারি কমিটির (Research Advisory Committee) সদস্য অধ্যাপক ড. কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও ড. মেরুনা মুর্মু মহাশয়াকে। অধ্যাপক কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই গবেষণা কর্মের একটি সংক্ষিপ্ত খসড়া দেখে প্রয়োজনীয় সংশোধনী মন্তব্য প্রদান করার পাশাপাশি, বিভিন্ন সময় পরামর্শ দানের মাধ্যমে ও প্রয়োজনীয় সংশোধনী মন্তব্য তুলে ধরে সাহায্য করেছেন। এছাড়া গবেষণা সন্দর্ভের শিরোনাম সম্পর্কিত কিছু ভুল ত্রুটিও সংশোধন করে দিয়েছিলেন অধ্যাপক ড. কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাশয়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. সুদেষ্ণা ব্যানার্জী, ড. মেরুনা মুর্মু সর্বদা আমাকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন। এছাড়া আমার গবেষণা কর্মের সময়কালের মধ্যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কর্মরত ড. রুপ কুমার বর্মন, ড. মেরুনা মুর্মু ও ড. কৌশিক রায় প্রমুখদের কাছে যখন নথিপত্র স্বাক্ষর করতে গেছি তখন তারা সহাস্যমুখে তা প্রদান করেছেন। তাঁদের সকলকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষা কর্মী বন্ধুরা, গবেষণা বিভাগের কর্মীবৃন্দ, কলা অনুষদের পি.এইচ.ডি বিভাগের কর্মীবৃন্দের আন্তরিক সহযোগিতাও উল্লেখের দাবি রাখে। বর্তমান গবেষণার উপাদান সংগ্রহ করতে গিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ইতিহাস বিভাগীয় গ্রন্থাগার, জাতীয় গ্রন্থাগার, গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, নদীয়া জেলা গ্রন্থাগার, কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরি, নবদ্বীপ আদর্শ পাঠাগার, নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদের পাঠাগার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে যেতে হয়েছে এবং এই সমস্ত সংগঠনের কর্মকর্তা, গ্রন্থাগারিক ও কর্মীদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়েছি। নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা, আঞ্চলিক ক্রীড়া সংস্থা ও অসংখ্য ক্রীড়া ক্লাবগুলি তাদের সংরক্ষিত নথিপত্র প্রদান করার মাধ্যমে এই গবেষণকার্যে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মীদের ধন্যবাদ জানাই। এছাড়া যে সমস্ত খেলোয়াড়, ক্রীড়া সংগঠক ও ক্রীড়া পরিচালকগণ তাদের মূল্যবান সময়ের মধ্যে থেকে কিছুটা সময় বার করে আমাকে সাক্ষাৎকার প্রদান করেছেন তাদের সকলকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। বিশেষভাবে নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা তাদের যাবতীয় নথিপত্র ও তাদের দ্বারা প্রকাশিত জেলার খেলাধুলার খবর সম্মিলিত পাক্ষিক পত্রিকার সমস্ত পুরনো সংস্করণ সংরক্ষণের মাধ্যমে যে ইতিহাস বোধের পরিচয় দিয়েছে তা সত্যিই বিস্ময়কর। গবেষণা কার্য চলাকালীন সময়ে আমার গবেষক বন্ধুরাও নানাভাবে সাহায্য করেছেন এবং এদের মধ্যেও বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় রাকেশ কুমার মন্ডলের কথা। আমার স্কুল জীবন থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত সমস্ত মাস্টারমশাইদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ যারা আমাকে জীবনে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। গবেষণার বিষয়ে নানাভাবে সাহায্য ও বিশেষ করে সঠিক সময় গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করার কথা ক্রমাগত মনে করিয়ে

দিয়েছেন আমার স্কুল জীবনের ইতিহাসের শিক্ষক স্বপন কুমার ঘোষ মহাশয়। এছাড়া আমার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠী সকল বন্ধু-বান্ধবদের ধন্যবাদ জানাই। বিশেষত বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে কৃষানু, জসীমউদ্দীন, মনোতোষ, ইমামুল ও প্রতাপ গবেষণার খোঁজখবর রেখে আমাকে উৎসাহ দিয়েছে। তাদের সকলের জন্য রইল আমার গভীর ভালোবাসা। এই গবেষণা কর্মের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগের 'জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপ' খাতে অর্থ সাহায্য পেয়েছিলাম, যার জন্য আর্থিক চিন্তাভাবনাকে দূরে সরিয়ে রেখে নির্ভীক চিত্রে গবেষণা কার্যে মনোনিবেশ করতে পেরেছি।

সবশেষে প্রণাম জানাই আমার বাবা-মা, স্বর্গলোকপ্রাপ্ত ঠাকুরদা ও ঠাকুরমাকে যাদের লালন-পালনে লেখাপড়ার যাত্রা শুরু করে আজ এখানে পৌঁছাতে পেরেছি। পরিবারের অন্য সদস্যদের কাছেও আমি সমপরিমাণ ঋণী। একই সঙ্গে আমার ভাই সৌরভ আমার পাশে থেকে সাহায্য করেছে নিরন্তর, তার কাছেও আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় সাগরিকার কথা, যে ক্রমাগত গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে না পারার ভয়কে মুক্ত করতে সাহায্য করেছে, সাহস জুগিয়েছে, উৎসাহিত করেছে এবং একই সঙ্গে এই অধমের গবেষণাকার্যের প্রুফ দেখে সাহায্য করেছে, তার এই অবদানের জন্য আমি তার কাছে চির কৃতজ্ঞ। এর বাইরেও অসাবধানতার কারণে যদি কোনো নাম বাদ পড়ে থাকে তার জন্য আমি দুঃখ প্রকাশ করি।

সন্তু হালদার

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়,

যাদবপুর, কলকাতা, ৭০০০৩২

সংকেতাবলী (Abbreviation)

AAFI	Amateur Athletic Federation of India
AFI	Athletics Federation of India
AICS	All India Council of Sports
AIFF	All India Football Federation
AIR	All India Radio
AHA	American Historical Association
ATFM	Asian Track and Field Meet
BCCI	Board of Control for Cricket in India
B.C. Roy Trophy	Bidhan Chandra Roy Trophy
BIDC	Bangladesh Industrial Development Corporation
BPCIT	Bipradas Pal Chowdhury Institute of Technology
BTTA	Bengal Table Tennis Association
CAB	Cricket Association of Bengal
CABPE	Central Advisory Board of Physical Education
C.K. Nayudu Trophy	Colonel Cottari Kanakaiya Nayudu Trophy
CMS School	Church Missionary Society School
EZJAC	East Zone Junior Athletics Championship
ICC	International Cricket Council
ICS	Indian Civil Service
IFA	Indian Football Association

IHF	Indian Hockey Federation
IPAC	Indian Polo Association Championship
IPL	Indian Premier League
IRCSSS	International Research Centre for Sports, Socialization and Society
IWLF	Indian Weight Lifting Federation
JBS	John Bull Society
NASSH	North American Society of Sports History
NDSA	Nadia District Sports Association
NSA	Nadia Sporting Association
NIDJAM	National Inter District Junior Athletics Meet
NIZJAC	National Inter Zonal Athletic Championship
NJAC	National Junior Athletic Championship
NSNIS	Nataji Subhas National Institute of Sports
NWC	National Weightlifting Championship
SAI	Sports Authority of India
SCS	State Council of Sports
SMAT	Syad Mushtaq Ali Cricket Tournament
SWD	Sports and Welfare Department
TSC	Tata Sports Club
VMT	Vijay Merchant Trophy
WBAA	West Bengal Athletic Association
WBBA	West Bengal Badminton Association

WBDSF	West Bengal District Sports Federation
WBSCS	West Bengal State Council of Sports
WTTC	World Table Tennis Championship

পারিভাষিক শব্দাবলী (Glossary)

অতিরিক্ত খেলোয়াড়	কোনো খেলায় চূড়ান্ত দলের বাইরে থাকা একজন খেলোয়াড় যিনি খেলা চলাকালীন আহত বা খারাপ প্রদর্শন করা সতীর্থের স্থলাভিষিক্ত হন।
অতিরিক্ত সময়	বিভিন্ন খেলায় নির্ধারিত সময়ের পরে খেলাটি সমতায় থাকলে বিজয়ী নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত অতিরিক্ত খেলার সময়কাল।
অ্যাথলিট	অ্যাথলেটিক্স ক্রীড়াবিদ।
অ্যাথলেটিক্স মিট	অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা।
আম্পায়ার	একজন বিচারক ও কর্তৃপক্ষ হিসেবে খেলাধুলার নিয়ম-কানুনের যথার্থ প্রয়োগ ঘটিয়ে খেলা পরিচালিত করে থাকেন।
ইনডোর কোচিং সেন্টার	আচ্ছাদিত বা গৃহমধ্যস্থ ক্রীড়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।
একদিনের ক্রিকেট ম্যাচ	ক্রিকেট প্রতিযোগিতা যেখানে দুটি দলের মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক ওভারের (সাধারণত প্রত্যেক দল ৫০ ওভার খেলে থাকে) খেলা হয়।
একদিনের ক্রিকেট সিরিজ	ক্রিকেট প্রতিযোগিতা যেখানে দুটি ক্রিকেট দল একাধিক এক দিবসীয় ক্রিকেট খেলায় পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।
ওভার	ক্রিকেট খেলায় একজন বোলার দ্বারা ব্যাটসম্যানের দিকে করা ছয়টি বৈধ বল।
কোচিং ক্যাম্প	খেলাধুলার প্রশিক্ষণের জন্য আয়োজিত শিবির।
ক্রিকেট পিচ	ক্রিকেট খেলার মাঠের মাঝখানে দুই উইকেটের মধ্যবর্তী একটি নির্দিষ্ট স্থান যেখানে ব্যাটসম্যান বোলার দ্বারা কৃত বলের সম্মুখীন হয়।

গ্রুপ	ক্রিড়া প্রতিযোগিতার প্রাথমিক পর্বে অংশগ্রহণকারী দল বা ব্যক্তি গুলিকে নিয়ে গঠিত উপবর্গ, যেখানে একটি উপবর্গে অবস্থানকারী সকল ব্যক্তি বা দল পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে প্রতিযোগিতার পরবর্তী স্তরে উন্নীত হওয়ার জন্য।
চেয়ারম্যান	সভাপতি।
চ্যাম্পিয়ন	লীগ বা প্রতিযোগিতার সেরা দল বা ব্যক্তি।
জার্সি	খেলোয়ার দলের পরিচয় জ্ঞাপক বিশেষ ধরনের পোশাক।
জেলা ট্রাইব্যুনাল	জেলার ক্রীড়া সংক্রান্ত বিরোধ বা দ্বন্দ্বের মীমাংসার জন্য গঠিত বিচারক সংস্থা।
জ্যাভলিন থ্রো	বর্শা নিক্ষেপ। অ্যাথলেটিক্সের ট্রাক অ্যান্ড ফিল্ড বিভাগের অন্তর্গত খেলা যেখানে প্রতিযোগীরা সর্বোচ্চ দূরত্বে বর্শা নিক্ষেপ করার চেষ্টা করে থাকে।
টস	ক্রিকেট খেলার শুরুর আগে কোন দল ব্যাট করবে বা ফিল্ড করবে তা নির্ধারণের জন্য মুদ্রা উল্টানো।
টুর্নামেন্ট	একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা যেখানে অনেক ব্যক্তি বা অনেকগুলো দলের মধ্যে নির্দিষ্ট একটি ক্রীড়ায় নির্দিষ্ট ক্রীড়া সূচির মাধ্যমে খেলাধুলার নিয়ম-কানুন মেনে কেবলমাত্র একজন ব্যক্তি বা দলকে বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হয়।
ট্রায়াথলন	একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা যা সাধারণ সাঁতার, সাইকেল চালানো ও দূরত্বে দৌড়ানো এই তিনটি খেলার সমন্বয়ে গঠিত।
ট্রায়াল ক্যাম্প	কোনো ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য দল গঠনের উদ্দেশ্যে আয়োজিত খেলোয়াড়দের ক্রীড়া দক্ষতা যাচাই করার শিবির।

ট্রিপল জাম্প বা হপস্টেপ অ্যান্ড জাম্প	হপস্টেপ অ্যান্ড জাম্প বা লাফ, ঝাঁপ ধাপ অর্থাৎ এই তিনের সমন্বয়ে যে লাফ দেওয়া হয় তাকে বলা হয় ট্রিপল জাম্প। অ্যাথলেটিক্সের ট্রাক অ্যান্ড ফিল্ড বিভাগের অন্তর্গত খেলা যেখানে প্রতিযোগীরা শুরুর দৌড় থেকে লাফ, ধাপ এবং লাফ দিয়ে যতদূর সম্ভব লাফ দেওয়ার চেষ্টা করে।
ডিসকাস থ্রো	অ্যাথলেটিক্সের ট্রাক অ্যান্ড ফিল্ড বিভাগের অন্তর্গত খেলা যেখানে প্রতিযোগীরা একটি ভারী ওজনের একটি ডিস্ক আকৃতির বস্তু কে একটি নিক্ষেপর জন্য নির্দিষ্ট স্থানে দূরত্বের জন্য ছুঁড়ে মারেন।
নকআউট খেলা	কোনো প্রতিযোগিতার এমন কোনো খেলা যেখানে পরাজিত দল স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতিযোগিতা থেকে বাদ পরে এবং বিজয়ী দল পরবর্তী পর্যায়ে উন্নীত হয়।
নকআউট প্রতিযোগিতা	একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা যেখানে অংশগ্রহণকারী দল বা ব্যক্তি প্রতিযোগিতার কোনো খেলায় পরাজিত হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমস্ত প্রতিযোগিতা থেকে বাদ পরে যতক্ষণ না চূড়ান্ত বিজয়ী নির্ধারিত হয়।
পারফরমেন্স	ক্রীড়া কৌশল প্রদর্শন বা প্রদর্শিত ক্রীড়া কৌশলাদি।
পেনট্রাথলন	একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা যা দৌড়, অশ্বচালনা, সাঁতার, বর্শা নিক্ষেপ ও শুটিং- এই পাঁচটি খেলা বা বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত।
পোলভল্ট	পল এর উপর ভর দিয়ে যে লাফ দেওয়া হয় তাকে পলভোল্ট বা দন্ডলাফ বলে। অ্যাথলেটিক্সের ট্রাক অ্যান্ড ফিল্ড বিভাগের অন্তর্গত খেলা যেখানে প্রতিযোগীদের একটি লম্বা ও নমনীয় দণ্ড সহযোগে শূন্যে লাফিয়ে অনেক উঁচুতে অবস্থিত একটি প্রতিবন্ধক আড়দন্ডের উপর দিয়ে সেটিকে স্পর্শ না করে অতিক্রম করতে হয়।

প্রদর্শনী খেলা/ প্রীতি খেলা	এমন একটি ক্রীড়া অনুষ্ঠান যেখানে অংশগ্রহণকারী দলগুলির কোনো বস্তুগত প্রাপ্তি অর্থাৎ আর্থিক পুরস্কার যুক্ত থাকে না এবং যা খেলোয়াড় বা দলের অবস্থানকে প্রভাবিত করে না।
ফাইনাল	প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত খেলা যার মাধ্যমে চূড়ান্ত বিজয়ী নির্ধারিত হয়।
ফিল্ড	খেলাধুলা বা ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মাঠ বা ক্ষেত্র।
বার্ষিক স্পোর্টস	কোনো ক্রীড়া সংগঠনের দ্বারা আয়োজিত বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা যেখানে মূলত অ্যাথলেটিক্সের বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলার প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়ে থাকে।
বেস্ট পারফর্মড অ্যাথলিট	অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় সর্বোত্তম ক্রীড়া দক্ষতা তুলে ধরা প্রতিযোগী।
ব্রড জাম্প	অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা যেখানে প্রতিযোগীরা একটি নির্দিষ্ট চিহ্নিত স্থান থেকে দাঁড়ানো অবস্থায় শুরু করে সম্ভাব্য সর্বাধিক দূরত্বে লাফানোর চেষ্টা করে।
ম্যানেজিং কমিটি	পরিচালক সমিতি।
ম্যান্ডেটরি ওভার	ক্রিকেট খেলায় বিশেষ কিছু পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট সংখ্যক ওভার সম্পন্ন করার বাধ্যবাধকতা।
যুগ্ম বিজয়ী	কোনো প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্যায়ে জয়লাভকারী একাধিক দল বা ব্যক্তি।
রানার্সআপ	এমন প্রতিযোগী বা দল যারা কোনো প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত খেলায় পরাজিত হয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।
রেফারি	খেলার নিয়ম প্রয়োগ, জরিমানা এবং নিয়ম বহির্ভূত কাজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা।
রিলে দৌড়	একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে চারজন প্রতিযোগী সমান দূরত্বে ব্যাটন বা কাঠি নিয়ে দৌড়ায় তখন তাকে রিলে দৌড় বলে।

লীগ — কোনো খেলার প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য একত্রিত দলগুলির মধ্যে অনুষ্ঠিত খেলা যেখানে প্রতিটি দল পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলায় অবতীর্ণ হয় এবং যে দল সবথেকে বেশি খেলায় জয়লাভ করে সেই চূড়ান্ত বিজয়ী হয়।

লীগ কাম নক আউট — ক্রীড়া প্রতিযোগিতা যেখানে প্রথমে অংশগ্রহণকারী দলগুলির অবস্থান নির্ধারণের জন্য লীগ প্রথায় খেলা অনুষ্ঠিত হয় এবং তারপর নকআউট রাউন্ডের খেলার মাধ্যমে চূড়ান্ত বিজয়ী স্থির করা হয়।

লং জাম্প — দীর্ঘ লম্ফন বা লাফ। অ্যাথলেটিক্সের ট্রাক অ্যান্ড ফিল্ড বিভাগের অন্তর্গত খেলা যেখানে প্রতিযোগীরা শুরুর বিন্দু থেকে যতদূর সম্ভব লাফানোর চেষ্টা করে।

শটপুট — অ্যাথলেটিক্সের ট্রাক অ্যান্ড ফিল্ড বিভাগের অন্তর্গত প্রতিযোগিতা যেখানে ক্রীড়াবিদরা এক হাতে ভারী ধাতব বল নিক্ষেপ করেন।

সেন্ট্রাল ব্লকার — ফুটবল দলের খেলোয়াড় যার প্রধান কাজ হলো সরাসরি নিজের দলের গোলের সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিপক্ষকে গোল করতে বাধা দেওয়া।

সেমিফাইনাল — প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত খেলার আগে অনুষ্ঠিত খেলা, যার মাধ্যমে চূড়ান্ত খেলায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি বা দলকে নির্দিষ্ট করা হয়।

স্ট্রাইকার — ফুটবল খেলায় প্রতিপক্ষের গোলের সবচেয়ে কাছে অবস্থানকারী খেলোয়াড় যার প্রধান লক্ষ হলো নিজের সতীর্থদের কাছ থেকে বল গ্রহণ করে সঠিকভাবে গোল করা।

হাই জাম্প — উচ্চ লম্ফন বা লাফ। অ্যাটলেটিক্সের ট্রাক অ্যান্ড ফিল্ড বিভাগের অন্তর্গত খেলা যেখানে প্রতিযোগীদের মাপা উচ্চতায় স্থাপন করা একটি অনুভূমিক দন্ডের উপর দিয়ে, কোনো সাহায্য ছাড়া, ঝাঁপিয়ে যেতে হয়, দ্বণ্ডটিকে ফেলে না দিয়ে।

হার্ডেল দৌড় অ্যাথলেটিক্সের ট্রাক অ্যান্ড ফিল্ড বিভাগের অন্তর্গত দৌড় প্রতিযোগিতা যেখানে প্রতিযোগীদের দৌড়ের সময় একাধিক বাধা অতিক্রম করতে হয়।

সারণি সূচি

সারণি	পৃষ্ঠা নং
১. ১৯৪১ থেকে ২০১১ সাল পযর্ন্ত নদীয়া জেলার জনসংখ্যা পরিবর্তনের পরিসংখ্যান।	৩৪৬
২. ১৯৪১ থেকে ২০১১ সাল পযর্ন্ত নদীয়া জেলার নারী জনসংখ্যা পরিবর্তনের পরিসংখ্যান।	৩৪৭
৩. ১৯৪১ থেকে ২০১১ সাল পযর্ন্ত নদীয়া জেলার মোট জনসংখ্যায় হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের শতকরা মানুষের সংখ্যা।	৩৪৮

মানচিত্র সূচি

মানচিত্র	পৃষ্ঠা নং
১. বিংশ শতকের প্রথমার্ধে অবিভক্ত বাংলার মানচিত্র।	৩৫০
২. ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়ের অবিভক্ত নদীয়া জেলার মানচিত্র।	৩৫১
৩. ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ের নদীয়া জেলার মানচিত্র।	৩৫২

প্রথম অধ্যায়:

ভূমিকা

বর্তমানে ইতিহাস চর্চার দিগন্ত প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস চর্চার পাশাপাশি মানব সমাজের অন্যান্য বিষয়গুলিও ইতিহাস চর্চার প্রচলিত ঘরানায় নিজেদের স্থান করে নিচ্ছে। মানব কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্র যেমন বিচিত্র, তেমনি সেই বিচিত্র কর্মকাণ্ডের প্রায় সমস্ত ক্ষেত্র যথা – লোক সংস্কৃতি, সমাজে নারীর অবস্থান, বিজ্ঞান, পরিবেশ, জনস্বাস্থ্য ও ক্রীড়া বা খেলাধুলার মতো বিষয়গুলিও ইতিহাস চর্চার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোই, ইতিহাস রচনার বিষয়বস্তু হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। ইতিহাস চর্চার বিবর্তনের ধারায় আধুনিক ঐতিহাসিকেরা সার্বিক ইতিহাস (Total History) রচনার কথা বলেছেন, যা মানব অভিজ্ঞতার সমস্ত ক্ষেত্রকে ইতিহাস রচনার কাঠামোয় অন্তর্ভুক্তির স্বপক্ষে মত দেয়।[১] এই সার্বিক ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা থেকে ক্রীড়া ইতিহাসের উৎপত্তি। মানব সভ্যতা ও সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল ক্রীড়া। ক্রীড়া ইতিহাস সার্বিক অর্থেই মানব সভ্যতা, সমাজ ও সংস্কৃতির বিবর্তন কে বোধগম্য করে তুলতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে, কারণ একদিকে ক্রীড়া ইতিহাসের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট সমাজের আর্থসামাজিক অবস্থা ও বিবর্তনকে যেমন অনুধাবন করা যায়, তেমনি অন্যদিকে সমাজের আর্থসামাজিক অবস্থা ক্রীড়া ক্ষেত্রকেও প্রভাবিত করে থাকে।

- **১.২. গবেষণার সমস্যা নির্বাচন ও নির্ধারিত সময়ের যৌক্তিকতা:**

পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রাচীন জনপদ হল নদীয়া। নদীয়া সাংস্কৃতিক দিক থেকে যেমন এক সমৃদ্ধ জেলা তেমনি এর সুদীর্ঘ ক্রীড়া ইতিহাস রয়েছে, যা যথেষ্ট মনোযোগের দাবি রাখি। পশ্চিমবঙ্গের ক্রীড়া ইতিহাস নিয়ে একাধিক গবেষণাপত্র রচিত হলেও জেলাভিত্তিক ক্রীড়া ইতিহাস নিয়ে গবেষণা সে অর্থে হয়নি। নদীয়া জেলার ক্রীড়া ইতিহাসের যথার্থ ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ গবেষণা পত্রটির মূল উদ্দেশ্য। গবেষণার সময়কাল হিসেবে ১৯৬৭ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত সময় কালকে নির্বাচন করা হয়েছে। উক্ত সময় পর্ব নির্বাচনের পশ্চাদে জেলার ক্রীড়া ইতিহাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যতা বজায় রাখা হয়েছে। ২৩শে জানুয়ারি ১৯৬৭ সালে জেলার প্রধান ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসেবে নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন (Nadia District Sport Association, N.D.S.A)-এর অধীনস্থ স্টেডিয়াম, যা একই সঙ্গে এন.ডি.এস.এ (N.D.S.A)-এর প্রধান কার্যালয় তার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয় কৃষ্ণনগর

শহরে ফলে গবেষণা কার্যটির সূচনা পর্ব হিসেবে উক্ত বছরটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে। গবেষণা কার্যটির সমাপ্তি কাল হিসেবে ২০১৭ সালকে বেছে নেওয়া হয়েছে কারণ ওই বছর ভুবনেশ্বরে আয়োজিত এশীয় অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে ৪x৪০০ মিটার রিলে দৌড়ে জেলার মেয়ে দেবশ্রী মজুমদার সোনা জেতেন, যা ক্রিকেট ও ফুটবলের মতো জনপ্রিয় খেলার বাইরে এক উল্লেখযোগ্য সাফল্যকে তুলে ধরে।

• ১.৩. সাহিত্য পর্যালোচনা:

প্রথাগত জ্ঞানচর্চার কাঠামোই প্রথম ভারতীয় কর্তৃক ক্রীড়া বিষয়ক গবেষণার কথা আমরা জানতে পারি ১৯৮৮ সালে। ওই বছর সৌমেন মিত্র জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ে ঔপনিবেশিক বাংলায় ফুটবলের ভূমিকা বিষয়ে তার গবেষণাপত্র প্রদান করেন।[২] যা পরবর্তীকালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।[৩] ১৯৮০-এর দশক থেকে ভারতীয় ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীরা ভারতে জনপ্রিয়তার নিরিখে সম্ভবত প্রথম স্থানাধিকারী ক্রীড়া হিসাবে ক্রিকেটের ইতিহাস রচনার বিষয়ে উদ্যোগী হন। রামচন্দ্র গুহ "A Corner of a Foreign Field"[৪], মিহির বসু "The Magic of Indian Cricket"[৫], এবং আশিস নন্দী "The Tao of Cricket"[৬] গ্রন্থে ভারতের ক্রিকেটের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। মারিও রদ্রিগেজ (Mario Rodriguaz) ক্রিকেটার রঞ্জিত সিং-এর রাজনৈতিক জীবনের বর্ণনা দিয়েছেন, যা ভারতের ক্রিকেটের ইতিহাসকেও বহুলাংশে আলোকিত করে।[৭] এছাড়াও এডওয়ার্ড ডকার (Edward Docker)[৮] ও রিচার্ড ক্যাশম্যান (Richard Cashmann)[৯] ভারতের ক্রিকেটের ইতিহাস বিষয়ে গবেষণা করেছেন। বোরিয়া মজুমদার ভারতীয় ক্রিকেটের সামাজিক ইতিহাসের বর্ণনা দিয়েছেন তার "Twenty Two Yards to Freedom" গ্রন্থে।[১০] ভারতে প্রচলিত আরেকটি জনপ্রিয় ক্রীড়া ফুটবল বিষয়েও একাধিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচিত হতে দেখা যায়। টনি মেসন (Tony Mason) "Football on the Maiden : Cultural Imperialism in India" প্রবন্ধে ব্রিটিশদের সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের একটি অংশ হিসেবে কলকাতার ময়দানে ফুটবল খেলার প্রচলনকে ব্যাখ্যা করেছেন।[১১]

একবিংশ শতাব্দীতে দক্ষিণ এশীয় সমাজে খেলার ভূমিকাকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় পশ্চিমী ঐতিহাসিকদের মধ্যে। এই প্রচেষ্টার একটি অন্যতম উজ্জ্বল প্রতিফলন হল পল ডিমিও (Paul Dimeo) ও জেমস মিলস (James Mills) কর্তৃক সম্পাদিত "Soccer in South Asia" গ্রন্থ।[১২] উক্ত গ্রন্থে ভারতীয় ফুটবল বিষয়ে একাধিক প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। বোরিয়া মজুমদার ও কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায় "Goalles: The Story of a Unique Footballing Nation" গ্রন্থে ভারতীয় ফুটবলে জাতীয়, প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক স্তরের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও টানাপোড়েনের বিষয়টি তুলে ধরেছেন এবং একই সঙ্গে ফুটবলের মাঠে সাম্রাজ্যবাদ, জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও বাণিজ্যিকতার প্রতিফলনের বিষয়টিও বর্ণনা করেছেন।[১৩] ঔপনিবেশিক দেশ গুলিতে পশ্চিমী খেলাধুলার আগমন তার ইউরোপীয় প্রেক্ষাপট ও বিবর্তন বর্ণিত হয়েছে জে.এ. ম্যাঙ্গান (J.A.Mangan) রচিত "The Games Ethics and Imperialism" গ্রন্থে।[১৪] রনজয় সেন "A History of Sport in India" গ্রন্থে প্রাচীন যুগ থেকে উত্তর ঔপনিবেশিক যুগ পর্যন্ত ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন ক্রীড়ার ধারাবাহিক বর্ণনা তুলে ধরেছেন।[১৫] জেমস মিলস (James Mills) সম্পাদিত "Subaltern Sports" গ্রন্থটি ভারতীয় খেলার ইতিহাসে নিম্নবর্গীয় ধারা ও অংশগ্রহণের বিষয়টি আলোকিত করেছে।[১৬] ভারতে খেলার ইতিহাস বিষয়ক অধিকাংশ গবেষণা মূলত ক্রিকেট ও ফুটবলের মতো দুটি জনপ্রিয় ক্রীড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। তবে বর্তমানে এক্ষেত্রে কিছু উজ্জ্বল ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হচ্ছে ফলে অলিম্পিকে ভারত কিংবা ভারত ও কমনওয়েলথ গেমস-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিও খেলার ইতিহাস চর্চায় সংযোজিত হয়েছে।[১৭] এই ধারারই একটি নিদর্শন হল বোরিয়া মজুমদার ও নলিন মেহেতা রচিত "Olympics: The Indian Story" গ্রন্থটি।[১৮]

• ১.৪. গবেষণার অনুমান ও সম্পর্কিত প্রশ্নাবলী:

সামাজিক গবেষণায় অনুমান একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এই অনুমান সর্বদাই তথ্য নির্ভর হওয়া একান্ত আবশ্যক। জ্ঞান ও তত্ত্ব থেকে উদ্ভূত আপাত স্থিরিকৃত ধারণা বা বিবৃতি যা অন্যান্য অজানা তথ্য

ও তত্ত্ব অনুসন্ধানের পথপ্রদর্শক হিসেবে সাহায্য করে থাকে, সাধারণ অর্থে তাকেই অনুমান বলা হয়ে থাকে। এই অনুমানের উপর ভিত্তি করে সর্বপ্রথম গবেষণার শিরোনামটি নির্ধারণ করা হয়েছে। আমার চয়ন করা এই শিরোনাম নিয়ে পূর্বে কেউ কাজ করেছে কিনা? অথবা আমার দেওয়া শিরোনামের সঙ্গে মিল আছে কিনা?- ইত্যাদি অনুসন্ধান করা হয়েছে এবং এই অনুসন্ধানের মাধ্যমে যখন আমি নিশ্চিত হয়েছি যে এই শিরোনামটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র তখন আমি শিরোনাম হিসাবে “নদীয়া জেলার খেলাধুলা ও ক্রীড়া সংগঠন: একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষা (১৯৭৬- ২০১৭)”-টিকে বেছে নিয়েছি।

উক্ত শিরোনামে গবেষণার জন্য কি ধরনের তথ্য সংগ্রহ করা দরকার, কেমন ধরনের বিষয় গত সুস্পষ্টতা তুলে ধরা দরকার, বিষয়ের সাথে সঙ্গতি রেখে কেমন ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করা উচিত, কেমন ধরনের নকশা প্রণয়ন-নির্ধারণ ও অবয়ব গঠন করা উচিত এবং পরিকল্পনামাফিক অধ্যায় বিন্যাস কেমন হওয়া বাঞ্ছনীয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিচালক, নির্দেশক তথা সর্বোপরি পথপ্রদর্শক হিসেবে সাহায্য করেছে অনুমান।

উক্ত গবেষণা কার্যটি যে প্রশ্নগুলোকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে সেগুলি হল-

১. খেলাধুলার যথার্থ সংজ্ঞা কী?

২. খেলাধুলা কিভাবে প্রথাগত ইতিহাস চর্চার কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত হল?

৩. নদীয়া জেলায় কিভাবে পাশ্চাত্য খেলাধুলার প্রচলন হয়?

৪. প্রাথমিক পর্যায়ে জেলার কোন কোন অঞ্চলে, কোন কোন খেলা গুলি বিস্তার লাভ করেছিল?

৫. খেলা গুলি কিভাবে সংগঠিত হয় এবং কিভাবে খেলাধুলা গুলিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সংগঠন গড়ে ওঠে?

৬. খেলাধুলা প্রসারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ক্রীড়া সংগঠনগুলি কী ধরনের ভূমিকা পালন করেছে?

৭. বিভিন্ন সময় পর্বে, বিভিন্ন খেলাধুলা গুলির জনপ্রিয়তা ও প্রসারের ক্ষেত্রে কী ধরনের তারতম্য লক্ষ করা যায়?

৮. আঞ্চলিক থেকে আন্তর্জাতিক স্তর পর্যন্ত, খেলাধুলার বিভিন্ন পর্যায়ে জেলার খেলোয়াড় ও ক্রীড়া সংগঠকরা কী ধরনের অবদান রেখেছেন তা বিশ্লেষণ করা?

৯. খেলার মাধ্যমে জেলার আর্থসামাজিক পেক্ষাপটের কী চিত্র ফুটে ওঠে?

১০. খেলাধুলায় নারী ও বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর কী ধরনের অবদান লক্ষ করা যায়? ইত্যাদি।

• ১.৫. গবেষণার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য:

গবেষণা কার্যের উদ্দেশ্য গুলি হল- নদীয়া জেলার প্রধান ক্রীড়া নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে এন.ডি.এস.এ ও তার অধীনস্থ বা অনুমোদিত ক্লাবগুলোর ইতিহাস বর্ণনা, জেলার ক্রীড়া ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলিকে চিহ্নিত করণ, জেলার বিশিষ্ট ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব ও তাদের সাফল্যের ইতিবৃত্ত বর্ণনা এবং সর্বোপরি ক্রীড়ার মাধ্যমে ধারক সমাজের যে বৈশিষ্ট্য ও বিবর্তনের ধারা প্রতিফলিত হয় তা বিশ্লেষণ করা।

• ১.৬. গবেষণার পদ্ধতি:

এই গবেষণাটি মূলত একটি আন্তঃবিষয় অধ্যায়ন। গবেষণার ক্ষেত্রে ক্রীড়া ইতিহাস বিষয়ক বিভিন্ন তত্ত্ব ও তার বিশ্লেষণের জন্য একাধিক পুস্তকের সাহায্য নেওয়া হয়েছে এবং জেলার ক্রীড়া বিষয়ক তথ্য সংগ্রহের জন্য ক্ষেত্র সমীক্ষার মাধ্যমে জেলার বিভিন্ন গ্রন্থাগার, ক্রীড়া সংগঠন ও ক্লাবের নথিপত্র, বার্ষিক কর্ম বিবরণী, প্রচার পুস্তিকা, ক্রীড়া বিষয়ক সংবাদপত্র, বার্ষিক হিসাব বিবরণী, সংগঠনের শাসনতান্ত্রিক পুস্তিকা প্রভৃতি থেকে প্রাথমিক তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। এছাড়াও তথ্য সংগ্রহের জন্য মৌখিক ইতিহাসের উপাদান হিসেবে জেলার ক্রীড়া সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ক্রীড়াবিদদের

সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। সমসাময়িক বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রতিবেদনও তথ্যভাণ্ডার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

• ১.৭. গবেষণা সন্দর্ভের অধ্যায় বিন্যাস:

বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভটি কয়েকটি অধ্যায়ে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে, যা নিম্নে বর্ণিত-

▪ প্রথম অধ্যায়- ভূমিকা:

গবেষণার উদ্দেশ্য, পরিধি ও অধ্যায় বিন্যাস দেখানো হয়েছে এবং সেই সংক্রান্ত প্রাথমিক ধারণা প্রদান করা হয়েছে।

▪ দ্বিতীয় অধ্যায়- খেলার সংজ্ঞা, ইতিহাস চর্চা ও সমাজের সাথে সম্পৃক্ততা:

খেলার ইতিহাস রচনা সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে খেলা বা ক্রীড়া বলতে কী বোঝায় অর্থাৎ উক্ত বিষয়ের সংজ্ঞা নির্ধারণ ও সেই সংক্রান্ত জটিলতার বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে। বাংলা ভাষায় 'খেলা' বা 'ক্রীড়া' শব্দ দুটি প্রায় সমার্থক অর্থে ব্যবহৃত হলেও উভয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য বর্তমান। 'খেলা' শব্দটিকে অনেক বিস্তৃত অর্থে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যার ফলে এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে অসংখ্য অপ্রতিযোগিতা বা অপ্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলা যথা- ছোরা খেলা। অপরদিকে 'ক্রীড়া' শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়েছে মূলত প্রতিদ্বন্দ্বিতা মূলক খেলা বোঝাতে যথা মল্লক্রীড়া।[১৯] বাংলা 'খেলা' ও 'ক্রীড়া' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 'Play', 'Game', 'Sport'। বাংলা ভাষায় 'খেলা' ও 'ক্রীড়া' শব্দ দুটির মধ্যে পার্থক্য প্রায় নগণ্য হলেও ইংরেজি 'Play', 'Game', 'Sport' শব্দগুলির মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বর্তমান। 'Play' শব্দটিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে "To do things for pleasure, as children do, to enjoy yourself, rather than work"[২০] অর্থাৎ খেলার ক্ষেত্রে কোন কিছু করার স্বাধীনতাই হল মুখ্য। এক্ষেত্রে আনন্দ খেলায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। যদিও এর সঙ্গে স্বাস্থ্যের উন্নতি, চরিত্রের

বিকাশ ঘটানো, সামাজিকীকরণের মতো বিষয়গুলি সংযুক্ত। বিভিন্ন মনোবিদ, দার্শনিক, ক্রীড়াবিজ্ঞানী ক্রীড়ার বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন।

বিভিন্ন মনোবিদ খেলা বা ক্রীড়া- এর সংজ্ঞা সংক্রান্ত বিভিন্ন সুচিন্তিত মতবাদ প্রদান করেছেন, প্রথমে যা উল্লেখের দাবি রাখে। মনোবিদ রস (Ross) বলেছেন, "Play is joyful, spontaneous, creative activity in which man find his fullest self expression."।[২১] ম্যাকডুগাল (McDougall) উল্লেখ করেছেন, "Play is the outcome of the primal libido or vital energy flowing not in the channel of instinct, but over flowing, generating a vague appetite for movement and finding out let it any or all the motor mechanism in turn."।[২২] হার্লক (Hurlock) বলেছেন, "Play relates to any activity engaged in for the enjoyment it gives, without consideration of the end result."।[২৩] রায়বার্ন (Ryburn) উল্লেখ করেছেন, "Play is a way, a means which is used by the self when the different instinctive urges are trying to express themselves."।[২৪]

ঐতিহাসিক ও নৃতত্ত্ববিদরাও ক্রীড়া সংজ্ঞা নির্ধারণ সংক্রান্ত জটিলতায় অংশগ্রহণ করেছেন এবং এই বিষয়ে বিভিন্ন মতামত প্রদানের মাধ্যমে বা সমালোচনার মাধ্যমে আমাদের জ্ঞানভান্ডার কে আরোও সমৃদ্ধ করেছেন। ডাচ ঐতিহাসিক জন হুইজিঙ্গা (John Huizinga) ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত গ্রন্থ "Homo Ludens" (Man the Player)- তে উল্লেখ করেছেন যে সকল মানবিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে খেলার উপাদান বা বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। তার মতে ক্রীড়া হল স্বাধীনতা এবং দৈনন্দিন জীবনের বাইরে পদার্পণের একটি মাধ্যম।[২৫] তিনি উল্লেখ করেছেন, "All peoples play, and play remarkably alike, but their languages differ widely in their conception of play..."।[২৬] ১৯৬০- এর দশকে ফরাসি নৃতত্ত্ববিদ রজার ক্যালিওস (Roger Caillois), হুইজিঙ্গা-এর মতের সমালোচনা করে ক্রীড়ার একটি পরিশোধিত সংজ্ঞা প্রদান করে বলেছেন, "In effect, play is essentially a separate

occupation, carefully isolated from the rest of life, and generally is engaged in with precise limits of time and space."।[২৭] এছাড়াও তিনি ক্রীড়া কে কতগুলি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন।[২৮] উপরোক্ত মতামতগুলি মূলত ইংরেজি 'Play' শব্দটিকে ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বিভিন্ন চিন্তাবিদ কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছে। ইংরেজি 'Game' শব্দটি বলতে বোঝায় "An activity or a sport with rules in which people or teams compete each other."।[২৯] স্বতঃপ্রবৃত্ত ক্রীড়া যখন নির্দিষ্ট নিয়মাবলির বাঁধনে আবদ্ধ হয়ে, নির্দিষ্ট স্থান, নির্দিষ্ট সময় ও নির্দিষ্ট পরিসংখ্যানের চৌহদ্দিতে সীমাবদ্ধ হয় তখন তাকে 'Game' বলা হয়ে থাকে, অর্থাৎ 'Game'- এর ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ততা দমিত হয়ে, ক্রীড়ার সাংগঠনিক জটিলতা ও নিয়ম-কানুন মুখ্য হয়ে ওঠে।[৩০] অপরদিকে ইংরেজি 'Sport' শব্দটিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, "Activity that you do for pleasure and that needs physical effort or skill, usually done in a special area and according to fix rules."।[৩১] 'Game'- এর বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সাংগঠনিক ব্যাপকতা ও প্রতিযোগিতা প্রাধান্য পেয়েছে। আর এই আনুষঙ্গিক সংযোজনের ফলে 'Game' ক্রম বিবর্তিত হয়ে যে নবরূপ লাভ করে তাকে 'Sports' বলা হয়ে থাকে।[৩২]

মার্কিন ঐতিহাসিক অ্যালান গাটম্যান (Allen Guttmann) তার, "From Ritual to Record" গ্রন্থে, হুইজিঙ্গা- এর ক্রীড়া বিষয়ক মতের তীব্র সমালোচনা করেছেন। বিশেষত হুইজিঙ্গা যেভাবে বিভিন্ন ধরনের খেলা ও প্রতিযোগিতার মধ্যে বিভাজন না করে সমস্ত ধরনের প্রতিযোগিতা কে ক্রীড়া হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তার তীব্র বিরোধিতা করেছেন গাটম্যান। তিনি Play, Game ও Sport- এর মধ্যে পার্থক্যগুলিকে সুস্পষ্ট ভাবে চিহ্নিত করেছেন। 'Play' বলতে তিনি বুঝিয়েছেন, "Play is any nonutilitarian physical or intellectual activity pursued for its own sake."।[৩৩] এই 'Play' কে তিনি দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন, প্রথমত- স্বতঃস্ফূর্ত খেলা (Spontaneous play) ও দ্বিতীয়ত- সংগঠিত খেলা (Organised play)। দ্বিতীয় শ্রেণি ভুক্ত সংগঠিত খেলাকে তিনি 'Game' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কোন খেলাকে 'Game' পর্যায়ে উন্নীত হতে গেলে তাকে অবশ্যই কিছু

নিয়ম নীতির দ্বারা শৃঙ্খলায়িত হতে হবে, "..but most play is regulated and rule bound."।[৩৪] 'Sport' বলতে তিনি বুঝিয়েছেন, "... 'playful' physical contests, that is, as nonutilitarian contest which include and important measure of physical as well as intellectual skill."।[৩৫] তিনি আধুনিক ক্রীড়ার সূচনা পর্ব হিসেবে অষ্টাদশ শতককে চিহ্নিত করেছেন এবং অষ্টাদশ শতক পরবর্তী আধুনিক ক্রীড়ার সঙ্গে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ক্রীড়ার পার্থক্যকে চিহ্নিত করেছেন। ওয়েবারিয়ান (Weberian) মডেলকে ব্যবহার করে আধুনিক ক্রীড়ার সাতটি বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করেছেন তিনি যথা – ধর্মনিরপেক্ষতা, সুযোগের সমতা, যুক্তিবাদিতা, বিশেষীকরণ, পরিমাপ যোগ্যতা, আমলাতান্ত্রিক সংগঠন এবং রেকর্ড এর প্রতি আকর্ষণ। আধুনিক ক্রীড়ার প্রকৃতি বিষয়ে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "Once the Gods have vanished from Mount Olympus or from the Dante's paradise, we can no longer run to appease them or to save our souls, but we can set a new record. It is a uniquely modern form of immortality."।[৩৬]

ইংরেজি 'Play', 'Game' এবং 'Sport' শব্দগুলি ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করলেও যেহেতু এই তিনটি শব্দটিকে বাংলায় 'ক্রীড়া' বা 'খেলা' বলা হয়ে থাকে, তাই এই গবেষণাপত্রে 'ক্রীড়া' ও 'খেলা' শব্দ দুটিকে সমার্থক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে ক্রীড়া বা খেলা বলতে আধুনিক ক্রীড়া বা ইংরেজি 'Sport' – কে বোঝানো হয়েছে, অর্থাৎ যে সমস্ত ক্রীড়াগুলি সংগঠিত ভাবে, সংগঠনের অধীনে, প্রতিযোগিতা মূলক ভাবে সংঘটিত হয়ে থাকে সেই সমস্ত ক্রীড়াকেই গবেষণার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ঐতিহাসিক ই.জে. হবসবম (E.J. Hobsbowm) ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নতুন সামাজিক অভ্যাস হিসেবে ক্রীড়াকে অভিহিত করেছেন।[৩৭] কিন্তু প্রথাগত ইতিহাস চর্চার কাঠামোতে খেলাধুলাকে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা হয়নি। প্রাথমিক পর্যায়ে মূলত নৃতাত্ত্বিকরা

ক্রীড়া বিষয়টিকে প্রথাগত জ্ঞানচর্চার কাঠামোয় অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছিলেন।[৩৮] এডওয়ার্ড বার্নেট টেইলর (Edward Burnett Taylor) যাকে অনেক সময় নৃতত্ত্বের জনক হিসেবে অভীভূত করা হয়ে থাকে, তিনি ১৮৭৯ সালে রচিত প্রবন্ধ "The History of the Games"- তে বিভিন্ন ধরনের খেলার বিষয়ে আলোচনা করেছেন। মার্কিন নৃতত্ত্ববিদ জেমস মুনি (James Mooney) এবং স্টিয়ার্ট কুলিন (Stewart Culin) আমেরিকার আদিম অধিবাসী (Native American) দের মধ্যে প্রচলিত ক্রীড়া গুলির বিষয়ে আলোচনা করেছেন।[৩৯] ডাচ ঐতিহাসিক জন হুইজিঙ্গা (John Huizinga) ১৯৩৮ সালে রচিত গ্রন্থ "Homo Ludens"- তে খেলার বিষয়ে আলোচনা করেছেন।[৪০] ১৯৬০- এর দশকে ফরাসি নৃতত্ত্ববিদ রজার ক্যালিওস (Roger Caillios), হুইজিঙ্গা- এর খেলা বিষয়ক মতের বিরোধিতা করে ক্রীড়া বিষয়ে নিজস্ব বক্তব্য তুলে ধরেন "Man, Play and Games" গ্রন্থে।[৪১] সমাজতত্ত্ববিদ নরবাট এলিশ (Norbert Elias) এবং এরিক ডানিং (Eric Dunning) ক্রীড়ার ক্রমবিকাশ বর্ণনা করতে গিয়ে ক্রীড়ার উদ্ভবকে সভ্যতার ক্রমবিকাশ (Civilizing Process)- এর একটি অংশ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।[৪২]

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে প্রথাগত ইতিহাস চর্চার ঘরানাই ক্রীড়া বিষয়ক রচনা ক্রমশ নিজের স্থান করে নিতে থাকে। ইউরোপ সহ পশ্চিমী বিশ্বে ক্রীড়া ইতিহাস চর্চার সূচনা হয় ১৯৭০- এর দশকে এবং তা বিশেষভাবে প্রসার লাভ করে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে ১৯৮০- এর দশকে কারণ ১৯৮২ সালে "British Society of Sport History" প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ক্রীড়া ইতিহাস চর্চা একটি সাংগঠনিক রূপ লাভ করে। "Frank Cass" প্রকাশনায় ক্রীড়া ইতিহাসচর্চার এই সংগঠনের গবেষণা পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে যা বর্তমানে "The International Journal of the History of Sport" নামে পরিচিত। সমাজবিজ্ঞানী জে.এ. ম্যাঙ্গান (J.A. Mangan), টনি ম্যাসন (Tony Mason), এলান গাটম্যান (Allen Guttmann), রিচার্ড হোল্ট (Richard Holt) প্রমুখদের গবেষণায় ক্রীড়া ইতিহাস চর্চা আরোও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। ক্রীড়া ইতিহাস চর্চার এই উদ্যোগ ক্রমশ ব্রিটেনের বাইরে ইউরোপের অন্যান্য দেশে যথা – ডেনমার্ক, সুইডেন ও ফিনল্যান্ডের মতো দেশে ছড়িয়ে পড়তে থাকে

এবং চীন, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার মতো এশীয় দেশগুলির সমাজবিজ্ঞানী গণও ১৯৮০- এর দশকের শেষ পর্ব থেকে এই প্রয়াসের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করতে থাকেন। ইউরোপে ক্রীড়া ইতিহাস চর্চার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রচারক জে.এ. ম্যাঙ্গান- এর উদ্যোগে স্কটল্যান্ড- এর স্টেট ক্লাউড বিশ্ববিদ্যালয়ে (University of Strathclye) গড়ে ওঠে "International Research Centre for Sport, Socialization and Society" (IRCSSS), যা পরবর্তীকালে ইংল্যান্ডের ডি মন্টফোর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে (De Montfort University) স্থানান্তরিত হয়। জে.এ ম্যাঙ্গান- এর সম্পাদনায় Frank Cass প্রকাশনার অধীনে ১৯৯৮ সালে "Culture, sports, society", ১৯৯৯ সালে "European Sport History Review" এবং ২০০০ সালে "Soccer and Society" নামে তিনটি গবেষণামূলক পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে, যার মধ্যে "Culture, Sports, Society" নামক পত্রিকাটি বর্তমানে "Sport in Society" নামে প্রকাশিত। এই একই সময় কালে "Sport in Global Society" নামে একটি সিরিজের অধীনে অনেক গুলি একক ও সম্পাদিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, Frank Cass প্রকাশনায়, যা পরবর্তীকালে Routledge প্রকাশনার দ্বারা অধিগৃহীত হয়।[৪৩]

ক্রীড়া ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক ও তার বিশ্লেষণের বিষয়টিও যথেষ্ট জটিল এবং এক্ষেত্রেও বিতর্ক লক্ষ করা যায়। অনেক ক্ষেত্রেই প্রথাগত ইতিহাস চর্চার কাঠামোই ক্রীড়া কে অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে তীব্র বক্তব্য পেশ করা হয়ে থাকে। খেলাধুলা যে কোনো সমাজে সাংস্কৃতিক জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ যা ওই সমাজের বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরে। ক্রীড়া ইতিহাস বলতে কোনো খেলার পরিসংখ্যানগত ইতিহাসকে বোঝায় না, বরং খেলার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, অর্থনৈতিক ভাবনা, কূটনীতি ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন রূপের যে প্রতিফলন ঘটে তার ইতিহাস কে বোঝায়।[৪৪] খেলার ইতিহাসের গুরুত্ব কে তুলে ধরতে খেলার ইতিহাসের অন্যতম রূপকার জে.এ. ম্যাঙ্গান লিখেছেন, বর্তমানে ক্রীড়া সমাজে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে যে তা কেবলমাত্র খেলোয়ারদের বিষয় হিসেবে সীমাবদ্ধ না থেকে ক্রমশ এক জনগণের বিষয় হয়ে উঠেছে, যা রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, শিক্ষা বিশেষজ্ঞ ও গবেষকদের কাছে সমান আকর্ষণীয়।[৪৫] খেলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য বিদ্যমান

যা একমাত্র যথার্থভাবে উপলব্ধি করা যায়, যদি আমরা প্রথাগত অবসর বিনোদনের কাঠামোর বাইরে গিয়ে বৃহত্তর ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রেক্ষিতে খেলার তাৎপর্য কে ব্যাখ্যা করি। দক্ষিণ এশিয়া তথা ভারতে খেলা সর্বদা বৃহত্তর ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত থেকেছে। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে ভারতে সাম্রাজ্যবাদ, জাতীয়তাবাদ, আঞ্চলিকতাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, অব-উপনিবেশীকরণ, দেশভাগ, শরণার্থী সমস্যা, কূটনীতি, বাণিজ্যিকতা প্রভৃতি প্রকরণ গুলি বিভিন্ন খেলার বিবর্তনের ইতিহাসে যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তা একমাত্র জানা যায় খেলা গুলির সামাজিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে।[৪৬] ১৯১১ সালে মোহনবাগান কর্তৃক শীল্ড বিজয় সম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে দেশীয় জনগণের জয়ের একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে গড়ে ওঠে, যা ফুটবল খেলার মাঠকে গড়ে তোলে জাতীয়তাবাদের প্রকাশের একটি আদর্শ ক্ষেত্র।[৪৭] ১৯৪৭ সালে দেশভাগ জনিত কারণে পূর্ববঙ্গ থেকে বহুসংখ্যক মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন এবং গৃহহীন, সম্বলহীন এই সমস্ত মানুষের কাছে দৈনন্দিন জীবন হয়ে ওঠে সংগ্রামের এক ক্ষেত্র। একই সঙ্গে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত এই সমস্ত মানুষের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের পুরাতন অধিবাসীদের সম্পর্কের নানা টানাপোড়েন ফুটবল খেলার মাঠকেউ স্পর্শ করে, যার প্রতিফলন লক্ষ করা যায় কলকাতার দুই নামী ক্লাব মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে। যদিও এই ক্লাব দুটির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল দেশভাগের বহু পূর্বে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকালে এবং দুই দলের ফুটবল খেলোয়াড়দের মধ্যেই দুই বঙ্গের প্রতিনিধিত্ব লক্ষ করা যায়। তথাপি দেশভাগ পরবর্তী শরণার্থী সমস্যা দুই দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে নতুন মাত্রা দান করে, সাংস্কৃতিক স্তরে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব যেন হয়ে ওঠে উদ্বাস্তু মানুষের প্রতিনিধি।[৪৮]

স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পর থেকেই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্ক সর্বদাই অম্লমধুর। তবে দুটি দেশের মধ্যে একাধিক যুদ্ধ সত্ত্বেও ক্রিকেট খেলার মাধ্যমে দ্বিপাক্ষিক আদান-প্রদান ও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস দেখা গেছে একাধিকবার। যার সূচনা হয়েছিল ১৯৫২ সালে এবং এর সাম্প্রতিকতম উদাহরণ হল ২০০৪ সালের ভারতের 'শুভেচ্ছা' সফর।[৪৯] স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৪৮ সালের লন্ডন অলিম্পিকে স্বাধীন দেশ হিসেবে ভারত প্রথমবার

অংশগ্রহণ করে, হকি খেলার ফাইনালে এতদিন যাদের হাতে পরাধীন ছিল, সেই ঔপনিবেশিক শাসক অর্থাৎ ব্রিটেন কে পরাজিত করে বিজয় লাভ, এক অন্যতম সেরা সময় হিসাবে রয়ে গেছে ভারতীয় হকি জগতে।[৫০] উপরোক্ত নিদর্শন থেকে বলা যায় যে খেলার মাঠ সর্বদাই ক্রীড়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাইরেও এক বৃহত্তর সমাজের প্রতিফলক হয়ে উঠেছে, যার যথার্থ ইতিহাস রচিত হলে আমাদের সামাজিক জ্ঞান আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। যথার্থ ক্রীড়া ইতিহাস রচিত হলে ভবিষ্যতের তারকারা বেড়ে উঠতে পারে অতীত বোধ নিয়ে, যে ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার তারা বহন করছে সেই সম্পর্কেও তাদের মনে একটা ধারণা তৈরি হয়।[৫১] সর্বোপরি ক্রীড়া ইতিহাস দেখিয়ে দেয় ঔপনিবেশিক ও তার অব্যবহিত পরের যুগেও ভারতের খেলাধুলার সঙ্গে জনসংস্কৃতির একটি নিবিড় যোগ বর্তমান, কিন্তু এই সম্পর্কে খুব কমই জানা যায় এবং তা নিয়ে গবেষণা হয়েছে খুব সামান্যই। ভারতে প্রচলিত প্রথাগত ইতিহাস চর্চা ফুটবল বা ক্রিকেট খেলার গুরুত্বকে জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতাবাদ, জনপ্রিয় সংস্কৃতি ও বাণিজ্যিকতার প্রতিফলক রূপে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে, যা ক্রীড়া ইতিহাস রচিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরে।[৫২] ঐতিহাসিক রামচন্দ্র গুহ খেলার ভারতীয় ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে দুটি দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখ করেছেন- প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি খেলার অভ্যাস, পৃষ্ঠপোষক ও খেলোয়াড়, সংগঠন ও প্রতিযোগিতা প্রভৃতি আলোচনায় সীমায়িত, আর দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি খেলার মাধ্যমে বৃহত্তর বিষয়কে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস করে, আর তিনি এই দ্বিতীয় দৃষ্টিকোণ কেই খেলার ইতিহাস রচনার আদর্শ গুণ বলে মনে করেন।[৫৩] এক্ষেত্রে উভয় দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমেই ক্রীড়া ইতিহাস সার্থক রূপ লাভ করতে পারে।

- **তৃতীয় অধ্যায়- ভারতে খেলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস:**

খেলাধুলা মানব জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং প্রাচীনকাল থেকেই প্রতিটি আদিম সমাজে কিছু খেলাধুলার প্রচলন লক্ষ করা যায়, যা উক্ত সমাজের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরে। ভারতবর্ষও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। প্রাচীন কাল থেকেই ভারতীয় সমাজে নানা ক্রীড়ার প্রচলন ছিল যার সঙ্গে

নতুন ক্রীড়া সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে। ক্রীড়া বিষয়ক যেকোনো আলোচনার পূর্বে ভারতের ক্রীড়া ইতিহাসের বিবর্তন সম্পর্কে একটি ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন। শিকার সম্ভবত ক্রীড়া গুলির মধ্যে প্রাচীনতম। প্রাগৈতিহাসিক যুগে আদি মানবের দৈনন্দিন জীবনযাপন তথা খাদ্যের জন্য বন্য পশুর শিকার এক আবশ্যিক শর্ত হলেও সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শিকার সমাজে মূলত অভিজাত সামরিক প্রধান ও শাসকদের ব্যক্তিগত পরাক্রম ও দক্ষতা প্রদর্শনের এক বিনোদনমূলক ক্রীড়ার রূপ লাভ করে। ভারতীয় উপমহাদেশে এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত প্রাচীনতম নাগরিক সভ্যতা হিসেবে হরপ্পা সভ্যতার মানুষদের মধ্যে মল্লযুদ্ধ ও শিকারের মতো ক্রীড়াগুলি প্রচলিত থাকার কথা জানা যায়।[৫৪] ভারতে আর্যদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রীড়া ক্ষেত্রেও বিভিন্ন নতুন খেলাধুলার প্রচলন ঘটে। আর্যদের মধ্যে মল্লক্রীড়া, রথচালনা, তীরন্দাজি, তরবারি চালনা বা অসিখেলা প্রভৃতি ক্রীড়া প্রচলিত ছিল যা সমগ্র বৈদিক যুগে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। বৈদিক যুগে খেলাধুলা কে শুধুমাত্র আনন্দের মাধ্যম হিসেবে নয়, যুদ্ধের মহড়া হিসেবেও গ্রহণ করা হয়েছিল ফলে মূলত সামরিক পেশার সঙ্গে যুক্ত শাসকগোষ্ঠী বিশেষত ক্ষত্রিয় বর্ণের মানুষেরা ও কিছু সংখ্যক সর্বোচ্চ বর্ণভুক্ত ব্রাহ্মণেরা প্রধানত ক্রীড়া চর্চার সঙ্গে যুক্ত ছিল। দুটি প্রধান মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতেও শরীরচর্চা এবং খেলাধুলার একাধিক নিদর্শন পাওয়া যায়। দুই মহাকাব্যে ধনুর্বিদ্যা, মল্লযুদ্ধ, যুদ্ধাস্ত্রে পারদর্শিতার উল্লেখ আছে। গুরু দ্রোণাচার্যের ধনুর্বিদ্যা ও যুদ্ধাস্ত্রে পারদর্শিতার কথা সুবিদিত এবং অর্জুনের ধনুর্বিদ্যার নৈপুন্যের একাধিক নিদর্শন মহাভারতে বর্ণিত।[৫৫] ঐতিহাসিক বিল (Beal) তাঁর “The Romantic Legend of Sakya Buddha” গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে গৌতম বুদ্ধের সময়েও সামরিক ও শারীরিক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দান করা হতো এবং বুদ্ধ নিজে সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করে ছিলেন।[৫৬] “কথাসরিৎসাগর” গ্রন্থে অশোক দত্তা নামক এক বিজ্ঞানের ছাত্রের কথা জানা যায় যিনি একইসঙ্গে মুষ্টিযুদ্ধ এবং মল্লযুদ্ধে পারদর্শী ছিলেন।[৫৭]

মধ্যযুগে তুর্ক-আফগানদের ভারতে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রীড়া ক্ষেত্রেও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীন যুগ থেকে প্রচলিত শিকার, তরবারির যুদ্ধ, তীরন্দাজির মতো ক্রীড়াগুলি অত্যন্ত জনপ্রিয় থাকলেও, এর পাশাপাশি পোলো বা চৌঘান- এর মতো নতুন ক্রীড়ার প্রচলন ঘটে। ভারতের প্রথম সুলতানি শাসক কুতুব-উদ্দিন-আইবক পোলো খেলার সময় ঘোড়ার নীচে পড়ে জীবন হারিয়েছিলেন। আবুল ফজল আইন-ই-আকবরীতে মুঘল দরবারে প্রচলিত একাধিক ক্রীড়ার বর্ণনা দিয়েছেন। একদিকে যেমন এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বিভিন্ন গৃহ মধ্যস্থ ক্রীড়া (Indoor Game) যথা- দাবা, কার্ড খেলা, চৌপার বা এক ধরনের লুডো, তেমনই অন্যদিকে এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বিভিন্ন বহিরঙ্গনের ক্রীড়া (Outdoor Game) যথা- শিকার, চৌঘান বা পোলো, ইশকবাজি বা পায়রা ওড়ানো।[৫৮]

ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠা হওয়ার সঙ্গে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ তথা পশ্চিমী ক্রীড়ার প্রচলন ঘটে। এদেশে আগত ব্রিটিশ তথা ইউরোপীয়রা তাদের মনোরঞ্জন ও অবসর যাপনের জন্য তাদের দেশে প্রচলিত ক্রীড়া গুলিকে এদেশে প্রচলন করে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে গঠিত ইউরোপীয় ক্লাবগুলি মূলত ক্রীড়া কার্যক্রমকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে ক্লাবগুলি ছিল এদেশে আগত ইউরোপীয়দের মেলামেশার স্থান, যেখানে পুস্তক পাঠের ও পানীয়ের ব্যবস্থা থাকত। ঔপনিবেশিকতাবাদের তীব্র বিরোধী ঔপন্যাসিক জর্জ অরওয়েল (George Orwell) ভারতে গড়ে ওঠা ইউরোপীয় ক্লাবগুলি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, “The spiritual citadel, the real seat of the British power.”।[৫৯] ভারতে ইংরেজদের দ্বারা প্রচলিত ক্রীড়া গুলি প্রধানত ইংরেজদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং এই সমস্ত ক্রীড়া গুলিকে ভারতে জনপ্রিয় করে তুলতে অথবা ভারতীয়দের ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করার ব্যাপারে ইংরেজদের কোনো উৎসাহ ছিল না। ভারতে আগত ইংরেজ সরকারি কর্মচারী, সেনাবাহিনী ও অন্যান্য ইউরোপীয়রা নিজেদের বাসভূমির থেকে দূরে বিদেশে নিজেদের বাসভূমির উষ্ণ অনুভূতি ও নৈকট্য লাভ করতে চাইত ক্রীড়ার মাধ্যমে। ইংরেজদের এই ধরনের মানসিকতা সত্বেও ইউরোপীয় ক্রীড়া গুলি ভারতীয়দের মধ্যে প্রচলিত ও

জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে। ভারতে পার্সিরা প্রথম ইউরোপীয় খেলা বিশেষত ক্রিকেটের প্রতি উৎসাহিত হয়েছিল এবং এই ক্রীড়া গুলিকে সংঘটিত করতে ক্লাব গড়ে তুলেছিল। ১৮৪৮ সালে ওরিয়েন্টাল ক্রিকেট ক্লাব (Oriental Cricket Club) ও ১৮৫০ সালে ইয়ং জরাথুষ্টিয়ান ক্লাব (Youg Zoroastrian Club) পার্সিদের দ্বারা গঠিত প্রথম ক্লাব।[৬০] ভারতীয়দের মধ্যে পশ্চিমী ক্রীড়া প্রচলনের বিষয়ে প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল খ্রিস্টান মিশনারি ও তাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলি এবং ইংরেজ পরিচালিত বিদ্যালয় গুলি। এই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ড্রিল, মার্চিং, জিমন্যাস্টিক, ফুটবল, ক্রিকেট ও হকির মতো খেলা গুলির প্রচলন করা হয়। পার্সিদের দ্বারা ক্রিকেট ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অল্প কিছুকাল পরেই এনফিলস্টোন উচ্চ বিদ্যালয় (Elphistone High School)- এর ছাএরা ১৮৬১ থেকে ১৮৭৭ সালের মধ্যে বম্বে ইউনিয়ন ক্রিকেট ক্লাব (Bombay Union Cricket Club) এবং হিন্দু ক্রিকেট ক্লাব (Hindu Cricket Club) গড়ে তোলে। ১৮৭৯ সালে আলীগড় অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজে গঠিত হয় আলীগড় ক্রিকেট ক্লাব (Aligarh Cricket Club) এবং ১৮৯১ সালে বুচি বাবু নাইডু (Buchi Babu Naidu) কর্তৃক গঠিত হয় মাদ্রাস ইউনাইটেড ক্রিকেট ক্লাব (Madras United Cricket Club)। ভারতের পশ্চিম উপকূলে ক্রিকেট খেলা জনপ্রিয়তা লাভ করলেও পূর্ব উপকূলে ফুটবল খেলা জনপ্রিয়তা লাভ করে। কলকাতায় গড়ে ওঠা বয়েজ ক্লাব (Boys Club) হল ভারতীয়দের দ্বারা গঠিত প্রথম ফুটবল ক্লাব।[৬১] এছাড়া হকি খেলাও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। তবে শুরুর দিকে পশ্চিমী ক্রীড়া গুলি মূলত ইংরেজ পরিচালিত বিদ্যালয়গুলির ছাত্র তথা অভিজাত বা সমাজের কর্তৃত্বের স্থানাধিকারী মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

ইংরেজরা পশ্চিমী সুঠাম শরীরের বিপরীতে ভারতীয়দের দুর্বল শরীরের এক কল্পিত তত্ত্ব তুলে ধরে নিজেদের জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে সচেষ্ট ছিল। একইভাবে পশ্চিমে ক্রীড়াগুলিতে পারদর্শিতাকে পুরুষোচিত সাহসিকতা ও নৈপুণ্যতা প্রদর্শনের আদর্শ ক্ষেত্র হিসেবে তুলে ধরা হয়েছিল। ইংরেজ শাসনের অধীনে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর সূচনার দিকে যখন ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটতে থাকে তখন ক্রীড়াও হয়ে ওঠে জাতীয়তাবাদ প্রকাশের

একটি ক্ষেত্র। জাতীয়তাবাদের প্রভাবে ব্রিটিশ জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের ধারণার বিরোধিতা করে এবং নিজেদের শারীরিক সক্ষমতা প্রকাশের জন্য ভারতীয়দের মধ্যে শরীর চর্চার প্রবণতা তৈরি হয়। এই সময় যুব সমাজে শরীরচর্চার অধিক প্রবণতা থেকে সমগ্র দেশে গড়ে উঠেছিল অসংখ্য আখড়া। এই আখড়া গুলি হয়ে উঠেছিল একদিকে শরীর চর্চার কেন্দ্র ও অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল। পশ্চিমী ক্রীড়ায় ভারতীয়দের সাফল্য বা ইংরেজদের পরাজিত করে বিজয় লাভ করার ঘটনা হয়ে ওঠে জাতীয়তাবাদীদের কাছে প্রেরণা স্বরূপ এবং জাতীয় দক্ষতার প্রতীক, যেমন- ১৯১১ সালে মোহনবাগান কর্তৃক শীল্ড বিজয়। পরবর্তীকালে দেশ ইংরেজদের পরাধীনতা থেকে মুক্ত হলেও পশ্চিমী খেলা গুলি ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার হিসেবে থেকে যায় এবং ক্রমে এই সমস্ত ক্রীড়াগুলি ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে। যার চূড়ান্ত নিদর্শন ক্রিকেট ও ফুটবলের মতো ক্রীড়া গুলির ব্যাপক জনপ্রিয়তা, যা আন্তর্জাতিক ক্রীড়া মঞ্চেও ভারতকে নিজের পরিচয় উজ্জ্বলতর করতে সাহায্য করেছে।

- **চতুর্থ অধ্যায়- জেলা রূপে নদীয়া ও তার ক্রীড়া পরিমণ্ডল:**

ইতিহাস বলতে যেমন আক্ষরিক অর্থে অতীত ঘটনাকে বোঝায় তেমনি অতীত ঘটনাবলী সর্বদা কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে যেমন- ফরাসি বিপ্লব বলতে আমরা বুঝি ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সে সংঘটিত বিপ্লব। সুতরাং ইতিহাসের কোনো বিষয় যথার্থভাবে অনুধাবনের জন্য প্রয়োজন হয় ভূগোল সংক্রান্ত প্রাথমিক জ্ঞানের।[৬২] নদীয়া জেলা সম্পর্কিত যে কোন আলোচনার পূর্বে আমাদের নদীয়া জেলার অতীত ইতিহাস সম্পর্কে জানতে হবে। নদীয়া জেলার নামের উৎপত্তি হয়েছে নবদ্বীপ থেকে যা প্রকৃতপক্ষে জেলার অন্তর্গত এক সুপ্রাচীন নগর, যা ভাগীরথী নদীর তীরে অবস্থিত। বঙ্গের সেন বংশীয় রাজা লক্ষণ সেনের রাজত্বকালে উমাপতি ধর রচিত দেওপাড়া প্রশস্তি[৬৩] থেকে জানা যায় যে সেন বংশের শাসক সামন্ত সেন গঙ্গা তীরবর্তী নবদ্বীপ শহরে বসবাসের জন্য প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন।[৬৪] হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতানুসারে সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা সামন্ত সেন তার আদিম নিবাস

কর্নাটকে একাধিক যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সেখান থেকে পলায়ন করে বঙ্গে আসেন এবং ভাগীরথী তীরবর্তী একটি ছোট অঞ্চলে নিজ কর্তৃত্ব স্থাপন করে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন, যা সম্ভবত প্রাচীন নবদ্বীপ।[৬৫] পরবর্তী সেন রাজা বল্লাল সেন নবদ্বীপে বিশাল প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন যার ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্তমান। সেন বংশের রাজধানী স্থাপনের কারণে নবদ্বীপ একটি রাজনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে বিকাশ লাভ করলেও সেন বংশের রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতার কারণে শহরটি ক্রমশ ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রীয় জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র হিসেবে এবং ভাগীরথীর তীরবর্তী হওয়ার কারণে ধর্মীয় তীর্থস্থান হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে। সেন বংশের শাসক লক্ষণ সেন (১১৫৯ – ১২০৬), যখন তার একাধিক রাজধানীর মধ্যে অন্যতম নবদ্বীপে অবস্থান করছিলেন তখন মুসলিম বিজেতা মহম্মদ বখতিয়ার খলজির আকস্মিক আক্রমণের কারণে নদীয়া ছাড়তে বাধ্য হন (১২০৩ সাল)[৬৬] এবং এইভাবে নদীয়া তথা বঙ্গে মুসলিম শাসনের সূচনা হয়।[৬৭] মুসলিম বিজয়ের পর নদীয়া জেলার ইতিহাস বিশেষ জানা যায় না কিন্তু মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর (১৪৮৬ –১৫৩৩) পুনরায় ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব সাহিত্যে নবদ্বীপের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৬৮] মুঘল শাসন পর্বে নদীয়া জেলা যশোর ফৌজদারির অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৬৯] মুঘল সেনাপতি মানসিংহ কে বাংলা বিজয়ে সাহায্য করার পুরস্কার স্বরূপ ভবানন্দ মজুমদারকে নদীয়া ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জমিদার নিযুক্ত করা হয় মুঘল বাদশাহ কর্তৃক ১৬০৬ সালে এবং এইভাবে স্বাধীন জমিদারি হিসাবে নদীয়া একটি শহরের পরিবর্তে একটি বৃহত্তর অঞ্চল হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। জমিদার নিযুক্ত হওয়ার পর ভবানন্দ মজুমদার তার রাজধানী বাগওয়ান থেকে মাটিয়ারিতে স্থানান্তরিত করেন। পরবর্তীকালে ভবানন্দ মজুমদারের উত্তরাধিকারী রাঘব কর্তৃক রাজধানী রেউ- তে স্থানান্তরিত হয় এবং এর নতুন নামকরণ করা হয় কৃষ্ণনগর যা বর্তমানেও নদীয়া জেলার সদর শহর। ১৭২৮ সালে নদীয়া রাজ হিসেবে পরিচিত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় নদীয়ার সিংহাসনে বসেন। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে তিনি বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিপরীতে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পক্ষ অবলম্বন করেন। ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে বহুবার নদীয়া জেলার আকৃতির পরিবর্তন ঘটানো হয়। ঔপনিবেশিক পর্বে নদীয়া জেলা প্রেসিডেন্সি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং একটি জেলা হিসেবে

এটি গড়ে ওঠে ১৭৮৭ সালে। ঔপনিবেশিক শাসন পর্বে একাধিকবার প্রশাসনিক এলাকা পুনর্গঠনের জন্য ১৭৭২ সালে রেনেল সাহেবের মানচিত্রে যে বৃহত্তর অঞ্চল জুড়ে নদীয়া কে চিহ্নিত করা হয়েছে, তা পরবর্তীতে বহুলাংশ সংকুচিত হয়। এই সমস্ত যাবতীয় পরিবর্তন সত্ত্বেও মোটের উপর ঔপনিবেশিক পর্বে নদীয়া জেলা ৫টি মহকুমা নিয়ে গঠিত ছিল যথা- কৃষ্ণনগর, রানাঘাট, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়া।[৭০]

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ লাইন অনুসারে নদীয়া জেলা দ্বিখন্ডিত হয়। জেলার পাঁচটি মহকুমার মধ্যে মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়া এই তিনটি মহকুমার অধিকাংশ অঞ্চল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান, বর্তমানে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং কৃষ্ণনগর ও রানাঘাট মহকুমা তার অধিকাংশ অঞ্চল সহ ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত হয়।[৭১] বর্তমানেও জেলার এই আকৃতি প্রায় অপরিবর্তিত। নদীয়া জেলার উত্তর-পশ্চিম দিকে মুর্শিদাবাদ জেলা, দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বর্তমান বাংলাদেশের যশোর জেলা, উত্তরে বর্ধমান ও হুগলি জেলা এবং দক্ষিণে ২৪ পরগনা জেলা অবস্থিত। ঊনবিংশ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের সূচনায় জেলায় পাশ্চাত্য খেলাধুলার প্রচলন ঘটে।

- **পঞ্চম অধ্যায়- নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা বা নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের ইতিহাস:**

নদীয়া জেলার ক্রীড়া ইতিহাস আলোচনা করতে হলে প্রথমেই জেলার সমস্ত ক্রীড়া সংগঠনের তত্ত্বাবধায়ক ও নিয়ন্ত্রক হিসেবে জেলার সর্বোচ্চ ক্রীড়া সংস্থা নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন (Nadia District Sport Association- N.D.S.A)- এর কথা উল্লেখ করতে হয়। জেলার প্রধান এই ক্রীড়া সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয় ঔপনিবেশিক শাসকবর্গ কর্তৃক ১৯৩৭ সালে। প্রতিষ্ঠার সময় এই সংগঠনের নাম ছিল নদীয়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন (Nadia Sporting Association)। প্রতিষ্ঠার সময় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন যথাক্রমে পদাধিকার বলে নদীয়া জেলার তৎকালীন জেলা শাসক I.C.S, এম.এম. স্টিওয়ার্ট (M.M. Stewart) এবং তৎকালীন কৃষ্ণনগর পৌরসভার পৌরপিতা সুধীন্দ্র চন্দ্র মল্লিক। ঔপনিবেশিক শাসকবর্গ কর্তৃক এই সংগঠন গড়ে তোলার পশ্চাতে

ভারতের যুব সমাজকে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে রাখার ঔপনিবেশিক উদ্দেশ্য কাজ করেছিল। এই সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যাবতীয় খেলাধুলা সংক্রান্ত কার্য পরিচালনার জন্য কৃষ্ণনগরে খেলার মাঠ পাঁচ বছরের মেয়াদে ভাড়া নেওয়া হয় এবং এই সংগঠনের তত্ত্বাবধানে ১৯৩৮ সালে নদীয়া জেলায় প্রথম শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় কৃষ্ণনগরে সরকারি মহাবিদ্যালয়ের মাঠে। ওই একই বছর সংগঠন সেই সময় পর্বে কলকাতায় অনুষ্ঠিত একমাত্র ক্রিকেট প্রতিযোগিতা হিসেবে কুচবিহার কাপে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সংগঠনের কাজের ক্ষেত্রে প্রতিকূল হয়ে ওঠে। এই সময় পর্বে সংগঠন প্রায় নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, এমনকি পূর্বে সংগঠনের ক্রীড়া সংক্রান্ত কার্য সম্পাদনের জন্য যে খেলার মাঠ ভাড়া নেওয়া হয়েছিল তার চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও তা পুনরায় নবীকরণ করা হয়নি। স্বাধীনতা লাভের পর এই সংগঠনের পুনর্জীবন ঘটে স্বাধীন দেশের স্বাধীন সরকারের অধীনে। ১৯৪৮ সালে সংগঠনকে পুনরুজ্জীবিত করা হয় এবং এর নতুন নামকরণ করা হয় নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন (Nadia District Sporting Association)। এরপর ১৯৫২ সালের সংগঠনের নাম পুনরায় পরিবর্তিত হয় এবং এর নতুন নামকরণ করা হয় নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন (Nadia District Sport Association), যে নাম বর্তমানেও একই রয়ে গেছে। ওই একই বছর সংস্থার নিয়মসংহিতা রচিত ও গৃহীত হয়। এই পর্বে জেলা ক্রীড়া সংগঠন প্রথমে ইণ্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (Indian Football Association, I.F.A) ও তার পরবর্তীতে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (Cricket Association of Bengal, C.A.B)- এর দ্বারা অনুমোদন লাভ করে। প্রতিষ্ঠার সময় থেকে এই সংগঠনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নিজস্ব একটি খেলার ময়দান ও সেই ময়দানকে কেন্দ্র করে স্টেডিয়াম স্থাপন। ১৯৬৫ সালে সংস্থা কৃষ্ণনগরের টাউন ক্লাবের মালিকানা থেকে খেলার মাঠ যা পূর্বে সংগঠন ভাড়া নিয়ে নিজের খেলাধুলা সংক্রান্ত কার্যে ব্যবহার করত তা নিজে মালিকানাতে আনতে সক্ষম হয়। এই খেলার মাঠে স্টেডিয়াম নির্মাণের অনুমতির জন্য ওই বছরই স্টেট কাউনসিল অফ স্পোর্টস (State Council of Sports)- এর কাছে আবেদন করা হলে তা গৃহীত হয়। কিন্তু ১৯৬৬ সালে ভারত-পাক যুদ্ধ শুরু হলে সরকার কর্তৃক আর্থিক অনুদান না পাওয়ার জন্য এই নির্মাণ

কার্য ব্যাহত হয়। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ক্রীড়া ক্ষেত্র কখনোই সমাজ বহির্ভূত বিষয় নয়, দেশ- সমাজের বিভিন্ন ঘটনা ক্রীড়া ক্ষেত্রকেও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে, এমনকি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও তার প্রভাব অনুভূত হয়। সরকারি অনুদানের অভাবে সংস্থা স্থানীয় পর্যায়ে নিজস্ব উদ্যোগে অর্থ সংগ্রহ করতে সচেষ্ট হয়। এই প্রয়াসের ফলস্বরূপ ১৯৬৭ সালের ২৩শে জানুয়ারি স্টেডিয়ামের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থে স্টেডিয়ামের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। স্টেডিয়ামের নির্মাণ কার্য শুরু হলে ১৯৬৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৫০০০০ টাকা অনুদান প্রদান করে নির্মাণ কার্য সম্পাদনের জন্য। এছাড়াও সরকারের তরফ থেকে বিভিন্ন সময় স্টেডিয়ামের কলেবর বৃদ্ধির জন্য আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়, যার চূড়ান্ত রূপ হল বর্তমান সংগঠনের স্টেডিয়াম।[৭২] ১০ই জুন ২০১৫ সালে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নবকলেবরে সজ্জিত স্টেডিয়ামের উদ্বোধন করে এর নতুন নামকরণ করা হয়, কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত সাহিত্যিক দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নামানুসারে ডি.এল.রায়. মেমোরিয়াল ডিস্ট্রিক্ট স্টেডিয়াম (D.L. Roy Memorial District Stadium)।

স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতের গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক আদর্শের প্রতিফলন লক্ষ করা যায় জেলা ক্রীড়া সংস্থার নিয়ম সংহিতায়। সংস্থার নিয়ম সংহিতা প্রথম গৃহীত হয় ১৯৪৮ সালে কিন্তু এই নিয়ম সংহিতায় সংস্থার বিভিন্ন পদাধিকারী নির্বাচন ও বিভিন্ন কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে উপযুক্ত গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রতিফলিত হয়নি, যার চূড়ান্ত নিদর্শন হল সংগঠন কর্তৃক স্বীকৃত ক্লাবগুলির সকলের নির্বাচনে ভোটদানের অধিকার না থাকা। নিয়ম সংহিতার গণতান্ত্রিকরণের জন্য জেলার ক্রীড়া ক্লাব গুলি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং নিজেদের পৃথক ফেডারেশন গঠন করলে জেলার ক্রীড়া ক্ষেত্রে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত এন.ডি.এস.এ বিদ্রোহী ক্লাব গুলির দাবি মেনে নিয়ে ১৯৫২ ও ১৯৫৪ সালে নিয়ম সংহিতায় সংশোধন করলে বিদ্রোহী ক্লাবগুলি নিজেদের পৃথক সংগঠনের অবলুপ্তি ঘটায়। নতুন নিয়ম সংহিতা অনুসারে অনুমোদিত ক্রীড়া ক্লাবগুলি জেলা সংগঠনে তাদের প্রতিনিধি প্রেরণ ও সংগঠনের গভর্নিং বডি সহ সমস্ত কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে ভোট দানের অধিকার লাভ করে। সংগঠনের নিয়ম সংহিতার গণতান্ত্রিকরণের এই আন্দোলন সদ্য স্বাধীনতা লাভ করা দেশের জনগণের মধ্যে সঞ্চারিত অধিকারবোধ

ও গণতান্ত্রিক সচেতনতার দ্যোতক। একইভাবে নিয়ম সংহিতায় সংগঠনের অনুমোদন প্রাপ্ত ক্রীড়া ক্লাবের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, ক্লাবকে অবশ্যই ক্রীড়া অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে এবং এই খেলাধুলায় অংশগ্রহণ হতে হবে মুক্ত অর্থাৎ জাতি, ধর্ম, বর্ণ বা পেশার ভিত্তিতে কাউকে অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত করা যাবে না, যা বহুলাংশে ভারতীয় সংবিধানের সাম্যের আদর্শকে তুলে ধরে।[৭৩]

জেলা ক্রীড়া সংস্থা সামাজিক সচেতনতার পরিচয় স্টেডিয়াম গঠিত হওয়ার অল্প কিছু সময়ের মধ্যেই প্রদান করে, যখন ১৯৬৮ সালের ৩রা নভেম্বর কৃষ্ণনগর স্টেডিয়ামে কলকাতার প্রথম বিভাগের দুটি দল- এরিয়ান্স ক্লাব ও বাটা স্পোর্টস ক্লাবের মধ্যে প্রদর্শনী ফুটবল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রদর্শনী ফুটবল অনুষ্ঠিত হওয়ার পশ্চাতে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল টিকিট বিক্রির মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থে উত্তরবঙ্গের বন্যা দুর্গতদের সাহায্য দান। নর্থ ক্যালকাটা কলেজ- এর সাহায্যার্থে ১৯৬৯ সালে ৪ঠা মে ইস্টবেঙ্গল ও এরিয়ান্স ক্লাবের মধ্যে প্রদর্শনী খেলা অনুষ্ঠিত হয়। টোকিও অলিম্পিকে জিমন্যাস্টিক বিভাগে ভারতের প্রতিনিধিত্বকারী নদীয়া জেলার বেথুয়াডহরীর অধিবাসী দেবাশীষ মন্ডলের অকাল প্রয়াণ ঘটলে, তার পরিবারবর্গকে সাহায্যের জন্য সংস্থা মোহনবাগান ও আই. এফ. এ- এর সভাপতি একাদশের মধ্যে প্রদর্শনী খেলার আয়োজন করে, যার মাধ্যমে লব্ধ অর্থ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বন্যা দুর্গতদের সাহাযার্থে ১৯৭৮ সালের ২৬শে নভেম্বর নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা মুখ্যমন্ত্রীর বন্যা ত্রাণ তহবিলে ৫০০০১ টাকা প্রদান করে। উড়িষ্যার কালাহান্ডি- তে খরা পীড়িত জনগণকে সাহায্য দানের উদ্দেশ্য নিয়ে পূর্ব যাদবপুর আন্তঃসংঘ সম্মিলনী ও ফ্রেন্ডস অফ দ্যা স্টেডিয়াম বিভিন্ন সাব জুনিয়র ফুটবল দল সমূহ কে নিয়ে ১৯৮৭ সালের ১৯শে জুন থেকে ২৮শে জুন পর্যন্ত বিস্তৃত ক্রীড়া সূচি সম্পন্ন জুনিয়র ফ্রেন্ডশিপ ট্রফি নামে একটি লীগ কাম নকআউট ভিত্তিক ফুটবল প্রতিযোগিতা আয়োজন করলে, এই প্রতিযোগিতার খেলাগুলি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে আয়োজনের ব্যবস্থা করা হয়। এই মহৎ উদ্দেশ্য সমন্বিত প্রতিযোগিতার খেলা ১৯শে জুন ১৯৮৭ সালে কৃষ্ণনগরে আয়োজিত হলে (ত্রিপুরা রাজ্য একাদশ বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্রীড়া সংস্থা একাদশ), এই খেলার যাবতীয়

ব্যবস্থাপনা ও ব্যয়ভার বহন করে নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা নিজেদের অবদান রাখে। ২০০৩ সালের ২৩শে জানুয়ারি জেলা স্টেডিয়ামের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় এবং সংস্থা তার অধীনস্থ আঞ্চলিক সংস্থা ও অনুমোদিত ক্লাবগুলিকে রক্তদান শিবির আয়োজন এর জন্য অনুরোধ করে। এই অনুরোধে সারা দিয়ে একাধিক ক্লাব ও আঞ্চলিক সংস্থা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে এবং ২০০৯ সালের পর থেকে জেলা সংস্থা প্রতিবছর ৩রা ফেব্রুয়ারি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে আসছে জেলা স্টেডিয়ামে। সমাজে সমস্ত দিক থেকে অনগ্রসর আদিবাসী সম্প্রদায় যাতে ক্রীড়া ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ ও নিজেদের কুশলতা প্রদর্শন করে ক্রীড়া ক্ষেত্রে উজ্জ্বল উপস্থিতি তুলে ধরতে পারে, এই মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আই.এফ.এ- এর পরিচালনায় ২০০৯ সালে আদিবাসী ফুটবল লীগ আয়োজন করার উদ্যোগ নেওয়া হলে, জেলা ক্রীড়া সংস্থা তাতে সাড়া দিয়ে খেলা আয়োজন করতে উদ্যোগী হয়। ২০০৯ সালের ২৬ থেকে ৩১শে মার্চ জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় চাকদহ নেতাজি সুভাষ স্টেডিয়ামে জেলা পর্যায়ের আদিবাসী ফুটবল লিগের প্রথম বর্ষের খেলা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে জেলার চারটি আদিবাসী খেলোয়াড়দের নিয়ে গঠিত দল এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। উপরোক্ত বর্ণনা একদিকে যেমন জেলা ক্রীড়া সংস্থার সমাজ সচেতনতা ও সামাজিক দায়িত্ব পালনে তাদের তৎপরতার চিহ্ন বহন করে, তেমনি অন্যদিকে ক্রীড়া ক্ষেত্র ও সমাজের মধ্যে যে গভীর যোগসূত্র বর্তমান তাও তুলে ধরে।

দেশভাগ ও তার পরবর্তী উদ্বাস্তু সমস্যা স্বাধীনতা পরবর্তী সমাজে নিয়ে এসেছিল নতুন সামাজিক দ্বন্দ্ব। যারা প্রায় সর্বহারা হয়ে পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিল তাদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের আদি অধিবাসীদের নানা আর্থসামাজিক কারণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে, আর ক্রীড়া ক্ষেত্রে এই দ্বন্দ্বের সার্থক প্রতিফলক হয়ে ওঠে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল ফুটবল ক্লাবের মধ্যে প্রতিযোগিতা। যদিও এক্ষেত্রে সহযোগিতার দৃষ্টান্তও প্রচুর পাওয়া যায়। যার এক উজ্জ্বল উদাহরণ ক্রীড়া ক্ষেত্রে স্থাপন করেছে নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা। ১৯৭১ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ পশ্চিম পাকিস্তানের সর্বগ্রাসী আগ্রাসনের ও আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে স্বাধীনতার দাবিতে।

স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনই ছিল এই পর্বে প্রধান লক্ষ্য। স্বাধীনতা ও দেশভাগের পর থেকেই বহু শরণার্থী পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে থাকেন। নদীয়া সীমান্তবর্তী জেলা হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই এখানে শরণার্থী আগমন বহু সংখ্যায় ঘটে। পশ্চিমবঙ্গের জনগণ স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী জনগণের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ছিল। পশ্চিমবঙ্গের মানুষজন বিভিন্ন উপায়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করতে উদ্যোগী হয়েছিল। এক্ষেত্রে খেলার মাঠ হয়ে উঠেছিল এক মাধ্যম। পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় গ্রহণকারী মুক্তি যোদ্ধারা তাদের নব উত্থিত জাতীয়তাবাদ প্রকাশের সফল সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র এবং বিশ্বের দরবারে তাদের মুক্তিযুদ্ধকে পৌঁছে দেওয়ার ও বিশ্ব সমর্থন লাভের একটি মাধ্যম হিসেবে খেলার মাঠ বিশেষত ফুটবল-কে গ্রহণ করেছিল। পূর্ব পাকিস্তানের বহু বাঙালি খেলোয়াড় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং অনেকে পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে আসেন ও কলকাতায় গঠিত স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের সমর্থনে হাত মেলান। পশ্চিমবঙ্গে আগত বেশ কিছু পূর্ব পাকিস্তানের ফুটবল খেলোয়াড় ‘বাংলাদেশ ক্রীড়া সমিতি’ প্রতিষ্ঠা করেন। এই ক্রীড়া সমিতি স্থির করে যে তারা বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শনী খেলায় অংশগ্রহণ করবে। এই প্রদর্শনী খেলায় পশ্চাতে দুটি উদ্দেশ্য কাজ করেছিল প্রথমত, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে প্রচার ও দ্বিতীয়ত, প্রদর্শনী খেলাযর মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থে মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য দান। জাকারিয়া পিন্টুর নেতৃত্বে গঠিত বাংলা ফুটবল দল ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে মোট ১৬ টি প্রদর্শনী খেলায় অংশগ্রহণ করে।

বাংলা দলের প্রথম খেলাটি অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭১ সালের ২৫শে জুলাই কৃষ্ণনগর স্টেডিয়ামে নদীয়া একাদশের বিরুদ্ধে। এই খেলার প্রবেশ মূল্য হিসেবে টিকিটের দাম ৫০ পয়সা ধার্য করা হয় এবং লব্ধ অর্থ সমস্তটাই বাংলাদেশের সরকারের হাতে মুক্তিযুদ্ধের সাহায্যার্থে প্রদান করা হবে বলে স্থির হয়। যাতে সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা যায় সেই উদ্দেশ্যে উক্ত প্রদর্শনী খেলায় সর্বপ্রকার ফ্রি-পাশের ব্যবস্থা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় জেলা ক্রীড়া সংস্থার তরফ থেকে। খেলাটির প্রচারে বাংলাদেশের ফুটবল দলের খেলোয়াড়দের ছবিসহ পোস্টার দেওয়ার ফলে প্রদর্শনী খেলাটাকে কেন্দ্র করে জনমানসে আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। স্বাধীন বাংলাদেশ রেডিওতে খেলার খবর প্রচার করা হলে নদীয়ার

পার্শ্ববর্তী কুষ্টিয়া থেকেও বহু মানুষের সমাগম ঘটে খেলার মাঠে।[৭৪] ২৫শে জুলাই সংঘঠিত এই খেলায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের বেশ কিছু পদস্থ ব্যক্তি এবং বাংলাদেশের মুক্তিফৌজের জনৈক্য উচ্চ পর্যায়ের রণনায়ক। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নদীয়ার জেলাশাসক, পুলিশ সুপার সহ জেলার অন্য অনেক পদস্থ আধিকারিক। খেলার পূর্বে বাংলাদেশ দল সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা স্বদেশের পতাকা নিয়ে স্টেডিয়াম প্রদক্ষিণ করবে এবং ওই পতাকা উত্তোলন করা হবে। ভারত সরকার কর্তৃক তখনও পর্যন্ত নির্বাসনে গঠিত বাংলাদেশ সরকারকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি না দেওয়ায়, এই দাবিকে কেন্দ্র করে জটিলতা দানাবাঁধে। শেষ পর্যন্ত নদীয়ার জেলা শাসক নিজ দায়িত্বে পতাকা উত্তোলনের অনুমতি দিলে জেলা ক্রীড়া সংস্থা তা মেনে নেয় এবং খেলা শুরুর পূর্বে উভয় দলের পতাকা উত্তোলন করা হয়। এই প্রদর্শনী খেলা উপলক্ষ্যে জেলা স্টেডিয়ামে প্রায় ৮ হাজার দর্শকের সমাগম ঘটে ও দর্শকদের মধ্যে উদ্দীপনা ছিল বিশেষ উল্লেখ্য। উভয় দলের খেলোয়াড় সুন্দর ক্রীড়া কীর্তির পরিচয় রাখেন, তবে খেলাটি শেষ পর্যন্ত ২-২ গোলে অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়। প্রদর্শনী খেলা সফলতার সাথে সম্পাদিত হলেও যেহেতু ভারত সরকার তখনও পর্যন্ত অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারকে আনুষ্ঠানিক অনুমোদন প্রদান করেনি, তাই খেলার পূর্বে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের জন্য শাস্তি স্বরূপ নদীয়ার জেলাশাসককে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয় এবং জেলা ক্রীড়া সংস্থার স্বীকৃতিও বাতিল করা হয়। এরপর অবশ্য ভারত সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি প্রদান করা হলে জেলা শাসক কে পুনর্বহাল করা হয় এবং জেলা ক্রীড়া সংস্থার স্বীকৃতিও ফিরিয়ে দেওয়া হয়।[৭৫]

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকে নদীয়া ও বাংলাদেশের মধ্যে ক্রীড়া ক্ষেত্রে যে সখ্যতা স্থাপিত হয়েছিল, তা বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পরও বজায় থাকে। স্বাধীনতা লাভের পর প্রথম ১৯৭২ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি নদীয়া জেলা দল ও বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলা দলের মধ্যে কৃষ্ণনগর জেলা স্টেডিয়ামে একটি প্রদর্শনী ভলিবল খেলা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে নদীয়া জেলা দল জয়লাভ করে। ১৯৭২ সালের ২৬শে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার প্রথম বার্ষিকী হিসেবে আয়োজিত স্বাধীনতা উৎসবের অনুষ্ঠানের মধ্যে একটি ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হলে, উক্ত প্রতিযোগিতায়

যোগদানের জন্য বাংলাদেশের স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ড (Sports Control Board) নদীয়া জেলা দলকে আমন্ত্রণ জানালে জেলা ক্রীড়া সংস্থার তরফ থেকে তা গৃহীত হয়। ৭, ৮ ও ১০ই এপ্রিল ঢাকা ফুটবল লিগ বিজয়ী বাংলাদেশ ইনডাসট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (বি.আই.ডি.সি)- এর সঙ্গে নদীয়া জেলা ফুটবল দলের খেলা হয় এবং প্রথম দুটি খেলা অমীমাংসিত থাকলেও, তৃতীয় খেলায় নদীয়া দল পরাজিত হয়, যদিও নদীয়া দলের খেলা বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়। ১৯৮২ সালে ভারত পরিক্রমারত বাংলাদেশের জাতীয় জুনিয়র ফুটবল চ্যাম্পিয়ন নারায়ণগঞ্জ মহকুমা ফুটবল দল ১৯শে অক্টোবর নদীয়া জেলা জুনিয়র একাদশের বিরুদ্ধে প্রীতি ফুটবল খেলায় মিলিত হয়। ১৯৮৪ সালের ১০ই মার্চ জেলা স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের রাজশাহী ফুটবল দল ও নদীয়া জেলা একাদশের মধ্যে প্রীতি ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর বাংলাদেশ ক্রিকেট খেলার উন্নতি ও প্রসারের উদ্যোগ নিলে নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা এক্ষেত্রেও ক্রিকেট এ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল- এর আনুকূল্যে জেলা স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের ক্রিকেট দল ও নদীয়া জেলা একাদশের মধ্যে চল্লিশ ওভারের সীমিত একদিনের খেলা আয়োজন করে ১৯৮৩ সালের ১৮ই ডিসেম্বর। এছাড়াও বাংলাদেশ ক্রিকেট দল ২০০৭ সালে ও ২০১২ সালে জেলা স্টেডিয়ামে ক্রিকেট খেলায় অংশগ্রহণ করে।[৭৬] ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে কূটনৈতিক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক যার সূচনা হয়েছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার অনেক পূর্বে মুক্তিযুদ্ধের সময়, সে ক্ষেত্রে খেলার মাঠ হয়ে উঠেছে এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা এই কূটনৈতিক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে নিজের ভূমিকা অত্যন্ত সদর্থক ভাবে পালন করেছে। ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা লাভের সময় নদীয়াও দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল এবং এর বৃহত্তর অংশ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ায়, সেখানকার বাঙ্গালীদের প্রতি আন্তরিক আকর্ষণও সম্ভবত স্বাধীনতার আগে ও পরে ক্রীড়া ক্ষেত্রে প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করতে উৎসাহিত করেছিল জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে। যার ফলে জেলা ক্রীড়া সংস্থাও বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্রীড়া দলের প্রদর্শনী খেলা আয়োজন করতে তৎপর হয়েছে এবং অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে তা সম্পাদন করেছে।

নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা তার প্রধান কাজ অর্থাৎ জেলার ক্রীড়া প্রসারের ব্যাপারেও

সর্বদা সচেষ্ট থেকেছে। জেলা ক্রীড়া সংস্থা দ্বি-বিধ উদ্দেশ্য নিয়ে বিভিন্ন ঐতিহ্যশালী ও সুনাম সম্পন্ন প্রতিযোগিতা এবং কলকাতার বিখ্যাত ও শক্তিশালী ক্লাবগুলির খেলা জেলা স্টেডিয়ামে আয়োজন করে এসেছে। প্রথম যে উদ্দেশ্য কাজ করেছিল তা হল জেলা ক্রীড়া প্রেমী মানুষদের ভালো ক্লাবের খেলা দেখার সুযোগ করে দেওয়া ও সেই খেলার টিকিট বিক্রির মাধ্যমে সংস্থার আর্থিক পরিস্থিতি মজবুত করা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি ছিল এই সমস্ত খেলা আয়োজনের মাধ্যমে বৃহৎ খেলা আয়োজনের সাংগঠনিক জ্ঞান লাভ করা ও উন্নত ক্রীড়া পারদর্শিতা প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে নিজেদের ক্রীড়ার মানের উন্নয়ন। কলকাতার প্রধান তিনটি ক্লাব মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ও মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ১৯৬৭ সালে জেলা স্টেডিয়াম প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর একাধিক বার জেলা স্টেডিয়ামে বিভিন্ন প্রদর্শনী খেলায় অংশ নিয়েছে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত। ১৯৯১ সালের ৯ই জুন নবদ্বীপের পি.এস.সি মাঠে ক্লাবের রজতজয়ন্তী বর্ষ উদযাপনের অন্যতম অঙ্গ হিসেবে নবদ্বীপের আজাদ হিন্দ ক্লাব আয়োজন করে এক প্রদর্শনী ফুটবল যেখানে অংশগ্রহণ করে নদীয়া জেলা একাদশ ও ইস্টবেঙ্গল দল, কলকাতার প্রধান ত্রয়ীর অন্যতম ইস্টবেঙ্গলকে নদীয়া জেলা একাদশ এক গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে। ১৯৯১ সালের পর ফুটবলে কলকাতার বৃহৎ ক্লাবগুলির জেলাতে প্রদর্শনী খেলায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অনীহা বৃদ্ধি পায়। এরপর পুনরায় ২০০৭ সালে ২৭শে জুলাই জেলা স্টেডিয়ামে ইস্টবেঙ্গল ও নদীয়া জেলা একাদশের মধ্যে প্রদর্শনী খেলা আয়োজিত হয়। দীর্ঘদিন পরে কলকাতার তিন প্রধান ক্লাবের একটি জেলা স্টেডিয়ামে খেলতে এলে জনমানসে ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং প্রবল বৃষ্টিপাত সত্ত্বেও স্টেডিয়াম দর্শকে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। যদিও এরপর বৃহৎ ক্লাব গুলি জেলায় খেলতে বিশেষ উৎসাহ দেখায়নি। ১৯৭৪ সালে আই.এফ.এ শীল্ড কলকাতা কেন্দ্রিকতা দূর করে বিকেন্দ্রীকরণের নীতি গ্রহণ করলে, নদীয়া জেলা সংস্থা তখন থেকেই জেলা স্টেডিয়ামে খেলা অনুষ্ঠিত করে আসছে। এমনকি এই বিকেন্দ্রীকরণের নীতি কে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়ে, জেলা সংস্থা জেলার পল্লী অঞ্চলে খেলাকে ছড়িয়ে দিতে উদ্যোগ নিয়ে ১৯৮৪ সালে জেলা স্টেডিয়ামের বাইরে পঞ্চায়েত অঞ্চল হিসেবে তেহট্টে খেলার আয়োজন করে। কিন্তু ১৯৮৪ সালের পরের থেকে পুনরায় আই.এফ.এ শীল্ডের খেলাগুলি কেন্দ্রীয়ভাবে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হতে থাকে। ১৯৮৪ সালের পর পুনরায় ১৯৯৬ সালে জেলা স্টেডিয়ামে আই.এফ.এ

শীল্ডের একটি ক্লাস্টারের খেলা সম্পন্ন হয় যদিও এর পরবর্তীতে এই শীল্ডের খেলা আর জেলায় অনুষ্ঠিত হয়নি।[৭৭]

জেলা ক্রীড়া সংস্থা সর্বদাই বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খেলা গুলিকে জেলা স্টেডিয়ামে আয়োজন করার বিষয়ে তৎপরতা দেখিয়েছে, যার ফল স্বরূপ বাংলাদেশ ছাড়াও দুটি আন্তর্জাতিক মানের ফুটবল দলের খেলা জেলা স্টেডিয়ামে আয়োজন করতে সক্ষম হয়েছে সংস্থা। ১৯৭২ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর সর্বপ্রথম এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতীয় ফুটবল দল ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় দল কোন জেলা শহরে খেলতে আসে। উক্ত দিনে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর স্টেডিয়ামে ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় দল ও আই.এফ.এ- এর সম্পাদক একাদশের মধ্যে প্রদর্শনী খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রদর্শনী খেলার ক্ষেত্রে প্রথম জেলা স্টেডিয়ামে যাতে মহিলারা মাঠে উপস্থিত থেকে এই আন্তর্জাতিক খেলা উপভোগ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়, যা নিঃসন্দেহে খেলার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি তথা বিশেষত মহিলাদের মধ্যে এর প্রসারের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ বলে গণ্য হতে পারে। ভারতে বর্ষব্যাপী রুশ উৎসবের একটি অংশ হিসেবে ‘কুজবাসকেমেরোভো’ নামক রুশ ফুটবল দলটি পশ্চিমবঙ্গে প্রদর্শনী খেলায় অংশ নিতে এলে, ৬ই নভেম্বর ১৯৮৮ সালে জেলা স্টেডিয়ামে আই.এফ.এ একাদশের সঙ্গে একটি প্রদর্শনী খেলায় অংশগ্রহণ করে। অতিথি দল এই খেলায় ২-০ গোলে জয়লাভ করে।[৭৮]

১৯৮০- এর দশক থেকে জেলা স্টেডিয়ামে খেলার বিষয়ে কলকাতার প্রধান ফুটবল ক্লাব গুলির অনীহা এবং একই সঙ্গে আই.এফ.এ শীল্ডের খেলা গুলি কেন্দ্রীয়ভাবে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হওয়ার ফলে জেলা সংস্থা ক্রমশ ক্রিকেটের গুরুত্বপূর্ণ খেলাগুলিকে আয়োজন করতে উদ্যোগী হয়। ১৯৮১ সালে জেলা স্টেডিয়ামে প্রথম ১৮-২০শে ডিসেম্বর বাংলা ও আসামের মধ্যে তিন দিনব্যাপী রঞ্জিট্রফির ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। একইভাবে ১৯৮২ সালে ১০-১২ই ডিসেম্বর বিহার ও বাংলার মধ্যে এবং ১৯৯৬ সালে ২১-২৫শে জানুয়ারি বাংলা ও আসামের মধ্যে রঞ্জি ট্রফির খেলা জেলা স্টেডিয়ামে আয়োজিত হয়। ২০০৬ সালে সি.কে.নাইডু ট্রফির খেলা বাংলা ও উড়িষ্যার মধ্যে, ২০০৮ সালে একযোগে পাঁচটি সর্বভারতীয় পর্যায়ের কুচবিহার ট্রফির খেলা যেখানে গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, গোয়া,

ত্রিপুরা রাজ্য দল ও রেলওয়েজ অংশ নেয়, ২০০৯-১০ সালে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের মর্যাদাপূর্ণ বিজয় মার্চেন্ট ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনাল খেলা যেখানে তামিলনাড়ু ও মুম্বাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, সি.এ.বি পরিচালিত অনূর্ধ্ব ১৬ বৎসর রাজ্য আন্তঃবিদ্যালয় দাত্তু ফাদকার ক্রিকেট প্রতিযোগিতার খেলা জেলা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়।[৭৯]

পাতিয়ালার নেতাজি সুভাষ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব স্পোর্টস- এর উদ্যোগে প্রতিবছর গ্রামের ছেলে মেয়েদের জন্য বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়ে থাকে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে, যেখানে ১৫ বৎসরের বয়স্ক গ্রামের অধিবাসী বালক-বালিকারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকারী। ১৯৭৮ সালের জানুয়ারি মাসের ৮ই মে সারা ভারত গ্রামীণ খেলাধুলার তিন নম্বর গ্রুপের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা জেলা স্টেডিয়ামে আয়োজিত হয়। তিন নম্বর গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত খেলা গুলি হল- ফুটবল, ভলিবল ও জিমন্যাস্টিক। তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল মাননীয় ত্রিভুবন নারায়ণ সিং অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ১০ই জানুয়ারি, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। এই প্রতিযোগিতায় ১৩ টি রাজ্যের ৪৪২ জন বালক ও ১৫০ জন বালিকা সহ সর্বমোট ৫৯২ জন অংশগ্রহণ করে।[৮০]

নদীয়া জেলার অ্যাথলিট খেলোয়ারদের মধ্যে মহিলা খেলোয়াড়দের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে দৃশ্যমান হলেও দলগত খেলার ক্ষেত্রে মহিলা খেলোয়ারদের অনুপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা সর্বদাই মহিলাদের মধ্যে খেলার সম্প্রসারণের বিষয়ে সচেতনভাবে উদ্যোগ নিয়ে এসেছে। ১৯৭৭ সালের ২৪শে জুলাই জেলার স্টেডিয়ামে কয়েক হাজার দর্শকের সামনে প্রথম মহিলা ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হয় ভারতের মহিলা ফুটবল দল ও পশ্চিমবঙ্গ মহিলা ফুটবল দলের মধ্যে। জেলা ক্রীড়া সংস্থা ১৯৯০ সালে প্রথম মহিলা ভলিবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। সি.এ.বি কর্তৃক প্রায় সব জেলায় মহিলা ক্রিকেট দল গঠন করতে উদ্যোগ নিতে বলা হলে, নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা তাতে সাড়া দিয়ে মহিলা ক্রিকেট দল গঠন করতে উদ্যোগী হয়। প্রথম আন্তঃজেলা মহিলা ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নশিপ নামক সি.এ.বি কর্তৃক আয়োজিত এই প্রতিযোগিতার জন্য জেলা দল গঠনের

উদ্যোগ নেওয়া হলে, খেলোয়াড়দের উৎসাহ দিতে হাজির হন ভারতের মহিলা ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক নদীয়ার বাসিন্দা ঝুলন গোস্বামী। সি.এ.বি পরিচালিত মহিলাদের আন্তঃজেলা ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে ২০১৭ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর কুচবিহার স্টেডিয়ামে গতবারের চ্যাম্পিয়ন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা দলকে পরাজিত করে নদীয়া মহিলা দল প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব অর্জন করে।[৮১]

ক্রীড়া ক্ষেত্রের পাশাপাশি জেলার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও নিজেদের অবদান তুলে ধরতে নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা সর্বদাই সচেষ্ট থেকেছে। খেলার প্রসারের পাশাপাশি যাতে তার ইতিহাসও যথার্থভাবে সংরক্ষিত হয় এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তা ব্যবহার করতে পারে, এই ধরনের সাংস্কৃতিক উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে সংস্থা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। সংগঠন শুধুমাত্র খেলাধুলা বিষয়ক একটি স্পোর্টস লাইব্রেরী গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়ে ২৬শে জানুয়ারি ১৯৭৩ সালে লাইব্রেরির উদ্বোধন করে। এই ধরনের উদ্যোগ সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এক অনন্য পদক্ষেপ কারণ এই ধরনের স্পোর্টস লাইব্রেরি পশ্চিমবাংলায় একটিও ছিল না অর্থাৎ এটি পশ্চিমবাংলার প্রথম স্পোর্টস লাইব্রেরি। জেলা সংস্থা আর্থিক দিক থেকে স্বচ্ছলতা লাভের জন্য সংগঠন কর্তৃক প্রকাশিত পাক্ষিক পত্রিকায় অর্থের বিনিময়ে বিজ্ঞাপন প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিলে ক্রীড়া জগতে ক্রম বাণিজ্যিকীরণের যে প্রবণতা গোটা বিশ্বে পরিলক্ষিত হয় তার প্রতিফলন লক্ষ করা যায় ভারতের এই প্রান্তিক জেলায়। ১৯৭১ সাল থেকে সংগঠনের পাক্ষিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়ে আসছে যদিও বিভিন্ন সময় পর্বে বিজ্ঞাপন প্রকাশের প্রবণতায় হ্রাস বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়।[৮২]

প্রাথমিক পর্বে জেলার খেলাধূলা গুলি প্রধানত চাকদহ, রাণাঘাট, কল্যাণী, কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর ও নবদ্বীপ এর মতো শহর অঞ্চলগুলিতে সীমাবদ্ধ ছিল। খেলাধুলা যাতে শহরকেন্দ্রিকতা থেকে মুক্ত হয়ে ক্রমশ গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে পারে তার জন্যও বিশেষ উদ্যোগ লক্ষ করা যায়। জেলা ক্রীড়া সংস্থার অধীনস্থ আঞ্চলিক ক্রীড়া সংস্থাগুলি পূর্বে পুলিশ থানা ভিত্তিক গড়ে উঠলেও ১৯৭৬ সালে সরকারি স্তরে প্রত্যেকটি ব্লকে একটি করে ব্লক স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশন গড়ে তোলার কথা বলা

হয় মূলত দেশের ক্রীড়া মানের উন্নতির জন্য। সরকারি এই উদ্যোগের প্রতিফলন স্বরূপ নদীয়া জেলায় ব্লক ভিত্তিক ক্রীড়া সংস্থা গঠন করা হতে থাকে এবং ১৯৮২ সালে হরিণঘাটা ব্লকে আঞ্চলিক ক্রীড়া সংস্থা গঠন সম্পন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জেলার সব ব্লকেই আঞ্চলিক ক্রীড়া সংস্থা গঠন সম্পন্ন হয়। এছাড়াও ১৯৭৬ সাল থেকে বিভিন্ন খেলার প্রশিক্ষণ শিবির পৌর অঞ্চলের বাইরে প্রকৃত গ্রামাঞ্চলে আয়োজন করা হতে থাকে এবং একই সঙ্গে জেলা স্তরের বিভিন্ন প্রতিযোগিতা কৃষ্ণনগর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হওয়ার পরিবর্তে জেলার বিভিন্ন স্থানে সম্পন্ন করা হতে থাকে।[৮৩]

- **ষষ্ঠ অধ্যায়- জেলার বিশিষ্ট খেলোয়াড়, ক্রীড়া সংগঠক ও ক্রীড়া ক্লাব:**

নদীয়া জেলার বাসিন্দা একাধিক খেলোয়াড় রাজ্য, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে নিজেদের ক্রীড়া প্রতিভার স্বাক্ষর দিয়েছেন, নদীয়া জেলা ইতিহাস সংক্রান্ত যেকোনো আলোচনা এই সমস্ত খেলোয়াড়দের বর্ণনা ব্যতীত সম্পূর্ণ হতে পারে না। নদীয়া জেলার বেথুয়াডহরীর অধিবাসী দেবাশীষ মন্ডল ১৯৬৪ সালে টোকিও অলিম্পিকে জিমন্যাস্টিক বিভাগে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন, যিনি সম্ভবত জিমন্যাস্টিক বিভাগে অলিম্পিকে অংশগ্রহণকারী প্রথম ও একমাত্র বাংলার খেলোয়াড়।[৮৪] আন্তঃরাজ্য জুনিয়র হকি প্রতিযোগিতায় নদীয়ার অর্ধেন্দু চক্রবর্তী ঠাকুর বাংলা দলে স্থান পায় এবং ১৯৬৯ সালে বোম্বেতে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতার প্রতিটি খেলায় চূড়ান্ত দলের স্থান সহ একটি খেলায় গোলও করেন। কৃষ্ণনগরের নিবাসী মোহাম্মদ আলম দক্ষিণ কলকাতার ফিজিক্যাল কালচার জিমনাসিয়ামে অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ ভারত্তোলন ও দেহ গঠন সমিতি কর্তৃক পরিচালিত বঙ্গশ্রী দেহসৌষ্টব প্রতিযোগিতায় ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি গ্রুপে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং বঙ্গশ্রী উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯৭১ সালে আমেদাবাদে অনুষ্ঠিত আন্তঃরাজ্য স্পোর্টস- এর নবম বার্ষিক অনুষ্ঠানে কৃষ্ণনগর অ্যাথলেটিক ক্লাবের গোপাল বিশ্বাস অনূর্ধ্ব ১৮ বছর বালক বিভাগে বাংলা দলের পক্ষে দীর্ঘ লম্ফনে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। নদীয়া জেলা ফুটবল দলের খেলোয়াড় প্রসাদ তরফদার পশ্চিমবাংলা দলের সদস্য হিসেবে ১৯৮১ সালে কেরালার কোচিনে অনুষ্ঠিত ভারতীয় জুনিয়র ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। ১৯৮১ সালে কানপুরে অনুষ্ঠিত জাতীয় জুনিয়র ভলিবল প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গের যে দল অংশ নেয়, তাতে নদীয়ার দুজন

খেলোয়াড় স্থান পাই- চাকদহ তরুণ সমিতির খেলোয়াড় মদনমোহন সাহা ও কৃষ্ণনগর ভারতী সংঘ ক্লাবের খেলোয়াড় জাইদুল হাসান। শান্তিপুর সবুজ সংঘের খেলোয়াড় সুবীর বসাক পশ্চিমবঙ্গ দলের খেলোয়াড় হিসেবে ১৯৮৫ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সেরা ফুটবল খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি লাভ করে। কৃষ্ণনগরের অমর ভারতী সংঘের খেলোয়াড় সৌতম মিত্র সর্বপ্রথম নদীয়ার খেলোয়াড় হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের রঞ্জিদলে নির্বাচিত হন ১৯৮৬ সালে। গৌহাটিতে অনুষ্ঠিত সারা ভারত গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী পশ্চিমবঙ্গ ফুটবল দলে নদীয়ার নবদ্বীপ অঞ্চলের অন্তর্গত চড়ব্রহ্মনগরের সেবক সমিতির খেলোয়ার শ্যামল ভৌমিক অন্তর্ভুক্ত হন। সি.এ.বি- এর বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে (১৯৮৭-১৯৮৮) কৃষ্ণনগরের ইয়ংস্টার ক্লাবের সদস্য রবীন্দ্রনাথ দাস পশ্চিমবঙ্গের সব জেলার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সাব-জুনিয়র ক্রিকেটার নির্বাচিত হন। ১৯৯৫ সালে ৪৫ তম রাজ্য অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় সাব-জুনিয়র বালিকা বিভাগে নদীয়ার খেলোয়াড় সারথি বর্মন সেরা অ্যাথলিট নির্বাচিত হন। ওই একই বছর জাতীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে (মধ্যপ্রদেশের ভূপালে অনুষ্ঠিত) সারথি বর্মন নিজ বিভাগে ১০০ মিটার দৌড়ে ও লং জাম্পে প্রথম হন এবং অ্যামেচার অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়া (এ.এ.এফ.আই) সারথি বর্মনকে দেশের সেরা জুনিয়র অ্যাথলিট হিসেবে পুরস্কৃত করে। ওই একই প্রতিযোগিতাই জুলফিকার হক মন্ডল অনূর্ধ্ব ১৭ বছর বিভাগে হাই জাম্পে প্রথম স্থান লাভ করে। দেবগ্রাম কালচারালসোসাইটির হয়ে ১৯৮১-৮৫ সাল পর্যন্ত নদীয়া জেলার বার্ষিক স্পোর্টসে অংশগ্রহণকারী জ্যোতির্ময়ী সিকদার ১৯৯৯ সালে ব্যাংকক এশিয়ান প্রতিযোগিতায় জোড়া সোনা ও একটি রুপোর পদক লাভ করেন। আনন্দবাজার পত্রিকায় ক্রীড়া সম্পাদক শ্রী রূপক সাহা পত্রিকায় লেখেন জেলা থেকে খেলোয়াড় সরবরাহের তালিকায় নদীয়া এখন সেরা জ্যোতির্ময়ী- এর দৌলতে।

বাদকুল্লা অনামী ক্লাবের হয়ে নিয়মিত নদীয়া জেলা অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী রাখি বিশ্বাস ২০০৩ সালে সুরাটে অনুষ্ঠিত জাতীয় ভারউত্তোলন প্রতিযোগিতায় 'স্টেংথ লিফটিং' বিভাগে ৭৫ কেজি ক্যাটাগরিতে প্রথম স্থান দখল করেন। ৪৭ তম জাতীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ যা ২০০৩ সালে জামশেদপুরে অনুষ্ঠিত হয় সেখানে জেলার দুজন অ্যাথলিট শিল্পী ঢালী

ও ডলি সরকার ৪x৪০০ মিটার রিলে দৌড়ে বাংলা দলের হয়ে অংশগ্রহণ করে এবং প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক লাভ করে। ২০০৬ সালের ৫৬ তম রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় নদীয়া দলের খেলোয়াড় দেবশ্রী মজুমদার প্রতিযোগিতার সেরা অ্যাথলিট ঘোষিত হন এবং ওই একই বছর ১৮ তম ইস্ট জোন অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় দেবশ্রী ১০০ মিটার, ৪০০ মিটার ও রিলে দৌড়ে প্রথম স্থান দখল করে পূর্ব জোনে 'বেস্ট পারফর্ম অ্যাথলিট' হবার সম্মান লাভ করে। ২০০৭ সালে পাটনায় অনুষ্ঠিত পূর্ব জোন অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় নদীয়া জেলার তিনজন অ্যাথলিট বাংলা দলের হয়ে অংশ নেয় এবং দেবশ্রী মজুমদার ২০০ ও ৪০০ মিটার দৌড়ে প্রথম, রোজিনা খাতুন হাই জাম্পে দ্বিতীয় ও সুমিতা রায় ব্রড জাম্পে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। রানাঘাট পাল চৌধুরী হাই স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র ও রানাঘাট স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন ক্লাবের খেলোয়াড় সায়ন মন্ডল, অম্বর রায় টুর্নামেন্টের সেরা বোলার হিসেবে, সি.এ.বি কর্তৃক অনূর্ধ্ব ১৪ বিভাগে সেরা ক্রিকেটার- এর মর্যাদা লাভ করেন ২০১০ সালে। নদীয়া জেলা ফুটবল লীগে নিয়মিত অংশগ্রহণকারী চাকদহের অগ্রদূত ক্লাবের খেলোয়াড় অনুপম সরকার সন্তোষ ট্রফি জয়ী বাংলা দলের অধিনায়ক হিসেবে রাজ্য সরকার কর্তৃক গোটা দল সহ সংবর্ধিত হন। নবম জাতীয় আন্তঃজেলা জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা যা ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে ২০১১ সালে অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে জেলার রাণাঘাটের হালালপুর বিবেকানন্দ সংস্কৃত পরিষদ ক্লাবের অনিতা দাস অনূর্ধ্ব-১৪ বছর বিভাগে ৫.২১ মিটার লাফিয়ে লং জাম্পে জাতীয় পর্যায়ের রেকর্ড করেন। ওই একই বছর হায়দ্রাবাদে জাতীয় জুনিয়র ভলিবল প্রতিযোগিতায় অসামান্য দক্ষতা প্রদর্শনের স্বীকৃতি স্বরূপ শান্তিপুরের শান্তিস্মৃতি সংঘের শান্তনু দেবনাথ ভলিবলে অনূর্ধ্ব-১৪ বছর বিভাগে, ২০১১ মরশুমে বাংলার বর্ষসেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন। সর্বভারতীয় অ্যাথলেটিক্স সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত ২৫ তম জাতীয় আন্তঃআঞ্চলিক জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় রানাঘাট হালালপুর বিবেকানন্দ সংস্কৃত সংঘের অনিতা দাস বাংলা দলের হয়ে বালিকা ১৬ বছর বিভাগে লং জাম্পে রূপো ও ১০০ মিটার দৌড়ে ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে। চাকদহ নবীন সংঘের খেলোয়াড় ও নদীয়া জেলা দলের নিয়মিত খেলোয়াড় সায়ন ঘোষ, ২০১৪ সালে মুম্বাইতে অনুষ্ঠিত মুশতাক আলী ক্রিকেট টুর্নামেন্টে সি.এ.বি সিনিয়র ক্রিকেট দলে প্রতিনিধিত্ব করেন এবং নিয়মিত

প্রথম একাদশে খেলে ভালো প্রদর্শন করেন। সায়ন ঘোষ ২০১৫ সালে ক্রিকেটে বাংলার রঞ্জি দলে নির্বাচিত হন এবং বিদর্ভ রাজ্যের সাথে খেলায় তার রঞ্জি অভিষেক ঘটে। ২০১৫ সালে বাংলা মহিলা ক্রিকেট দলে তেহট্টের প্রিয়াংকা বালা ও কৃষ্ণনগরের পম্পা সরকার এবং অনূর্ধ্ব ১৯ বছর বাংলা মহিলা দলে বাদকুল্লার রূপা দত্ত ও চাকদহের অম্বিকা গুহ নিয়মিত খেলেন। ওই একই বছরে ১৩ তম সর্বভারতীয় আন্তঃজেলা বয়স ভিত্তিক অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় জেলার অ্যাথলিট রুবিনা খাতুন বালিকা অনূর্ধ্ব ১৪ বছর বিভাগে লং জাম্পে ও সুমিতা ভৌমিক বালিকা অনূর্ধ্ব ১৬ বছর বিভাগে ৪০০ মিটার দৌড়ে প্রথম হন এবং ২৭ তম পূর্বাঞ্চল জাতীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় সুমিত্রা ভৌমিক ৪০০ মিটার দৌড়ে ও রুবিনা খাতুন লং জাম্পে প্রথম হয়ে সোনার পদক লাভ করেন। পূর্বাঞ্চল জাতীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় ২০১৬ সালে বাংলা দলের হয়ে জেলার খেলোয়াড় সুরভী বিশ্বাস অনূর্ধ্ব কুড়ি বছর বিভাগে ডিসকাস ও শটপুটে এবং প্রিয়াঙ্কা হালদার অনূর্ধ্ব ১৪ বছর বিভাগে ১০০ মিটার দৌড়ে প্রথম হয়ে সোনার পদক লাভ করেন। ব্রাজিলের রিও অলিম্পিকে ভারতের অ্যাথলিটদের মধ্যে বাংলার একমাত্র অ্যাথলিট নদীয়ার মেয়ে দেবশ্রী স্থান লাভ করে এবং এর পরের বছর ২০১৭ সালে এশীয় অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় তিনি সোনার পদক লাভ করেন ৪x৪০০ মিটার রিলে দৌড়ে।[৮৫]

ক্রীড়া সংক্রান্তকার্য যথার্থভাবে পরিচালনা ও খেলাধুলার ক্রম উন্নতি সাধনের ক্ষেত্রে ক্রীড়া সংগঠকদেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। বিশিষ্ট খেলোয়াড়দের পাশাপাশি নদীয়ার একাধিক ক্রীড়া সংগঠক রাজ্য, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে তাদের সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৭৬ সালে রাজ্য ক্রীড়া পরিষদ পুনর্গঠন করে ক্রীড়ামন্ত্রী প্রফুল্ল ক্রান্তি ঘোষের সভাপতিত্বে ২৫ সদস্যের একটি পরিষদ গঠন করে। এই ক্রীড়া পরিষদের সকলেই কলকাতার ক্রীড়া মহলের সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব হলেও মফস্বল থেকে একমাত্র সদস্য মনোনীত হন নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক গোবিন্দ প্রসাদ দত্ত। উল্লেখ্য অনুরূপভাবে ১৯৬৮ ও ১৯৬৯ সালেও রাজ্য ক্রীড়া পরিষদে মফস্বল থেকে একমাত্র সদস্য ছিলেন জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রাক্তন সম্পাদক এস.এম. বদরুদ্দীন। জেলা

ক্রীড়া সংস্থার অন্যতম সহ সাধারণ সম্পাদক শিবদাস রায় ১৯৮২ সালে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত নবম এশিয়ান গেমসে পশ্চিমবাংলা থেকে নির্বাচিত বিচারক দলের অন্যতম সদস্য হিসাবে অ্যাথলেটিক্স বিভাগের স্বীয় ক্ষেত্রে কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ১৯৮৬ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি ক্রীড়া দিবস উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার রাজ্যের ১২ জন ক্রীড়া সংগঠক ব্যক্তিকে তাদের সংগঠন শক্তি ও কর্ম কুশলতার স্বীকৃতি স্বরূপ পুরষ্কৃত করে। এই পুরষ্কার প্রাপকদের মধ্যে অন্যতম হলেন নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহ-সভাপতি তথা ওয়ার্কিং কমিটির চেয়ারম্যান এস.এম. বদরুদ্দীন। দিল্লিতে ১৯৮৭ সালে অনুষ্ঠিত বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় আম্পেয়ারিং করার জন্য নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার অন্যতম ডেপুটি সেক্রেটারি হরপ্রসাদ মুখার্জী নিয়োগপত্র লাভ করেন। ১৯৮৭ সালে রাজ্য স্পোর্টস কাউন্সিল ক্রীড়া দিবসে কুড়ি জন ব্যক্তিকে সম্মানিত করে যার মধ্যে ছিলেন জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহ-সভাপতি ও ওয়ার্কিং কমিটির চেয়ারম্যান গোবিন্দ দত্ত এবং ১৯৮৮ সালে এই পুরস্কার লাভ করেন জেলার অন্যতম ক্রীড়া সংগঠক শঙ্করীচরণ চট্টোপাধ্যায়। জেলা সংস্থার প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক গোবিন্দ প্রসাদ দত্ত ১৯৯৫ সালে সি.এ.বি- এর সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন।[৮৬]

নাগপুরে ২০০০ সালের ১৯শে মার্চ অনুষ্ঠিত ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে একদিনের ক্রিকেট সিরিজের পঞ্চম তথা শেষ একদিনের খেলায় অন্যতম আম্পিয়ার হিসেবে মাঠে নামেন কৃষ্ণনগরের শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগার ও নদীয়া জেলা ক্রিকেট দলের প্রাক্তন নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় কৃষ্ণনগরের বাসিন্দা ফ্রান্সিস গোমেজ। নদীয়ার মানুষ হিসেবে তিনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলায় প্রথম এই কৃতিত্ব দেখালেন। সর্বভারতীয় অ্যাথলেটিক্স সংস্থার (অ্যামেচার অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া) পূর্ণ দায়িত্বপ্রাপ্ত টেকনিক্যাল কমিটির অন্যতম সদস্য নিযুক্ত হন ২০০০ সালে, জেলা ক্রীড়া সংস্থার অন্যতম সহ-সভাপতি ও ওয়ার্কিং কমিটির চেয়ারম্যান শিবদাস রায়। পশ্চিমবঙ্গ থেকে অন্য কেউ এই কমিটিতে এর আগে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন বলে জানা যায় না। সি.এ.বি কর্তৃক ২০১০-১১ মরশুমে ক্রিকেটে বর্ষসেরা আম্পিয়ার নির্বাচিত হন বীরনগরের বাসিন্দা দেবতোষ মুখার্জি। দেশের প্রাচীনতম ক্রীড়া সংগঠন ও বাংলার ফুটবল নিয়ামক সংস্থা আই.এফ.এ- এর ২০১২ সালে গভর্নিং

বডির সভায় আই.এফ.এ- এর সহ-সচিব নির্বাচিত হন জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক জয়ন্ত চ্যাটার্জি।[৮৭]

জেলার খেলাধুলা সংক্রান্ত কার্য তৃণমূল স্তরে পরিচালিত হয় একাধিক ক্রীড়া সংক্রান্ত ক্লাবের দ্বারা। এই সমস্ত ক্লাবগুলি নিজেদের ক্ষুদ্র পরিসরে ক্রীড়া সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে ক্রীড়া ক্ষেত্রে প্রতিভাবানদের খেলোয়াড় হিসেবে গড়ে তোলার প্রাথমিক রসদ সরবরাহ করে থাকে। জেলার প্রায় প্রতিটি অঞ্চলেই এই সমস্ত ক্লাবগুলি গড়ে উঠেছে এবং নদীয়ার যে সমস্ত খেলোয়াড় রাজ্য, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছে তাদের প্রায় প্রত্যেকেই জেলার কোনো না কোনো ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত থেকেছে, তাদের খেলোয়াড় জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে। এই ক্লাব গুলি ক্রীড়া সংক্রান্ত কার্যের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক কার্যের সঙ্গেও যুক্ত থাকে। বিভিন্ন ক্লাবগুলি নিজেদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দুস্থদের সাহায্য করা, বন্যার মত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় ত্রাণ ও সাহায্যের ব্যবস্থা করা, রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা প্রভৃতি কাজের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত রাখে। এছাড়া সাংস্কৃতিক কার্যেও ক্লাবগুলি নিজেদের অবদানের স্বাক্ষর তুলে ধরে স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস ও বিভিন্ন মনীষীদের জন্ম বা মৃত্যুদিনে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে। অধিকাংশ ক্লাবগুলি নিজেদের অঞ্চলে দুর্গাপূজা, কালী পূজার মতো বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। জেলার ক্রীড়া ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এই ক্লাবগুলোর অবদান তুলে ধরা আবশ্যক। সমগ্র জেলাজুড়ে একাধিক ক্লাব গরে উঠলেও নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার দ্বারা অনুমোদিত এবং ক্রীড়া ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা ক্লাবগুলোর বর্ণনা তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে উক্ত গবেষণাকার্যে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর সূচনার দিকে জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ক্লাবগুলি গড়ে উঠতে থাকে এবং প্রাথমিক পর্যায়ে চাকদহ, কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর, রাণাঘাট ও নবদ্বীপের মতো পৌরসভা অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল ক্লাবগুলি। ১৮৯০ সালে কৃষ্ণনগরে প্রথম টাউন ক্লাব গড়ে ওঠে। এই পর্বে কৃষ্ণনগরে মিনার্ভা স্পোর্টিং, সবুজ সংঘ, অনন্ত হরি ক্লাব, মুসলিম ক্লাব ইত্যাদি গড়ে উঠলেও তা বেশিদিন টিকে থাকেনি। স্বাধীনতা লাভের পর ক্লাবের সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে- হিরোজ ক্লাব (১৯৪০),

কৃষ্ণনগর সাউথ ক্লাব, অগ্রণী সংঘ (১৯৫৩), শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগার ইত্যাদি গড়ে ওঠে। শান্তিপুরের ক্লাবগুলোর মধ্যে- শান্তিপুর স্পোটিং ইউনিয়ন, শান্তিপুর মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, ন্যাশনাল ক্লাব, সূত্রাগড় স্পোর্টিং ক্লাব, নবদ্বীপের ক্লাবগুলোর মধ্যে- নবদ্বীপ অ্যাথলেটিক ক্লাব, নদিয়া ক্লাব, রাণাঘাটের ক্লাব গুলির মধ্যে- রাণাঘাট টাউন ক্লাব, রাণাঘাট স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন, রাণাঘাট হ্যাপি ক্লাব, ভারতী সংঘ, চাকদহের ক্লাব গুলির মধ্যে- নবীন সংঘ, লাইফ ফর ডু ইত্যাদি প্রাচীনতম ও উল্লেখযোগ্য ক্লাব। ১৯৭০- এর দশকের পর থেকে ক্লাবের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি হয় এবং গ্রামাঞ্চলেও নতুন ক্লাব গড়ে উঠতে থাকে। এই ক্লাবগুলি ক্রীড়া ক্ষেত্রে অসাধারণ দক্ষতা প্রদর্শন এর মাধ্যমে প্রমাণ করে উপযুক্ত সুযোগ পেলে গ্রামাঞ্চল থেকেও প্রতিভাবান খেলোয়াড় লাভ সম্ভব। পৌর অঞ্চলের বাইরে অবস্থিত পল্লীগ্রামের ক্লাব গুলির মধ্যে বাদকুল্লার অনামী ক্লাব ও রাণাঘাটের সন্নিকটে অবস্থিত হালালপুর বিবেকানন্দ সংস্কৃত সংঘ বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এদের মধ্যে অনামী ক্লাব ২০১২ সালে জেলা অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মাধ্যমে একটানা সাতবার এই প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হবার অনন্য কৃতিত্ব অর্জন করে। হালালপুর বিবেকানন্দ সংস্কৃত সংঘ জেলা অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় একাধিক বার দ্বিতীয় স্থান দখল করে এবং এই ক্লাবের অনেক খেলোয়াড় রাজ্য ও জাতীয় স্তরে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছে। এছাড়াও বেথুয়াডহরি, তেহট্ট, আড়ংঘাটা প্রভৃতি গ্রামাঞ্চলের ক্লাবগুলিও একাধিক প্রতিভাবান খেলোয়াড় উপহার দিয়েছে।[৮৮]

- **সপ্তম অধ্যায়- জেলায় খেলার আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট ও আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে খেলা:**

স্থানীয় ইতিহাস সমৃদ্ধ না হলে বৃহত্তর ইতিহাস সমৃদ্ধ হয় না। নদীয়া জেলার ক্রীড়া ইতিহাস সংক্রান্ত গবেষণা এই জেলার ইতিহাস কে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি বৃহত্তর ক্রীড়া ইতিহাসের ধারা কেউ সমৃদ্ধ করে তুলবে। জেলার ক্রীড়া বিবর্তনের ধারা পর্যবেক্ষণ করলে লক্ষ করা যায়, প্রথমে জেলায় হকি ও ফুটবলের মত খেলা জনপ্রিয় থাকলেও ১৯৮০- এর দশকের পর থেকে ক্রমশ ক্রিকেট প্রধান খেলা হয়ে ওঠে, যা ভারতের ক্রীড়া বিবর্তনে ফুটবল ও হকির স্থানে ক্রিকেটের সর্বগ্রাসী আধিপত্য স্থাপনের

এক ক্ষুদ্র জেলা ভিত্তিক সংস্করণ তুলে ধরে। ক্রীড়া ক্ষেত্রে অবদানের কথা বললে জেলার অ্যাথলিটদের অবদান যেকোনো দলগত ক্রীড়ার থেকে অধিক এবং এক্ষেত্রে মহিলা অ্যাথলিটদের সাফল্য যথেষ্ট শ্লাঘার বিষয়। ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের এক প্রান্তিক জেলায়, অ্যাথলেটিক্স- এর মতো ক্রীড়া ক্ষেত্রে অবহেলিত প্রান্তিক খেলায়, সমাজের প্রান্তিক অবহেলিত গোষ্ঠী হিসেবে পরিগণিত মহিলাদের সাফল্য যথার্থই প্রান্তিক ইতিহাসের ধারাকে তুলে ধরে। জেলার মহিলা অ্যাথলিটদের অসাধারণ সাফল্য সত্ত্বেও ক্রীড়া সংগঠকদের মধ্যে ও ক্লাব সংগঠকদের মধ্যে মহিলা সদস্যের অনুপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। জেলা ক্রীড়া সংস্থার কোন সাংগঠনিক পদে কোনো মহিলা সদস্য কখনোই নিযুক্ত হননি, ক্লাব গুলির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। পরিশেষে বলা যায় নদীয়া জেলার ক্রীড়া ইতিহাস সংক্রান্ত গবেষণা জেলার ক্রীড়া ইতিহাস কে যথার্থভাবে সংরক্ষণ করে খেলার মাধ্যমে সামাজিক ইতিহাসের ধারাকে বর্ণনা করে সামগ্রিক ইতিহাস বোধ কে করে তুলবে সমৃদ্ধ।

- **অষ্টম অধ্যায়- উপসংহার:**

পরিশেষে স্বাধীনতা উত্তর পর্বে নদীয়া জেলার খেলাধুলার ইতিহাস বর্ণনার ক্ষেত্রে গবেষণা কার্যটি কতটা সফল তার মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে গবেষণা কার্যটির মাধ্যমে যে সামগ্রিক ধারণা লাভ করেছি তার সংক্ষিপ্তসার প্রদানের প্রচেষ্টা করা হয়েছে। একই সঙ্গে কোন কোন ক্ষেত্রে গবেষণা সন্দর্ভটির সীমাবদ্ধতা রয়েছে তাও তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে, যাতে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার বিষয়টিও তুলে ধরা সম্ভব হয়।

• টীকা ও সূত্র নির্দেশ:

১. Arthur Marwick, *The New Nature of History: Knowledge Evidence, Language* (Houndmills: Palgrave, 2001), 88-90.

২. Soumen Mitra, "Nationalism, Communalism and Sub-regionalism: A Study of Football in Bengal," (M.Phil. diss., Centre for Historical Studies, Jawaharlal Nehru University, 1988).

৩. Soumen Mitra, *In Search of an Identity: History of Football in Colonial Calcutta* (Kolkata: Das Gupta and Co., 2006).

৪. Ramachandra Guha, *A Corner of a Foreign Field: The Indian History of a British Sport* (New Delhi: Penguin Books, 2014).

৫. Mihir Bose, *The Magic of Indian Cricket: Cricket and Society in India* (London: Routledge, 2006).

৬. Ashis Nandy, *The Tao of Cricket: On Games of Destiny and Destiny of Games* (New Delhi: Oxford University Press, 2000).

৭. Mario Rodriguaz, *Batting for the Empire: A Political Biography of Ranjitsinhji* (New Delhi: Penguin Books, 2003).

৮. Edward Docker, *History of Indian Cricket* (Delhi: Macmillan, 1976).

৯. Richard Cashmann, *Patrons, Players and the Crowd: The Phenomenon of Indian Cricket* (New Delhi: Oriental Longman, 1980).

১০. Boria Majumdar, *Twenty Two Yards to Freedom* (New Delhi: Penguin Books, 2004).

১১. Tony Mason, "Football on the Maidan: Cultural Imperialism in Calcutta," in *The Cultural Bond: Sport, Empire and Society*, ed. J.A. Mangan (London: Frank Cass, 1992).

১২. Paul Dimeo and James Mills, eds., *Soccer in South Asia: Empire, Nation, Diaspora* (London: Routledge, 2001).

১৩. Boria Majumdar and Kausik Bandyopadhyay, *Goalless: The Story of a Unique Footballing Nation* (New Delhi: Penguin Book, 2006).

১৪. J.A. Mangan, *The Games Ethic and Imperialism: Aspects of the Diffusion of an Ideal* (London: Frank Cass, 2003).

১৫. Ronojoy Sen, *Nation at Play: A History of Sport in India* (New York: Columbia University press, 2015).

১৬. James H. Mills, ed., *Subaltern Sports: Politics and Sports in South Asia* (London: Anthem Press, 2005).

১৭. কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *খেলা যখন ইতিহাস: সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি* (কলকাতা: সেতু প্রকাশনী, ২০১৯), ৭।

১৮. Boria Majumdar and Nalin Mehta, *Olympics: The Indian Story* (London: Routledge, 2008).

১৯. *সংসদ বাংলা অভিধান*, ষষ্ঠ মুদ্রণ। (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ২০০৪), "খেলা", "ক্রীড়া"।

২০. *Oxford Advanced Learners Dictionary*, 8th Edition. (Oxford: Oxford University Press, 2010), s.v. "play".

২১. James S. Ross, *Ground Work of Educational Psychology* (London: George G. Harpar and Co. Limited, 1953), 61.

২২. সুশীল রায়, *শিক্ষা তত্ত্ব ও শিক্ষা দর্শন* (কলকাতা: বুক হাউস, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ), ২০১।

২৩. E.B. Hurlock, *Child Development* (New York: McGrow- Hill Book Company, 1942), 337.

২৪. W.M. Ryburn, *Introduction to Educational Psychology* (London: Oxford University Press, 1965), 280.

২৫. John Huizinga, *Homo Ludens: A Study in Play Element in Culture* (Boston: The Beacon Press, 1960), 7.

২৬. Ibid., 28.

২৭. Roger Caillois, *Man, Play and Games* (Chicago: University of Illinois Press, 2001), 6.

২৮. Ibid., 16-23.

২৯. *Oxford Advanced Learners Dictionary*, 8th Edition. (Oxford: Oxford University Press, 2010), s.v. "game".

৩০. জিয়াউল আলম, "শরীর চর্চার আলোকে বাংলার লোকক্রীড়ার সন্ধান," (পি.এইচ.ডি গবেষণা নিবন্ধ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২), ৩।

৩১. *Oxford Advanced Learners Dictionary*, 8th Edition. (Oxford: Oxford University Press, 2010), s.v. "sport".

৩২. আলম, "শরীর চর্চার আলোকে বাংলার লোকক্রীড়ার সন্ধান," ৩-৪।

৩৩. Allen Guttmann, *From Ritual to Record* (New York: Columbia University Press, 2004), 3.

৩৪. Ibid., 4.

৩৫. Ibid., 18.

৩৬. Ibid., 55.

৩৭. Eric Hobsbowm and Terence Ranger, eds., *The Invention of Tradition* (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), 298.

৩৮. Ronojoy Sen, *Nation at Play: A History of Sport in India* (New York: Columbia University press, 2015), 3.

৩৯. Kendall Blanchard, "The Anthropology of Sport," in *Handbook of Sports Studies*, ed. Jay Coakley and Eric Dunning (London: Sage Publication, 2000), 145.

৪০. John Huizinga, *Homo Ludens: A Study in Play Element in Culture* (Boston: The Beacon Press, 1960).

৪১. Roger Caillois, *Man, Play and Games* (Chicago: University of Illinois Press, 2001).

৪২. Norbert Elias and Eric Dunning, *Quest for Excitement: Sport and Leisure in the Civilizing Process* (Oxford: Basil Blackwell, 1986).

৪৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, *খেলা যখন ইতিহাস*, ৬।

৪৪. তদেব, ১-২।

৪৫. J.A. Mangan, "Series Editor's Foreword," in *Sporting Nationalism: Identity, Ethnicity, Immigration, Assimilation*, ed. Mike Cronin and David Myall (London: Frank Cass, 1998).

৪৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, *খেলা যখন ইতিহাস*, ২।

৪৭. তদেব, ৪৫–৪৯।

৪৮. তদেব, ৮৭-৮৯।

৪৯. তদেব, ১১৪-১১৭।

৫০. বোরিয়া মজুমদার, *শতশিল্পে আলোকিত ভারতের ক্রীড়া ইতিহাস* (কলকাতা: দীপ প্রকাশন, ২০১৮), ৮৪।

৫১. তদেব, ৭।

৫২. বন্দ্যোপাধ্যায়, *খেলা যখন ইতিহাস*, ৩।

৫৩. Ramachandra Guha, "Cricket and Politics in Colonial India," *Past and Present*, no.161 (November 1998): 155-190.

৫৪. শিরিন রত্নাগর, *হরপ্পা সভ্যতার সন্ধানে* (কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ২০০৫), ৭২–৭৭, ১০৮–১১২।

৫৫. Sen, *Nation at Play*, 14-17.

৫৬. S. Beal, *The Romantic Legend of Sakya Buddha* (London: Trubner and Co., 1875), 71.

৫৭. C.H. Tawncy, *Somadevas Kathasarit Sagar* (Varanasi: Motilal Banarasidas, 1968), 200.

৫৮. Sen, *Nation at Play*, 25-26.

৫৯. George Orwell, *Burmese Days* (London: Penguin, 1989), 14.

৬০. Sen, *Nation at Play*, 47-48.

৬১. Ibid., 51.

৬২. E. Sreedharan, *A Manual of Historical Research Methodology* (Kerala: Oriental Black Swan, 2017), 27.

৬৩. মেটকাফ (C.T. Metcalf) ১৮৬৫ সালে বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত রাজশাহী জেলার দেওপাড়া নামক গ্রামের সন্নিকট থেকে লেখটি আবিষ্কার করেন।

৬৪. Nani Gopal Majumdar, *Inscription in Bengal* (Rajshahi Bangladesh: The Varendra Research Society, 1929), 44-47.

৬৫. Harprasad Shastri, *School History of India* (Calcutta: Calcutta Sanskrit Press Depository, 1899), 35.

৬৬. মিনহাজ উস সিরাজ, "তবাকত-ই-নাসিরী"- তে বক্তিয়ার খলজির 'নৌদিয়া' বিজয়ের বর্ণনা দিয়েছেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এর মতে এই 'নৌদিয়া' রাজশাহী জেলার অন্তর্গত শহর যা গৌড় শহরের কুড়ি মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। অন্যদিকে অনিরুদ্ধ রায়ের মতে এই 'নৌদিয়া' ও বর্তমান নবদ্বীপ অভিন্ন স্থান।

৬৭. অনিরুদ্ধ রায়, *মধ্যযুগের ভারতীয় শহর* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৮), ১৩০-১৩৩।

৬৮. তদেব, ১৫৮।

৬৯. J.H.E. Garrett, *Bengal District Gazetters: Nadia* (Calcutta: The Bengal Secretariat Book Depot., 1910), 34.

৭০. Ibid., 37-38.

৭১. Durgadas Majumdar, *Nadia District Gazetter* (Calcutta: Information and Public Relation Department, 1978), 1-5.

৭২. Jayanta Chatterjee, ed., *Nadia District Sports Association, Amended Constitution Book* (Krishnagar: Nadia District Sports Association, 2017), I-V.

৭৩. Ibid., 6.

৭৪. সালেক সুফী, "মুক্তিযুদ্ধের ফুটবল ফ্রন্ট," *খেলার কথা কথার খেলা,* সম্পা। ইকরামউজ্জামান ও অন্যান্য (ঢাকা, ১৯৯৩), ৩৭।

৭৫. *নদীয়া ডিস্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা আগস্ট, ১৯৭১, ২।

৭৬. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ।*

৭৭. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ।*

৭৮. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ।*

৭৯. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ।*

৮০. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ।*

৮১. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ।*

৮২. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ।*

৮৩. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ।*

৮৪. *The Times of India.*

৮৫. *আনন্দবাজার পত্রিকা।*

৮৬. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ।*

৮৭. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ।*

৮৮. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ।*

দ্বিতীয় অধ্যায়:

খেলার সংজ্ঞা, ইতিহাস চর্চা ও সমাজের সঙ্গে সম্পৃক্ততা

খেলা বা ক্রীড়া ইতিহাস বিষয়ক যেকোনো আলোচনার পূর্বে আমাদের এই বিষয় সম্পর্কিত একাধিক জ্ঞানতাত্ত্বিকক্ষেত্র এবং সেই সংক্রান্ত জটিলতার বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা দরকার। এক্ষেত্রে প্রথমেই যে বিষয়টি আলোচনার দাবি রাখে তা হল খেলা বা ক্রীড়া বলতে আমরা কী বুঝি ? অর্থাৎ খেলা বা ক্রীড়ার সংজ্ঞা নির্ধারণ করা এবং সেই বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা গঠন করা একান্ত আবশ্যক। ইংরেজিতে খেলার প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহৃত শব্দ গুলির ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং বিভিন্ন সময় পর্বে বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকগণ খেলার যে সংজ্ঞা প্রদান করেছেন তার তুলনামূলক আলোচনা এক্ষেত্রে আমাদের ধারণা গঠনের ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে। দ্বিতীয় বিষয়টি হল খেলা কিভাবে ইতিহাস চর্চার প্রথাগত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হল ? প্রথাগত প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাস চর্চায় খেলার অন্তর্ভুক্তি অপেক্ষাকৃত নবীন এক বিষয়। মূলত বিংশ শতকে খেলার ইতিহাস চর্চার সূচনা হয় এবং একবিংশ শতকে তা আরও সমৃদ্ধি লাভ করে। প্রাথমিক পর্যায়ে ইতিহাস বলতে কেবল রাজ-রাজড়ার কাহিনী কে বোঝানো হতো। কিন্তু সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রেরও ক্রম প্রসারণ ঘটে এবং নিত্যনতুন বিষয় এর অন্তর্ভুক্ত হয়। বর্তমানে ইতিহাস রাজনৈতিক সীমার গণ্ডিকে অতিক্রম করে মানব সমাজের সমস্ত ক্ষেত্রকে নিজের জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার কাঠামোয় অন্তর্ভুক্ত করেছে। একদিকে বিভিন্ন ঐতিহাসিক পর্বে ইতিহাস চর্চার বিবর্তনের ধারা বিষয়ক আলোচনা এবং অন্যদিকে বিভিন্ন ক্রীড়া ঐতিহাসিক কর্তৃক ক্রীড়া ইতিহাসকে প্রতিষ্ঠা দানের বর্ণনা ও তাদের ক্রীড়া বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্র সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, ক্রীড়া ইতিহাসের উদ্ভবের বিষয়টিকে আমাদের কাছে বর্ণময় করে তুলতে পারে। তৃতীয় এবং সম্ভবত সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল খেলা ও সমাজের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টি আলোচনা করা। ক্রীড়া বা খেলা সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনে কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে, খেলার মাঠ কিভাবে নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক সময় পর্বের সমাজের বিভিন্ন বিষয়ের সার্থক প্রতিফলক হয়ে ওঠে এবং খেলাগুলিও কিভাবে বিভিন্ন সামাজিক উপাদানের দ্বারা প্রভাবিত হয় ইত্যাদি সম্পর্কে দেশ ও বিদেশের একাধিক বিষয়ের উপস্থাপনা ধারণা গঠনের সহায়ক হতে পারে। ক্রীড়ার মাধ্যমে ধারক সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্র যথা- জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতাবাদ, সামাজিক দ্বন্দ্ব, জনপ্রিয় জনসংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়গুলি যেভাবে প্রকাশিত হয় তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তুলে ধরা আবশ্যক। গবেষণা কার্যের প্রথম অধ্যায়ে মূলত এই

তিনটি বিষয়কে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যা একাধারে আমাদের পরবর্তী আলোচনার প্রথম সোপান হিসেবে ক্রীড়া বিষয়ক ধারণাকে স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট করে তুলবে এবং সেই সংক্রান্ত জটিলতা গুলিরও নিরসন করবে।

• ২.২. ক্রীড়া বা খেলার সংজ্ঞা:

খেলা বা ক্রীড়া বলতে কী বোঝায় অর্থাৎ উক্ত বিষয়ের সংজ্ঞা নির্ধারণ ও সেই সংক্রান্ত জটিলতার বিষয়টি প্রথম উল্লেখের দাবি রাখে। এই বিষয়টি আপাতভাবে অত্যন্ত সরল মনে হলেও, খেলা বা ক্রীড়ার যথার্থ অর্থ নির্ধারণ করা মোটেও ছেলে খেলার বিষয় নয়। এর অর্থ নির্ণয় কে কেন্দ্র করে একাধিক দার্শনিক জটিল জ্ঞানতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে নিযুক্ত হয়েছেন এবং এক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী মতবাদ ও তীব্র বিতর্কও লক্ষ করা যায়। এই জটিল বিতর্কের দিকটি নিয়ে আলোচনার মাধ্যমেই কেবল উক্ত বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ সম্ভব। সর্বাগ্রে আমরা ভাষাতাত্ত্বিক বা অভিধান গত বিশ্লেষণের উল্লেখ করতে পারি। বাংলা অভিধানে 'খেলা' ও 'ক্রীড়া' শব্দ দুটির এবং ইংরেজি অভিধানে এর প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত 'Play', 'Game' ও 'Sport' শব্দগুলির আভিধানিক অর্থের তুলনামূলক আলোচনা এক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে। বাংলা ভাষায় 'খেলা' বা 'ক্রীড়া' শব্দ দুটি প্রায় সমার্থক অর্থে ব্যবহৃত হলেও উভয়ের আভিধানিক অর্থের মধ্যে কিছু পার্থক্যকে চিহ্নিত করা যায়। যদিও বাংলা অভিধানে 'খেলা'র প্রতিশব্দ হিসেবে 'ক্রীড়া' শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে তথাপি 'খেলা' শব্দটিকে অনেক বিস্তৃত অর্থে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যার ফলে এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে অসংখ্য অপ্রতিযোগিতা বা অপ্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলা। বাংলা অভিধানে 'খেলা' শব্দের ব্যাখ্যা প্রদান করতে গিয়ে উদাহরণ হিসেবে একাধারে বল নিয়ে খেলার উল্লেখ আছে, তেমনি অন্যদিকে সাপ খেলা, ছোরা খেলা, ভোজ বাজি বা ভানুমতির খেলা ইত্যাদিরও উল্লেখ করা হয়েছে।[১] একইভাবে 'ক্রীড়া' শব্দটির বাংলা আভিধানের অর্থ লক্ষ করলে দেখা যায় যে এই শব্দটির মাধ্যমে মূলত প্রতিদ্বন্দ্বিতা মূলক খেলাকে বোঝানো হয়েছে। 'ক্রীড়া' শব্দটির সমার্থক শব্দ হিসাবে অভিধানে 'খেলা' শব্দটির উল্লেখ করা হলেও, শব্দটির ব্যাখ্যা প্রদান করতে গিয়ে উদাহরণ হিসেবে মল্ল ক্রীড়ার উল্লেখ করা হয়েছে, যা একই সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা মূলক ও শারীরিক সক্ষমতা মূলক বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরে।[২]

বাংলা ‘খেলা’ ও ‘ক্রীড়া’ শব্দ দুটির ইংরেজি আভিধানিক প্রতিশব্দ হলো ‘Play’, ‘Game’ ও ‘Sport’। বাংলা ‘খেলা’ ও ‘ক্রীড়া’ শব্দ দুটির মধ্যে পার্থক্য প্রায় নগণ্য হলেও ইংরেজি ‘Play’, ‘Game’ ও ‘Sport’ শব্দগুলির মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বর্তমান। ‘Play’ শব্দটিকে ইংরেজি অভিধানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, “To do things for pleasure as children do, to enjoy yourself, rather than work.”[৩] অর্থাৎ খেলার ক্ষেত্রে কোনো কিছু করার স্বাধীনতাই হলো মুখ্য। আনন্দ খেলায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। যদিও এর সঙ্গে স্বাস্থ্যের উন্নতি, চরিত্রের বিকাশ ঘটানো, নৈতিক শিক্ষা প্রদান, সামাজিকীকরণের মতো বিষয়গুলি সংযুক্ত থাকে। ইংরেজি অভিধানে ‘Game’ শব্দটি বিশ্লেষিত হয়েছে “An activity or a sport with rules in which people or teams compete each other.”।[৪] স্বতঃপ্রবৃত্ত খেলা যখন নির্দিষ্ট নিয়মাবলীর বাঁধনে আবদ্ধ হয়ে, নির্দিষ্ট স্থান, নির্দিষ্ট সময় ও নির্দিষ্ট পরিসংখ্যানগত চৌহদ্দিতে সীমাবদ্ধ হয় তখন তাকে ‘Game’ বলা হয়ে থাকে, অর্থাৎ ‘Game’-এর ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ততা দমিত হয়ে, খেলার সাংগঠনিক জটিলতা ও নিয়ম কানুন মুখ্য হয়ে ওঠে।[৫] অপরদিকে ইংরেজি ‘Sport’ শব্দটিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, “Activity that you do for pleasure and that needs physical effort or skill, usually done in a special area and according to fix rules.”।[৬] ‘Game’- এর বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সাংগঠনিক ব্যাপকতা ও প্রতিযোগিতা প্রাধান্য পেয়েছে। আর এই আনুষঙ্গিক সংযোজনের ফলে ‘Game’ ক্রম বিবর্তিত হয়ে, যে নবরুপ লাভ করে তাকে ‘Sport’ বলা হয়ে থাকে।[৭]

খেলা বা ক্রীড়ার এই সংজ্ঞা নির্ধারণ সংক্রান্ত বিতর্কে একাধিক মনোবিদ, দার্শনিক, নৃতাত্ত্বিক ও ক্রীড়াবিজ্ঞানী অংশগ্রহণ করেছেন এবং নিজেদের সুচিন্তিত মতবাদ প্রদানের মাধ্যমে ক্রীড়ার বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। সর্বাগ্রে বিভিন্ন মনোবিদ কর্তৃক প্রদত্ত ক্রীড়ার সংজ্ঞা উল্লেখ করা যেতে পারে। মনোবিদ্যায় খেলাকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অর্থে ব্যাখ্যা করা হয় কারণ মনোবিদ্যা খেলাকে শুধু মাত্র দেহ চর্চার মাধ্যম হিসেবে গণ্য করে না বরং খেলার মাধ্যমে অনেক মানসিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যেরও

বিকাশ ঘটে বলে মত দেয়। যদিও প্রাচীনপন্থী মনোবিদরা খেলাকে নিছক পেশীর স্বতঃস্ফূর্ত সঞ্চালনের সমতুল্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন। যার ফলে স্বতঃস্ফূর্ত কর্ম ও প্রতিক্রিয়াজনিত কর্মের সঙ্গে খেলার কোন পার্থক্য থাকে না, কারণ ঐ ধরনের অনৈচ্ছিক কর্মও স্বতঃস্ফূর্ত পেশী সঞ্চালনের মাধ্যমে সংঘটিত হয়। এই মতবাদে বিশ্বাসী মনোবিদদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন অ্যাঞ্জেল (Angell) যিনি বলেছেন, “In little children the impulse to play is practically identical with the impulse to use voluntary muscle.”।[৮] মনোবিদ রস (Ross) বলেছেন, “Play is a joyful, spontaneous, creative activity in which men finds his fullest self expression.”, অর্থাৎ তার মতে খেলা হল আনন্দদায়ক, স্বতঃস্ফূর্ত, সৃষ্টিশীল মানব ক্রিয়া, যার মাধ্যমে মানুষ নিজেকে প্রকাশের সবচেয়ে বেশি সুযোগ পায়।[৯] প্রবৃত্তি তত্ত্বের প্রবর্তক ম্যাকডুগাল (MacDougall) বলেছেন, “Play is the outcome of the Primal libido or vital energy flowing not in the channel of instinct, but over flowing, generating a vague appetite for movement and finding out let in any or all the motor mechanism in turn.” অর্থাৎ জন্মগত প্রবণতা গুলির মধ্যস্থ শক্তি স্বাভাবিক পথে প্রকাশিত হওয়ার পরিবর্তে সমাজ সম্মত কোন পথে প্রকাশিত হলে তা খেলার রূপ লাভ করে।[১০] হার্লক (Hurlock) খেলাকে আনন্দদায়ক ক্রীয়া হিসেবে বর্ণনা করে, খেলার ক্ষেত্রে ফলাফলের গুরুত্বকে গৌণ হিসেবে চিহ্নিত করে লিখেছেন, “It (play) relates to any activity engaged in for the enjoyment it gives, without consideration of the end result. It is entered into voluntarily by the individual and is lacking in external force or compulsion.”।[১১] রায়বার্ন (Ryburn) খেলাকে বিভিন্ন প্রবৃত্তিগুলির প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে বর্ণনা করে বলেছেন, “Play is a way, a means which is used by the self when the different instinctive urges are trying to express themselves.”।[১২] তিনি খেলার প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে স্বাধীনতার উল্লেখ করেছেন যা কোন দৈনন্দিন কার্যের মধ্যে লক্ষ করা যায় না।[১৩] এমনকি কোনো ব্যক্তির নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে খেলায় অংশগ্রহণ করতে বাধ্য হলে, সেই খেলা তার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে কর্মের পরিণত হয় বলে

তিনি মত দিয়েছেন। খেলার বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি তার কিছু প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্বের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। তার মতে খেলা একইসঙ্গে শিশুর শারীরিক, বৌদ্ধিক ও সামাজিক বিকাশে সহায়তা করে।[১৪] যদিও তিনি খেলা ও চারুশিল্পের মধ্যে বিশেষ পার্থক্যকে চিহ্নিত করেননি, এমনকি উভয়কে সমবৈশিষ্ট্য সম্পন্ন বলে মত দিয়েছেন। উপরোক্ত মনোবিদগণ খেলার যে সংজ্ঞা প্রদান করেছেন তা মূলত ইংরেজি 'Play' শব্দটিকে বিশ্লেষণ করে তার বৈশিষ্ট্য গুলিকে তুলে ধরে। তবে এক্ষেত্রে একজন উজ্জ্বল ব্যতিক্রমী হলেন মনোবিদ হার্লক (Hurlock), তিনি খেলা ও কর্মের মধ্যে বিভাজনের বিষয়ে যে অস্পষ্টতা লক্ষ করা যায় তা উল্লেখ করে, জানিয়েছেন যে, কোনো খেলায় অংশগ্রহণ করে ব্যক্তি যদি তার ফলাফলের উপর অধিক গুরুত্ব দান করে তাহলে সেই খেলা, কর্মের রুপ লাভ করে এবং তা মূলত নির্ভর করে ব্যক্তির মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গির উপর। তার মতে খেলায় অংশগ্রহণের আনন্দের পরিবর্তে যখন ফলাফলের ওপর অধিক গুরুত্ব দান করা হয়, তখন খেলা বা Play হয়ে ওঠে প্রতিযোগিতামূলক খেলা (Game ও Sports), তাকে তিনি কর্মের পর্যায়ে স্থান দিয়েছেন।[১৫]

ঐতিহাসিক ও নৃতত্ত্ববিদরাও ক্রীড়ার সংজ্ঞা নির্ধারণ সংক্রান্ত জটিলতায় অংশগ্রহণ করেছেন এবং উক্ত বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদ প্রদানের মাধ্যমে বা সমালোচনার মাধ্যমে আমাদের জ্ঞানভান্ডারকে আরও সমৃদ্ধ করেছেন। ডাচ ঐতিহাসিক জন হুইজিঙ্গ (John Huizing) ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত "Homo Ludens" (Man the Player)- গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে সকল মানবিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে খেলার উপাদান বা বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। তার মতে ক্রীড়া হলো স্বাধীনতা এবং দৈনন্দিন জীবনের বাইরে পদার্পণের একটি মাধ্যম।[১৬] তিনি খেলার তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন, প্রথমত খেলা হলো মুক্ত ও স্বাধীন ("...it is free, is in fact freedom"), দ্বিতীয়ত খেলা বাস্তব ও দৈনন্দিন জীবনের বাইরে পদার্পণের এক মাধ্যম ("...that play is not ordinary or real life"), তৃতীয়ত খেলার কোন নির্দিষ্ট সময়ানুবর্তিতা ও সময়সীমা নেই ("..its secludedness, its limitedness")।[১৭] তিনি জানিয়েছেন যখন আমরা কোনো শব্দের মাধ্যমে প্রকাশিত ধারণাকে সংজ্ঞায়িত বা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করি, তখন আমাদের ধারণাটি সংজ্ঞায়িত বা বিশ্লেষণ এর জন্য ব্যবহৃত শব্দটির দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। শব্দ এবং ধারনা সর্বদা

বৈজ্ঞানিক বা যৌক্তিক চিন্তাভাবনার ফসল নয়, বরং সৃজনশীল ভাষা একাধিক ভাষার মধ্যে সম্বন্বয়ে ও পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে বিবর্তিত হয় এবং শব্দের অর্থেরও বিবর্তনঘটে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে।[১৮] ভাষা ও শব্দ সংক্রান্ত উক্ত ধারণার উপর ভিত্তি করে হুইজিঙ্গ খেলার সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বলেছেন, 'খেলা' শব্দটির কোন সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা সম্ভব নয়, কারণ বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্নভাবে শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়েছে।[১৯] তথাপি তিনি খেলার বৈশিষ্ট্য গুলিকে চিহ্নিত করে, খেলার সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বলেছেন, "Summing up the formal characteristics of play we might call it a free activity standing quite consciously outside 'ordinary' life as being 'not serious', but at the same time absorbing the player intensely and utterly. It is an activity connected with no material interest, and no profit can be gained by it. It proceeds within its own proper boundaries of time and space according to fixed rules and in an orderly manner. It promotes the formation of social groupings which tend to surround themselves with secrecy and to stress their difference from the common world by disguise or other means."।[২০] হুইজিঙ্গও মূলত খেলা বলতে ইংরেজি 'Play' শব্দটিকেই বুঝিয়েছেন ও তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

১৯৬০- এর দশকে ফরাসি নৃতত্ত্ববিদ রজার ক্যালিওস (Roger Caillios), হুইজিঙ্গ- এর মতের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। তার মতে হুইজিঙ্গ খেলার যে সংজ্ঞা প্রদান করেছেন তা একইসঙ্গে খুব বিস্তৃত ও সংকীর্ণ অর্থ প্রকাশ করে। এই সংজ্ঞা একদিকে যেমন খেলার ক্ষেত্রে সমস্ত রকমের বস্তুগত স্বার্থকে অস্বীকার করে একাধিক খেলা কে স্বীকৃতি প্রদান করেনি, তেমনি অন্যদিকে অনেক রহস্যময় জাদুবিদ্যাকে স্বীকৃতি প্রদান করেছে।[২১] খেলার একটি পরিশোধিত সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "In effect, play is essentially a separate occupation, carefully isolated from the rest of life, and generally is engaged in with precise limits of time and space."।[২২] উপরোক্ত সংজ্ঞার মাধ্যমে তিনি মূলত খেলা বলতে ইংরেজি 'Play' শব্দটিকেই বুঝিয়েছেন।

এই খেলা হল স্বাধীন স্বতঃস্ফূর্ত ও আনন্দদায়ক। তবে এর পাশাপাশি তিনি ইংরেজি 'Game' অর্থে খেলার সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বলেছেন, "The game consists of the need to find or continue at once a response which is free with the limits set by the rules." অর্থাৎ 'Game' গুলি সর্বদা নিয়ম-নীতির দ্বারা পরিচালিত।[২৩] এছাড়াও তিনি খেলাকে কতগুলি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন এবং খেলার কতগুলি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন যথা- স্বাধীন (Free), বিযুক্ততা (Separate), অনিশ্চয়তা (Uncertain), অলাভজনক (Unproductive), নিয়ন্ত্রিত (Governed by rules), দৈনন্দিন জীবন থেকে স্বতন্ত্র (Make-believe)।[২৪]

মার্কিন ঐতিহাসিক অ্যালান গাটম্যান (Allen Guttman) তার "From Ritual to Record" গ্রন্থে হুইজিঙ্গ- এর মতের তীব্র সমালোচনা করার পাশাপাশি 'Play', 'Game', ও 'Sport' এই শব্দগুলির যথার্থ অর্থে ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে, তাদের উপযুক্ত সংজ্ঞা প্রদানের প্রয়াস করেছেন। 'Play' বলতে তিনি বুঝিয়েছেন, "...play is any nonutilitarian physical or intellectual activity pursued for its own sake."।[২৫] একই সঙ্গে তিনি এই সংজ্ঞার সমালোচনা করে জানিয়েছেন যে এই সংজ্ঞা অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত কারণ একদিকে তা যেমন জুয়া খেলার মতো বিষয়গুলিকে খেলার অন্তর্ভুক্ত করে, তেমনি অন্য দিকে তা অনেক শারীরিক দক্ষতা বর্ধক খেলাকে অস্বীকার করে। বাস্তবে খেলার সঙ্গে চরিত্রের বিকাশ, সুস্বাস্থ্যের বিকাশ, সামাজিকীকরণ- এর মতো বিষয়গুলি যুক্ত থাকে তা উক্ত সংজ্ঞাটি অস্বীকার করে। তবে 'Play' শব্দটির বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন যে এক্ষেত্রে খেলায় অংশগ্রহণের বিষয়টি মুখ্য, তার পরিণতি বা ফলাফলের বিষয়টি হলো গৌণ অর্থাৎ স্বাধীনতা হলো এক্ষেত্রে প্রধান চালিকাশক্তি।[২৬] 'Play' ও 'Game'- এর মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিত করতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন জার্মান ও ফরাসি ভাষার বিপরীতে ইংরেজি ভাষা এই দুটি শব্দের মধ্যেকার পার্থক্যকে চিহ্নিত করে। 'Play'- এর অন্তর্ভুক্ত খেলা গুলিকে তিনি দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন- স্বতঃস্ফূর্ত খেলা (Spontaneous play) ও সংগঠিত খেলা (Organised play)। এই দ্বিতীয় শ্রেণি ভুক্ত সংগঠিত খেলাগুলিকে 'Game' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কোনো 'Play' কে 'Game' পর্যায়ে উন্নীত হতে গেলে

তাকে অবশ্যই কিছু নিয়ম নীতির দ্বারা শৃঙ্খলায়ীত হতে হবে, "but most play is regulated and rule bound."।[২৭] এই বিভাজন বহুলাংশে অস্পষ্ট ও পরস্পর বিরোধীও বটে কারণ সংগঠিত খেলা কখনওই স্বতঃস্ফূর্ত হতে পারে না। এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে, স্বতঃস্ফূর্ত খেলায় ব্যক্তি প্রকৃত অর্থে স্বাধীনভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে কিন্তু অধিকাংশ খেলায় কিছু না কিছু নিয়ম কানুনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় যা স্বতঃস্ফূর্ততাকে বহুলাংশে দমিত করে, খেলা কে করে তোলে সংগঠিত, যদিও এক্ষেত্রে বস্তুগত প্রাপ্তি যুক্ত থাকে না। তাঁর ভাষায়, "It remains nonutilitarian and in that sense has its own kind of freedom from the need to provide food, shelter and the other material requirement of existence, but games symbolize the willing surrender of absolute spontaneity for the sake of playful order."।[২৮] খেলায় অংশগ্রহণের চেয়ে ফলাফলের উপর অর্থাৎ জয় পরাজয়ের উপর অধিক গুরুত্ব দানের দরুণ খেলা হয়ে ওঠে প্রতিযোগিতা (Contest), যদিও প্রতিযোগিতা হীন অনেক খেলাও বর্তমান। সমাজের প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতার প্রতিফলনের ফলে খেলায় প্রতিযোগিতা মুখ্য হয়ে ওঠে বলে তিনি মত দিয়েছেন। নিজের বক্তব্যের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদান করতে গিয়ে তিনি 'Athlete' শব্দটির শব্দতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন। এই 'Athlete' শব্দটি দুটি গ্রীক শব্দের সংমিশ্রণের গঠিত, প্রথম শব্দটি হলো 'Athlos' যার অর্থ প্রতিযোগিতা (Contest) এবং দ্বিতীয় শব্দটি হলো 'Athlon' যার অর্থ পুরস্কার (Prize), যা প্রতিযোগিতা ও ফলাফলের উপর গুরুত্বদান করে থাকে।[২৯] হুইজিঙ্গ এমনকি যুদ্ধকেও খেলার অন্তর্ভুক্ত করেছেন কিন্তু গাটম্যান এর বিরোধিতা করে বলেছেন যে যুদ্ধকে নিছকই সামরিক প্রতিযোগিতা হিসেবে বর্ণনা করা যেতে পারে তা কখনওই খেলার (Game) সমতুল্য নয়। তিনি স্পষ্টতই খেলা ও প্রতিযোগিতার মধ্যেকার বিভেদকে চিহ্নিত করেছেন এবং জানিয়েছেন এমন অনেক খেলা (Game) আছে যা প্রতিযোগিতা হীন ও অনেক প্রতিযোগিতা আছে সেগুলিকে খেলা (Game)- এর অন্তর্ভুক্ত করা যায় না।[৩০] 'Sport' বলতে তিনি বুঝিয়েছেন, " 'playful' physical contests, that is, as nonutilitarian contests which include and important measure of physical as well as intellectual skill."।[৩১] তিনি আধুনিক ক্রীড়ার সূচনা পর্ব হিসেবে

অষ্টাদশ শতককে চিহ্নিত করেছেন এবং অষ্টাদশ শতক পরবর্তী আধুনিক ক্রীড়ার সঙ্গে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ক্রীড়ার পার্থক্যকে চিহ্নিত করেছেন। ওয়েবারিয়ান (Weberian) মডেলকে ব্যবহার করে আধুনিক ক্রীড়ার সাতটি বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করেছেন তিনি, যথা– ধর্মনিরপেক্ষতা (Secularism), সুযোগের সমতা (Equality of opportunity), যুক্তিবাদ (Rationalization), বিশেষীকরণ (Specialisation of rolls), পরিমাপ যোগ্যতা (Quantification), আমলাতান্ত্রিক সংগঠন (Bureaucration organization), এবং রেকর্ডের প্রতি আকর্ষণ (Quest for records)। আধুনিক ক্রীড়ার প্রকৃতি বিষেয় বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, “Once the Gods have vanished from Mount Olympus or from the Dante’s paradise, we can no longer run to appease them or to save our souls, but we can set new record. It is a uniquely modern form of immortality.”।[৩২] ‘Sports’ কে চিহ্নিত করণের ক্ষেত্রে তিনি প্রধানত শারীরিক দক্ষতা বা শারীরিক কসরতের ওপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন, কেবলমাত্র শারীরিক প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়া গুলিকেই ‘Sports’- এর তালিকাভুক্ত করেছেন এবং বৌদ্ধিক প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়া গুলিকে শ্রেণীকরণের বাইরে রেখেছেন।

অধিকাংশ মনোবিদদের মত অনুসারে খেলা হলো স্বাধীন, স্বতঃস্ফূর্ত, আনন্দদায়ক এবং সৃজনাত্মক ক্রিয়া যা কর্মের থেকে পৃথক। মনোবিদগণ পষ্টতই খেলা ও কর্মের মধ্যে পার্থক্য কে চিহ্নিত করেছেন। কাজের মধ্যেকার বাধ্যবাধকতা, খেলার মধ্যে অনুপস্থিত। খেলা স্বতঃস্ফূর্ত অপরদিকে কাজ বাধ্যবাধকতার গণ্ডিতে আবদ্ধ। কাজের পেছনে বাহ্যিক উদ্দেশ্য সক্রিয় থাকে, তবে খেলা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যহীন নয় বরং এর পশ্চাতে নিজের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বর্তমান। খেলার আনন্দই অংশগ্রহণের প্রধান উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে কোনো পার্থিব আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতা এক্ষেত্রে মুখ্য নয়। কর্মের মতো খেলার পশ্চাতে কোনো প্রত্যাশা ক্রিয়াশীল নয়। তবে খেলা ও কর্মের মধ্যে পার্থক্য কে চিহ্নিত করা হলেও উভয়ের মধ্যে বিভেদ রেখা খুবই ক্ষীণ। কোনো আচরণ উদ্দেশ্যের বিভিন্নতার জন্য কারো কাছে খেলা অথবা কারো কাছে কাজ হতে পারে। স্বাধীনতা ও উদ্দেশ্যের তারতম্য পার্থক্য নির্ধারণ করে থাকে।

পৃথিবীর সমস্ত দেশের সমস্ত সমাজে খেলার প্রচলন লক্ষ করা যায়। প্রত্যেক মানব শিশুর মধ্যে খেলার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃতপক্ষে খেলা এমন এক আচরণ যা মানুষ এবং মনুষ্যেতর প্রাণী উভয়ের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। খেলার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সংস্কারগত প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যে, 'Play' বলতে বোঝায় এমন ক্রিয়া যেখানে অংশগ্রহণকারী স্বতঃস্ফূর্ততা ও স্বাধীনতা মুখ্য ভূমিকা পালন করে এবং যার মাধ্যমে বস্তুগত প্রাপ্তি বা জয় পরাজয়ের মতো ফলাফলের পরিবর্তে আত্মতৃপ্তি ও আনন্দ লাভের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়ে থাকে, যদিও এই ধরনের খেলার সঙ্গে সৃজনশীলতা, সামাজিকতা ও শারীরিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটানোর মতো বিষয়গুলি যুক্ত থাকে। একইভাবে 'Game' বলতে বোঝায় এমন খেলা যেগুলি অবশ্যই কিছু নিয়ম কানুনের বাঁধনে আবদ্ধ, যা ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ততাকে ও স্বাধীনতাকে বহুলাংশ দমন করলেও, তা সরাসরি বস্তুগত প্রাপ্তির সঙ্গে সংযুক্ত নয়, এবং যার মাধ্যমে ব্যক্তি আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করতে পারে। এই খেলা যতই বিস্তৃতি হয়েছে ততই এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নানা জটিলতা, প্রাধান্য পেয়েছে সাংগঠনিক ব্যাপকতা ও প্রতিযোগিতা, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নানা আনুষঙ্গিক বিষয় এবং তার মাধ্যমে খেলার যে নবরূপান্তর ঘটেছে তাকে 'Sports' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। 'Sports'- এর ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় সাংগঠনিক ব্যাপকতা ও প্রতিযোগিতার প্রাধান্য, যা যথার্থই 'Sports'- কে 'Game' ও 'Play' থেকে বিশিষ্টতা দান করে। 'Sport'- এর ক্ষেত্রে ফলাফল বা জয় পরাজয়ের ওপর অর্থাৎ বস্তুগত প্রাপ্তির ওপর অধিক গুরুত্ব দান করা হয়ে থাকে, ফলে এই ধরনের প্রতিযোগিতায় সাফল্যের জন্য দরকার হয় অতি উচ্চমানের দক্ষতা। এই দক্ষতা বলতে মূলত শারীরিক দক্ষতাকেই বোঝানো হয়ে থাকে, যার জন্য প্রয়োজন হয়ে থাকে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি, প্রশিক্ষণ এবং অনুশীলন।

ইংরেজি ভাষায় 'Play', 'Game' এবং 'Sport' শব্দগুলি ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করলেও যেহেতু এই তিনটি শব্দকে বাংলা ভাষায় 'ক্রীড়া' বা 'খেলা' বলা হয়ে থাকে, তাই এই গবেষণা কার্যে 'ক্রীড়া' ও 'খেলা' শব্দ দুটিকে সমার্থক অর্থে যথেচ্ছ ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং এদের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্যকে চিহ্নিত করা হয়নি। তবে এক্ষেত্রে 'ক্রীড়া' বা 'খেলা' বলতে আধুনিক ক্রীড়া বা ইংরেজি

'Sports'- কে বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ যে সমস্ত ক্রীড়া গুলি সংগটিতভাবে, সংগঠনের অধীনে প্রতিযোগিতামূলক ভাবে সংঘটিত হয়ে থাকে সেই সমস্ত ক্রীড়া কে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

• ২.৩. ইতিহাস চর্চার বিবর্তন:

খেলার ইতিহাস চর্চার বিষয়ে আলোচনার পূর্বে ইতিহাস চর্চার বিবর্তনের ধারা সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা আবশ্যিক। ইতিহাস চর্চার ধারা সম্পর্কিত আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন ঐতিহাসিক সময় পর্বে ইতিহাসের বিষয়বস্তুর, যে ক্রমপরিবর্তন ঘটেছে যার মাধ্যমে আধুনিক ইতিহাস চর্চার উদ্ভব ঘটেছে, তা স্পষ্ট করে তুলে ধরা সম্ভব হবে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক পর্বে নানা তর্ক-বিতর্ক ও বিবর্তনের মাধ্যমে ইতিহাসের বিষয়বস্তুর বিবর্তন ও ক্রম পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, যার ফলে সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানব সমাজের তথা মানব অভিজ্ঞতার নানা ক্ষেত্র ইতিহাস চর্চার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোয় অন্তর্ভুক্ত হয়ে, ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রকে করে তুলেছে বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ। এই বিবর্তনের মাধ্যমে যে নিত্য নতুন বিষয় ইতিহাস চর্চার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তার মধ্যে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও নবীনতম ক্ষেত্র গুলির মধ্যে অন্যতম হলো খেলার ইতিহাস। খেলার ইতিহাস চর্চার ধারা বিষয়ক আলোচনার পূর্বে ইতিহাস চর্চার বিবর্তন এবং এই বিবর্তনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন গুলির দিক নির্দেশ করা ও এই পরিবর্তনে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণকারীদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা বিষয়টিকে অধিক বোধগম্য করে তুলবে।

ইতিহাসে ব্যক্তি বড় না সমাজ এটি হলো ইতিহাসের এক মৌলিক প্রশ্ন। এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে ঐতিহাসিকদের মধ্যে তীব্র বিতর্ক বর্তমান। প্রাথমিক পর্যায়ে ইতিহাস বলতে প্রধানত সমাজের মহান ব্যক্তিদের কর্মকান্ডের বর্ণনাকে বোঝানো হতো এবং এটিকে প্রাথমিক বা প্রারম্ভিক পর্যায়ের ইতিহাস চর্চার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন ঐতিহাসিক ই.এইচ. কার (E.H. Carr)।[৩৩] ইতিহাসে এই ব্যক্তি পূজার অন্যতম সমর্থক ও প্রচারক হলেন ঐতিহাসিক থমাস কার্লাইল (Thomas Carlyle, 1795-1881)। তার মতে মহাপুরুষের জীবনী হলো ইতিহাস। ১৮৮০ সালের মে মাসে "Heroes, Hero-Worship, and the Heroic in History", শীর্ষক শিরোনামে প্রদত্ত এক ভাষণে কার্লাইল ইতিহাসে মহাপুরুষের

গুরুত্বের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, “Universal history, the history of what man has accomplished in this world, is at bottom the history of the Great Men who have worked here. They the leaders of men, these great ones, the modelers, paterns, and in a wide sense creator, of whatsoever the general mass of men contrived to do or attain, all things that we see standing accomplished in the world are properly the outer material result, the practical realisation and embodiment, of thoughts that dwelt in the Great men send into the world: the soul of the whole world’s history it may justly be considered, were the history of these.”।[৩৪] স্যার ইসাইয়া বার্লিন (Sir Isaiah Berlin, 1909-1997)- এর মতে ইতিহাস হল ব্যক্তির কর্মকাণ্ডের কাহিনী। প্রাচীনকাল থেকে মানুষ বিশ্বাস করে এসেছে যে, ইতিহাসের স্রষ্টা হলেন বীর নায়ক। রেনেসাঁস যুগেও এই বীর পূজার ধারণা বজায় ছিল। আধুনিক যুগের ঐতিহাসিক কার্লাইল এই ধারণাকে আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়ে মন্তব্য করেছেন, “History was the biography of great man”।[৩৫] লেখিকা সি.ভি. ওয়েজউড (C.V. Wedgwood, 1910-1997) ইতিহাসে ব্যক্তিকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে, তার “The King’s Peace” গ্রন্থে জানিয়েছেন যে সমষ্টি মানুষের তুলনায় ব্যক্তি মানুষের আচরণ ও কর্মকাণ্ড তার কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ।[৩৬] ঐতিহাসিক এ.জে.পি. টেলর (A.J.P. Taylor, 1906-1990)- এর মতে আধুনিক ইউরোপের সামগ্রিক ইতিহাস তিনজন মহামানবের কর্মকাণ্ডের বর্ণনার মাধ্যমে তুলে ধরা সম্ভব এবং এই তিনজন মহামানব হলেন- নেপোলিয়ান, বিসমার্ক ও লেলিন।[৩৭]

ইতিহাসে এই বীর পূজায় যাদের কর্মকাণ্ড তথা কীর্তিকাহিনী তুলে ধরা হয় তাদের অধিকাংশই মূলত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। ইতিহাস চর্চার এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড। প্রাচীন ও মধ্যযুগে ইতিহাস বলতে মূলত বোঝানো হতো রাজনৈতিক ইতিহাস, যেখানে ইতিহাসের বিষয়বস্তু হিসেবে স্থান পেত সাম্রাজ্যের উত্থান পতনের কাহিনী, যুদ্ধবিগ্রহ, শাসন ও শাসকের বর্ণনা ইত্যাদি। অর্থাৎ অতীত কালের রাজনৈতিক কাহিনী কে মনে করা হতো বর্তমান কালের ইতিহাস। এই

রাজনৈতিক ইতিহাসের অঙ্গ হিসাবে সাংবিধানিক, আইনগত, কূটনৈতিক, সামাজিক ও সামরিক পরিবর্তনের কাহিনী বর্ণনা করা হয়ে থাকে। প্রাচীন যুগের রোমান ঐতিহাসিক পলিবায়াস (Polybius, c.208-126 B.C) জানিয়েছেন যে ইতিহাস রাজনীতি শিক্ষা দেয় ("the soundest education and training for a life of active politics is the study of history.")।[৩৮] আধুনিক যুগেও ইতিহাস চর্চার এই ধারা বহমান এবং লর্ড অ্যাকটন (Lord Acton, 1834-1902)- এর মতো আধুনিক ঐতিহাসিকরা ইতিহাসে রাজনীতিকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

ঊনবিংশ শতকের শেষ এবং বিংশ শতকের সূচনায় ইতিহাস চর্চায় ব্যাপক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়, ঐতিহাসিক মহলে ক্রমশ রাজনৈতিক ইতিহাসের বিপক্ষে মত গড়ে উঠতে থাকে। যদিও অষ্টাদশ শতকে ফরাসি জ্ঞানদীপ্তির যুগে মন্তেস্কু (Montesquieu, 1689-1755) ও ভলতেয়ার (Voltaire, 1694-1778) প্রচলিত ইতিহাস চর্চার কাঠামোর বিরোধিতা করে সমাজের সমস্ত মানুষের আচার-আচরণ, অভ্যাস এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির পশ্চাতে যে বৃহৎ কাঠামো বর্তমান তা ইতিহাসে তুলে ধরার উপর জোর দেন। দার্শনিকরা নতুন প্রশ্ন তুললেন মানুষকে নিয়ে এবং আলোচনা চলছিল আদিম সমাজ, সরকার, শাসন, আইন, অধিকার ইত্যাদি নিয়ে। যুক্তিবাদ ও প্রগতি বাদের ওপর অত্যাধিক গুরুত্ব দানের ফলে ইতিহাসের চালিকাশক্তি হিসেবে ঈশ্বরের ভূমিকা গুরুত্ব হারালো এবং ঐতিহাসিকরা মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মনিরপেক্ষভাবে ঘটনাবলীর বিশ্লেষণে মন দেন। ভলতেয়ারের ইতিহাস চেতনায় আমরা দুইটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করতে পারি প্রথমত তিনি ইতিহাসকে সামগ্রিকভাবে দেখেছেন ও জীবনের সর্বদিক আলোচনার মধ্যে এনেছেন এবং দ্বিতীয়ত জীবনের বিভিন্ন দিকের মধ্যেকার সম্পর্ক খুজেছেন। তিনি মনে করতেন ইতিহাস হলো জীবনের সমস্ত দিকের পরিচয় এবং শিল্প, শিক্ষা, বিজ্ঞান, আচার-আচরণ, খাদ্য, প্রযুক্তি, বিনোদন ও দৈনন্দিন জীবন- সমস্ত কিছুই হলো ইতিহাসের বিষয়। তবে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে অষ্টাদশ শতকের জ্ঞান দীপ্তির যুগে ঐতিহাসিকদের অস্পষ্ট ধারণা ছিল। কিন্ত ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় তারা ঈশ্বরের কর্তৃত্বকে স্বীকার করেননি, যা থেকে পরবর্তীকালে কার্যকারণ ভিত্তিক সামাজিক শক্তি নিয়ন্ত্রিত ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ধারণা গড়ে উঠেছিল।[৩৯]

ঊনবিংশ শতকের শেষ দশকে পেশাদার ঐতিহাসিকেরা ক্রমশ র‍্যাঙ্কের (Ranke, 1785-1885) ইতিহাসের উপাদান সংক্রান্ত মতামত এবং রাজনৈতিক ইতিহাস ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রথাগত ইতিহাস চর্চার কাঠামোয় অত্যাধিক গুরুত্ব দানের বিরুদ্ধে পাল্টা বক্তব্য তুলে ধরতে থাকেন। র‍্যাঙ্কের পজিটিভিজমের বিরোধিতা করে প্রতিবাদী ইতিহাস গবেষণার ধারা শুরু হয়। দলিল দস্তাবেজ লব্ধ তথ্যই ছিল ইতিহাসে প্রধান এবং মনে করা হতো ভূগোল, সমাজতত্ত্ব ও অর্থনীতি থেকে ইতিহাসের শেখার কিছু নেই। র‍্যাঙ্কে তথ্য নির্ভর, বিষয় নিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ ইতিহাস লিখতে চেয়েছেন। তার মতে একজন ঐতিহাসিক মহাফেজ খানার নথিপত্রের উপর নির্ভর করে ইতিহাস রচনা করবেন। এমনকি তথ্য যিনি সরবরাহ করেছেন তার তথ্য সরবরাহের সুযোগ, চরিত্র উদ্দেশ্য ইত্যাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিশ্লেষণ করে, উপলব্ধ তথ্যগুলিকে অন্যান্য তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ করবেন। ইতিহাস সম্পর্কিত এই দর্শনের ওপর ভিত্তি করে তিনি লিখিত নথি ব্যবহার করে রাষ্ট্র, কূটনীতি ও শাসনের ইতিহাস রচনা করেছেন। লিখিত নথি তথা মহাফেজ খানার তথ্য ব্যবহারের ওপর অত্যাধিক গুরুত্ব দান এবং স্মৃতি কথার গুরুত্বকে অস্বীকার করে সীমিত উপাদানের মাধ্যমে র‍্যাঙ্কে রাজনীতি, যুদ্ধ ও কূটনীতির ইতিহাস লিখতে সক্ষম হলেও সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ইত্যাদির ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে তার ইতিহাস পদ্ধতি কার্যকর নয়। সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন সম্পর্কে তার ইতিহাস রচনা সম্পূর্ণ নীরব, যদিও তিনি উপাদানের বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা রীতির প্রবর্তক।[৪০]

রাজনৈতিক ইতিহাসের এই আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রথমদিকে সবচেয়ে বেশি জোরালো বক্তব্য তুলে ধরেছেন জার্মান ঐতিহাসিক কাল ল্যামপ্যেকথ (Karl Lamprecht , 1856-1915)। তিনি একটি ‘সামগ্রিক ইতিহাস’ (Collective history)- এর কথা বলেছেন, যা জ্ঞানচর্চার অন্যান্য বিষয়গুলিকেও ইতিহাস রচনার কাঠামোয় স্থান দেবে। এক্ষেত্রে জ্ঞান চর্চার অন্যান্য বিষয় বলতে তিনি প্রধানত সামাজিক মনোবিজ্ঞান (Social psychology), মানবীয় ভূগোল (Human geography)- এর উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন এবং এদের ইতিহাস রচনার কাঠামোয় অন্তর্ভুক্তির স্বপক্ষে জোরালো বক্তব্য তুলে ধরেছেন। ইতিহাসের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, “History is primarily a socio-

psychological science” অর্থাৎ ইতিহাস হল মূলত একটি সামাজিক বা সমাজ মনস্তাত্ত্বিক বিজ্ঞান।[৪১] ল্যামপ্যেকথের রাজনৈতিক ইতিহাস চর্চার বিরুদ্ধে জোরালো বক্তব্য রাজনৈতিক ইতিহাস চর্চার একাধিকত্বকে খর্ব করতে ব্যর্থ হলেও ইতিহাস বিষয়ক তার চিন্তা ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে এবং সেখানে সামাজিক ইতিহাস (Social history) রচনার স্বপক্ষে মতামত গড়ে উঠতে থাকে। এই ইতিহাস চেতনা বিকাশের ক্ষেত্রে তিনটি পর্ব বা পর্যায় পরিলক্ষিত হয়। প্রথম পর্যায়ে, নতুন ইতিহাস চেতনার প্রকাশ ঘটেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, দ্বিতীয় পর্যায়ে, ফ্রান্সের এ্যানাল গোষ্ঠীর হাতে এই নতুন ইতিহাস চর্চা আরও সমৃদ্ধ হয় এবং তৃতীয় পর্যায়ের ষাটের দশকে ব্রিটেনে ‘নতুন সামাজিক ইতিহাস’ (The New Social History) নামে নব্যচেতনার বিকাশ ঘটে।[৪২]

১৮৯০- এর দশকে মার্কিন ঐতিহাসিক ফ্রেডারিক জ্যাকশন টার্নার (Frederick Jackson Turner, 1861-1932) প্রথাগত ইতিহাসচর্চার অসাড়তাকে তীব্র আক্রমণ করে মানব কর্মকাণ্ডের সমস্ত ক্ষেত্র কে ইতিহাস রচনার কাঠামোতে অন্তর্ভুক্তির স্বপক্ষে মত দেন এবং তিনি আরোও জানান, মানব সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলি কে পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে যে চিত্র ফুটে ওঠে তা কখনওই পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরে না।[৪৩] তিনি ১৮৯৩ সালে আমেরিকান হিস্টোরিকাল অ্যাসোসিয়েশন (American Historical Association, AHA)- এর সভায় “ The significance of Frontier in American history” নামক শিরোনামে প্রদত্ত এক প্রবন্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সীমান্তের গুরুত্ব তুলে ধরার মাধ্যমে মার্কিন ইতিহাসচর্চার জগতে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেন।[৪৪] টার্নার ইতিহাস গবেষণায় ভূগোল, অর্থনীতি, মনোবিজ্ঞান এবং অন্যান্য সহযোগী শাখা কে ব্যবহার করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস গবেষণা ও পঠনপাঠনের ক্ষেত্রে টার্নার বিশাল প্রভাব বিস্তার করেছিলেন যা অন্য কেউ করতে পারেননি। মার্কিন ঐতিহাসিক জেমস হার্ভি রবিনসন (James Harvey Robinson, 1863-1936) প্রথম নিজের রচিত ইতিহাসকে “নতুন ইতিহাস” (New History) বলে তুলে ধরেন। তিনি এই শব্দটি (New History) সচেতন ভাবে গ্রহণ করেছিলেন এডওয়ার্ড ইগেলস্টোন (Edward Eggleston, 1837-1902)- এর “Transit of Civilization” গ্রন্থটি থেকে। উক্ত গ্রন্থে এডওয়ার্ড ইগেলস্টোন প্রকৃতপক্ষে ইউরোপ

থেকে আমেরিকায় আগত বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির বা মতবাদের বর্ণনা দিয়েছিলেন, যার বিরুদ্ধে টার্নার নিজের বক্তব্য তুলে ধরেছিলেন।[৪৫] প্রারম্ভিক পর্যায়ের নতুন ধারার ঐতিহাসিক হিসেবে চার্লস বিয়ার্ড (Charles Beard, 1874-1948) তাঁর "An Economic Interpretation of the Constitution" (1933) গ্রন্থে মার্কিন সংবিধান রচিত হওয়ার অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন এবং এর পশ্চাতে সংবিধান রচয়িতা দের উদারনৈতিক চেতনার পরিবর্তে অর্থনৈতিক বাস্তববোধ, যে অধিক সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তা তুলে ধরেন।[৪৬] ঐতিহাসিক আর্থার শ্লেসিংগার সিনিয়র (Arthur M. Schlesinger sr., 1888 -1965)- এর গবেষণা পত্র যা, ১৯১৮ সালে "The Colonial Merchants And The American Revolution" শীর্ষক নামে প্রকাশিত হয়, সেখানে তিনি অর্থনীতি ও রাজনীতির মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক অনুধাবন করেছেন। নতুন ইতিহাস চর্চার ধারাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে মূলত তার একক প্রচেষ্টায় ও তত্ত্বাবধানে ১৯২২ সালে আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (University of Iowa) 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস' (Social and Cultural History of United States) নামক এক নতুন বিষয়ে পাঠদানের সূচনা হয়।[৪৭] বৌদ্ধিক ইতিহাস (Intellectual History) বা মানুষের মননের ইতিহাস হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস চর্চার একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। ইতিহাসের একটি পৃথক শাখা হিসেবে বৌদ্ধিক ইতিহাস চর্চা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত প্রায় কোনো দেশেই প্রচলিত ছিল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বৌদ্ধিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে অন্য দেশকে পথ দেখিয়েছিল। গণতন্ত্র ও উদারনীতিবাদ নাৎসিবাদ দ্বারা আক্রান্ত হলে কবি, শিল্পী, সাহিত্যিকরা স্বাধীনতার অর্থ অন্বেষণ করতে শুরু করলে উদ্ভব হয় মননশীলতার ইতিহাস বা চিন্তার ইতিহাস। এই ইতিহাসের সমর্থক চিন্তকরা মনে করেন, জ্ঞান চর্চার বিভিন্ন শাখা থেকে গৃহীত তথ্য ও তত্ত্ব দিয়ে বৌদ্ধিক ইতিহাস রচনা সম্ভব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৩৯ সালে স্থাপিত হয় "Journal of the History of Ideas"। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যে সামাজিক ঐতিহাসিকরা বৌদ্ধিক ইতিহাস চর্চার অগ্রগতি ঘটিয়েছিলেন, তারা বৌদ্ধিক ও নান্দনিক আন্দোলন গুলিকে সামাজিক ইতিহাসের অঙ্গ বলে গণ্য করেন। আর্থার শ্লেসিংগার সিনিয়র তাঁর, "History of American Life" গ্রন্থে বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে বড় বড় আন্দোলন গুলির পরিচয় দিয়েছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ইতিহাস রচনার এই ধারা অর্থনৈতিক ও

বৌদ্ধিক বিষয় সহ সমাজের সঙ্গে সংযুক্ত অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি কেউ ইতিহাসের স্থান করে দিতে আগ্রহী এবং এই উদ্দেশ্যে তার সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়গুলির পদ্ধতি ব্যবহারের পক্ষপাতি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে বৈচিত্রতা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যার ছিল বহু অভিমুখ। ইউরোপের ধ্যান ধারণা যুক্তরাষ্ট্রে এসে স্থানীয় পরিস্থিতির সঙ্গে মিশে নতুন রূপ পরিগ্রহ করে আরও বেশি পরিণত, সূক্ষ্ম ও পরিশীলিত রূপ নিয়েছিল। পুরনো চিন্তা নিয়ে নতুন যুগের দক্ষ শিল্পীরা নতুন পরিবেশে এঁকে নতুন করে গড়ে তোলেন। পুরনো চিন্তা নিয়ে বসে না থেকে মার্কিন ঐতিহাসিকরা নতুন নতুন তত্ত্ব উপহার দেন যার ফলে ইতিহাস আরও বৈচিত্র্যময় আরও চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে।

নতুন ইতিহাস রচনার এই প্রয়াস প্রকৃতপক্ষে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে ফ্রান্সে বিংশ শতাব্দীর সূচনা লগ্নে যার পুরোধা ছিলেন এ্যানাল গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকেরা, যা আদতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস চর্চার একটি পত্রিকা, এবং এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে একদল ঐতিহাসিক নতুন ইতিহাসের সন্ধান করেন, যারা এ্যানাল গোষ্ঠীর ঐতিহাসিক নামে পরিচিত। ১৯২০- এর দশকে ট্রাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের (University of Strancebourg) দুজন অধ্যাপক লুসেন ফেবর (Lucien Febvre, 1878-1956) ও মার্ক ব্লখ (Marc Bloch, 1886-1944) রাজনৈতিক ইতিহাসের একাধিকত্বকে খর্ব করে তার স্থানে স্থাপন করতে চেয়েছিলেন এমন এক ইতিহাস যার আলোচনার পরিধি হবে অনেক বেশি বিস্তৃত এবং যা হবে অনেক বেশি মানবীয় ইতিহাস (“a wider and more human history.”)।[৪৮] এই প্রয়াসের পরিপূর্ণতার জন্য তারা “Annals d’historie economique et socials” নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করে যা সংক্ষেপে “Annals” নামে অধিক পরিচিত। এই গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন লুসিয়েন ফেবর ও মার্ক ব্লখ যারা একই সঙ্গে এই গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা। এছাড়াও লাদুরী, ব্রদেল, লেফেভর প্রমুখ এই গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত। ফেবর ও ব্লখ মনে করতেন শুধুমাত্র মহাফেজ খানার দলিল বা প্রথাগত সূত্র ইতিহাস রচনার একমাত্র উপাদান নয়। তারা ভূগোল ও যূথ মনস্তত্ত্বের ওপর জোর দিয়েছিলেন এবং অর্থনৈতিক তত্ত্ব, জনসংখ্যা তত্ত্ব, পরিসংখ্যান সবকিছু নিয়ে এসে ছিলেন ইতিহাস গবেষণার ক্ষেত্রে। বর্ণনামূলক ইতিহাস ও রাজনৈতিক ইতিহাসের পরিবর্তে তারা ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের

উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে এই গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকেরা দলিল দস্তাবেজের একাধিকত্বকে খর্ব করলেও, তার গুরুত্বকে অগ্রাহ্য করতে বলেননি। ইতিহাসে জনগণের জীবনযাত্রাকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলা ছিল তাদের মূল লক্ষ্য। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইতিহাসের কথা বলেছেন তারা, যার পদ্ধতি হবে বহুমাত্রিক, সমাজ-বিজ্ঞানসম্মত, সমস্যা কেন্দ্রিক ও বিশ্লেষণ মূলক। ফেবর ও ব্লখ উভয়ের উদ্দেশ্য ছিল সামগ্রিক ইতিহাস রচনা। এ্যানাল গোষ্ঠী মূলত এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই অগ্রসর হয়েছিল। সামগ্রিক ইতিহাস বলতে এক্ষেত্রে বোঝানো হয়েছে এমন ইতিহাস যাতে মানব জীবনের সমস্ত বৈচিত্র ধরা পড়বে। তবে এই সামগ্রিক ইতিহাস একজন ঐতিহাসিক এককভাবে লিখতে পারবেন না, এর জন্য প্রয়োজন সমষ্টিগত উদ্যোগ- এই সহজ সত্যকে উপলব্ধি করে তারা চেয়েছিলেন সামগ্রিক ইতিহাস লিখতে আগ্রহী সমমনস্ক ব্যক্তিদের একত্রিত করতে নিজেদের গবেষণা ধর্মী পত্রিকার ছত্র তলে, যার চূড়ান্ত পরিণতি হলো এ্যানাল পত্রিকাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এ্যানাল গোষ্ঠী।[৪৯] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে এই পত্রিকার প্রকাশ সাময়িকভাবে বন্ধ হলেও ১৯৪৬ সালে ফেবর- এর সভাপতিত্বে "Annales: Économies, Sociétiés, Civilisation" নামে এ্যানাল গোষ্ঠীর মুখপত্র পত্রিকাটির পুনর্জন্ম ঘটে। দ্বিতীয় প্রজন্মের এ্যানাল গোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা হলেন ফারনান্দ ব্রদেল (Fernand Braudel, 1902-83)। ব্রদেল তার শ্রেষ্ঠ রচনা "The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II" (1949) গ্রন্থে বহুমাত্রিক সামগ্রিক ইতিহাস কে তুলে ধরতে চেয়েছেন এবং জনসংখ্যা ভিত্তিক পরিসংখ্যান ও ভৌগোলিক নিমিত্তবাদ দিয়ে ইতিহাস ব্যাখ্যা করেছেন। তৃতীয় প্রজন্মের এ্যানাল গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকেরা হলেন- জ্যাকুয়াস লা গফ (Jacques Le Goff), ইমানুয়েল লা রয় লাদুরি (Emmanuel Le Roy Ladurie)। এদের মধ্যে লাদুরি "The Peasants of the Languedoc", (1966) গ্রন্থে পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে ল্যাঙ্গডক গ্রামের কৃষক জীবনের বর্ণনা দিয়েছেন। এছাড়াও তিনি 'Montaillou' (1975) গ্রন্থে ফ্রান্স ও স্পেনের সীমান্তে অবস্থিত মতায়ু নামক একটি গ্রামের সমাজ, উৎপাদন ব্যবস্থা, সামাজিক সম্পর্ক, ধর্ম, বিশ্বাস, উৎসব, রীতি-নীতির জীবন্ত বর্ণনা তুলে ধরেছেন।[৫০] ক্ষুদ্র ভৌগোলিক অঞ্চলের সামগ্রিক ইতিহাস রচনার প্রয়াস লাদুরির ইতিহাস রচনার

অন্যতম বৈশিষ্ট্য। লাদুরির ইতিহাস রচনার এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ করে ঐতিহাসিক আর্থার মারউইক (Arthur Marwick) তাকে আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা (Micro History)- এর অন্যতম প্রবক্তা হিসাবে বর্ণনা করে লিখেছেন, “With regard to an important development in the discipline of history, we could record Le Roy Ladurie as an important proponent of ‘micro history’ using one episode in one place to draw out wider conclusions”।[৫১]

ইতিহাস চর্চার বিষয়বস্তু বিস্তারের প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ সমগ্র বিংশ শতাব্দী জুড়ে ইতিহাস চর্চার বৃহত্তর কাঠামোর মধ্যে উপ শাখা বা উপ ইতিহাসের (Sub-history)- এর বিকাশ ঘটতে থাকে যথা- বৌদ্ধিক ইতিহাস (Intellectual History), অর্থনৈতিক ইতিহাস (Economic History), নগরের ইতিহাস (Urban History), শ্রমিক ইতিহাস (Labour history), জনসংখ্যা তত্ত্বের ইতিহাস (Historical Demography), নারী ইতিহাস (Women’s History), সাংস্কৃতিক ইতিহাস (Cultural History), বিজ্ঞানের ইতিহাস (History of Science) ইত্যাদি। ঐতিহাসিক আর্থার মারউইক ইতিহাস চর্চায় উপবিভাগ গঠিত হওয়ার পশ্চাতে ঐতিহাসিকদের মধ্যে পেশাদারিত্ব বৃদ্ধিকে কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[৫২] ইতিহাস চর্চায় এই উপবিভাগ গুলি গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নতুন পদ্ধতিরও সমাগম ঘটে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে যেমন- অর্থনৈতিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান ও বিশ্লেষণ পদ্ধতির ব্যবহার প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে।

উনিশ শতকে কাল মার্কস মানব জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চালিকা শক্তি হিসেবে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড কে চিহ্নিত করলে, ঐতিহাসিক মহলেও বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার পশ্চাতে ক্রিয়াশীল অর্থনৈতিক কার্যকারণ গুলিকে অনুসন্ধানের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। এই প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ ইতিহাসের একটি শাখা হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে অর্থনৈতিক ইতিহাস। উৎপাদন, বিনিময়, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, কর ইত্যাদি ইতিহাসে আগের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব পেল। শান্তি, যুদ্ধ ,সাম্রাজ্য, শোষণ সবকিছুর পশ্চাতে অর্থনৈতিক কারণ সক্রিয় থাকে বলে মত দেওয়া হলো। বেলজিয়ামের ঐতিহাসিক হেনরি পিরেন (Henri Pirenne, 1862-1975) তাঁর বিভিন্ন রচনায় ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডের পশ্চাতে ক্রীয়াশীল অর্থনৈতিক

কারণগুলি কে বিশ্লেষণ করেছেন।[৫৩] ফরাসি ঐতিহাসিক জর্জ লেভেফর (George Lefebvre, 1874-1957) মার্কসের শ্রেণি দ্বন্দ্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ইতিহাস গবেষণায় সমাজ ও অর্থনীতিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন এবং শ্রমজীবী ও কৃষকদের কথা তুলে ধরতে চেয়েছেন।[৫৪] ব্রিটেনের শিল্প বিপ্লবের পরবর্তীকালে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বৈষম্য ও শ্রমিক শ্রেণীর দুর্দশার চিত্র লক্ষ করে বুদ্ধিজীবী মহলে অর্থনৈতিক ইতিহাস চর্চার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। ব্রিটিশ অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে অন্যতম হলেন- জে.এইচ. ক্ল্যাপহ্যাম (J.H. Clapham, 1873-1946)[৫৫], আর.এইচ. টাউনি (R.H. Tawney, 1880-1962)।[৫৬] এর পরবর্তীতে মূলত মার্কসীয় তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে একদল ঐতিহাসিক, ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির ব্যাখ্যা দানে সচেষ্ট হয় ব্রিটেনে। এই ধারার ঐতিহাসিকেরা হলেন- ক্রিস্টোফার হিল (Christopher Hill, 1912-2003), ই.পি. থমসন (E.P. Thompson, 1924-1993), এরিক হবসবন (Eric Hobsbawn, 1917-2012) প্রমুখ। এই গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকদের মধ্যে মূলত এরিক হবসবনের উদ্যোগে **১৯৫২** সাল থেকে অক্সফোর্ড ইতিহাস পত্রিকা হিসেবে "Past and Present" প্রকাশিত হতে থাকে। এই ইতিহাস চর্চার ধারা থেকে পরবর্তীতে শ্রমিক ইতিহাস চর্চার সূচনা হয়। ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবি (Arnold Toynbee, 1889-1975) নিম্নস্থ শ্রমিক শ্রেণীর ওপর শিল্প বিপ্লবের প্রতিকূল প্রভাব বর্ণনা করেছিলেন। প্রাথমিক পর্যায়ে শ্রমিক ইতিহাস মূলত শ্রমিক আন্দোলনের পরিসরে নিজেকে আবদ্ধ রাখলেও পরবর্তীতে তা হয়ে ওঠে প্রকৃত অর্থে শ্রমিক শ্রেণীর ইতিহাস, যার প্রতিফলন আমরা লক্ষ করতে পারি ব্রিটিশ মার্কসীয় ঐতিহাসিক ই.পি. থম্পসন (E.P Thompson) রচিত "The Making of the English Working Class" (1963) গ্রন্থে। এই গ্রন্থ সম্পর্কে আর্থার মারউইক বলেছেন, "The making of the English Working Class is a true work of historical revisionism bringing into proper perspective the aspirations and conscious efforts of working people, too often treated by other historians as an inert and faceless mass, passive to the central forces of history"।[৫৭] মার্কিন মার্কসীয় ঐতিহাসিকেরা হলেন হারবার্ট গাটম্যান (Herbert Guttmann, 1928-1985), গ্যাবরিয়েল কলক (Gabriel Kolko, b-1932)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের

পরবর্তীকালে অর্থনীতির তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে নতুন ধরনের অর্থনৈতিক ইতিহাস চর্চার সূচনা ঘটে, যা মূলত অর্থনৈতিক বৃদ্ধির ধারণা ও জাতীয় অর্থনীতির পরিসংখ্যানগত তথ্যের বিশ্লেষণের উপর গুরুত্ব দান করে। এই ধরনের অর্থনৈতিক ইতিহাস চর্চার সূচনা হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেখানে সাইমন কুজনেটস (Simon Kuznets, 1918-2007)- এর সূচনা করেন, যা 'Cliometric' বা 'Econometric' নামেও পরিচিত। এই ধারা পরবর্তীতে অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়ে।[৫৮] ব্রিটিশ ঐতিহাসিক ই.এইচ. হান্ট (E.H. Hunt, 1918-2007) "The New Economic History", (1968) শিরোনামে ব্রিটিশ ইতিহাসবিদদের জন্য একটি মডেল তুলে ধরেন যা পরিসংখ্যানগত পদ্ধতি, শ্রেণীকরনের নির্ভুলতা ও গণনার কাজে কম্পিউটারগত জ্ঞানের প্রয়োগের উপর জোর দান করে। এই পরিশীলিত পরিসংখ্যানগত পদ্ধতির ব্যবহার প্রথমে সামাজিক ইতিহাস চর্চা ও পরবর্তীতে সাংস্কৃতিক ইতিহাস চর্চার মধ্যেও প্রসারিত হয়। এই ধারার একজন উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক হলেন আর.ডাব্লু. ফজেল (R.W. Fogel, 1926-2013)। যদিও এই পদ্ধতির নিজস্ব সীমাবদ্ধতা বর্তমান।[৫৯]

পরিসংখ্যানগত তত্ত্বের ব্যবহারের ফলে ইতিহাস চর্চায় বিভিন্ন ঐতিহাসিক পর্বের জনসংখ্যা বিষয়ক গবেষণা (Historical Demography) সংক্রান্ত এক নতুন ক্ষেত্রের সূচনা হয়। যা জন্মহার, মৃত্যুহার, উর্বরতার হার, পারিবারিক গঠন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ইত্যাদি বিষয়গুলির ইতিহাসের প্রতি মনোনিবেশ করে। এই বিষয়ে প্রথম উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেন লুইস হেনরি (Luis Henry, 1911-1991)। যিনি জেনেভার বুর্জোয়া পরিবারের বিষয়ে গবেষণা করেন, যা ১৯৬৬ সালে "Anciennes Familles Genevoises" শিরোনামে প্রকাশিত হয়। ই.এ. রিগলি (E.A. Wrigley, 1931-2022), আর.এস. সোফিল্ড (R.S. Shofield, 1937-2019), পিটার লাসলেট (Peter Laslett, 1915-2001) প্রমুখ ব্রিটিশ ঐতিহাসিকেরা, ঐতিহাসিক জনসংখ্যা তত্ত্ব বিষয়ক গবেষণাকে আরোও এগিয়ে নিয়ে যান এবং পিটার লাসলেটের উদ্যোগে ১৯৬২ সালে ক্রেমব্রিজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল "Cambridge Group for the History of Population and Social Structure"। ঐতিহাসিক জনসংখ্যা তত্ত্ব বিষয়ক গবেষণা থেকে নগর ইতিহাস (Urban History)- এর সূচনা হয়েছিল এবং ব্রিটেনের একজন অগ্রগামী শহুরে

ঐতিহাসিক হলেন এসা ব্রিগস (Asa Briggs, 1921-2016)। ব্রিগস নগর ইতিহাসের গুরুত্বের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন- “The need to examine in detail social structure and change in the most meaningful units that historians can discover, and providing knowledge of local relationship and pressures.”।[৬০] ফ্রান্সে শহুরে ইতিহাস চর্চার সূচনা ঘটেছিল “Institut National d’Études Demographiques” প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যার সঙ্গে যুক্ত উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিকেরা হলেন- এডলিন ডাওমার্ড (Adeline Daumard, 1924-2003), পিয়েরে গাউবার্ট (Pierre Goubert, 1915-2012), লুই সেভালিয়ার (Louis Chevalir, 1911-2001) প্রমুখ। মার্কিন শহুরে ঐতিহাসিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন অস্কার হ্যাণ্ডলিন (Oscar Handlin, 1915-2011), স্টিফেন থার্নস্টম (Stephen Thernstom, b.1934) প্রমুখ। জনসংখ্যা তত্ত্ব বিষয়ক গবেষণা থেকে পরবর্তীতে শহুরে ইতিহাস চর্চার সূচনা হয় এবং এই সমস্ত গবেষণার ক্ষুদ্রতম সামাজিক একক হিসাবে পরিবার বিষয়ক গবেষণাও ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পারিবারিক বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে ইতিহাস চর্চার একাধিক উপ-শাখার সৃষ্টি হয় যথা- শৈশবের ইতিহাস (History of Childhood), যৌনতার ইতিহাস (History of Sexuality), মৃত্যুর ইতিহাস (History of Death)। ফরাসি ঐতিহাসিক ফিলিপ এরিস (Philippe Aries, 1914-1982) প্রায় একক প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইতিহাস চর্চার এক নতুন উপশাখা হিসেবে শৈশবের ইতিহাস কে প্রতিষ্ঠা দান করেন। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক লরেন্স স্টোন (Lawrence Stone, 1919-1999), “The Family Sex and Marriage in England from 1500-1800” (1977) গ্রন্থটি এই ইতিহাস চর্চার ধারার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যৌন দৃষ্টিভঙ্গি এবং যৌন আচরণের পরিবর্তনের বিশ্লেষণ করেছেন ঐতিহাসিক জীন লুইস ফ্লানড্রীন (Jean Louis Flandrin, 1931-2001) তাঁর, “Families: Kingship, Home, Sexuality in Former Times” গ্রন্থে।[৬১]

১৯৬৯ সালে নারীবাদী আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সমাজে স্বাধীন ব্যক্তিত্ব হিসেবে পুরুষ আধিপত্যের বিরুদ্ধে নারীদের কর্মকাণ্ড ইতিহাসে তুলে ধরার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। নতুন প্রজন্মের বহু নারীবাদী ঐতিহাসিকেরা মার্কসীয় দর্শনের প্রতি আস্থাশীল ছিলেন এবং তারা বলেন পরিবার হল

নারীর উপর পুঁজিবাদী শোষণের এক মাধ্যম। নারীবাদী সিমোন ডি বিউভর (Simone de Beauvoir, 1908-1986) তাঁর "Le Deuxiéme Sexe" (The Second Sex) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে নারীত্ব একটি জৈবিক বিষয় নয় বরং তা একটি সামাজিক নির্মাণ। প্রথমদিকে এই নতুন নারী ইতিহাস চর্চা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং এই ধারার উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিকেরা হলেন- মার্থা ভিসিনাস (Martha Vieinus), রিনাটা ব্রাইডেনথাল (Renata Bridenthal), ক্লডিয়া কঞ্জ (Claudia Koonz, b.1940), জন কেলি গেডল (Joan Kelly Gadol, 1928-1982), কেরল আর. বার্কিন (Carol R. Burkin, b. 1942), জুডিথ সি. ব্রাউন (Judith C. Brown, b. 1946) প্রমুখ।[৬২]

প্রাথমিক পর্যায়ে মনে করা হতো বিজ্ঞানের ইতিহাস রচনা মূলত বৈজ্ঞানিকদের কাজ কিন্তু পরবর্তীতে এই ধারণার পরিবর্তন ঘটে এবং বিজ্ঞানের ইতিহাস ঐতিহাসিকদের গবেষণার এক ক্ষেত্র তে পরিণত হয়। থমাস এস. কুন (Thomas S. Kuhn, 1922-1996) তাঁর "The Structure of Scientific Revolution" (1962) গ্রন্থে দেখালেন বিজ্ঞানীরা কেন একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট সমস্যার প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং কিভাবে এই মনোননিবেশ এর ক্ষেত্রটি পরিবর্তিত হয় পারিপার্শ্বিকতার ভিত্তিতে। ১৯৫০-৬০- এর দশকে বিজ্ঞানের ইতিহাস চর্চা পরিপূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করে 'The History of Science Medicine and Technology' শিরোনামে। এই ধারার উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিকেরা হলেন- জি.সি. গিলিস্পি (G.C. Gillispie), হেনরি গুলাক (Henry Guerlac, 1910-1985), ডেভিড ল্যান্ডেস (David Landes, 1914-2013), ব্রিটেনের এ.সি. ক্রম্বি (A.C. Crombie, 1915-1996) এবং ফ্রান্সের আলেকজান্ডার কোয়ের (Alexandre Koyré, 1892-1964) প্রমুখ। বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের জীবনীও এই পর্বে রচিত হয় ঐতিহাসিক কর্তৃক।[৬৩]

ব্রিটেনে নতুন সামাজিক ইতিহাস (The New Social History)- এর কথা ঘোষিত হয় যা মূলত সমাজে ব্যক্তি ও শ্রেণীর অবস্থান, মতাদর্শ, আধিপত্য, সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কাঠামো ইত্যাদি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দান করে। এই নতুন সামাজিক ইতিহাসের প্রতিফলন আমরা লক্ষ করতে পারি "Social History" (1975) পত্রিকার গবেষণা পত্রে। একই সময় পর্বে ব্রিটেনে মৌখিক ইতিহাসের (Oral

History) উপর বিশেষ গুরুত্ব দান করা হতে থাকে, যা বিভিন্ন বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী বিবরণ লিপিবদ্ধ করণ এবং বিশ্লেষণের উপর গুরুত্ব দেয়। যদিও ইতিহাস চর্চার এই ধারার নিজস্ব সীমাবদ্ধ বর্তমান।[৬৪]

একই সময় পর্বে সাংস্কৃতিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রেও নতুন ভাবধারার অনুপ্রবেশ ঘটে যার ফলে নতুন সাংস্কৃতিক ইতিহাস (The New Cultural History)- এর কথা বলা হয়। এই নতুন সাংস্কৃতিক ইতিহাস চর্চা গুরুত্ব দান করে বিস্তৃত অর্থে সংস্কৃতির বিশ্লেষণের উপর, যা সামাজিক মানসিকতা, আদর্শ, প্রতীক, আচর-অনুষ্ঠান ও জনপ্রিয় সংস্কৃতিকে ইতিহাসে তুলে ধরতে চাই। এই ইতিহাস চর্চার উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিকেরা হলেন- রবার্ট ডার্টন (Robert Darton b.1939), হেইডেন হোয়াইট (Hayden White, 1928-2018), ক্লিফোর্ড গ্রির্টস (Clifford Geertz, 1926-2006), নেটালিয়া জিমন ডেভিস (Natalie Zemon Davis, b.1928), লিন হান্ট (Lean Hunt, b.1945), রজার চারটিয়ার (Roger Chartier, b.1945) প্রমূখ। এই ধারার ঐতিহাসিকেরা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানায় আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার উপর বিশেষ গুরুত্ব দান করে, যার ফলস্বরূপ আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা (Micro History) জনপ্রিয় ও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। নেটালিয়া জিমন ডেভিস- এর “The Return of Martin Guerre” গ্রন্থটি নতুন সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও আঞ্চলিক ইতিহাসের এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ডার্টন “The Great Cat Massacre and Other Episodes in French Cultural History” (1984) গ্রন্থটির মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে কীভাবে একাধিক আঞ্চলিক ইতিহাস একটি বৃহত্তর সাংস্কৃতিক ইতিহাসের চিত্র ফুটিয়ে তুলতে পারে। তবে আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হলেন কালোর্ গ্রিন্সবার্গ (Carlo Ginzburg, b.1939) এবং তার রচিত “The Cheese and the Wones: The Cosmos of a Sixteenth Century Miller” গ্রন্থটি হলো আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার এক উজ্জ্বল উদাহরণ। তিনি ইতিহাস চর্চা বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, “In the past historians could be accused of wanting to know only about ‘the great deeds of the kings’, but today this is certainly no longer true. More and more they are turning towards what their predecessors passed over in silence, discarded or simply ignored.”।[৬৫]

• ২.৪. খেলার ইতিহাস চর্চা:

গোটা বিংশ শতক জুড়ে ইতিহাস চর্চার বিষয়বস্তু সম্প্রসারণের এই যে প্রচেষ্টা তার ফল স্বরূপ যূথবদ্ধ মানব জীবনের নানা নিত্য নতুন ক্ষেত্র ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই বৃহত্তর প্রক্রিয়ার এক অংশ রূপে খেলার ইতিহাসও, ইতিহাস চর্চার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত হয়। ঐতিহাসিক ই.জে. হবসবম (E.J. Hobsbowm) ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নতুন সামাজিক অভ্যাস হিসেবে ক্রীড়াকে অভিহিত করেছেন।[৬৬] কিন্তু প্রথাগত ইতিহাস চর্চার কাঠামোতে খেলাধুলাকে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা হয়নি। প্রাথমিক পর্যায়ে মূলত নৃতাত্ত্বিকরা ক্রীড়া বিষয়টিকে প্রথাগত জ্ঞানচর্চার কাঠামোয় অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছিলেন।[৬৭] এডওয়ার্ড বার্নেট টেইলর (Edward Burnett Taylor) যাকে অনেক সময় নৃতত্ত্বের জনক হিসেবে অভিভূত করা হয়ে থাকে, তিনি ১৮৭৯ সালে রচিত "The History of the Games"- প্রবন্ধতে বিভিন্ন ধরনের খেলার বিষয়ে আলোচনা করেছেন। মার্কিন নৃতত্ত্ববিদ জেমস মুনি (James Mooney) এবং স্টিওয়ার্ট কুলিন (Stewart Culin) আমেরিকার আদিম অধিবাসী (Native American) দের মধ্যে প্রচলিত ক্রীড়া গুলি বিষয়ে আলোচনা করেছেন।[৬৮] ফ্রেডারিক পেক্সন (Frederic Paxson) "The Rise of Sports" গ্রন্থে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমাজের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে খেলার ভূমিকার কথা বর্ণনা করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে খেলাধুলা বিষয়ে আলোচনার জন্য ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় "North-American Society of Sport History" (NASSH) এবং ১৯৭৩ সাল থেকে এই সংস্থা "Journal of Sport History" নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত করতে থাকে। ডাচ ঐতিহাসিক জন হুইজিঙ্গ (John Huizinga) ১৯৩৮ সালে রচিত "Homo Ludens"- গ্রন্থে খেলার বিষয়ে আলোচনা করেছেন।[৬৯] ১৯৬০- এর দশকে ফরাসি নৃতত্ত্ববিদ রজার ক্যালিওস (Roger Caillios), হুইজিঙ্গ- এর খেলা বিষয়ক মতের বিরোধিতা করে ক্রীড়া বিষয়ে নিজস্ব বক্তব্য তুলে ধরেন "Man, Play and Games" গ্রন্থে।[৭০] সমাজতত্ত্ববিদ নর্বার্ট এলিস (Norbert Elias) এবং এরিক ডানিং (Eric Dunning) ক্রীড়ার ক্রমবিকাশ বর্ণনা করতে গিয়ে ক্রীড়ার উদ্ভবকে সভ্যতার ক্রমবিকাশ (Civilizing Process) এর একটি অংশ হিসেবে বর্ণনা করে

জানিয়েছেন যে প্রাচীন সমাজের হিংস্র ও সামরিক প্রতিযোগিতার ক্রম বিবর্তিত অহিংস ও অসামরিক রূপ হল ক্রীড়া।[৭১]

বিজ্ঞানের ইতিহাস চর্চার মতো ক্রীড়া ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রেও এ ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে খেলোয়াড় বা খেলার সঙ্গে যুক্ত কোনো ব্যক্তি একমাত্র খেলার ইতিহাস যথার্থভাবে তুলে ধরতে পারেন। এই ধারণার বিরোধিতা করে ঐতিহাসিক জেমস ওয়ালভিন (James Walvin) বলেছেন, "Such claims to exclusivity are intellectually crippling and depend ultimately for their rationale on the belief of that there is, or ought to be, only one particular approach or interpretation of historical experience. It is to be hoped that sport history will avoid such factional fights, although this is not to claim that sporting practitioners have nothing to tell us. Far from it. What is quite clear however is that one does not need to be player, spectator or aficionado of any sport- to appreciate its border social or historical significance."।[৭২] বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে প্রথাগত ইতিহাস চর্চার ঘরানাই ক্রীড়া বিষয়ক রচনা ক্রমশ নিজের স্থান করে নিতে থাকে এবং ব্রিটেনে প্রাথমিক পর্যায়ে এই ইতিহাস চেতনার সূচনা হয়। ইউরোপ সহ পশ্চিমী বিশ্বে ক্রীড়া ইতিহাস চর্চার সূচনা হয় ১৯৭০- এর দশকে এবং তা বিশেষভাবে প্রসার লাভ করে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে ১৯৮০- এর দশকে কারণ ১৯৮২ সালে "British Society of Sport History" প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ক্রীড়া ইতিহাস চর্চা একটি সাংগঠনিক রূপ লাভ করে। 'Frank Cass' প্রকাশনায় ক্রীড়া ইতিহাসচর্চার এই সংগঠনের গবেষণা পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে, যা বর্তমানে "The International Journal of the History of Sport" নামে পরিচিত। সমাজবিজ্ঞানী জে.এ. ম্যাঙ্গান (J.A. Mangan), টনি ম্যাসন (Tony Mason), এলান গাটম্যান (Allen Guttmann), রিচার্ড হোল্ট (Richard Holt) প্রমুখদের গবেষণায় ক্রীড়া ইতিহাস চর্চা আরোও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। ক্রীড়া ইতিহাস চর্চার এই উদ্যোগ ক্রমশ ব্রিটেনের বাইরে ইউরোপের অন্যান্য দেশে যথা- ডেনমার্ক,

সুইডেন ও ফিনল্যান্ডের মতো দেশে ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং চীন, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার মতো এশীয় দেশগুলির সমাজবিজ্ঞানী গণও ১৯৮০- এর দশকের শেষ পর্ব থেকে এই প্রয়াসের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করতে থাকেন। ইউরোপে ক্রীড়া ইতিহাস চর্চার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রচারক জে.এ. ম্যাঙ্গান- এর উদ্যোগে স্কটল্যান্ডের স্টেট ক্লাউড বিশ্ববিদ্যালয়ে (University of Strathclye) গড়ে ওঠে "International Research Centre for Sport, Socialization and Society" (IRCSSS), যা পরবর্তীকালে ইংল্যান্ডের ডি মন্টফোর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে (De Montfort University) স্থানান্তরিত হয়। জে.এ. ম্যাঙ্গান- এর সম্পাদনায় 'Frank Cass' প্রকাশনার অধীনে ১৯৯৮ সালে "Culture, Sports, Society", ১৯৯৯ সালে "European Sport History Review" এবং ২০০০ সালে "Soccer and Society", নামে তিনটি গবেষণামূলক পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে, যার মধ্যে "Culture, Sports, Society" নামক পত্রিকাটি বর্তমানে "Sport in Society" নামে প্রকাশিত। এই একই সময় কালে "Sport in Global Society" নামে একটি সিরিজের অধীনে অনেক গুলি একক ও সম্পাদিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, 'Frank Cass' প্রকাশনায়, যা পরবর্তীকালে 'Routledge' প্রকাশনার দ্বারা অধিগৃহিত হয়।[৭৩]

বিংশ শতাব্দীর সূচনাতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্রীড়া বিষয়ক গবেষণার কাজ শুরু হলেও প্রকৃতপক্ষে ক্রীড়া ইতিহাস চর্চার সূচনা ঘটে ব্রিটেনে, কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্রীড়া বিষয়ক গবেষণার সূচনা হয়েছিল শারীর শিক্ষা ও ক্রীড়া বিজ্ঞান বিষয়ক ধারণা ও তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে। এর বিপরীতে ব্রিটেনে ক্রীড়া ইতিহাস চর্চার সূচনা ঘটেছিল সামাজিক ইতিহাস চর্চা ও সেই সংক্রান্ত তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে। ব্রিটেনে ক্রীড়া ইতিহাসের বিবর্তনের বিভিন্ন ধারা পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন সময় পর্বে ক্রীড়া ইতিহাসের বিষয়বস্তুর পরিবর্তন ও বিবর্তন লক্ষ করা যায়, যা ক্রীড়া ইতিহাসের আলোচনার পরিধিকে বিস্তৃত করেছে। প্রথম পর্বে ক্রীড়া ইতিহাস রচনার উপর ব্রিটেনের সামাজিক ইতিহাস রচনার ধারা প্রভাব বিস্তার করেছিল। সামাজিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নিচের তলা থেকে বা নিচু থেকে ইতিহাস দেখার ও লেখার যে প্রবণতা ক্রীড়া ইতিহাসের ক্ষেত্রেও তা প্রসারিত হয় ফলে শ্রেণী সংক্রান্ত ধারণা

ও আলোচনা ক্রীড়া ইতিহাসে মুখ্য হয়ে ওঠে। রিচার্ড হোল্ট শ্রমজীবী সংস্কৃতির অংশ হিসেবে খেলার গুরুত্বের কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি "Sport and The British: A Modern History" গ্রন্থে, ১৮০০ সাল থেকে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে খেলাধুলার এক নিপুন বর্ণনা তুলে ধরেছেন যেখানে তিনি ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলা, ভিক্টোরিয়ান যুগের অপেশাদারী খেলা, শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে জনপ্রিয় ও প্রচলিত খেলা এবং খেলার সঙ্গে সাম্রাজ্য, জাতীয় পরিচয় ও হিংস্রতা কিভাবে যুক্ত থাকে তার বর্ণনা দিয়েছেন।[৭৪] ঐতিহাসিক টনি মেশন (Tony Mason) "Association, Football and English Society, 1863-1915" গ্রন্থে শ্রমজীবী সংস্কৃতির অংশ হিসেবে খেলার কথা তুলে ধরেছেন। তিনি খেলা কে একই সঙ্গে শ্রেণী নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম ও শ্রেণী অভিব্যক্তি প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন ফুটবল খেলার মাধ্যমে একদিকে যেমন প্রশাসকরা জনগণের মধ্যে নৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটাতে ও তাদের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করতে চেয়েছিল, তেমনি অন্যদিকে তা হয়ে উঠেছিল খেলোয়াড় ও দর্শকদের নিজস্ব চেতনার প্রকাশের ক্ষেত্র।[৭৫] ঐতিহাসিক জে.এ. ম্যাঙ্গান ভিক্টোরিয়ান ও এডওয়ার্ডিয়ান পাবলিক স্কুলে খেলাধুলার চর্চার বর্ণনা এবং তা কিভাবে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীর সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠে তার বর্ণনা দিয়েছেন।[৭৬] ঐতিহাসিক জে. হারগ্রিভস (J. Hargreaves) জনসাধারণকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের এক পরিশীলিত মাধ্যম হিসেবে খেলাধুলার বর্ণনা করেছেন।[৭৭] দ্বিতীয় পর্যায়ে খেলার ইতিহাস চর্চার উপরে মার্কসীয় তথা অর্থনৈতিক ইতিহাস চেতনার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ঐতিহাসিক রে ভ্যামপ্লিউ (Wray Vamplew) "Play Up and Play Game" গ্রন্থে মার্কসীয় তত্ত্বের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন ক্রীড়া ইতিহাস বর্ণনায়। তাঁর মতে পেশাদারি খেলা গুলি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সংগঠিত হলেও এগুলি মুনাফা সর্বস্ব ছিল না।[৭৮] তৃতীয় পর্যায়ে খেলার মাধ্যমে কীভাবে আত্ম পরিচিতির বিকাশ ঘটে অর্থাৎ খেলার মাধ্যমে কীভাবে আঞ্চলিক ও জাতীয় চেতনা গঠিত হয়, তা অনুসন্ধানে লিপ্ত হন ঐতিহাসিকেরা। খেলার মাধ্যমে কীভাবে আঞ্চলিক পরিচয় এর প্রকাশ ঘটে তার বর্ণনাও খেলার ইতিহাসের অন্যতম বিষয় হয়ে ওঠে ব্রিটেনে এবং আঞ্চলিক স্তরে খেলাকে নিয়ে একাধিক গবেষণা কার্য সম্পাদিত হয়। এক্ষেত্রে ঐতিহাসিক রিচার্ড হোল্ট

জানিয়েছেন, "Supporting a club and assembling with thousands of others like himself a man could assert a kind of membership of the city, the heart of which was physically and emotionally his for the afternoon."।[৭৯] একইভাবে খেলার মাধ্যমে কীভাবে জাতীয় চেতনার প্রকাশ ঘটে বা খেলা কীভাবে জাতীয়তাবাদের দ্যোতক হয়ে ওঠে তাও খেলার ইতিহাস রচনার অঙ্গীভূত হয়। ওয়েলসের ক্ষেত্রে রাগবি ও ফুটবল খেলা ইংল্যান্ডের ছত্রছায়া থেকে বেরিয়ে এসে জাতীয় পরিচয় গঠনের মাধ্যম হয়ে ওঠে।[৮০] একইভাবে ফুটবল খেলা স্কটল্যান্ডের জাতীয় সত্তা গঠনের সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে যায়।[৮১] চতুর্থ পর্যায়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও খেলার মধ্যে যে গভীর যোগসূত্র বর্তমান তা বিশ্লেষণ করা খেলার ইতিহাস রচনার এক আকর্ষণীয় ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ সম্রাজ্যে নিযুক্ত কর্মচারীদের কাছে তাদের মাতৃভূমির ক্রীড়া গুলি ছিল স্বদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করার ও নিজেদের অবসর যাপনের মাধ্যম। একই সঙ্গে উপনিবেশ গুলিতে ব্রিটিশ ক্রীড়া গুলির বিস্তার ঘটানোর উদ্যোগ নেওয়া হয় যাতে উপনিবেশ গুলির জনগণের মধ্যে ব্রিটিশ চেতনার বিকাশ ঘটানো যায়। তবে পরবর্তীতে এই খেলা গুলিকে কেন্দ্র করে উপনিবেশ গুলিতে জাতীয়তাবাদ এর বিকাশ ঘটতে থাকে এবং তা ব্রিটিশদের শ্রেষ্ঠত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র হয়ে ওঠে।[৮২] এই ব্রিটিশ ক্রীড়া ইতিহাস চর্চা মূলত ক্রিকেট, ফুটবল ও রাগবি খেলার মতো গুরুত্বপূর্ণ খেলা গুলিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে এবং এই খেলাগুলির একাধিকত্ব লক্ষ করা যায় ক্রীড়া ইতিহাস চর্চায়। কিছু ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত বাদ দিলে খেলায় নারীদের অংশগ্রহণের বিষয়টিও উপেক্ষিত থেকেছে।[৮৩]

• ২.৫. ভারতে খেলার ইতিহাস চর্চা:

ভারতে খেলার ইতিহাস চর্চা মূলত ঔপনিবেশিক শাসন পর্বে প্রচলিত খেলাগুলি বিষয়ে কেন্দ্রীভূত থেকেছে। প্রথাগত জ্ঞান চর্চার কাঠামোই প্রথম ভারতীয় কর্তৃক ক্রীড়া বিষয়ক গবেষণার কথা আমরা জানতে পারি ১৯৮৮ সালে। ওই বছর সৌমেন মিত্র জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ে ঔপনিবেশিক বাংলায় ফুটবলের ভূমিকা বিষয়ে তার গবেষণা পত্র প্রদান করেন, যেখানে তিনি ১৯১১ সালে

মোহনবাগান কর্তৃক ঐতিহাসিক আই.এফ.এ শিল্ড বিজয় কীভাবে জাতীয়তাবাদের প্রতীক হয়ে উঠেছিল তার বর্ণনা দিয়েছেন।[৮৪] যা পরবর্তীকালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।[৮৫] ১৯৮০-এর দশক থেকে ভারতীয় ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীরা ভারতে জনপ্রিয়তার নিরিখে সম্ভবত প্রথম স্থানাধিকারী ক্রীড়া হিসাবে ক্রিকেটের ইতিহাস রচনার বিষয়ে উদ্যোগী হন। রামচন্দ্র গুহ তার একাধিক প্রবন্ধে ঔপনিবেশিক শাসন পর্বে ক্রিকেট খেলার বিষয়ে আলোচনা করে দেখিয়েছেন, যে কীভাবে খেলাটি উপনিবেশ বিরোধিতা ও জাতীয়তাবাদের প্রকাশের মাধ্যম হয়ে উঠেছিল। তিনি দেখিয়েছেন ভারতের মূলত উচ্চ বর্গীয়রাই প্রাথমিক পর্বে ক্রিকেট খেলার প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছিল, তবে পরবর্তীতে এই খেলা ক্রমশ ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ অঙ্গ হয়ে ওঠে। তবে তার এই আলোচনা মূলত বোম্বে ও মাদ্রাস কেন্দ্রিক, বাংলা ঔপনিবেশিক শাসন পর্বে ক্রীড়া সংস্কৃতির এক অন্যতম প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হওয়া সত্ত্বেও তিনি এটিকে উপেক্ষা করেছেন। যদিও জনমানসিকতায় খেলার প্রভাব বিষয়ে তিনি উল্লেখযোগ্য বর্ণনা তুলে ধরেছেন।[৮৬] এছাড়াও তিনি “A Corner of a Foreign Field” গ্রন্থে ভারতের ক্রিকেটের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন।[৮৭] মিহির বসু “The Magic of Indian Cricket”[৮৮] এবং আশিস নন্দী “The Tao of Cricket”[৮৯] গ্রন্থে ভারতের ক্রিকেটের ইতিহাস তুলে ধরেছেন। মারিও রদ্রিগেজ (Mario Rodriguaz) ক্রিকেটার রঞ্জিত সিং- এর রাজনৈতিক জীবনের বর্ণনা দিয়েছেন, যা ভারতের ক্রিকেটের ইতিহাসকে বহুলাংশে আলোকিত করে।[৯০] এছাড়াও এডওয়ার্ড ডকার (Edward Docker)[৯১] ও রিচার্ড ক্যাশম্যান (Richard Cashmann)[৯২] ভারতে ক্রিকেটের ইতিহাস বিষয়ক গবেষণা করেছেন। বোরিয়া মজুমদার ভারতীয় ক্রিকেটের সামাজিক ইতিহাসের বর্ণনা দিয়েছেন তার “Twenty Two Yards to Freedom” গ্রন্থে।[৯৩]

ভারতে প্রচলিত আরেকটি জনপ্রিয় ক্রীড়া ফুটবল বিষয়েও একাধিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচিত হতে দেখা যায়। ঐতিহাসিক টনি মেশন (Tony Mason) তার, “Football on the Maiden: Cultural Imperialism in India” প্রবন্ধে ভারতের ব্রিটিশদের সাংস্কৃতিক আধিপত্যের

নিরিখে ফুটবল খেলার ভূমিকা বিশ্লেষণ করেছেন এবং ভারতের উচ্চ বর্গীয় মানুষদের মধ্যে ফুটবল খেলা প্রসারের ক্ষেত্রে ব্রিটিশদের দ্বারা স্থাপিত বিদ্যালয় গুলির ভূমিকা তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন মূলত ভারতে নিযুক্ত ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সদস্যরা সেনা শিবিরের একঘেয়েমি থেকে মুক্তি লাভের জন্য, নিজেদের দৈহিক ক্ষমতা বজায় রাখতে ও শৃঙ্খলা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ফুটবল খেলার প্রচলন ঘটায়। এই সেনাদল গুলিকে কেন্দ্র করে প্রাথমিক পর্যায়ে ভারতে বিভিন্ন ফুটবল প্রতিযোগিতার সূচনা ঘটেছিল এবং এই সেনাদল গুলি সমস্ত প্রতিযোগিতা গুলিতে নিজেদের একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন করেছিল।[৯৪] বোরিয়া মজুমদার ও কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায় "Goalles: The Story of a Unique Footballing Nation" গ্রন্থে ভারতীয় ফুটবলে জাতীয়, প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক স্তরের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও টানা পড়েনের বিষয়টি তুলে ধরেছেন এবং একই সঙ্গে ফুটবলের মাঠে সম্রাজ্যবাদ, জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও বাণিজ্যিকতার প্রতিফলনের বিষয়টিও বর্ণনা করেছেন।[৯৫] একবিংশ শতাব্দীতে দক্ষিণ এশিয় সমাজে খেলার ভূমিকা কে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়, পশ্চিমী ঐতিহাসিকদের মধ্যে। এই প্রচেষ্টার একটি অন্যতম উজ্জ্বল প্রতিফলন হলো পল ডিমিও (Paul Dimeo) ও জেমস মিলস (James Mills) কর্তৃক সম্পাদিত "Soccer in South Asia" গ্রন্থ। উক্ত গ্রন্থে ভারতীয় ফুটবল বিষয়ে একাধিক প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে, যার মাধ্যমে বাংলায় বিশেষত কলকাতা শহরে ফুটবল খেলার জনপ্রিয়তার কারণ অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা করা হয়েছে এবং ১৮৮০ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে ফুটবল খেলার ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে।[৯৬]

ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে পশ্চিমী খেলাধুলার আগমন, তার প্রেক্ষাপট ও বিবর্তন বর্ণিত হয়েছে জে.এ. ম্যাঙ্গান (J.A. Mangan) রচিত "The Games Ethics and Imperialism" গ্রন্থে। ম্যাঙ্গানের মতে ব্রিটিশ শাসন পর্বে সরকারি ও মিশনারি স্কুল-কলেজে ক্রিকেট ও ফুটবলের মতো খেলাগুলো প্রবর্তনের মাধ্যমে ভারতীয়দের ব্রিটিশ শাসকদের প্রতি অনুরক্ত প্রজাবর্গে পরিণত করার চেষ্টা হয়েছিল। তার মতে খেলা গুলিকে বিশেষত ক্রিকেটকে ভারতীয়দের মধ্যে ব্রিটিশ আদর্শ প্রসারের এক আদর্শ মাধ্যম হিসেবে দেখা হয়েছিল।[৯৭] রনজয় সেন "A History of Sport in India" গ্রন্থে

প্রাচীন যুগ থেকে উত্তর ঔপনিবেশিক যুগ পর্যন্ত ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন ক্রীড়ার ধারাবাহিক বর্ণনা তুলে ধরেছেন।[৯৮] জেমস মিলস (James Mills) সম্পাদিত “Subaltern Sports” গ্রন্থটি ভারতীয় খেলার ইতিহাসে নিম্নবর্গীয় ধারা ও অংশগ্রহণের বিষয়টি আলোকিত করেছে।[৯৯] ভারতে খেলার ইতিহাস বিষয়ক অধিকাংশ গবেষণা মূলত ক্রিকেট ও ফুটবলের মতো দুটি জনপ্রিয় ক্রীড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। তবে বর্তমানে এক্ষেত্রে কিছু উজ্জ্বল ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হচ্ছে ফলে অলিম্পিকে ভারত কিংবা ভারত ও কমনওয়েলথ গেমস এর মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিও খেলার ইতিহাস চর্চায় সংযোজিত হয়েছে। ভারতের দেশীয় খেলা গুলি বিষয়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেছেন জোসেফ আল্টার (Joseph Alter)। তিনি “The Wrestlers Body” (1992) গ্রন্থে নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ভারতের বিশেষত উত্তর ভারতের মল্লযুদ্ধ ও কুস্তি খেলার ইতিহাস তুলে ধরেছেন।[১০০] এই ধারারই আর একটি নিদর্শন হলো বোরিয়া মজুমদার ও নলিন মেহেতা রচিত “Olympics: The Indian Story” গ্রন্থটি, যেখানে অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় ভারতের সফলতার নানা নিদর্শন আলোচিত হয়েছে।[১০১]

একবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে খেলাধুলার ইতিহাস বিষয়ক একাধিক গবেষণা কার্য সম্পাদিত হতে দেখা যায়। ১৯১১ সালে মোহনবাগানের ঐতিহাসিক আই.এফ.এ শিল্ড বিজয় থেকে শুরু করে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের ফুটবলের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার গবেষণা সন্দর্ভে, যেখানে তিনি খেলার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও প্রাদেশিকতাবাদ- এর মতো বিষয়গুলির প্রতিফলন তুলে ধরেছেন।[১০২] বিংশ শতাব্দীতে বঙ্গের ক্রীড়া ক্ষেত্রে নারীদের অবদানের বিষয়টি বর্ণনা করেছেন সুপর্ণা ভট্টাচার্য তার গবেষণা সন্দর্ভে।[১০৩] অমিতাভ চ্যাটার্জী ঔপনিবেশিক বাংলায় ক্রীড়া সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনা করেন তার গবেষণা সন্দর্ভে।[১০৪] দেবাশীষ মজুমদার তার গবেষণা সন্দর্ভে ১৮৫৮ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে বাংলায় ফুটবল খেলার বিকাশের দিকটি তুলে ধরেছেন যদিও তার এই আলোচনা মূলত কলকাতা

শহরকেন্দ্রিক।[১০৫] পশ্চিম বঙ্গের বাইরে ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় গলিতেও বিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে খেলার ইতিহাস নিয়ে গবেষণা কার্য সম্পাদিত হতে থাকে যার এক উজ্জ্বল উদাহরণ হল প্রতীমা শর্মা- এর গবেষণা সন্দর্ভ। প্রাগ-ঐতিহাসিক কাল থেকে ৬৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রাচীন ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া ও অবসর বিনোদনের মাধ্যমগুলির বিষয়ে বর্ণনা দিয়েছেন প্রতীমা শর্মা তার গবেষণা সন্দর্ভে।[১০৬] সৌভিক নাহা একজন ভারতীয় ঐতিহাসিক হিসাবে বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতের খেলার ইতিহাস নিয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা কার্য সম্পাদন করেছেন। সৌভিক নাহা ১৯৩৪ থেকে ১৯৯৯ সালের মধ্যে কীভাবে কলকাতায় ক্রিকেট একটি বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকদের খেলা থেকে ক্রমশ সাধারণ জনগণের সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে উঠল তার বর্ণনা দিয়েছেন এবং একইসঙ্গে জনসংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে ক্রিকেটকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গণমাধ্যম যথা- সংবাদপত্র, রেডিও ইত্যাদি মাধ্যমগুলি যে ভূমিকা পালন করেছিল বর্ণনা প্রদান করেছেন তার গবেষণা সন্দর্ভে।[১০৭]

• ২.৬. খেলা ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক:

ক্রীড়া ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক ও তার বিশ্লেষণের বিষয়টিও যথেষ্ট জটিল এবং এক্ষেত্রও বিতর্ক লক্ষ করা যায়। খেলাধুলা যে কোনো সমাজে সংস্কৃতিক জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা ওই সমাজের বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরে। সংস্কৃতি ও খেলার মধ্যে নিবিড় সম্পর্কের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে জন হুইজিঙ্গ মানব সভ্যতার এক অন্যতম অঙ্গ হিসেবে খেলা কে নাগরিক জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং খেলার মাধ্যমে সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে বলে মত দিয়ে বলেছেন, “The view we take in the following pages is that culture arise in the form of play, that it is played from the way beginning.”।[১০৮] এক সুদীর্ঘ সময় পর্বে খেলার ইতিহাস বলতে মূলত খেলার প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য, আইন-কানুন, সহজাত ভিত্তি ইত্যাদির বর্ণনা কে বোঝানো হতো। খেলা কে নিছকই অবসর বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে বর্ণনা করা হতো এবং এর কোনো সাংস্কৃতিক গুরুত্ব আছে বলে স্বীকার করা হতো না, যার বিরোধিতা করে রজার ক্যালিওস অত্যন্ত জোরের সাথে উল্লেখ

করেছেন যে খেলা ও সামাজিক রীতিনীতির মধ্যে সুনির্দিষ্ট পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান।[১০৯] বর্তমান সমাজে ক্রীড়ার গুরুত্ব কে অস্বীকার করে সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান আহরণ সম্ভব নয়। বিশ্বায়িত সমাজে ক্রীড়া একটি আন্তর্জাতিক রূপ লাভ করেছে যার সঙ্গে যুক্ত অর্থনীতি, রাজনীতি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নানা বিষয়। খেলা হয়ে ওঠে সাম্প্রদায়িক, আঞ্চলিক ও জাতীয় দ্বন্দ্বের দ্যোতক। এছাড়াও সামাজিক নানা বিভাজন ও সংস্কৃতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটে খেলায়। টেলিভিশন শিল্প, চলচ্চিত্র শিল্প, পর্যটন শিল্প, শ্রমিক অভিবাসন প্রভৃতির মতো বিষয় গুলির ক্ষেত্রেও ক্রীড়া গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এমনকি খেলাকে কেন্দ্র করে হিংসাত্মক ঘটনা ও অসামাজিক বা আইন বিরুদ্ধ কাজও সংঘটিত হতে দেখা যায়।[১১০] খেলার মাধ্যমে কীভাবে একটি সমাজের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যগুলিকে চিহ্নিত করা যায় তার বর্ণনা দিতে গিয়ে মার্কিন দার্শনিক জ্যাকুয়াস বার্জুন (Jacques Barzun) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেসবল খেলার কথা উল্লেখ করে বলেছেন, “Whoever wants to know the heart and mind of America better learn baseball, the rules and realities of the game- and do it by watching first some high school or small towns teams.”।[১১১] বিভিন্ন ঐতিহাসিক সময় পর্বে সমাজের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে প্রচলিত খেলা গুলির জনপ্রিয়তা ও গুরুত্বেরও পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনের বর্ণনা দিতে গিয়ে মার্কিন ক্রীড়া সমাজতাত্ত্বিক (Sports sociologist) স্ট্যানলি ইটজেন (Stanley Eitzen) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমাজে কীভাবে বেসবলের পরবর্তীতে ফুটবল খেলার জনপ্রিয়তা ক্রমশ্ বৃদ্ধি পায় তার বর্ণনা দিতে গিয়ে, আর্থসামাজিক ব্যাখ্যাদানের চেষ্টা করে বলেছেন, “Baseball, then, represents what we were an inner-directed, rural, individualistic society. It continues to be popular because of our longing for the peaceful past. Football, on the other hand, is popular now because it symbolizes what we now are- an other- directed, urban-technical, corporate-bureaucratic society.”।[১১২] অ্যালান ইনহ্যাম (Alan Ingham) রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকায় ক্রীড়ার বিশ্লেষণের কথা বলেছেন এবং এক্ষেত্রে মার্কসীয়

ঐতিহাসিক বস্তুবাদের উপযোগীতার স্বপক্ষে মত দিয়েছেন।[১১৩] "Sport, Power and Culture" গ্রন্থে জন হারগ্রিভস (John Hargreaves) জানিয়েছেন যে বিভিন্ন সংস্কৃতিতে খেলার ভূমিকা বিভিন্ন হয়ে থাকে কারণ সমাজের ক্ষমতার কাঠামোর দ্বারা খেলাগুলিও প্রভাবিত হয়ে থাকে।[১১৪] খেলার ইতিহাসের গুরুত্ব কে তুলে ধরতে খেলার ইতিহাসের অন্যতম রূপকার জে.এ. ম্যাঙ্গান লিখেছেন, বর্তমানে ক্রীড়া সমাজে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে যে তা কেবলমাত্র খেলোয়ারদের বিষয় হিসেবে সীমাবদ্ধ না থেকে ক্রমশ এক জনগণের বিষয় হয়ে উঠেছে, যা রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, শিক্ষা বিশেষজ্ঞ ও গবেষকদের কাছে সমান আকর্ষণীয়।[১১৫] খেলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য বিদ্যমান যা একমাত্র যথার্থভাবে উপলব্ধি করা যায় যদি আমরা প্রথাগত অবসর বা বিনোদনের কাঠামোর বাইরে গিয়ে, বৃহত্তর ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রেক্ষিতে খেলার তাৎপর্য কে ব্যাখ্যা করি।

- **২.৭. ভারতে খেলা ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক:**

দক্ষিণ এশিয়া তথা ভারতে খেলা সর্বদা বৃহত্তর ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত থেকেছে। ভারতের ইতিহাস আলোচনায় ক্রীড়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে জোসেফ আলটার বলেছেন, "Transcends the categories that anthropologists and others have traditionally used to interpret Indian society and culture. It is a sport, but it is also an elaborate way of life involving general prescriptions a physical culture, diet, health, ethics and morality."।[১১৬] ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে ভারতে সাম্রাজ্যবাদ, জাতীয়তাবাদ, আঞ্চলিকতাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, অব-উপনিবেশীকরণ, দেশভাগ, শরণার্থী সমস্যা, কূটনীতি, বাণিজ্যিকতা প্রভৃতি প্রকরণ গুলি বিভিন্ন খেলার বিবর্তনের ইতিহাসে যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তা একমাত্র জানা যায় খেলা গুলির সামাজিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে।[১১৭] কিন্তু তা সত্বেও ভারতবর্ষে সমাজ বিজ্ঞান চর্চায়, ক্রীড়া ইতিহাস চর্চাকে যথোপযুক্ত গুরুত্ব দান করা হয়নি। ঐতিহাসিক দীপেশ চক্রবর্তী একই সঙ্গে ভারতবর্ষে সমাজবিজ্ঞান চর্চায় খেলার ইতিহাস চর্চার অনুপস্থিতি ও তার

উজ্জ্বল সম্ভাবনার গুরুত্বকে তুলে ধরতে গিয়ে বলেছেন, “All Bengali children of my generation grew up on stories of Gobarbabu’s wrestling prowess or Mohun Bagan’s victory in the IFA Shield tournament of 1911. But as an arena in which the colonized or the subjugated could fight for political power, sport seemed remote and less important than even the street. It is not surprising therefore, that social historians of India have paid more attention to riots than to sports, to street-battles with the police than to rivalries on the soccer field.”।[১১৮] ১৯১১ সালে মোহনবাগান কর্তৃক শীল্ড বিজয় সম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে দেশীয় জনগণের জয়ের একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে গড়ে ওঠে, যা ফুটবল খেলার মাঠকে গড়ে তোলে জাতীয়তাবাদের প্রকাশের একটি আদর্শ ক্ষেত্র।[১১৯] ১৯৪৭ সালের দেশভাগ জনিত কারণে পূর্ববঙ্গ থেকে বহুসংখ্যক মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন এবং গৃহহীন, সম্বলহীন এই সমস্ত মানুষের কাছে দৈনন্দিন জীবন হয়ে ওঠে সংগ্রামের এক ক্ষেত্র। একই সঙ্গে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত এই সমস্ত মানুষের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের পুরাতন অধিবাসীদের সম্পর্কের নানা টানাপোড়েন ফুটবল খেলার মাঠকেউ স্পর্শ করে, যার প্রতিফলন লক্ষ করা যায় কলকাতার দুই নামী ক্লাব মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে। যদিও এই ক্লাব দুটির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল দেশভাগের বহু পূর্বে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকালে এবং দুই দলের ফুটবল খেলোয়াড়দের মধ্যেই দুই বঙ্গের প্রতিনিধিত্ব লক্ষ করা যায়। তথাপি দেশভাগ পরবর্তী শরণার্থী সমস্যা দুই দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে নতুন মাত্রা দান করে, সাংস্কৃতিক স্তরে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব যেন হয়ে ওঠে উদ্বাস্তু মানুষের প্রতিনিধি।[১২০]

স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পর থেকেই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্ক সর্বদাই অম্লমধুর। তবে দুটি দেশের মধ্যে একাধিক যুদ্ধ সত্ত্বেও ক্রিকেট খেলার মাধ্যমে দ্বিপাক্ষিক আদান-প্রদান ও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস দেখা গেছে একাধিকবার। যার সূচনা হয়েছিল ১৯৫২ সালে এবং এর সাম্প্রতিকতম উদাহরণ হলো ২০০৪ সালের ভারতের ‘শুভেচ্ছা’ সফর।[১২১]

স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৪৮ সালের লন্ডন অলিম্পিকে স্বাধীন দেশ হিসেবে ভারত প্রথমবার অংশগ্রহণ করে, হকি খেলার ফাইনালে এতদিন যাদের হাতে পরাধীন ছিল, সেই ঔপনিবেশিক শাসক অর্থাৎ ব্রিটেন কে পরাজিত করে বিজয় লাভ, এক অন্যতম সেরা সময় হিসাবে রয়ে গেছে ভারতীয় হকি জগতে।[১২২]

• ২.৮. পর্যবেক্ষণ:

উপরোক্ত নিদর্শন থেকে বলা যায় যে খেলার মাঠ সর্বদাই ক্রীড়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাইরেও এক বৃহত্তর সমাজের প্রতিফলক হয়ে উঠেছে, যার যথার্থ ইতিহাস রচিত হলে আমাদের সামাজিক জ্ঞান আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। যথার্থ ক্রীড়া ইতিহাস রচিত হলে ভবিষ্যতের তারকারা বেড়ে উঠতে পারে অতীত বোধ নিয়ে, যে ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার তারা বহন করছে সেই সম্পর্কেও তাদের মনে একটা ধারণা তৈরি হয়।[১২৩] সর্বোপরি ক্রীড়া ইতিহাস দেখিয়ে দেয় ঔপনিবেশিক ও তার অব্যবহিত পরের যুগেও ভারতের খেলাধুলার সঙ্গে জনসংস্কৃতির একটি নিবিড় যোগ বর্তমান, কিন্তু এই সম্পর্কে খুব কমই জানা যায় এবং তা নিয়ে গবেষণা হয়েছে খুব সামান্যই। ভারতে প্রচলিত প্রথাগত ইতিহাস চর্চা ফুটবল বা ক্রিকেট খেলার গুরুত্বকে জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতাবাদ, জনপ্রিয় সংস্কৃতি ও বাণিজ্যিকতার প্রতিফলক রূপে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে, যা ক্রীড়া ইতিহাস রচিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরে।[১২৪] ঐতিহাসিক রামচন্দ্র গুহ খেলার ভারতীয় ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে দুটি দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখ করেছেন- প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি খেলার অভ্যাস, পৃষ্ঠপোষক, খেলোয়াড়, সংগঠন ও প্রতিযোগিতা প্রভৃতি আলোচনায় সীমায়িত, আর দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি খেলার মাধ্যমে বৃহত্তর বিষয়কে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস করে, আর তিনি এই দ্বিতীয় দৃষ্টিকোণ কেই খেলার ইতিহাস রচনার আদর্শ গুণ বলে মনে করেন।[১২৫] তবে উভয় দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমেই ক্রীড়া ইতিহাস সার্থক রূপ লাভ করতে পারে।

• টীকা ও সূত্র নির্দেশ:

১. *সংসদ বাংলা অভিধান*, ষষ্ঠ মুদ্রণ। (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ২০০৪), "খেলা"।

২. *সংসদ বাংলা অভিধান*, ষষ্ঠ মুদ্রণ। (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ২০০৪), "ক্রীড়া"।

৩. *Oxford Advanced Learners Dictionary*, 8th Edition, (Oxford: Oxford University Press, 2010), s.v. "play".

৪. *Oxford Advanced Learners Dictionary*, 8th Edition, (Oxford: Oxford University Press, 2010), s.v. "game".

৫. জিয়াউল আলম, "শরীর চর্চার আলোকে বাংলার লোকক্রীড়ার সন্ধান," (পি.এইচ.ডি গবেষণা নিবন্ধ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২), ৩।

৬. *Oxford Advanced Learners Dictionary*, 8th Edition, (Oxford: Oxford University Press, 2010), s.v. "sport".

৭. আলম, "শরীর চর্চার আলোকে বাংলার লোকক্রীড়ার সন্ধান," ৩-৪।

৮. সুশীল রায়, *শিক্ষা তত্ত্ব ও শিক্ষা দর্শন* (কলকাতা: বুক হাউস, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ), ২০১।

৯. James Ross, *Ground Work of Educational Psychology* (London: George G. Harpar and Co. Limite, 1953), 61.

১০. রায়, *শিক্ষা তত্ত্ব ও শিক্ষা দর্শন*, ৩৪৫-৩৬০।

১১. E.B. Hurlock, *Child Development* (New York: McGraw Hill, 1942), 337.

১২. W.W. Ryburn, *Introduction to Educational Psychology* (London: Oxford University Press, 1959), 268.

১৩. Ibid., 281.

"There is in play a freedom that we do not usually have when we are at work."

১৪. Ibid., 281-286.

১৫. Hurlock, *Child Development*, 337.

১৬. J. Huizinga, *Homo Ludens: A Study of the Play-Element in Culture* (Boston: The Beacon Press, 1960), 7.

১৭. Ibid., 8-9.

১৮. Ibid., 28.

১৯. Ibid., 28.

২০. Ibid., 13.

২১. Roger Caillois, *Man, Play and Games*, trans. Meyer Barash (Chicago: University of Illinois Press, 2001), 4-5.

২২. Ibid., 6.

২৩. Ibid., 8.

২৪. Ibid., 16-23.

২৫. Allen Guttmann, *From Ritual to Record: The Nature of Modern Sports* (New York: Colombia University Press, 1978), 3.

২৬. Ibid., 3-4.

২৭. Ibid., 4.

২৮. Ibid., 4.

২৯. Ibid., 5.

৩০. Ibid., 6.

৩১. Ibid., 7.

৩২. Ibid., 55.

৩৩. E.H. Carr, *What is History?*, Second Edition. (London: Penguin Books, 1987), 45.

৩৪. Fritz Stern, *The Varieties of History: From Voltaire to the Present* (London: Macmillan, 1970), 101.

৩৫. Carr, *What is History?*, 49.

৩৬. C.V. Wedgwood, *The King's Peace: 1637-1641* (New York: Macmillan, 1956), 17.

৩৭. Carr, *What is History?*, 45-46.

৩৮. Will Durant, *The Life of Greece* (New York: Simon and Schuster, 1939), 615.

৩৯. Arthur Marwick, *The Nature of History* (Houndmills: Macmillan, 1989), 34-35.

৪০. Ibid., 39-47.

৪১. Peter Burke, *History and Social Theory* (New York: Cornell University Press, 1993), 14.

৪২. Arthur Marwick, *The New Nature of History: Knowledge, Evidence, Language* (Houndmills: Palgrave, 2001), 88.

৪৩. Burke, *History and Social Theory*, 15.

৪৪. Marwick, *The Nature of History*, 74.

৪৫. Ibid., 75.

৪৬. Ibid., 76.

৪৭. Marwick, *The New Nature of History*, 90.

৪৮. Burke, *History and Social Theory*, 15.

৪৯. Marwick, *The Nature of History*, 80-84.

৫০. Marwick, *The New Nature of History*, 119-124.

৫১. Ibid., 125.

৫২. Ibid., 97.

৫৩. হেনরি পিরেন রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ- "History of Belgium", "The Economic and Social History of Europe", "Muhammad and Charlemagne"।

৫৪. জর্জ লেফেভর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ- "Peasants of the North during the French Revolution" (1924), "Agrarian Problems at the Time of the Terror" (1932)।

৫৫. ক্ল্যাপহ্যাম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ- "An Economic History of Modern Britain"।

৫৬. টাউনি রচিত গ্রন্থ- "Religion and the Rise of Capitalism"।

৫৭. Marwick, *The Nature of History*, 230.

৫৮. Marwick, *The New Nature of History*, 98-119.

৫৯. Ibid., 126-129.

৬০. Ibid., 130.

৬১. Ibid., 129-131.

৬২. Ibid., 132.

৬৩. Ibid., 133-135.

৬৪. Ibid., 135-136.

৬৫. Ibid., 136-143.

৬৬. Eric Hobsbown and Terence Ranger, eds., *The Invention of Tradition* (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), 298.

৬৭. Ronojoy Sen, *Nation at Play: A History of Sport in India* (New York: Columbia University Press, 2015), 3.

৬৮. Kendall Blanchard, "The Anthropology of Sport," in *Handbook of Sports Studies*, ed. Jay Coakley and Eric Dunning (London: Sage Publication, 2000), 145.

৬৯. John Huizinga, *Homo Ludens: A Study in Play Element in Culture* (Boston: The Beacon Press, 1960).

৭০. Roger Caillois, *Man, Play and Games*, trans. Meyer Barash (Chicago: University of Illinois Press, 2001).

৭১. Norbert Elias and Eric Dunning, *Quest fir Excitement: Sport and Leisure in the Civilizing Process* (Oxford: Basil Blackwell, 1986).

৭২. James Walvin, "Sport, Social History and the Historian," *British Joural of Sports History*, 1.1 (1984): 7.

৭৩. কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *খেলা যখন ইতিহাস: সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি* (কলকাতা: সেতু প্রকাশনী, ২০১৯), ৬।

৭৪. Richard Holt, *Sport and the British: A Modern History* (Oxford: Clarendon Press, 1989).

৭৫. Tony Mason, *Association Football and English Society: 1863-1915* (Brighton: Harvester Press, 1980).

৭৬. J.A. Mangan, *Athleticism in the Victorian and Edwardian Public School: The Emergence and Consolidation of the Educational Ideology* (London: Frank Cass, 2000).

৭৭. J. Hargreaves, *Sport, Power and Culture: A Social and Historical Analysis of Popular Sports in Britain* (Oxford: Polity Press, 1986).

৭৮. W. Vamplew, *Pay Up and Play the Game: Professional Sport in Britain: 1875-1914* (Cambridge: Cambridge University Press, 1988).

৭৯. Richard Holt, "Football and the urban way of life in nineteenth-century Britain," in *Pleasure, Profit, Proselytism: British Culture and Sport at Home and Abroad, 1700-1914*, ed. J.A. Mangan (London: Frank Cass, 1988), 67–85; quote from page no. 81.

৮০. Martin Johnes, *History of Sport in Wales* (Cardiff: University of Wales Press, 2005).

৮১. Grant Jarvie and John Burnett, eds., *Sport, Scotland and the Scots* (Phantassie: Tuckwell Press, 2000).

৮২. J.A. Mangan, ed., *The Cultural Bond: Sport, Empire and Society*, (London: Frank Cass, 1992).

৮৩. খেলাই নারীদের অংশ গ্রহণের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে এমন কিছু গ্রন্থ- A. Guttmann, "Women's Sports: A History", Columbia University Press, New York, 1991.; J. Hargreaves, "Sporting Females: Critical Issues in the History and Sociology of Women's Sport", Routledge, London, 1994.; Fan Hong & J.A. Mangan, eds., "Soccer, Women, Sexual Liberation", Frank Cass, London, 2005.

৮৪. Soumen Mitra, "Nationalism, Communalism and Sub-regionalism: A Study of Football in Bengal," (M.Phil. diss., Centre for Historical Studies, Jawaharlal Nehru University, 1988).

৮৫. Soumen Mitra, *In Search of an Identity: History of Football in Colonial Calcutta* (Kolkata: Das Gupta and Co., 2006).

৮৬. Ramachandra Guha, *Wickets in the East: An Anecdotal History* (Delhi: Oxford University Press, 1992), 69; Ramachandra Guha, "Cricket and Politics in Colonial India," *Past and Present*, no.161, (November 1998): 158.

৮৭. Ramachandra Guha, *A Corner of a Foreign Field: The Indian History of a British Sport* (New Delhi: Penguin Books, 2014).

৮৮. Mihir Bose, *The Magic of Indian Cricket: Cricket and Society in India* (London: Routledge, 2006).

৮৯. Ashis Nandy, *The Tao of Cricket: On Games of Destiny and Destiny of Games* (New Delhi: Oxford University Press, 2000).

৯০. Mario Rodriguaz, *Batting for the Empire: A Political Biography of Ranjitsinhji* (New Delhi: Penguin Books, 2003).

৯১. Edward Docker, *History of Indian Cricket* (Delhi: Macmillan, 1976).

৯২. Richard Cashmann, *Patrons, Players and the Crowd: The Phenomenon of Indian Cricket* (New Delhi: Oriental Longman, 1980).

৯৩. Boria Majumdar, *Twenty Two Yards to Freedom* (New Delhi: Penguin Books, 2004).

৯৪. Tony Mason, "Football on the Maidan: Cultural Imperialism in Calcutta," in *The Cultural Bond: Sport, Empire and Society*, ed. J.A. Mangan (London: Frank Cass, 1992).

৯৫. Boria Majumdar and Kausik Bandyopadhyay, *Goalless: The Story of a Unique Footballing Nation* (New Delhi: Penguin Book, 2006).

৯৬. Paul Dimeo and James Mills, eds., *Soccer in South Asia: Empire, Nation, Diaspora* (London: Routledge, 2001).

৯৭. J.A. Mangan, *The Games Ethic and Imperialism: Aspects of the Diffusion of an Ideal* (London: Frank Cass, 2003).

৯৮. Ronojoy Sen, *Nation at Play: A History of Sport in India* (New York: Columbia University Press, 2015).

৯৯. James H. Mills, ed., *Subaltern Sports: Politics and Sports in South Asia* (London: Anthem Press, 2005).

১০০. Joseph Alter, *The Wrestler's Body: Identity and Ideology in North India* (Berkeley: University of California Press, 1992).

১০১. Boria Majumdar and Nalin Mehta, *Olympics: The Indian Story* (London: Routledge, 2008).

১০২. Kausik Bandyopadhyay, "Football in Bengali Culture and Society: A Study in the Social History of Football in Bengal 1911- 1980," (PhD diss., University of Calcutta, 2008).

১০৩. Suparna Bhattacharya, "Women of Bengal in Sports 1905-1985," (PhD diss., Jadavpur University, 2007).

১০৪. Amitava Chatterjee, "Evolution of Sporting Culture in Colonial Bengal," (PhD diss., University of Calcutta, 2014).

১০৫. Debashis Majumder, "Rolling the Ball: History of Physical Culture in Bengali Football (1858- 1990)," (PhD diss., Jadavpur University, 2016).

১০৬. Pratima Sharma, "Sport and Pastimes in Ancient India (from Pre-historic times to circa 650 A.D.)," (PhD diss., Punjab University, 1993).

১০৭. Souvik Naha, "Cricket, Public Culture and Mediated Identities in Calcutta, 1934 to 1999," (PhD Diss., ETH Zurich, 2016).

১০৮. Huizinga, *Homo Ludens*, 46.

১০৯. Caillois, *Man, Play and Games*, 57.

১১০. Jarvie Grant, *Sport, Culture and Society: An Introduction* (London: Routledge, 2006), 44-46.

১১১. David G. McComb, *Sport in World History* (London: Routledge, 2004), 4.

১১২. Ibid., 4.

১১৩. Richard Gaiulianotti, *Sport and Modern Social Theorists* (Houndmills: Palgrave, 2004), 4.

১১৪. John Hargreaves, *Sports, Power and Culture: A Social and Historical Analysis of Popular Sports in Britain* (Cambridge: Polity Press, 1986), 4.

১১৫. J.A. Mangan, "Series Editor's Foreword," in *Sporting Nationalism: Identity, Ethnicity, Immigration, Assimilation*, ed. Mike Cronin and David Myall (London: Frank Cass, 1998).

১১৬. Alter J., *The Wrestler's Body: Identity and Ideology in North India* (Berkeley: University of California Press, 1992), 5.

১১৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, *খেলা যখন ইতিহাস*, ২।

১১৮. Dipesh Chakrabarty, "Introduction: The fall and rise of Indian sports history," *The International Journal of the History of Sport* 21, 3-4 (2004): 337-343.

১১৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, *খেলা যখন ইতিহাস*, ৪৫-৪৯।

১২০. তদেব, ৮৭-৮৯।

১২১. তদেব, ১১৪-১১৭।

১২২. বোরিয়া মজুমদার, *শতশিল্পে আলোকিত ভারতের ক্রীড়া ইতিহাস* (কলকাতা: দীপ প্রকাশন, ২০১৮), ৮৪।

১২৩. তদেব, ৭।

১২৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, *খেলা যখন ইতিহাস*, ৩।

১২৫. Ramachandra Guha, "Cricket and Politics in Colonial India," 157.

তৃতীয় অধ্যায়:

ভারতে খেলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

খেলাধুলা মানব জীবনের ও সভ্যতার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। প্রতিটি সমাজ তথা সভ্যতার সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য গুলিকে সুচারুভাবে অবলম্বন করে বিকাশ লাভ করা খেলাধুলাগুলি সেই ধারক সমাজের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে দৃষ্টিগোচর করে তোলে। প্রতিটি আদিম সমাজ তার পারিপার্শ্বিকতার ভিত্তিতে প্রাথমিক পর্যায়ে অবসর বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে কিছু খেলাধুলার উদ্ভব ঘটায়, পরবর্তীতে যা ক্রম বিবর্তনের মাধ্যমে নিছক অবসর বিনোদনের পরিবর্তে ব্যক্তিগত দক্ষতা-নৈপুণ্যতা, সামাজিক আদান-প্রদান, গোষ্ঠী সমাজ তথা দেশের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিষ্ঠা, জাতীয়তাবাদ, সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ, কূটনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। প্রাচীনকাল থেকেই প্রতিটি আদিম সমাজে কিছু খেলাধুলার প্রচলন লক্ষ করা যায়, আর পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীনতম সভ্যতা হিসেবে ভারতবর্ষও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী নয়। ভারতীয় উপমহাদেশে সুপ্রাচীনকাল থেকেই নানা ক্রীড়া বা খেলাধুলার প্রচলন ছিল যার সঙ্গে সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে আরোও নিত্যনতুন ক্রীড়া বা খেলাধুলা। বাণিজ্যিক কারণে অথবা আক্রমণকারী হিসেবে ভারতে আগত বিদেশিদের সংস্পর্শে এসে বিদেশি বিভিন্ন ক্রীড়া ভারতীয় সমাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এবং ক্রমশ ভারতীয় সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। ক্রীড়া বিষয়ক যেকোনো আলোচনার পূর্বে ভারতে ক্রীড়া ইতিহাসের বিবর্তন সম্পর্কে এক সম্যক ধারণা থাকা আবশ্যক। এই অধ্যায়ে মূলত প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন খেলাধুলা বা ক্রীড়ার রূপরেখা প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য ভারতের মতো সুবিশাল মহাদেশের অঞ্চল ভেদে প্রচলিত ক্রীড়ার মধ্যে বিভিন্ন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তবে এক্ষেত্রে যে সমস্ত ক্রীড়া গুলির উপস্থিতি বৃহত্তর তথা সর্বভারতীয় স্তরে পরিলক্ষিত হয় এবং যেগুলি সমাজে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে ও সংগঠিত ভাবে আয়োজিত হয়ে আসছে সেগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে।

• ৩.২. প্রাচীন যুগ:

শিকার সম্ভবত ক্রীড়া গুলির মধ্যে দেশ-কাল নির্বিশেষে সবচেয়ে প্রাচীনতম। প্রাগৈতিহাসিক যুগে আদি মানবের দৈনন্দিন জীবন নির্বাহের ক্ষেত্রে খাদ্য সংগ্রহের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বন্য জীবজন্তু শিকার এক আবশ্যিক শর্ত হলেও সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শিকার সমাজে মূলত অভিজাত সামরিক প্রধান

ও শাসকদের ব্যক্তিগত পরাক্রম এবং দক্ষতা প্রদর্শনের এক বিনোদনমূলক ক্রীড়ার রূপ লাভ করে। সুপাচীন প্রস্তর যুগ থেকেই ভারতে আদিম মানবের অস্তিত্বের ও কর্মকাণ্ডের প্রমাণ পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্য মালভূমির উত্তর অংশে আধুনিক উত্তর প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত গুহা আবাসগুলিতে আদিম মানবের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেছে, যারা মাইক্রোলিথ (Microlith)[১] জাতীয় অস্ত্র ব্যবহার করত।[২] প্রাচীন প্রস্তর যুগে শিকারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল খাদ্য সংগ্রহ ও পশুপালিত জীবগুলিকে হিংস্র বন্য জন্তুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করা এবং এর পশ্চাতে কোনো ক্রীড়া মূলক উদ্দেশ্য ছিল না। শিকারের কাজে তীর-ধনুক, বর্শা ইত্যাদি ব্যবহৃত হতো।[৩] ভূপাল[৪] ও ভীমবেটকার[৫] গুহা আবাস গলিতে পশু শিকারের চিত্র পাওয়া যায়। কাশ্মীরেও নব্য প্রস্তর যুগের পশু শিকারের চিত্র অঙ্কিত থাকতে দেখা যায়।[৬] হরপ্পা সভ্যতার মানুষদের মধ্যে শিকার অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল এবং শিকারি কর্তৃক বিভিন্ন প্রজাতির হরিণ শিকারের নিদর্শন পাওয়া যায়।[৭] বৈদিক সভ্যতার স্রষ্টা হিসেবে পরিচিত আর্যদের মধ্যেও শিকার জনপ্রিয় ছিল। যেহেতু প্রাথমিক পর্যায়ে আর্যদের সমাজ ছিল পশুপালন ভিত্তিক তাই বন্য জন্তুদের হত্যা করা হতো হিংস্র বন্য জন্তুর আক্রমণের হাত থেকে নিজেদের গৃহপালিত পশুগুলিকে রক্ষা করতে, বন্য জন্তুর মাংস খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতে এবং অবসর বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে।[৮] অথর্ববেদেও আমরা শিকারের উল্লেখ পাই।[৯] রামায়ণ[১০] ও মহাভারতেও[১১] আমরা শিকারের একাধিক বর্ণনা পাই যা শিকারের জনপ্রিয়তার পরিচায়ক। মৌর্য শাসন পর্বে শাসক শ্রেণী ও উচ্চ অভিজাতদের কাছে অন্যতম ক্রীড়া ছিল শিকার। অশোকের লেখতে আমরা বিহার যাত্রার উল্লেখ পাই।[১২] মৌর্য যুগের ইতিহাস জানার অন্যতম উপাদান কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও শিকার কে সমর্থন করা হয়েছে এবং এর সুফলের কথা বর্ণিত হয়েছে।[১৩] এছাড়াও মেগাস্থিনিস ও স্ট্র্যাবো রাজা কর্তৃক শিকার যাত্রার একাধিক বর্ণনা প্রদান করেছেন।[১৪] সাঁচি[১৫] ও ভারহুতের[১৬] স্তূপে অলঙ্কৃত শিকারের দৃশ্য থেকে আমরা জানতে পারি যে, শুঙ্গ ও কুষাণ যুগেও শিকার ক্রীড়া হিসেবে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। গুপ্ত যুগে শিকারে জনপ্রিয়তার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে দণ্ডী শিকারের (মৃগয়া) উপযোগিতার কথা বলেছেন।[১৭] এই পর্বের অপর এক সাহিত্যিক কালিদাস তার “রঘুবংশম্”

নাটকে রাজা দশরথ কর্তৃক শিকারের বর্ণনা দিয়েছেন।[১৮] গুপ্ত শাসকদের জারি করা মুদ্রা গুলিও সেই সময় পর্বে শাসক শ্রেণীর মধ্যে শিকারের প্রতি প্রবল আকর্ষণের সাক্ষ্য প্রদান করে। সমুদ্রগুপ্ত ও চন্দ্রগুপ্তের বহু মুদ্রায় ব্যাঘ্র শিকারের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।[১৯] হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালেও শিকার শাসক শ্রেণীর কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় এক অবসর বিনোদনের মাধ্যম ছিল যার নিদর্শন সমকালীন একাধিক উপাদান থেকে আমরা পাই। হর্ষবর্ধনের সভাকবি বানভট্ট তার পৃষ্ঠপোষক শাসকের শিকারের প্রতি প্রবল আগ্রহ ও নৈপুণ্যতা তথা পারদর্শিতার কথা বর্ণনা করেছেন।[২০] বানভট্টের বিখ্যাত "কাদম্বরী" গ্রন্থে নায়ক যুবরাজের শিকারের প্রতি প্রবল আকর্ষণ বর্ণিত হয়েছে।[২১] ভারতে আগত চীনা পর্যটক হিউ-এন-সাং ভারতীয় শাসকদের কর্তৃক বন্য শুকর শিকারের বর্ণনা দিয়েছেন।[২২] শিকার শাসক শ্রেণীর কাছে একটি অবসর বিনোদনমূলক ক্রীড়া হলেও বনভূমিতে বসবাসকারী আদিম উপজাতি গুলির কাছে তা ছিল খাদ্য সংগ্রহ ও জীবিকা নির্বাহের এক পন্থা।[২৩] বিভিন্ন ধরনের বন্য জন্তু যথা- বিভিন্ন প্রজাতির হরিণ, বন্য শুকর, হিংস্র প্রাণী হিসাবে বাঘ, চিতা বাঘ ইত্যাদির শিকার করা হতো।

প্রাচীন ভারতের শিকারের পাশাপাশি অন্যান্য আরও বিভিন্ন ক্রীড়া প্রচলিত ছিল। তবে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকেরা তাদের সংকীর্ণ জাত্যাভিমানী ও ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিশ্লেষণ করে পশ্চিমের সুঠাম শরীরের অধিকারী শ্বেতাঙ্গ মানবের বিপরীতে প্রাচ্যের দুর্বল শারীরিক সক্ষমতার অধিকারী মানবের তত্ত্ব নির্মাণ করতে গিয়ে প্রাচীন ভারতে যথার্থ ক্রীড়ার প্রচলন ছিল না বলে মত দিয়েছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় আমরা পাই ঐতিহাসিক এ.এল. ব্যাসাম (A.L. Basham)- এর রচনায়। এ.এল. ব্যাসাম প্রাচীন ভারতে খেলার বিষয়ে বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, "A form of polo, introduced from Central Asia, became popular among warriors in the Middle ages, though it is little mentioned in literature, and a kind of hockey was also played. But, in general, ancient India did not put such stress on the athletics as did the Mediterranean world. Chariot racing is mention in the Rig Veda, and bullock racing was popular in the late medieval period. Boxing and wrestling are often referred

to, but were not generally the hobbies of the respectable young men, but the preserve of low caste pugilists, who performed for the amusement of an audience. The archery contests however, was a much-loved amusement of the warrior class, and vivid descriptions of such contests occur in the Epic."।[২৪] ব্যাসাম প্রাচীন ভারতের যথার্থ খেলার স্বল্পতা বিষয়ে যে মত প্রদান করেছেন, তার বিরোধিতা করে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর সূচনায় ভারতে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটলে, ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা প্রাচীনকাল থেকে ভারতে খেলার ও শরীর চর্চার সংস্কৃতির যে ধারা প্রবহমান তার নিদর্শন তুলে ধরতে সচেষ্ট হন। এই প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ দত্তারেও চিন্তামণি মজুমদার (Dattareya Chintamani Mujumder)- এর সম্পাদনায় মারাঠি ভাষায় দশ খন্ডে রচিত "এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইন্ডিয়ান ফিজিক্যাল কালচার" ("Encyclopedia of Indian Physical Culture") গ্রন্থে ভারতের খেলা ও শরীরচর্চার ইতিহাস তুলে ধরা হয়, যা ১৯৫০ সালে ইংরেজি ভাষায় মুদ্রিত হয়। পশ্চিম ভারতের বরদা নিবাসী মজুমদার ভারতীয়দের মধ্যে খেলার ও শরীরচর্চা প্রসারের জন্য সচেষ্ট হন এবং এই উদ্দেশ্যে ১৯১৫ সাল থেকে মারাঠি ভাষায় 'ব্যায়াম' (Vyayam) নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন।

ভারতীয় উপমহাদেশে এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত প্রাচীনতম নাগরিক সভ্যতা হিসেবে হরপ্পা সভ্যতার মানুষদের মধ্যে শিকারের পাশাপাশি মল্লযুদ্ধের মতো ক্রীড়াগুলিও প্রচলিত থাকার কথা জানা যায়।[২৫] আর্যদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে নতুন ধরনের ক্রীড়ারও আগমন ঘটে, আর্যদের মধ্যে মল্লযুদ্ধ, রথচলনা, তীরন্দাজি, তরবারি চালনা বা অসি খেলা ইত্যাদির প্রচলন ছিল বলে জানা যায়। তীরন্দাজি বৈদিক যুগে সামরিক ক্ষেত্রে যুদ্ধের অন্যতম প্রধান উপকরণ হওয়ার পাশাপাশি প্রতিযোগিতা মূলক ক্রীড়া হিসেবেও অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল।[২৬] অভিজাত শ্রেণীর কাছে ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শিতা বিশেষ মর্যাদাব্যঞ্জক ছিল।[২৭] রামায়ণ ও মহাভারতেও আমরা মূলত রাজা কর্তৃক একাধিক প্রতিযোগিতা আয়োজনের কথা জানতে পারি যেখানে তীরন্দাজিতে পারদর্শিরা তাদের নৈপুণ্য প্রদর্শন করতে পারতো। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বস্তুগত প্রাপ্তি মূলক পুরস্কার যথা- মূল্যবান দ্রব্য, বিবাহযোগ্য রাজকুমারী অথবা নিজ

গোষ্ঠীর মর্যাদা বৃদ্ধির মতো বস্তুগত প্রাপ্তি প্রতিযোগিতা গুলিতে জয় লাভের সঙ্গে যুক্ত ছিল।[২৮] প্রতিযোগিতা গুলির উক্ত বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ করতে পারি স্বয়ম্বর সভার আয়োজনের মধ্যে, যেখানে প্রতিযোগিতায় জয় লাভ করা প্রতিযোগী রাজকুমারীকে বিবাহের অধিকার লাভ করত প্রতিযোগিতায় জয়লাভের পুরস্কার স্বরূপ। রামায়ণে রামের[২৯] এবং মহাভারতে অর্জুন ও কর্ণের সহ একাধিক মহাকাব্যের নায়কের[৩০] তীরন্দাজির পারদর্শিতা বর্ণিত হয়েছে। বরাহ সংহিতায় তীরন্দাজির একাধিক প্রতিযোগিতার কথা বর্ণিত হয়েছে।[৩১]

আর্যদের আগমনের সঙ্গে রথদৌড়, ঘোড়দৌড়- এর মতো ক্রীড়া গুলিরও আগমন ঘটে ভারতে যা সমগ্র প্রাচীন যুগে প্রচলিত ছিল। পশ্চিমী ঐতিহাসিকেরা বৈদিক যুগে ভারতে ঘোড়সওয়ারি প্রচলিত ছিল কিনা সেই বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। ম্যাকডোনাল (Macdonell)- এর মতে রথচালনার কাজে ঘোড়ার ব্যবহার হলেও বৈদিক যুগে ঘোড়সওয়ারের প্রচলন ছিল না, এমনকি যুদ্ধেও ঘোড়সওয়ার ব্যবহার হতো না বলে তিনি মত দিয়েছেন।[৩২] ঐতিহাসিক কিথ (Keith)-ও একই কথার প্রতিধ্বনি করে লিখেছেন, “Though hors-riding was probably not unknown for other purpose, no mention is made of this use of the horse in the war.”।[৩৩] যদিও ঋকবেদে আমরা ঘোড়সওয়ারের একাধিক উদাহরণ পাই।[৩৪] বৈদিক যুগে প্রতিটি গ্রামে ঘোড়দৌড়ের জন্য নির্দিষ্ট ক্ষেত্র চিহ্নিত করা থাকতো, যেখানে ঘোড়দৌড়ের জন্য ঘোড়াগুলিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হতো এবং বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে ঘোড়দৌড়ের আয়োজন করা হতো, যার বিজেতাদের পুরস্কার প্রদান করা হতো।[৩৫] ঋকবেদে ঘোড়দৌড়ে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের ঘোড়ার নামের তালিকা প্রদান করা হয়েছে।[৩৬] ঋকবেদ ও অথর্ববেদ- এর একাধিক শ্লোকে ঘোড়দৌড়ে বিজয়ের জন্য প্রার্থনা উচ্চারিত হয়েছে। মৌর্য যুগে ঘোড়দৌড়ের জন্য অশ্বকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো, এক্ষেত্রে ঘোড়াকে সোজা রাস্তায় নির্দিষ্ট দূরত্বে সর্বোচ্চ গতিবেগে দৌড়ানোর পাশাপাশি বৃত্তাকার পথে দৌড়ানোর ও লাফানোর প্রশিক্ষণও প্রদান করা হতো।[৩৭] এর ফলে বলা যায় মৌর্য যুগেও ঘোড়সওয়ারি ও ঘোড়দৌড় ছিল প্রচলিত এক উল্লেখযোগ্য ক্রীড়া।[৩৮]

আর্যদের মাধ্যমে ভারতে আগত অপর এক ক্রীড়া হলো রথদৌড়, যা সমগ্র প্রাচীন যুগ জুড়ে প্রচলিত ছিল।[৩৯] রথদৌড়ের গুরুত্বের কথা জানা যায় বাজপেয় সহ একাধিক যজ্ঞের অংশ হিসেবে এর অন্তর্ভুক্তির মধ্যে দিয়ে। রাজকীয় কর্তৃত্বের প্রতীক এই যজ্ঞানুষ্ঠানের অন্যতম অংশ ছিল রথদৌড়ের আয়োজন, যদিও উক্ত রথদৌড়ে বাজপেয় যজ্ঞের আয়োজক রাজার বিজয় লাভ পূর্ব নির্ধারিত থাকতো।[৪০] এছাড়াও রাজসূয় যজ্ঞের অন্যতম অঙ্গ ছিল রথদৌড় এবং এখানেও যজ্ঞের আয়োজক রাজার বিজয় লাভ ছিল পূর্ব নির্ধারিত। মহাভারতেও রথ দৌড়ের কথা বর্ণিত হয়েছে।[৪১] মৌর্য যুগেও রথদৌড় জনপ্রিয় ছিল এবং চারটি সাদা ঘোড়া দ্বারা চালিত রথের কথা বর্ণিত হয়েছে।[৪২] পরবর্তী প্রাচীন ভারতেও রথ দৌড় অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল, যার উল্লেখ করেছেন হর্ষবর্ধনের সভাকবি বানভট্ট তার "কাদম্বরী" গ্রন্থে। এই গ্রন্থের নায়কের অন্যতম গুণাবলীর মধ্যে রথদৌড়ে পারদর্শিকতার কথা বর্ণিত হয়েছে, যা রথ দৌড়ের সমাজে গুরুত্বের পরিচায়ক।[৪৩]

ঋকবেদে মুষ্টি যুদ্ধের কথা উল্লিখিত হয়েছে এবং মুষ্টিযুদ্ধে পারদর্শী ব্যক্তি সমাজে যে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হতো তার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, "With the constant practice of the skills in the boxing and by defeating their opponent this champions won the honour and respect of the people. People use to adore them."।[৪৪] একইভাবে পরবর্তী বৈদিক যুগে মুষ্টিযুদ্ধের জনপ্রিয়তার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, "Since these fighters were the ideals before them, naturally the people wished for the brave son, with the grace of these fighters, who would be a good boxer having strong arms and bearer of good horses."।[৪৫] ষ্ট্র্যাবো (Strabo) ভারতে প্রচলিত রীতিনীতি বিষয়ে বর্ণনা দিতে গিয়ে জানিয়েছেন যে, ভারতে মুষ্ঠিযুদ্ধে জয়লাভ করা বিজয়ীদের কুমারী কন্যা পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করা হতো বিবাহের জন্য।[৪৬] এরিয়্যান (Arrian) লিখেছেন যে ভারতে বিবাহযোগ্য কন্যাদের তাদের পিতা প্রকাশ্যে ক্রীড়া

প্রতিযোগিতায় আনতেন এবং মুষ্টিযুদ্ধে জয়লাভ করা বিজয়ী তাদের কন্যাদের বিবাহের জন্য বেছে নিতেন।[৪৭]

প্রাচীন যুগে ভারতে প্রচলিত অন্যতম এক জনপ্রিয় ক্রীড়া হলো মল্লযুদ্ধ যার ঐতিহ্য এখনও বর্তমান। পাণিনি তার "অষ্টাধ্যায়ী" গ্রন্থে স্পষ্টতই মল্লযুদ্ধের কথা উল্লেখ করেছেন।[৪৮] রামায়ণে মল্লযোদ্ধা ও তাদের কৌশল এর কথা বর্ণিত হয়েছে।[৪৯] মহাভারতে বিশেষ ধরনের প্রতিযোগিতার কথা বলা হয়েছে যেখানে মল্লযুদ্ধের আয়োজন করা হতো।[৫০] এছাড়াও মহাভারতে বৈরাট নগরীতে এক বিশাল মল্লযুদ্ধের প্রতিযোগিতা আয়োজিত হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে, যেখানে বহু দূর দূরান্ত থেকে মল্ল যোদ্ধাদের সমাগম হতো নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে।[৫১] মল্লযুদ্ধে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের কৌশলের নামের তালিকা প্রমাণ করে এর প্রতি আগ্রহ।[৫২] মৌর্য যুগে 'সমাজ' (Samaja) নামক এক উৎসবের কথা জানা যায় যেখানে মল্লযুদ্ধের ন্যায় বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হতো।[৫৩] এরিয়্যান (Arrian) জানিয়েছেন যে পিতা দ্বারা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় আনিত বিবাহযোগ্যা কন্যাদের মধ্যে থেকে মল্লযুদ্ধে জয়লাভ করা বিজয়ী নিজেদের বিবাহ সঙ্গীকে বেছে নিতেন।[৫৪] শুঙ্গ- কুষাণ যুগেও মল্লক্রীড়া সমান জনপ্রিয় ছিল। শুঙ্গ-কুষাণ যুগে নির্মিত ভারহুতের স্তূপে[৫৫] ও কৌশম্বী থেকে প্রাপ্ত মাটির ফলকে মল্লযুদ্ধের চিত্র চিত্রায়িত হয়েছে।[৫৬] পতঞ্জলিও তার সময় জনগণের মধ্যে বিনোদনমূলক ক্রীড়া হিসেবে মল্লযুদ্ধের জনপ্রিয়তার কথা বলেছেন।[৫৭] গুপ্ত যুগের সমসাময়িক বরাহমিহির তার "বৃহৎসংহিতা" গ্রন্থে মল্লযুদ্ধের বর্ণনা দিয়েছেন।[৫৮] গুপ্ত যুগের সমসাময়িক অপর এক সাহিত্যিক বাৎসায়ন তার "কামসূত্র"- গ্রন্থে মল্লযুদ্ধের বর্ণনা দিয়েছেন, যদিও তিনি জানিয়েছেন যে শহরের বিত্তবান ক্রেতাদূরস্ত নাগরিক শ্রেণী যাদেরকে তিনি 'নগরক' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তারা ছিল মূলত এই মল্লযুদ্ধের দর্শক, অংশগ্রহণকারী বা অনুশীলনকারী নয়।[৫৯] পৌরাণিক যুগে মল্লযুদ্ধের জনপ্রিয়তার বর্ণনা দিতে গিয়ে ডি.সি. মজুমদার বলেছেন, "Wrestling seemed to form the prominent exercise in Pauranic age. The

people of all castes practiced it... We read of some description of wrestling bouts, arenas and of seating arrangements for spectators in various Puranas. The idea of the present stadium has its origin in this arrangements."।[৬০] প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন ভারতে মল্লযুদ্ধের আয়োজনের একাধিক নিদর্শন পাওয়া যায়, যেখানে এমনকি রাজাও দর্শক হিসেবে উপস্থিত থাকতেন এবং রাজার অধিষ্ঠানের জন্য আসন নির্মাণের বিশেষ পদ্ধতির কথাও বর্ণিত হয়েছে একাধিক উপাদানে। চালুক্য বংশীয় রাজা সোমেশ্বর কর্তৃক রচিত "মানসোল্লাশা" গ্রন্থ থেকে আমরা সেই সময়েও যে মল্লযুদ্ধ সমান জনপ্রিয় ছিল তার নিদর্শন লক্ষ করতে পারি। উক্ত গ্রন্থে "মল্লবিনোদ" শিরোনামে এক অধ্যায়ে সেই সময়ের মল্লক্রীড়ার প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এমনকি সেখানে দক্ষতা অনুসারে মল্ল ক্রীড়াবিদদের তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। সর্বোচ্চ দক্ষতার অধিকারী মল্লযোদ্ধাদের 'জেষটিকা' (Jyeshthika), মধ্যম দক্ষতার অধিকারীদের 'অন্তর জেষটিকা' (Antar-Jyesthika), এবং এর নিম্নস্ত দক্ষতার অধিকারীদের বলা হয়েছে 'গোভালা' (Govala)। জীবনের বিভিন্ন সময় পর্বে মল্লযোদ্ধাদের বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হতো, যারও তালিকা প্রদান করা হয়েছে উক্ত গ্রন্থে। একজন মল্লযোদ্ধার বয়স যখন কুড়ি বছর তখন তাকে বলা হতো 'ভাবিসনু' (Bhavishnu) এবং তার বয়স যখন তিরিশ তখন তাকে বলা হতো 'পরধা' (Paroodha), এই সময় পর্বে তিনি সর্বোচ্চ দক্ষতার অধিকারী বলে মনে করা হতো। 'মল্লবিনোদ' অধ্যায়ে মল্ল ক্রীড়ার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং মল্ল যোদ্ধাদের দৈনন্দিন প্রশিক্ষণ তথা জীবন যাপনের বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে। প্রায়শ মল্ল ক্রীড়ার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হতো, যেখানে একাধিক সাধারণ দর্শকের পাশাপাশি রাজা ও তার সভাসদদের উপস্থিতির কথাও জানা যায়।[৬১] মল্ল যোদ্ধারা রাজা কর্তৃক পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করত এবং তাদের জন্য বিশেষ ধরনের খাদ্যের ব্যবস্থা করা হতো যার অন্তর্ভুক্ত ছিল প্রাণিজ মাংস ও দুগ্ধ নির্মিত বিভিন্ন মিষ্টান্ন।[৬২]

সমগ্র প্রাচীন যুগে নানা ধরনের ক্রীড়া বা খেলাধুলা প্রচলিত ছিল। বৈদিক যুগে 'সমন' (Samana) নামক এক উৎসবের কথা জানা যায়। অনেক ঐতিহাসিকদের মতে এটি ছিল ক্রীড়া উৎসব

যেখানে তীরন্দাজি, ঘোড়দৌড়, রথদৌড় ইত্যাদি ক্রীড়াগুলির প্রতিযোগিতা আয়োজিত হতো এবং প্রতিযোগিরা পুরস্কার লাভের আশায় তাতে অংশগ্রহণ করতো, যদি অনেক ঐতিহাসিক এই ব্যাখ্যা মেনে নিতে নারাজ।[৬৩] জাতক রচিত হওয়ার যুগে আমরা ক্রীড়া ক্ষেত্র হিসেবে 'মণ্ডপম' (Mandapam) এর উল্লেখ পাই, যেখানে দর্শকেরা সমবেত হতো মল্লযুদ্ধ দর্শনের উদ্দেশ্যে।[৬৪] প্রাচীন ভারতে প্রচলিত খেলাধুলা বা ক্রীড়া গুলির অধিকাংশ শুধুমাত্র আনন্দের মাধ্যম হিসেবে নয় যুদ্ধের মহড়া হিসেবেও গ্রহণ করা হয়েছিল ফলে মূলত সামরিক পেশার সঙ্গে যুক্ত শাসক গোষ্ঠী বিশেষত ক্ষত্রিয় বর্ণের মানুষেরা ও কিছু সংখ্যক সর্বোচ্চ বর্ণভুক্ত ব্রাহ্মণরা প্রধানত ক্রীড়া চর্চার সঙ্গে যুক্ত ছিল। জাতি বিভক্ত ভারতীয় সমাজে সামরিক প্রশিক্ষণ মূলত ক্ষত্রিয় বর্ণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল যার দৃষ্টান্ত মহাভারতে লক্ষ করা যায়। সামরিক প্রশিক্ষণ রাজকীয় পরিবারে রাজকুমারদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল যার নিদর্শন পাওয়া যায় কৌরব ও পান্ডবদের সামরিক প্রশিক্ষণে, যদিও তাদের প্রশিক্ষক ছিলেন ব্রাহ্মণ বর্ণভুক্ত। ঐতিহাসিক বিল (Beal) তার "The Romantic Legend of Sakya Buddha" গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে গৌতম বুদ্ধের সময়ও সামরিক ও শারীরিক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দান করা হতো এবং বুদ্ধ নিজে তার জীবনের প্রথম পর্বে সন্ন্যাস গ্রহণ করে গৃহত্যাগের পূর্বে, সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।[৬৫] নিম্ন বর্ণের মানুষদের সামরিক প্রশিক্ষণ ও সামরিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ সমাজে ভালো চোখে দেখা হতো না, যার নিদর্শন লক্ষ করা যায় মহাভারতে বর্ণিত কর্ণের ও একলব্যের কাহিনীর মাধ্যমে। নিম্ন বর্ণ ভুক্ত হওয়ার কারণে কর্ণের সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ সমাজ ভালোভাবে নেয়নি, এমনকি জীবনের প্রথম পর্বে ব্রাহ্মণ বর্ণভুক্ত সামরিক প্রশিক্ষক তার শুধুমাত্র বর্ণপরিচয়ের কারণে তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার থেকে বিরত থেকেছে। যদিও শেষ পর্যন্ত কর্ণ ধনুর্বিদ্যা সহ সামরিক বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেছে, যা সামাজিক কাঠামোর সচলতা তথা জাতি ব্যবস্থার নমনীয়তার নিদর্শন প্রদর্শন করলেও, এই ধরনের দৃষ্টান্ত একান্ত বিরল এবং এগুলি ব্যতিক্রমী হিসেবে গণ্য হতে পারে। অপরদিকে উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্ত একলব্য ধনুর্বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করা সত্ত্বেও, ব্রাহ্মণ গুরু দ্রোণাচার্যকে গুরুদক্ষিণা বাবদ নিজের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ট প্রদান করতে বাধ্য হয়, যা উপজাতি সমাজের ওপর বর্ণভিত্তিক ব্রাহ্মণ্য সমাজের আধিপত্যকে তুলে ধরে। তীরন্দাজি ও

রথদৌড়-এর মতো খেলা গুলি উচ্চ শ্রেণি ভুক্ত সামরিক শাসকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও, মুষ্টিযুদ্ধ ও মল্লযুদ্ধ-এর মতো ক্রীড়া গুলি প্রধানত নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত ছিল। সামরিক প্রশিক্ষণের বাইরে উচ্চ শ্রেণীর মনোরঞ্জনের জন্য পেশাদারী খেলোয়াড়দের উদ্ভব হতে থাকে, যারা শাসকশ্রেণীর মনোরঞ্জনের জন্য নিজেদের ক্রীড়া দক্ষতার প্রদর্শন করত এবং বিনিময়ে তারা শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা ও পুরস্কার লাভ করত।[৬৬] সুতরাং বর্ণ বিভক্ত ভারতীয় সমাজের প্রতিফলনও লক্ষ করা যায় ক্রীড়া ক্ষেত্রে, যার ফলে প্রাচীন ভারতের ক্রীড়া ইতিহাস চর্চা সামগ্রিক সমাজ বাস্তবতা উপলব্ধির সহায়ক হতে পারে। এছাড়াও সামরিক প্রতিযোগিতা গুলিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে পুরুষদের একাধিপত্ব লক্ষ করা যায়, ক্রীড়া ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণের বিশেষ দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায় না।

- **৩.৩. মধ্যযুগ:**

মধ্যযুগে তুর্কো-আফগানদের ভারতে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রীড়া ক্ষেত্রেও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীন যুগ থেকে প্রচলিত শিকার, তরবারির যুদ্ধ, তীরন্দাজির মতো ক্রীড়াগুলি প্রচলিত থাকলেও এর পাশাপাশি পোলো বা চৌঘান- এর মতো নতুন ক্রীড়ারও প্রচলন ঘটে। মুঘল বাদশাহ ও অভিজাতদের মধ্যেও শিকার অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল, পূর্ববর্তী প্রাচীন ভারতীয় শাসকদের মতোই। বাদশাহ ও তার সভাসদদের জন্য বৃহৎ আকারে শিকারের আয়োজন করা হতো। বাদশাহ ও তার সভাসদদের বনাঞ্চলে প্রবেশের পূর্বে পেশাদার শিকারিরা বন্য জন্তুদের বনাঞ্চলের নির্দিষ্ট বৃত্তাকার ক্ষেত্রে আবদ্ধ করত এবং তারপরেই বাদশাহ ও তার সভাসদরা বনাঞ্চলে প্রবেশ করতো শিকারের জন্য। শিকারের ক্ষেত্রে এই ধরনের কৃত্রিম পরিবেশ রচনা সত্ত্বেও, মুঘল যুগের অন্যতম বিবরণীকার ও আকবরের সভাসদ আবুল ফজল জানিয়েছেন যে এই ধরনের শিকারের কিছু নিজস্ব উপযোগিতা রয়েছে, যার অন্যতম হলো শিকারের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জনগণের অবস্থা সম্পর্কে বাদশাহ অবহিত হতে পারতেন।[৬৭] এই ধরনের কৃত্রিম পরিবেশ নির্মাণ সত্ত্বেও শিকার যে যথেষ্ট ঝুঁকির ছিল তার নমুনা লাভ করা যায় ১৬১১ সালের একটি শিকারের ঘটনা থেকে, যেখানে শিকার চলাকালীন বাদশাহ জাহাঙ্গীরের জীবন রক্ষা করেছিলেন বন্য

বাঘের আক্রমণের হাত থেকে যুবরাজ শাহজাহান ও অভিজাত অনুপ রায়।[৬৮] জাহাঙ্গীর তার সভাসদ ছাড়াও রাজ পরিবারের মহিলাদেরও শিকারের সময় সঙ্গে নিতেন।[৬৯]

আবুল ফজল "আইন-ই-আকবরী" গ্রন্থে মুঘল দরবারে প্রচলিত একাধিক ক্রীড়ার বর্ণনা দিয়েছেন। একদিকে যেমন এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বিভিন্ন গৃহ মধ্যস্থ ক্রীড়া (Indoor Game) যথা- দাবা, কার্ড খেলা, চৌপার বা এক ধরনের লুডো, তেমনি অন্যদিকে এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বিভিন্ন বহিরঙ্গনের ক্রীড়া (Outdoor Game) যথা- শিকার, চৌঘান বা পোলো, ইশক বাজি বা পায়রা ওড়ানো।[৭০]

মধ্যযুগে তুর্কো-আফগানদের দ্বারা ভারতে প্রচলিত ক্রীড়া গুলির মধ্যে অন্যতম ও প্রধান হলো পোলো। মূলত মধ্য এশিয়ায় প্রচলিত এই ক্রীড়া মুসলিম আক্রমণকারীদের মাধ্যমে ভারতে প্রবেশ করে। ভারতের প্রথম মুসলিম শাসক কুতুবুদ্দিন আইবক (১২০৬-১২১০) পোলো খেলার সময় নিজের ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে ঘোড়ার পদে পিষ্ট হয়ে জীবন হারিয়েছিলেন। মুঘল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে এই খেলা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে, যার বর্ণনা দিয়েছেন তার সভাসদ আবুল ফজল। আবুল ফজল এই খেলার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন যা প্রধানত দশ জন খেলোয়াড়দের মধ্যে অনুষ্ঠিত হতো।[৭১] আবুল ফজল আকবরের পোলো খেলার প্রশংসা করে তাকে অদ্বিতীয় বলে বর্ণনা করেছেন।[৭২] তিনি আরও জানিয়েছেন যে সম্রাট আকবর এই খেলার প্রতি এতটাই অনুরক্ত ছিলেন যে, সম্রাট এমনকি রাতেও এই খেলার ব্যবস্থা করতেন এক্ষেত্রে রাতের অন্ধকারে যাতে খেলাটি অনুষ্ঠিত হতে পারে তার জন্য পোলো খেলার বলটি কাঠ দ্বারা নির্মিত হতো, যাতে আগুন জ্বালিয়ে বলটিকে দৃশ্যমান করা যায় এবং এর মাধ্যমে রাতেও পোলো খেলা অনুষ্ঠিত হতে পারতো।[৭৩] লক্ষনীয় যে তুর্কো-আফগান যুগে ভারতে পোলো খেলা প্রচলিত হলেও তা ছিল মূলত মুসলিম অভিজাত তথা শাসক শ্রেণী এর মধ্যে প্রচলিত এক ক্রীড়া, সাধারণ ভারতবাসীর মধ্যে এই খেলা জনপ্রিয় হয়নি। এই অভিজাতদের প্রাধান্যের অন্যতম কারণ হলো এই ক্রীড়ার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ভাল জাতের ঘোড়ার মূল্য ও রক্ষণাবেক্ষণ ছিল অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ, যা সাধারণ মানুষ এমনকি নিম্ন শ্রেণীর অভিজাতদের কাছেও ব্যয়বহুল ছিল। এছাড়াও এই ক্রীড়ার জন্য ঘোড়সওয়ারের

বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন ছিল, যা সামরিক পেশার বাইরে সাধারণ নাগরিকদের কাছে পরিশ্রম সাপেক্ষ ও সময় সাপেক্ষ ছিল। তাই পোলো ক্রীড়া তার সূচনা লগ্ন থেকেই অভিজাত শ্রেণীর কাছে আভিজাত্যের প্রতীক স্বরূপ ছিল।

প্রাচীন কাল থেকে ভারতে প্রচলিত অপর এক ক্রীড়া মল্লযুদ্ধ, মধ্যযুগেও সমান জনপ্রিয় ছিল যার একাধিক নিদর্শন লক্ষ করা যায়। চতুর্দশ শতকে দক্ষিণ ভারতে গড়ে ওঠা বিজয়নগর রাজ্যে মল্লযুদ্ধ বিশেষ জনপ্রিয় ছিল, বিশেষত বিজয় নগরের তুলুভ বংশীয় শাসক কৃষ্ণদেব রায় (১৫০৯-১৫২৯) উন্নত শারীরিক সক্ষমতার অধিকারী হওয়ার পাশাপাশি, মল্লযুদ্ধের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং স্বয়ং মল্লযুদ্ধে পারদর্শী ছিলেন।[৭৪] বিজয়নগর রাজ্যে আগত একাধিক বৈদেশিক পর্যটক তাদের ভ্রমণ বিবরণীতে বিজয়নগর রাজ্যে প্রচলিত মল্লযুদ্ধের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। বিজয়নগরে আগত পর্তুগিজ পর্যটক ফরনাও নুনিজ (Fernao Nuniz), ডোমিনগো পায়েজ (Domingo Paes) সেই সময় বিজয়নগরে প্রচলিত মল্লক্রীড়ার বর্ণনা তুলে ধরেছেন। পায়েজ যিনি কৃষ্ণদেব রায়ের রাজত্বকালে বিজয়নগর রাজ্যে এসেছিলেন তিনি মল্লযুদ্ধে হিংসাত্মক আক্রমণ যথা- দাঁত ও চোখ উপড়ে নেওয়ার মতো ঘটনাও সংঘটিত হতো বলে বর্ণনা দিয়েছেন।[৭৫] নুনিজ যিনি অচ্যুতদেব রাই- এর রাজত্বে বিজয়নগর রাজ্যে এসেছিলেন, তিনি বিজয়নগর রাজ্যে বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে মল্লক্রীড়ার আয়োজন করা হতো বলে বর্ণনা দিয়েছেন।[৭৬] ভারতে ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রথম মুঘল সম্রাট বাবর (১৫২৬-১৫৩০), ১৫২৮ সালে উৎসব উদযাপনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে মল্লক্রীড়া প্রদর্শনের উল্লেখ করেছেন তার আত্মজীবনীতে।[৭৭] অপর এক মুঘল সম্রাট আকবর মল্লক্রীড়ার প্রতি বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। আবুল ফজল জানিয়েছেন যে আকবরের শাসনকালে প্রতিদিন মল্লক্রীড়ার আয়োজন করা হতো এবং প্রতিযোগিদের দৈনিক পারিশ্রমিক প্রদান করা হতো, এছাড়াও প্রতিযোগিতার শেষে বিজয়ীদের বিশেষ মূল্যবান পুরস্কার প্রদান করা হতো। আবুল ফজল সেই সময়কার প্রখ্যাত মল্ল খেলোয়াড়দের উল্লেখ করেছেন যাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন মধ্য-এশিয়ার মানুষ। এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন- মোহাম্মদ কুলি, জিনি 'শের হামলা' বা সিংহ আক্রমণকারী উপাধি লাভ করেছিলেন। মল্লক্রীড়াই পারদর্শিতা

প্রদর্শনের ক্ষেত্রে ধর্ম বা সম্প্রদায় যে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করত না তার একাধিক নজির লক্ষ করা যায়। এই সময়ের একাধিক হিন্দু মল্লক্রীড়া পারদর্শীদের কথা জানা যায়, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- শ্রীরাম, কানহা, গণেশ এবং বলভদ্র। হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে বহু মল্লযোদ্ধা সম্রাট আকবরের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন।[৭৮]

মধ্যযুগের মল্লক্রীড়া বিষয়ক একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল "মল্লপুরাণ"। এই গ্রন্থটি সম্ভবত পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত এবং এর রচনাকার হলেন 'জষ্টিমল্ল' নামক পেশাদার মল্ল যোদ্ধাদের এক সম্প্রদায়। এই জষ্টিমল্ল সম্প্রদায় আদতে গুজরাটের মধিরা শহরের, মধা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত এক উপজাতি সম্প্রদায়, যদিও তারা পরবর্তীতে রাজস্থান, মহারাষ্ট্র ও দক্ষিণ ভারতে অভিবাসন করেন। উক্ত গ্রন্থ শুধুমাত্র মল্লক্রীড়া সংক্রান্ত বিষয়কে কেন্দ্র করে ভারতের রচিত প্রথম মৌলিক গ্রন্থ, যেখানে মল্লযোদ্ধাদের শ্রেণীবিভাগের পাশাপাশি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে তাদের প্রশিক্ষণের পদ্ধতি, খাদ্য তালিকা, মল্লক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের নিয়মাবলী ইত্যাদি লিপিবদ্ধ হয়েছে।[৭৯] বর্ণভিত্তিক ভারতীয় সমাজের চিত্রও ফুটে ওঠে 'মল্লপুরাণ'- য়ে যেখানে মল্লক্রীড়া যেহেতু প্রথাগত বর্ণভিত্তিক ভারতীয় সমাজে ব্রাহ্মণদের জন্য ঐতিহ্যগতভাবে নির্দিষ্ট কর্মের অন্তর্ভুক্ত নয়, তাই এই ক্রীড়া ব্রাহ্মণদের গ্রহণের পশ্চাতে হিন্দু ধর্মের অন্যতম দেবতা কৃষ্ণের সঙ্গে সংযুক্ত করে এক কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে এবং নিজেদের ধর্ম রক্ষার জন্য ব্রাহ্মণদের মল্লক্রীড়া প্রশিক্ষণ ও পেশা হিসেবে গ্রহণ আইনসম্মত বলে মত দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে মল্লক্রীড়া যেহেতু হাতের মাধ্যমে যুদ্ধ তাই তা ক্ষত্রিয়দের অস্ত্রের মাধ্যমে যুদ্ধের থেকে পৃথক বলে চিহ্নিত করা হয়েছে মল্লপুরাণে।[৮০] মল্লক্রীড়া অনেক ক্ষেত্রেই হিংস্র আকার ধারণ করত যার উল্লেখ পাওয়া যায়। এইরকম মল্লক্রীড়ার প্রকারভেদ 'অসুর' ও 'বজ্রমুষ্টি' নামে পরিচিত ছিল। 'অসুর' প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগিরা একে অপরকে হিংসা ভাবে আক্রমণ করে কামড়ানো, নখ দিয়ে আছরে দেওয়া, চুল ধরে টানা, দাঁত ও আঙুল ভেঙে দেওয়ার মতো কার্য সম্পাদন করতে পারত, তবে এক্ষেত্রে কোনো বাহ্যিক অস্ত্র ব্যবহার করা যেত না। অপরদিকে 'বজ্রমুষ্টি' প্রতিযোগিতায় মল্লযোদ্ধারা পরস্পরকে আঘাত করার জন্য 'মুষ্টিকাম', 'মুষ্টিম' বা 'মুঠিয়া' নামক তীক্ষ্ণ শীর্ষ দেশ বা ফলা বিশিষ্ট বিশেষ ধরনের

আংটি ব্যবহার করতে পারত। মহীশূর রাজ্যে এই ধরনের হিংস্র মল্লযুদ্ধ বিশেষ প্রচলিত ও জনপ্রিয় ছিল।[৮১] এই ক্রীড়ার সঙ্গে যুক্ত ছিল ধর্মীয় প্রথা ও সংস্কার, যা সেই সময় ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে জানতেও সাহায্য করে। এই সময় পর্বে মল্লযোদ্ধরা ক্রীড়া ক্ষেত্রে যাওয়ার আগে দেবতা হিসেবে গোবিন্দের কাছে প্রার্থনা জানাতেন। মুঘল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে লাখাজী নামক এক যোদ্ধার কথা জানতে পারি যিনি আকবরের মল্লযোদ্ধাকে পরাজিত করেছিলেন।[৮২]

• ৩.৪. আধুনিক যুগ:

ভারতে ইংরেজদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে ব্রিটিশ তথা পাশ্চাত্য ক্রীড়ার প্রচলন ঘটে। এদেশে আগত ব্রিটিশ তথা ইউরোপীয়রা তাদের মনোরঞ্জন ও অবসর যাপনের জন্য তাদের দেশে প্রচলিত ক্রীড়া গুলিকে এদেশে প্রচলন করেছিলেন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে গঠিত ইউরোপীয় ক্লাবগুলি মূলত ক্রীড়া কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। যদিও প্রাথমিক পর্যায়ে ক্লাব গুলি ছিল ইউরোপীয়দের নিজেদের মধ্যে মেলামেশার ও সুরা পান করার এক অবসর বিনোদনের ক্ষেত্র। ঔপনিবেশিকতাবাদের তীব্র সমালোচক জর্জ ওরওয়েল (George Orwell) ভারতে গড়ে ওঠা ইউরোপীয় ক্লাবগুলি সম্পর্কে বলেছেন, "The spiritual citadel, the real seat of the British power."।[৮৩] ক্লাবগুলিতে ক্রিকেট, রাগবি, গলফ ইত্যাদি খেলার ব্যবস্থা ছিল। ১৮০০ সালে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা কে কেন্দ্র করে বোম্বে ট্রার্ফ ক্লাব (Bombay Turf Club), ১৮৪৬ সালে মাদ্রাস ক্রিকেট ক্লাব (Madras Cricket Club), ১৮৭৫ সালে ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাব (Calcutta Rowing Club), ১৮৬৮ সালে ব্যাঙ্গালোর ক্লাব (Bangalore Club), ১৮৭৫ সালে বোম্বে জিমখানা (Bombay Gymkhana) গড়ে ওঠে। বোম্বে জিমখানা গড়ে ওঠার পশ্চাতে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ক্রিকেট, ফুটবল, পোলো ইত্যাদির মতো খেলা গুলিকে একটি ক্লাবের ছত্র তলে নিয়ে আসা, যার সঙ্গে পরবর্তীতে যুক্ত হয়েছিল টেনিস, হকি, ব্যাডমিন্টনের মতো খেলা গুলি।[৮৪] এই সমস্ত ক্লাবগুলি শ্বেতাঙ্গদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। এমনকি ব্রিটিশদের মধ্যেও ছিল বিত্তিগত স্তর বিভাজন, যার সর্বোচ্চ স্তরে অবস্থান করতেন ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস (Indian Civil Service) অফিসারেরা এবং

সর্বনিম্ন স্তরে অধিষ্ঠিত ছিল সাধারণ সৈনিক ও ইউরেশিয়ানরা। অনেক ক্ষেত্রে পেশার ভিত্তিতে ক্লাবগুলি নির্দিষ্ট পেশাজীবী মানুষদের জন্য সংরক্ষিত বা নির্দিষ্ট থাকত যেমন- ইউনাইটেড সার্ভিস ক্লাব (United Service Club) শুধুমাত্র সৈনিক পেশাজীবীদের জন্য সংরক্ষিত ছিল।[৮৫] বিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকে বিভিন্ন ক্লাব ব্রিটিশ তথা ইউরোপীয়দের পাশাপাশি ভারতীয়দের জন্যও তাদের সদস্যপদ উন্মুক্ত করে দিতে থাকে। ব্রিটিশ ও ভারতীয় উভয় সদস্য নিয়ে গঠিত হয়- ক্যালকাটা ক্লাব (Calcutta Club, 1908) ও ওয়েলিংডন ক্লাব (Wellingdon club, 1918)।[৮৬] গোটা ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে কিছু স্কুল ও মিশনারী প্রতিষ্ঠানকে ব্যতিক্রমী হিসেবে বাদ দিলে ব্রিটিশরা তাদের খেলাধুলা বা ক্রীড়া গুলিকে ভারতীয়দের মধ্যে প্রসারের বিষয়ে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। তা সত্ত্বেও সাধারণ ভারতীয়রা পাশ্চাত্য খেলা গুলির প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং খেলা গুলিকে সংগঠিত করতে ক্লাব গড়ে তুলতে থাকে। ভারতীয়দের মধ্যে পার্সিরা সম্ভবত প্রথম পাশ্চাত্য ক্রীড়া, বিশেষত ক্রিকেটের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং খেলাগুলিকে বৃহত্তর ভাবে সংগঠিত করেন ও ক্লাব গড়ে তোলেন। ১৮৪৮ সালে পার্সিরা গড়ে তোলেন ওরিয়েন্টাল ক্রিকেট ক্লাব (Oriental Cricket Club), ও ১৮৫০ সালে ইয়ং জরাথুষ্টিয়ান ক্লাব (Young Zoroastrian Club)। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পার্সিদের মধ্যে এই ক্লাব গঠনের প্রক্রিয়া আরও ত্বরান্বিত হয় এবং ১৮৮৮ সালের মধ্যে ক্রিকেট খেলাকে কেন্দ্র করে পার্সিরা প্রায় ২৭ টি ক্লাব গড়ে তোলে, যার উল্লেখ করেছেন তৎকালীন সময়ের পার্সি ক্রিকেটার মহালসা এডুলজি পাভরি (Mehallash Edulji Pavri)। পার্সিদের অনুকরণে অন্যান্য ভারতীয়রা ইউরোপীয় খেলাধুলার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং ক্রীড়াগুলি সংগঠনের জন্য ক্লাব গড়ে তুলতে থাকেন। এনফিলস্টোন হাইস্কুলের (Elphinstone High School)- এর মারাঠা ছাত্ররা ১৮৬১ সালে বোম্বে ইউনিয়ন ক্রিকেট ক্লাব (Bombay Union Cricket Club) এবং ১৮৭৭ সালে হিন্দু ক্রিকেট ক্লাব (Hindu Cricket Club) গড়ে তোলেন। মহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজে (Mohammedan Anglo Oriental College) ১৮৭৯ সালে আলিগড় ক্রিকেট ক্লাব (Aligarh Cricket Club) এবং মাদ্রাসে বুচি বাবু নাইডু (Buchi Babu Naidu) কর্তৃক ১৮৯১ সালে মাদ্রাস ইউনাইটেড ক্রিকেট ক্লাব (Madras United Cricket Club) গড়ে ওঠে।[৮৭]

ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে বোম্বে প্রেসিডেন্সি ও দক্ষিণাঞ্চলে মাদ্রাস প্রেসিডেন্সি অঞ্চলে ক্রিকেট খেলা যেমন জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং সেই খেলাকে কেন্দ্র করে ক্লাবগুলি গড়ে ওঠে, তেমনি ভারতের পূর্বাঞ্চলে বাংলা প্রেসিডেন্সিতে ফুটবল খেলা জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং এই খেলাকে কেন্দ্র করে ক্লাবগুলি গঠিত হয়। ১৮৭৮ সালে ভারতে প্রথম ফুটবল ক্লাব হিসেবে ট্রেডার্স ক্লাব (Traders Club) গড়ে ওঠে, পরবর্তীতে যার নামকরণ করা হয় ডালহৌসি ক্লাব। উল্লেখ্য ১৮৭২ সালে কলকাতা ফুটবল ক্লাব গড়ে উঠলেও তা মূলত রাগবি খেলা কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। কলকাতা শহর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ব্রিটিশ সৈনিক রেজিমেন্ট গুলির বিভিন্ন দল ফুটবল খেলার প্রবর্তন করে। প্রথম ভারতীয় হিসেবে সম্ভবত নগেন্দ্র প্রসাদ সর্বাধিকারী ফুটবল খেলায় অংশগ্রহণ করেন এবং তার উদ্যোগে গড়ে ওঠা বয়েজ ক্লাব (Boys Club) ভারতীয়দের দ্বারা গঠিত প্রথম ফুটবল ক্লাব। এই সময় পর্বে হাওড়া ইউনাইটেড ক্লাব (Howrah United Club), দ্য ক্যালকাটা রেঞ্জার্স (The Calcutta Rangers), নেভেল ভলেন্টিয়ার্স (Naval Volunteers), আর্মেনিয়ান ক্লাব (Armanian Club) ইত্যাদি গড়ে ওঠে। এর পরবর্তীতে কলকাতার গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা মেডিকেল কলেজ, শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ নিজেদের ফুটবল দল গড়ে তোলে। নগেন্দ্র প্রসাদ সর্বাধিকারী প্রথমে প্রেসিডেন্সি ও পরে ওয়েলিংটন ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত ১৮৭৭ সালে শোভাবাজার ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৮৮০- এর দশকে কলকাতায় একাধিক ফুটবল ক্লাব গড়ে ওঠে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন (National Association), টাউন ক্লাব (Town Club), কুমারটুলি (Kumartuli), এরিয়ান (Aryan), মোহনবাগান ইত্যাদি। মুসলিম সম্প্রদায় ১৮৭৭ সালে গড়ে তোলে ফুটবল ক্লাব জুবিলি ক্লাব (Jubilee Club), যা ১৮৯১ সাল থেকে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব (Mohammedan Sporting Club) নামে পরিচিত হয়। কলকাতার পাশাপাশি বাংলার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শহর গুলিতেও ফুটবল ক্লাব গড়ে উঠতে থাকে। চুঁচুড়াতে ১৮৮৩ সালে টাউন ক্লাব (Town Club), ১৮৯০ সালে চুঁচুড়া স্পোর্টিং (Chincurah Sporting), হাওড়ায় ১৮৮৯ সালে হাওড়া স্পোর্টিং ক্লাব (Howrah Sporting Club), ঢাকায় সুরেন্দ্রনাথ রায় নামক জনৈক্য জমিদার ১৮৯৮ সালে ওয়ারী ক্লাব (Wari

Club) গড়ে তোলেন এবং ওয়ারী ক্লাবের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ১৯০৩ সালের ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব (Victoria Sporting Club) প্রভৃতি গড়ে ওঠে।[৮৮]

ক্লাব গুলির বাইরে ভারতে পশ্চিমী ক্রীড়া প্রচলনের অন্যতম ক্ষেত্র ছিল ব্রিটিশ সেনাবাহিনী। ব্রিটিশ সৈনিকদের স্বদেশের বাইরে নিজেদের অবসর বিনোদনের ও স্বদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করার অন্যতম মাধ্যম ছিল ক্রীড়া বা খেলাধুল। একজন ব্রিটিশ সৈনিক লিখেছেন, “We had one great weapon against boredom. The answer was sport sport, sport.”।[৮৯] ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর মধ্যে খেলাধুলার বিশেষ প্রচলন ছিল। এমনকি সেনাবাহিনীর বিভিন্ন রেজিমেন্ট যখন এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করত সেই যাত্রাপথে তারা স্থানীয় কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে প্রদর্শনী খেলার আয়োজন করে খেলায় অংশগ্রহণ করত। সরকারি স্তরেও সেনাবাহিনীর মধ্যে বিভিন্ন খেলাধুলার প্রচলনের বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করা হতো। ১৮৬৩ সালে রয়েল কমিশন অব দ্যা স্টেট অব দি আর্মি (Royal Commission on the Sanitary State of the Army in India)- এর রিপোর্টে ভারতে ব্রিটিশ সৈনিকদের উচ্চ মৃত্যুহারের পশ্চাতে তাদের অলস জীবন যাপন ও শরীর চর্চার অভাবকে দায়ী করা হয়।[৯০] ১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহের পর ব্রিটিশ সরকার ভারতে নিযুক্ত ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীতে ইংরেজ সৈনিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে ভারতীয় সৈনিকদের সঙ্গে ১:২ অনুপাতে নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিলে, ভারতীয় ও ইংরেজ সৈনিকদের মধ্যে সংযোগ তৈরির মাধ্যম হিসেবেও খেলা গুলি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ভারতে সর্বদাই ব্রিটিশ সৈন্যদল ইংরেজ ও ভারতীয় উভয় সৈনিকদের নিয়ে গঠিত ছিল। সেনাবাহিনীর মধ্যে ক্রিকেট, ফুটবল, ও বক্সিং- এর মতো খেলা গুলি প্রচলিত ছিল এবং এমনকি প্রাথমিক পর্যায়ে ফুটবল প্রতিযোগিতা গুলিতে সেনাবাহিনীর দল গুলির একাধিপত্য ছিল।[৯১]

ভারত তথা সমগ্র উপনিবেশ গুলিতে পশ্চিমী ক্রীড়ার প্রসারের বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারের কোনো সুনির্দিষ্ট নীতি ছিল না। উপনিবেশ গুলিতে পশ্চিমী খেলা গুলি প্রসারের বিষয়ে খ্রিস্টান মিশনারী ও ইংরেজি মাধ্যম স্কুল গুলির শিক্ষকগণের ব্যক্তিগত ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৫৭ সালের

মহাবিদ্রোহের পর ভারতীয় ব্রিটিশ সরকার ও দেশীয় রাজ্যের শাসকবর্গ নিজেদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন করতে উদ্যোগী হয়। ইংরেজি শিক্ষার প্রতি দেশীয় শাসকবর্গ আগ্রহী হয়ে উঠলে দেশীয় রাজ্যের শাসকবর্গ তথা রাজকুমারদের জন্য ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় স্থাপিত হতে থাকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। এই সমস্ত বিদ্যালয় গুলির শিক্ষকদের অধিকাংশ ছিল ইংরেজ এবং তাদের অধিকাংশের উদ্যোগে এই সমস্ত বিদ্যালয় গুলিতে পশ্চিমী খেলাধুলার উপর বিশেষ গুরুত্ব দান করা হতে থাকে।[৯২] ভারতীয় দেশীয় রাজ্যের শাসকদের অধিকাংশই যেহুতু ব্রিটিশ পরিচালিত বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষা গ্রহণ করত, তাই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকেই তারা পশ্চিমী ক্রীড়াগুলির প্রতি আগ্রহী হয়ে অংশগ্রহণ করতে থাকেন এবং সংগঠিতভাবে ক্রীড়া গুলি আয়োজন ও পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকেন।[৯৩] এইভাবে বিভিন্ন মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে পাশ্চাত্য খেলা গুলি ভারতে প্রচলিত হয় এবং এই খেলাগুলি ঔপনিবেশিক সাংস্কৃতিক উপাদান হওয়া সত্ত্বেও বৃহত্তর ভারতীয় সমাজের মানুষ এগুলির প্রতি আকৃষ্ট হয়। ক্রমশ এই ক্রীড়াগুলি ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতাবাদের মতো বিষয়গুলির সঙ্গেও সংযুক্ত হয় ও শেষ পর্যন্ত ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে ওঠে।

ব্রিটিশদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের যে সমস্ত পাশ্চাত্য খেলার আগমন ঘটে তার মধ্যে রয়েছে হকি, ফুটবল, ক্রিকেটের মতো খেলা গুলি। প্রাথমিক পর্যায়ে ভারতে আগত ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক জাহাজের নাবিক ও কর্মীরা বন্দর শহর গুলিতে অবসর বিনোদনের জন্য নিজেদের মধ্যে খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করত। ১৭২১ সালে গুজরাট উপকূলে অবস্থিত কাম্বে বন্দর শহরে ইংরেজ নাবিকেরা নিজেদের মধ্যে ক্রিকেট খেলায় অংশগ্রহণ করে, যা সম্ভবত ভারতে আয়োজিত প্রথম ক্রিকেট প্রতিযোগিতা।[৯৪] ব্রিটিশ সরকারও ভারতে ক্রিকেট খেলার প্রসারের ক্ষেত্রে উৎসাহ দান করেছিল, তারা ক্রিকেট খেলাটিকে রাষ্ট্রীয় সাংস্কৃতিক সংহতি সাধনের অস্বীকৃত মাধ্যম হিসেবে দেখেছিলেন, "unofficial instrument of state cultural policy."।[৯৫] ক্রিকেট খেলাটি মূলত ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে তৎকালীন বোম্বে প্রেসিডেন্সিতে অর্থাৎ বর্তমান মহারাষ্ট্র ও গুজরাট এবং পরবর্তীতে দাক্ষিণাত্যে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে অর্থাৎ বর্তমান তামিলনাড়ু অঞ্চলে প্রধানত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। ভারতীয়দের মধ্যে পার্সিরা সম্ভবত

প্রথম পাশ্চাত্য ক্রীড়া হিসেবে ক্রিকেট খেলাকে বৃহত্তর ভাবে সংগঠিত করে। পেশাগত ভাবে ব্যবসার কারণে ব্রিটিশদের সঙ্গে নৈকট্য ও সখ্যতা সম্ভবত পার্সিদের ব্রিটিশ ক্রীড়া গুলির প্রতিও আকৃষ্ট করে তোলে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই তারা ক্লাব গড়ে তোলে ক্রিকেট খেলা কে কেন্দ্র করে। পার্সিদের এই ক্রিকেট প্রীতি ইংরেজরা ভালোভাবে গ্রহণ করেনি, এমনকি ১৮৬৮ সাল থেকে বোম্বেতে উভয়ের মধ্যে সংঘাতের নিদর্শন লক্ষ করা যায়, বিশেষত খেলার মাঠ ব্যবহারকে কেন্দ্র করে।[৯৬] যদিও শেষ পযর্ন্ত তারা ব্রিটিশ শ্বেতাঙ্গদের নিয়ে গঠিত বোম্বে জিমখানার ন্যায় নিজেদের জিমখানা তৈরির জন্য মাঠ ব্যবহারের অনুমতি পেয়েছিল। ইতিপূর্বে ১৮৮৬ ও ১৮৮৭ সালে পার্সিদের একটি দল ইংল্যান্ড সফর করে সেখানকার বিভিন্ন দলের সঙ্গে ক্রিকেট খেলায় অংশগ্রহণ করে। ১৮৮৯ সালে পার্সি জিমখানা, বোম্বে জিমখানাকে পরাজিত করে, যা পরবর্তীতে একটি বার্ষিক প্রতিযোগিতার রূপ নেয়। ১৮৯০ সালেও তারা একটি ইংরেজ দলকে পরাজিত করে। এই খেলাগুলি দেখতে ব্যাপক দর্শক সমাগম ঘটত যা খেলা গুলির জনপ্রিয়তার পরিচায়ক। শ্বেতাঙ্গ ক্রিকেট দলগুলোর বিরুদ্ধে পার্সিদের জয় একদিকে যেমন অনেক সাধারণ ভারতীয় মানুষ সাদা চামড়ার ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অশ্বেতাঙ্গ ভারতীয়দের জয় হিসেবে মনে করেছিল, তেমনি অন্যদিকে অনেক পার্সিরা একে ব্রিটিশ সংস্কৃতির প্রতি তাদের গভীর অনুরাগের বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করেছিল। পার্সিদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বোম্বের হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ও নিজেদের জিমখানা গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। যার ফলস্বরূপ ইসলাম জিমখানা (Islam Gymkhana, 1891) ও হিন্দু জিমখানা (Hindi Gymkhana, 1892) গড়ে ওঠে, সরকার কর্তৃক ব্যবহারযোগ্য মাঠ লাভ করার পর। এক্ষেত্রে তৎকালীন বোম্বাইয়ের গভর্নর লর্ড হ্যারিসের (১৮৯০-১৮৯৫) অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তার উদ্যোগে মুম্বাইয়ে সমুদ্রের ধারে বিস্তীর্ণ জমি পৃথক পৃথক প্লট হিসেবে বিভিন্ন ক্রিকেট ক্লাবকে দেওয়া হয়। তার এই অনন্য অবদানের কথা মাথায় রেখে বোম্বাইয়ের স্কুল স্তরে ১৮৯৬ সালে শুরু হয় 'হ্যারিস শিল্ড ক্রিকেট টুর্নামেন্ট' যা ভারতের প্রাচীনতম ক্রিকেট প্রতিযোগিতা হিসেবে আজও বর্তমান।[৯৭] ১৮৮৯ সালে পার্সি ও ইউরোপিয়ানদের নিয়ে প্রথম যে ক্রিকেট প্রতিযোগিতা বোম্বেতে শুরু হয়েছিল তা ১৯১২ সালে হিন্দু ও মুসলিম জিমখানা এবং আরও পরে অবশিষ্ট নামে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ক্রিকেট দলের যোগদানের

মাধ্যমে পঞ্চসম্প্রদায় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার রূপ নেয়। এইভাবে বম্বেতে সম্প্রদায় গত বিভাজনের ভিত্তিতে যে ক্রিকেট প্রতিযোগিতার সূচনা হয় তা ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত চলেছিল।[৯৮]

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্ব থেকেই ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয় দেশীয় রাজ্যের শাসকেরাও ক্রিকেট খেলার প্রতি আকৃষ্ট হন কারণ ব্রিটিশ শাসকবর্গের সঙ্গে সান্নিধ্য স্থাপনের অন্যতম মাধ্যম ছিল এই ক্রীড়া। ক্রিকেট খেলার এই বৈশিষ্ট্যকে লক্ষ করে রিচার্ড ক্যাশম্যান (Richard Cashman) বলেছেন, "Cricket was one of the languages of the Raj and those could master its subtle inflections and rhythms could expect to exert a greater influence on colonial policy makers."।[৯৯] আয়তনে ছোট দেশীয় রাজ্যের শাসকেরা ক্রিকেটের প্রসারে ও উন্নতিতে বিশেষ অবদান রেখেছিল। ছোট রাজ্যগুলি ক্রিকেট খেলার পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল দুটি কারণে, প্রথমত তাদের রাজ্যের ক্ষুদ্র আকৃতির কারণে তারা ইংরেজদের প্রশাসনিক কাঠামোতে নিজেদের অন্তর্ভুক্তি ও ব্রিটিশদের কাছ থেকে উপযুক্ত গুরুত্ব লাভ করে তাদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনের মাধ্যম হিসেবে ক্রিকেট খেলাকে বেছে নিয়েছিল, দ্বিতীয়ত ক্ষুদ্র আকৃতির কারণে এই দেশীয় রাজ্যগুলির আর্থিক সঙ্গতি ছিল অনেক কম এবং ক্রিকেট খেলার পৃষ্ঠপোষকতার খরচ পোলো খেলার ঘোড়া রক্ষণাবেক্ষণের চাইতে অনেক কম ছিল অর্থাৎ ক্রিকেটর পৃষ্ঠপোষকতা অর্থনৈতিক দিক থেকে কম ব্যয় সাপেক্ষ ছিল, যা একে আকর্ষক করে তুলেছিল তাদের কাছে।[১০০] বাংলাতেও ক্রিকেট রাজন্য পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। কোচবিহারের রাজা নিপেন্দ্রকৃষ্ণ এবং নাটোরের রাজা যোগীন্দ্র নারায়ন নিজেদের ব্যক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে ক্রিকেট খেলার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এদের মধ্যে যোগেন্দ্র নারায়ন জাতীয়তাবাদী চেতনার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন এবং দেশীয় খেলোয়াড়দের নিয়ে ক্রিকেট দল গঠন করেছিলেন, যার খেলোয়াদের মধ্যে অন্যতম হলেন- বালো পালওয়ানকার ও তার দুই ভাই ভিতেল এবং গণপত। যদিও কোচবিহারের রাজার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান হলে তিনি ক্রিকেটের পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ করেন।[১০১]

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে ভারতে ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং পরবর্তীতে ব্যাপক আকার ধারণ করে, যদিও ১৯৮৩ সালে বিশ্বকাপ জয়ের পূর্ব পর্যন্ত আন্তর্জাতিক

স্তরে এই খেলায় ভারতীয় দলের সাফল্য ছিল নগণ্য। ভারতে ক্রিকেটের জনপ্রিয়তার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে আশিস নন্দী যথার্থ বলেছেন যে, "Cricket is an Indian game accidentally discovered by the English."।[১০২] ভারতে ১৯৪৮ সাল থেকে মূলত প্রধান শহর গুলিতে অল ইন্ডিয়া রেডিও (All India Radio, AIR)- এর মাধ্যমে ক্রিকেট খেলার ধারাভাষ্য পরিবেশন শুরু হয়, যা এই খেলার ব্যাপক জনসমর্থন সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল বলে, রিচার্ড ক্যাশম্যান জানিয়েছেন।[১০৩] ১৯৬০-এর দশকে হিন্দি, বাংলা, তামিলের মতো প্রধান প্রধান ভারতীয় ভাষায় ক্রিকেট খেলার ধারাভাষ্য প্রদান রেডিওতে শুরু হলে, এই খেলার জনভিত্তি আরও প্রসারিত হয়।[১০৪] আশিস নন্দী ভারতে ক্রিকেটের জনপ্রিয়তার বর্ণনা দিতে গিয়ে ভারতীয় বিশেষত হিন্দু ঐতিহ্যের সঙ্গে টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচের সাদৃশ্যতা তুলে ধরতে গিয়ে বলেছেন, "The duration of a test match lasting up to thirty-three hours and even then often ending in a draw, would tax the patience of most people except the Gita-devouring ahistorical Indians, who continue to try to see it as pleasurable and as an epitome desireless, karmic life."।[১০৫] একইভাবে ঐতিহাসিক রামচন্দ্র গুহ ভারতে ক্রিকেট খেলার জনপ্রিয়তার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন, "Indians have more time, Indians like doing things together, Hindu don't really mind a 'draw', Hindus are culturally syncretic and choose to absorb foreign imports rather than reject them: those are the lines on which we might begin to explain the extraordinary Indian love for cricket."।[১০৬] টেলিভিশনে ক্রিকেট খেলার সম্প্রচার ও ২০০৭ সাল থেকে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লীগ (Indian Premier League, I.P.L)- এর সূচনা ক্রিকেটকে আরও জনপ্রিয় করে তোলে। যদিও রামচন্দ্র গুহ আই.পি.এল- এর সমালোচনা করে বলেছেন, "Representative of the worst sides of Indian capitalism and society."।[১০৭] মিহির বসুর মতে আই.পি.এল হলো এক বিনোদন যার সঙ্গে চলচ্চিত্র জগৎ ও রাজনীতিবিদদের পাশাপাশি ক্রিকেটাররাও যুক্ত।[১০৮]

পাশ্চাত্য থেকে আগত অপর এক ক্রীড়া ফুটবল মূলত ভারতের পূর্বাঞ্চলে বাংলা প্রেসিডেন্সিতে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে, আরও নির্দিষ্ট করে বললে বৃহত্তর কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করে একাধিক ফুটবল ক্লাব গড়ে ওঠে। প্রাথমিক পর্বে এক্ষেত্রে ব্রিটিশ ক্লাবের ফুটবল দলগুলি, বিশেষত সেনাবাহিনীর ফুটবল দলগুলি নিজেদের একাধিকত্ব বজায় রাখলেও, ক্রমশ ভারতীয় ফুটবল দলগুলিও গঠিত হতে থাকে। ফুটবল খেলা কে কেন্দ্র করে একাধিক প্রতিযোগিতা আয়োজিত হতে থাকে। ১৮৮৮ সালে শিমলাতে শুরু হওয়া ডুরান্ড কাপ ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন ফুটবল টুর্নামেন্ট। দীর্ঘদিন পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতা কেবলমাত্র ব্রিটিশ ফুটবল দলগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৮৮৯ সাল থেকে শুরু হওয়া ট্রেডার্স চ্যালেঞ্জ কাপ (Traders Challenge Club) প্রথম ফুটবল প্রতিযোগিতা যেখানে ইউরোপীয় দলগুলোর পাশাপাশি ভারতীয় ফুটবল দল গুলিও অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করে। বোম্বেতে ১৮৯০ সালে রোভারস ক্লাব (Rovers Club) গড়ে ওঠে এবং ১৮৯১ সালের রোভার্স কাপ (Rovers Cup) প্রতিযোগিতার সূচনা হয়। ১৮৯২ সালে ভারতীয় প্রতিনিধি ব্যাতিরেকেই ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (Indian Football Association) গড়ে ওঠে এবং এই সংগঠনের তত্ত্বাবধানে ১৮৯৩ সাল থেকে আই.এফ.এ শিল্ড (I.F.A Shield) প্রতিযোগিতা আয়োজিত হতে থাকে, যা দীর্ঘদিন পর্যন্ত শুধুমাত্র ব্রিটিশ দলগুলির জন্যই সংরক্ষিত ছিল। ১৮৯৪ সাল থেকে কলকাতায় প্রথম শ্রেণির ফুটবল লীগ (First Division Football League) শুরু হয়, যা ১৯১৪ সাল পর্যন্ত শুধুমাত্র ব্রিটিশ দলগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বাংলা ছাড়াও ভারতের অন্যত্র বিশেষত দাক্ষিণাত্যে ফুটবল ক্লাব গড়ে উঠতে থাকে ও প্রতিযোগিতা আয়োজিত হতে দেখা যায়, যার সাক্ষ্য প্রদান করে মাদ্রাস জিমখানা কাপ, ব্যাঙ্গালোর ব্রিওয়ারি কাপ (Bangalore Brewery Cup), সেকেন্দ্রাবাদে স্থানীয় জিমখানা কাপ ইত্যাদি প্রতিযোগিতা গুলির সূচনা। ১৯৩০ সাল পর্যন্ত সেনাবাহিনীর রেজিমেন্ট ফুটবল দলগুলি সমস্ত প্রতিযোগিতায় নিজেদের আধিপত্য বজায় রেখেছিল। কলকাতাতে গড়ে ওঠা ভারতীয় ফুটবল ক্লাবগুলি ব্রিটিশদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয় এবং শোভাবাজার ক্লাব প্রথম দল হিসেবে ব্রিটিশ দলগুলির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়। শোভাবাজার ১৮৮৯ সালে থেকে ট্রেডার্স কাপ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে থাকে এবং ১৮৯২ সালে

প্রথম ভারতীয় দল হিসেবে ব্রিটিশ দলকে পরাজিত করে। যদিও প্রথম ভারতীয় দল হিসেবে ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন (National Association) ১৯০০ সালে ট্রেডার্স কাপ প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করে।[১০৯]

বিংশ শতব্দীর সূচনায় জাতীয়তাবাদী চেতনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে খেলার মাঠও হয়ে ওঠে জাতীয়তাবাদের কেন্দ্র এবং ১৯১১ সালে মোহনবাগান কর্তৃক আই.এফ.এ শিল্ড বিজয় ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জয় লাভের নিদর্শন হিসেবে জাতীয় অনুপ্রেরণার প্রতীক হয়ে ওঠে।[১১০] মুসলিম সম্প্রদায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ১৯৩৬ সালে একইসঙ্গে কলকাতা লিগ ও আই.এফ.এ শিল্ড জয় করে। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এই দলের অবনমন ঘটে কারণ দেশভাগের ফলে ধনী মুসলিম সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণের অনেকে যারা প্রধানত এই দলের মুখ্য পৃষ্ঠপোষক ছিল, তারা পশ্চিমবঙ্গ ত্যাগ করে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ও অধুনা বাংলাদেশে চলে যান।[১১১] ১৯২০ সালে ইস্টবেঙ্গল দল প্রতিষ্ঠা ও মোহনবাগানের সঙ্গে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা যে ঘটি-বাঙাল দ্বন্দ্বের সূচনা করেছিল, তা দেশভাগ ও তৎপরবর্তী উদ্বাস্তু আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আরও তীব্রতর হয় কারণ সাংস্কৃতিক স্তরে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে উদ্বাস্তু জনগণ ইস্টবেঙ্গল দলকে নিজেদের প্রতিনিধি মনে করেছিল ফুটবল মাঠে, যদিও প্রতিষ্ঠার পর ১৯২০- এর দশকের কিছু সময় বাদ দিলে দুটি দলের খেলোয়াড়রা কখনওই নির্দিষ্টভাবে ঘটি-বাঙালের প্রতিনিধিত্ব করত না।[১১২] স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ভারতীয় ফুটবল দলের সাফল্য যদিও অত্যন্ত সীমিত। ১৯৫১ সালের প্রথম এশিয়ান গেমস, ১৯৫২ থেকে ১৯৫৫ সালের মধ্যে ভারত, পাকিস্তান, সিংহল ও বর্মার মধ্যে আয়োজিত কলম্বোকাপ চারবারবিজয়, ১৯৫৬ সালের মেলবোর্ন অলিম্পিকে চতুর্থ স্থান অধিকার ও ১৯৬২ সালে জাকার্তাই অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমসে জয়লাভ- হলো ভারতীয় ফুটবল দলের কিছু উল্লেখযোগ্য সাফল্য। ১৯৭০ সালে এশিয়ান গেমসে ব্রোঞ্জ পদক লাভ ভারতীয় ফুটবল দলের শেষ উল্লেখযোগ্য সাফল্য আন্তর্জাতিক মঞ্চে। টেলিভিশনে ইউরোপীয় দলগুলির খেলা প্রদর্শন শুরু হলে ভারতীয় দর্শকেরা নিজেদের দেশীয় ফুটবল দলের সঙ্গে তাদের খেলার মানের যে পার্থক্য সেই সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে ফলে ভারতীয় ফুটবল ক্রমশ তার জনসমর্থন হারাতে থাকে।

ঔপনিবেশিক শাসন পর্বে ও স্বাধীনতার অব্যহতি পরবর্তী যুগে যে পাশ্চাত্য খেলায় ভারত সম্ভবত সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছে তা হলো হকি। ভারতে প্রথম সংগঠিত ভাবে হকি খেলার সূচনা হয় কলকাতায় ১৮৮৫ সালে এবং ওই বছরই প্রথম হকি ক্লাব গড়ে ওঠে। এর এক দশক পরে ১৮৯৫ সালে কলকাতায় ব্রাইটন কাপ আর বোম্বেতে আগা খান টুর্নামেন্টের সূচনা হয়। ১৯০৩ সালে আর্মি ক্যান্টনমেন্ট ও তারপর পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি স্পোর্টস টুর্নামেন্ট এবং লাহোরের ওয়াটার টুর্নামেন্টের সূচনা হয়। ক্রিকেটের ক্ষেত্রে যেমন বোম্বে পেন্টাগুলার তেমনি হকির ক্ষেত্রে ব্রাইটন কাপ আর্মি ক্যান্টনমেন্ট-এর বাইরে হকিকে জনপ্রিয় করে তোলে। ১৯২৫ সালে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকারের সমর্থন পেয়ে ইন্ডিয়ান হকি ফেডারেশন (Indian Hockey Federation, I.H.F) গড়ে ওঠে। এই সংগঠন ১৯২৭ সালে বিশ্বের স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য আবেদন করে এবং এই স্বীকৃতি লাভ করার ফলে ১৯২৮ সালের অ্যামস্টারডাম অলিম্পিকে ভারতীয় হকি দল প্রথম অংশগ্রহণ করে। ১৯২৮ সাল থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে ভারত হকিতে অলিম্পিকে ছটি সোনার মেডেল জয় করে। এরপর ১৯৬৪ ও ১৯৮০ সালে পুনরায় ভারত অলিম্পিকে সোনার মেডেল জয় করে।[১১৩] এই গোটা সময় পর্বে ভারত হকিতে যে উন্নতি ও উচ্চতা লাভ করেছিল তা ক্রিকেট ও ফুটবলের মতো অন্য কোনো খেলার ক্ষেত্রে লাভ করেনি। ১৯৮০-এর পর হকিতে ভারতের ক্রম অবনমন ঘটে এবং এরপর ভারত পুনরায় আর কোনো আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করতে ব্যর্থ হয়।

ভারতে ইংরেজ কর্তৃক পাশ্চাত্য খেলা গুলি প্রচলন এর পাশাপাশি ইংরেজরাও ভারতে প্রচলিত যে সমস্ত ক্রীড়া গুলি গ্রহণ করেছিল তার অন্যতম হলো পোলো। পোলো খেলার সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে ব্রিটিশরা যথার্থই বলেছেন যে, “Indian game before it become an English one.” ।[১১৪] মণিপুরে ইংরেজরা প্রথম খেলাটি পর্যবেক্ষণ করে এবং খেলাটি সংগঠিত হবে আয়োজনের জন্য ক্লাব গড়ে তুলতে থাকে। ১৮৬৩ সালে কলকাতা ময়দানে প্রথম ব্যারাকপুর ক্লাব ও কলকাতা ক্লাবের মধ্যে পোলো খেলা অনুষ্ঠিত হয়।[১১৫] ইন্টার রেজিমেন্টাল প্রতিযোগিতা ও ইন্ডিয়ান পোলো অ্যাসোসিয়েশন চ্যাম্পিয়নশিপ

(Indian Polo Association Championship) হলো সেই সময় পর্বের প্রধান দুই পোলো প্রতিযোগিতা। ইংরেজদের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করার পর তাদের দ্বারা গ্রহণ ও প্রসারণের পর, পোলো একটি আধুনিক ক্রীড়ার মর্যাদা লাভ করে এবং সমগ্র বিশ্বে প্রসার ও প্রচার লাভ করে। ১৮৭১ সালে ইংল্যান্ডের হাউনস্লো হিথ (Hounslow Heath)-য়ে পোলো খেলা অনুষ্ঠিত হয়।[১১৬] পোলো খেলার জন্য যেহেতু উন্নত মানের ঘোড়ার প্রয়োজন হতো যার রক্ষনাবেক্ষন ছিল অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ তাই সাধারণ নিম্ন বেতনের কর্মচারীদের পক্ষে এই খেলায় অংশগ্রহণ করা সম্ভব ছিল না, একমাত্র উচ্চ বেতনের কর্মচারীরায় এই খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারতো ফলে পোলো খেলাটি সর্বদাই আভিজাত্যের প্রতীক ছিল। পোলো খেলা যেহেতু পূর্বেই ভারতে প্রচলিত ছিল এবং এর সঙ্গে আভিজাত্যের সংযোগ থাকায় যেহেতু উচ্চ পদাধিকারী ব্রিটিশরা এই খেলায় অংশগ্রহণ করত, তাই ভারতীয় দেশীয় রাজ্যের শাসকেরাও ব্রিটিশদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে হিসেবে এই খেলায় ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করতে থাকে। পোলো খেলা রাজন্যবর্গের উচ্চ পরিচয় এর প্রতীক হয়ে ওঠে। হায়দ্রাবাদ, গোয়ালিয়র, মাইসোর, কাশ্মীর, যোধপুর, পাতিয়ালা ইত্যাদি রাজ্যের শাসকেরা পোলো খেলার প্রতি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন এবং নিজেদের পোলো দল গড়ে তুলেছিলেন যারা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করত দেশে এবং এমনকি বিদেশেও।[১১৭]

অবসর বিনোদনের অন্যতম ক্রীড়া বা খেলা হিসেবে শিকার প্রাচীন ও মধ্যযুগের মতো ব্রিটিশ শাসনেও যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল। ভারতীয় দেশীয় শাসকগণ বিভিন্ন মাত্রায় শিকারের আয়োজন করতেন। শিকারের সঙ্গে যেহেতু সর্বদাই একটি আভিজাত্যের সংমিশ্রণ ছিল, তাই ভারতে আগত ব্রিটিশরা শিকারের প্রতি সর্বদাই বিশেষভাবে আগ্রহী ছিল। বিশেষত ব্রিটিশ উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা দেশীয় রাজ্য ভ্রমণ করলে তাদের সম্মানার্থে শিকারের আয়োজন করা হতো। বিভিন্ন প্রজাতির হরিণের পাশাপাশি বাঘও শিকার করা হতো এবং শেষোক্ত প্রাণীটিকে শিকার করা বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ বলে মনে করা হতো। সামগ্রিকভাবে শিকারকে পুরুষোচিত বীরত্ব ও সামর্থ্য প্রকাশের এক মাধ্যম হিসেবে মনে করা হতো। গোটা ভারত জুড়ে দেশীয় রাজ্যের শাসক ও ইংরেজদের শিকারের ফলে কি বিপুল পরিমাণে বন্য জন্তুর

মৃত্যু ঘটত তার একাধিক বর্ণনা সমসাময়িক বিভিন্ন তথ্যসূত্রে বর্ণিত হয়েছে। শিকারের উপকরণের ক্ষেত্রেও এই সময় পর্বে দেখা দিয়েছিল ব্যপক পরিবর্তন। প্রাচীন ও মধ্যযুগের শিকারের ক্ষেত্রে তীর-ধনুক, বর্শা, বল্লম ইত্যাদি হাতিয়ার ছিল মুখ্য যদিও মুঘল যুগ থেকে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার শুরু হয়, তবে ব্রিটিশ শাসনকালে শিকারের একমাত্র উপকরণ ছিল আগ্নেয়াস্ত্র।[১১৮]

প্রাচীন ও মধ্যযুগের মতো আধুনিক যুগেও মল্লক্রীড়া ভারতে প্রচলিত ছিল। ইংরেজরা ভারতীয় তথা বাঙালির দুর্বল শারীরিক সক্ষমতার যে চিত্র তুলে ধরেছিল, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ বাঙালি শরীরচর্চা সংস্কৃতির উন্নতির জন্য সচেষ্ট হন রাজনারায়ণ বসু। তার উদ্যোগে ও ঠাকুর পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজিত হিন্দু মেলায় মল্লক্রীড়া, জিমনাস্টিক ও অন্যান্য ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলার যেমন- লাঠির লড়াই ইত্যাদির আয়োজন করা হতো। বাঙালি মল্ল যোদ্ধাদের সাথে যোদ্ধা জাতি হিসেবে পরিগণিত পাঞ্জাবি মল্ল যোদ্ধাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার আয়োজন করা হতো। জোসেফ আলটার (Joseph Alter) জানিয়েছেন যে মুঘল শাসনের অন্তিম পর্বে যে সমস্ত মল্লযোদ্ধারা দেশীয় রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল তারা সবাই ছিলেন মুসলিম সম্প্রদায় ভুক্ত। ঔপনিবেশিক শাসন পর্বে মল্লযোদ্ধাদের মধ্যে অন্যতম হলেন গামা, যার আসল নাম সম্ভবত গোলাম মোহাম্মদ। ১৯১০ সালে লন্ডনে জন বুল সোসাইটি (John Bull Society) কর্তৃক আয়োজিত বিশ্ব কুস্তি প্রতিযোগিতায় ভারত থেকে গামা, ইমাম বক্স, আহমেদ বক্স, গামু অংশগ্রহণ করে। যদিও এর আগে ১৮৯৯ সালে গুলাম ও কালু নামে দুজন ভারতীয় মল্লযোদ্ধা মতিলাল নেহেরু তত্ত্বাবধানে প্যারিসে গিয়ে তাদের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন বিভিন্ন দেশের মল্লযোদ্ধাদের সঙ্গে মল্লযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। বাংলার অধিবাসী গোবরা গুহ মল্লযুদ্ধে বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছিলেন এবং একাধিকবার ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ করে সেখানকার মল্লযোদ্ধাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছিলেন। বাংলার অপর এক উল্লেখযোগ্য মল্লযোদ্ধা হলেন ভবানী চরণ সাহা।[১১৯]

উপরোক্ত ক্রীড়াগুলির পাশাপাশি বক্সিং, টেনিস ব্যাডমিন্টন, গল্ফ, আধুনিক জিমন্যাস্টিক- এর মত ক্রীড়া গুলিও ব্রিটিশ শাসনে ভারতে প্রচলিত হয় এবং এই খেলাগুলি সংগঠিতভাবে আয়োজিত হতে থাকে। তবে এই ক্রীড়াগুলি ভারতীয় সমাজে ফুটবল বা ক্রিকেট- এর মতো ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ

করতে পারেনি। ১৯০৫ সালে বি.কে. নেহেরু প্রথম ভারতীয় টেনিস খেলোয়াড় হিসাবে উইলম্বন (Wimbledon)- য়ে অংশগ্রহণ করেন। প্রকৃতপক্ষে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে টেনিসেই প্রথম ভারতীয় দল প্রতিনিধিত্ব করে ১৯২৮ সালে ডেভিস কাপে, ১৯৩২ সালে ক্রিকেটে ভারতীয় দল প্রতিনিধিত্ব করার অনেক আগে।[১২০] ১৯২০ সালে ভারত প্রথম অলিম্পিকে যোগদান করলেও এক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ভারত উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেনি। দলগত ক্ষেত্রে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত হকির সফলতার নিরিখে ভারত স্বর্ণপদক লাভ করলেও প্রথম ব্যক্তিগত পদক হিসেবে ১৯৫২ সালে কে.ডি. যাদব কুস্তিতে ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন।[১২১] এরপর পুনরায় ব্যক্তিগত স্তরে অলিম্পিক পদক লাভের জন্য ভারতকে প্রায় ৪০ বছর অপেক্ষা করতে হয় এবং পুনরায় ১৯৯৬ সালে অলিম্পিকে টেনিসে লিয়েন্ডার পেজ ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন।[১২২] এই পর্বে ভারতীয় মহিলা খেলোয়াড়দের সাফল্যও ছিল সীমিত। ১৯৭০ সালের এশিয়ান গেমসে কমলজিত সান্ধুর লাভ করা স্বর্ণপদক প্রথম ভারতীয় মহিলা কর্তৃক অর্জিত আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ব্যক্তিগত বা একক পদক।[১২৩] অপরদিকে ২০০০ সালের সিডনি অলিম্পিকে ওয়েটলিফটিং-য়ে ৬৯ কেজি বিভাগে কার্নান মালেশ্বরী ব্রঞ্চ পদক লাভ করেন, যা প্রথম ভারতীয় মহিলা কর্তৃক অলিম্পিকে প্রাপ্ত ব্যক্তিগত বা একক পদক।[১২৪] প্রকৃতপক্ষে একবিংশ শতাব্দীতে এসে ভারত অলিম্পিকে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করতে থাকে। ২০০৮ সালের বেজিং অলিম্পিকে ভারত প্রথম ব্যক্তিগত স্বর্ণপদক লাভ করে অভিনব বিন্দার হাত ধরে।[১২৫]

স্বাধীনতা লাভের পর সরকারি স্তরেও ক্রীড়া গুলি প্রসারের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১৯৪৮ সালে তারা চাঁদ- এর সভাপতিত্বে গঠিত স্কুল শিক্ষা বিষয়ক কমিটির শারীর শিক্ষা বিষয়ক সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৫১ সালে সেন্ট্রাল এডভাইসারি বোর্ড অব ফিজিক্যাল এডুকেশন (Central Advisory Board of Physical Education) স্থাপিত হয়। ১৯৫৪ সালে কে.এম. কারিআপ্পা- এর সভাপতিত্বে অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল অব স্পোর্টস (All India Council of Sports, AICS) গঠিত হয়, যার কাজ ছিল সরকার ও বিভিন্ন জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন গুলির মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করা। ১৯৫৮ সালে

ভারত সরকারের শিক্ষা দপ্তরের অধীনে স্পোর্টস এন্ড ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট (Sports and Welfare Department) গঠন করা হয়। ১৯৬১ সাল থেকে ক্রীড়া ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ভারত সরকারের তরফ থেকে অর্জুন পুরস্কার প্রদান করা শুরু হয়।[১২৬] বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিও ক্রীড়া প্রসারের অংশগ্রহণ করে এবং নিজেদের দপ্তরের বিভিন্ন পদে খেলোয়াড়দের নিযুক্ত করতে থাকে। ভারতের অন্যতম প্রাচীনতম ও বৃহত্তর শিল্প গোষ্ঠী হিসেবে টাটা গ্রুপ (Tata Group) ঔপনিবেশিক আমল থেকেই, ১৯৩৭ সাল থেকে টাটা স্পোর্টস ক্লাব (Tata Sports Club) গঠন করে ক্রীড়াই বাণিজ্যিক পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে আসছে এবং তারাই ভারতে প্রথম শিল্প-বাণিজ্যিক সংস্থা হিসেবে এই ধরনের ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল।[১২৭]

৩.৫. পর্যবেক্ষণ:

প্রাচীন কাল থেকেই ভারতে নানা ধরনের ক্রীড়া প্রচলিত ছিল এবং মধ্য ও আধুনিক যুগে একদিকে যেমন বহু নতুন ক্রীড়া এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়, তেমনি অন্যদিকে প্রাচীন খেলা গুলিতেও দেখা যায় নানা ধরনের পরিবর্তন। প্রকৃতপক্ষে ক্রীড়াগুলিও যেহেতু চলমান সমাজের একটি অংশ আর সমাজ যেহেতু পরিবর্তনশীল তাই সমাজের এক সজীব অংশ হিসেবে ক্রীড়া ক্ষেত্রেও দেখা দেয় নানা পরিবর্তন যেমন- প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের প্রাথমিক পর্বে শিকার অভিজাত শ্রেণীর অন্যতম অবসর বিনোদনমূলক ক্রীড়া হলেও বর্তমানে তা পরিত্যক্ত। বর্তমানে ভারতে প্রচলিত অধিকাংশ ক্রীড়া ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ঔপনিবেশিক শাসকদের দ্বারা যেহেতু এদেশে প্রচলিত হয়েছে তাই এইগুলি মূলত ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির অবশেষ যা বর্তমানেও ভারতে প্রচলিত। তবে এই ঔপনিবেশিক ক্রীড়াগুলি ক্রমে ভারতীয় সমাজ সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভারতীয় সমাজ সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। ঔপনিবেশিক আমল থেকেই এই ক্রীড়া গুলি হয়ে উঠেছিল জাতীয়তাবাদ প্রকাশের ক্ষেত্র যেখানে ভারতীয়রা তাদের ঔপনিবেশিক শাসকদের সঙ্গে চোখে চোখ রেখে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারতো এবং এমনকি তাদের পরাজিত করতে পারত, যা ব্রিটিশ জাতির জাত্যাভিমানে আঘাত দিয়ে ভারতীয় শ্রেষ্ঠত্বের নজির হয়ে উঠত। এই ক্রীড়া

গুলি ভারতের সামনে সুযোগ করে দিয়েছে আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর তুলে ধরতে কারণ পশ্চিমী ক্রীড়া গুলির অধিকাংশ আন্তর্জাতিক স্তরে সংগঠনের অধীনে আয়োজিত হয়ে থাকে। ভারত পশ্চিমী ক্রীড়ায় যেমন ক্রিকেট, হকি সহ একাধিক ক্ষেত্রে নিজেকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসিয়েছে, তেমনই অন্যদিকে তার সামনে সুযোগ রয়েছে অন্য আরও অনেক ক্ষেত্রে নিজের প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর। একথা সত্যি জনসংখ্যার নিরিখে ভারতের ক্রীড়া সাফল্য সীমিত এমনকি গুরুত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ক্রীড়ার মধ্যে তারতম্য বর্তমান, এর পাশাপাশি ক্রীড়া সংগঠন, সুযোগ-সুবিধা এবং সরকারি স্তরেও নানা ত্রুটি বর্তমান, তা সত্বেও একাধিক ক্রীড়ায় ভারতীয়রা সাফল্য প্রদর্শন করেছে। উক্ত অধ্যায়ে মূলত প্রাচীন থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত ভারতে প্রচলিত ক্রীড়া গুলির একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে, যা নির্দিষ্ট বিষয়গত আলোচনার পূর্বে একটি প্রাথমিক ধারণা প্রদান করবে ও দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা রক্ষায় সাহায্য করবে।

- **টীকা ও সূত্র নির্দেশ:**

১. পুরা প্রস্তর যুগের পর মধ্য প্রস্তর যুগের আবির্ভাব ঘটে। এই পর্বে মানুষের দ্বারা ব্যবহৃত হাতিয়ার গুলি আকারে অতি ক্ষুদ্র হওয়ায়, এই পর্বকে মাইক্রোলিথিক বা ক্ষুদ্রাশ্মীয় আখ্যা দেওয়া হয়। দৈর্ঘ্যে এই হাতিয়ারগুলি এক থেকে আট সেন্টিমিটার। তবে এক থেকে তিন সেন্টিমিটার দীর্ঘ হাতিয়ারের সংখ্যাই বেশি।

২. W.A. Fairservis, *The Roots of Ancient India* (London: George Allen & Unwin Ltd., 1971), 96.

৩. Ibid., 88.

৪. V.S. Wakankar and R.R. Brooks, *Stone Age Paintings in India* (Bombay: D.B. Taraporewala Sons Co., 1976), 38.

৫. Ibid., 78.

৬. D.P. Agarwal and D.K. Chakrabarti, *Essays in Indian Protohistory* (Delhi: B.R. Publishing Corporation, 1979), 226.

৭. Fairservis, *The Roots of Ancient India*, 276.

৮. H.H. Wilson, trans., *Rig-Veda Sanhita* (Delhi: Nag Publishers, 1977), VII.2.6, X.86.4.4.

৯. W.D. Whitney, trans., *Atharva-Veda-Samhita* (Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Ltd., 1971), VIII.8.5.

১০. B. Datta and R. Labhaya, eds., *Ramayana of Valmiki* (Lahore: 1931), II.94/27.

১১. K. Subhramanium, *Mahabharata* (Bombay: Bharatiya Vidya Bhavan, 1983), 7-8.

১২. E. Hultzsch, *Corpus Inscriptionum Indicarcum: Inscriptions of Asoka*, Vol. I. (Oxford: Clarendon Press, 1925), 14.

১৩. R. Shamasastry, *Kautilya's Arthasastra* (Mysore: Mysore Printing and Publishing House, 1961), 358.

১৪. R. Jain, ed., *Ancient India as Described by Megasthenes and Arrian* (New Delhi: Today and Tomorrow's Printers and Publishers, 1972), 72; R.C. Majumdar, *Classical Accounts of India* (Calcutta: Firma K.L.M Private Ltd., 1960), 271.

১৫. A.L. Srivastava, *Life in Sanchi Sculpture* (New Delhi: Abhinav Publication, 1983), 88-89.

১৬. B.M. Barua, *Barhut: Aspects of Life and Art,* Book-III. (Calcutta: Indian Research Institute Publications, 1937), Pl. XCVI, 147-148.

১৭. B.N. Saletore, *Life in the Gupta Age* (Bombay: The Popular Book Depot., 1943), 157.

১৮. M.R. Kale, *Raghuvamsa of Kalidasa* (Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Ltd., 1969), IX. 49.

১৯. J. Allan, *Catalogue of the Coins of Gupta Dynasties and of Sasanika Kings of Gauda* (London: British Museum, 1914), 383.

২০. E.B. Cowell and F.W. Thomas, trans., *Harsacarita* (London: Royal Asiatic Society, 1897), 132.

২১. C.M. Ridding, trans., *The Kadambari of Bana* (New Delhi: Oriental Books Reprint Corporation, 1974), 73-75.

২২. S. Beal, *Chinese Accounts of India: Hiuen Tsiang*, Vol. II. (Calcutta: Susil Gupta (India) Limited, 1958), 157.

২৩. Cowell and Thomas, *Harsacarita*, 231.

২৪. A.L. Basham, *The Wonder That was India: A Survey of the Culture of the Indian Sub-Continent Before the Coming of the Muslims* (New York: Grove Press, 1959), 208-209.

২৫. শিরিন রত্নাগর, *হরপ্পা সভ্যতার সন্ধানে* (কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ২০০৫), ৭২-৭৭, ১০৮-১১২।

২৬. C.J. Longman and H.W. Walrond, *Archery* (London: Longmans Green & Co., 1894), 161.

২৭. G.N. Pant, *Indian Archery* (Delhi: Agam Kala Prakashan, 1978), lp. 302.

২৮. J.A.B. Van Buitenen, trans., *The Mahabharata* (Chicago: University of Chicago Press, 1973), 50.

২৯. K. Subramanium, *Mahabharata* (Bombay: Bharatiya Vidya Bhavan, 1983), 69.

৩০. M. Bh., 1.25.25-8.66.8.

৩১. Pant, *Indian Archery*, 303.

৩২. A.A. Macdonell, *History of Sanskrit Literature* (Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Ltd., 1958), 50.

৩৩. E.J. Rapson, ed., *The Cambridge History of India*, Vol. I. (Cambridge: Cambridge University Press, 1992), 98.

৩৪. F. Max Muller, trans., *Rig-Veda-Sanhita* (London: Trubner & Co., 1869), 31.

৩৫. A.C. Das, *Rig Vedic Culture* (Cacutta: R. Cambray & Co., 1925), 254.

৩৬. Ibid., 255.

৩৭. Shamasastry, *Kautilya's Arthasastra*, 149.

৩৮. Jain, *Ancient India as Described by Megasthenes and Arrian*, 90.

৩৯. Das, *Rig Vedic Culture*, 254.

৪০. V. Sarma, ed., *Katyayana-Srauta Sutra* (Varanasi: Oriental Library Publication, 1930), XIV.3.21; Narasimhachar, eds., *Apastamba-Srauta-Sutra* (Kashi: Achyut Granthamala Karyalay, 1944), XVII/3.5.

৪১. Subramanium, *Mahabharata*, 60.

৪২. B.C. Law, *India as Described in Early Texts of Buddhism and Jainism* (London: Luzac & Co., 1941), 170.

৪৩. Ridding, *The Kadambari of Bana*, 60.

৪৪. S.H. Deshpande, *Physical Education in Ancient India* (Delhi: Bharatiya Vidya Prakashan, 1992), 46.

৪৫. Ibid., 46.

৪৬. Majumdar, *Classical Accounts of India*, 260.

৪৭. Ibid., 231.

৪৮. V.B. Mishra, *From the Vedas to Manu Samhita* (Delhi: Sterling, 1982), 79.

৪৯. Dutta and Labhaya, *Ramayana of Valmiki*, II.35/24.

৫০. Subramanium, *Mahabharata*, 51.

৫১. Ibid., 26.

৫২. H.P. Diwedi, *Prachin Bharat Ke Kalatmaka Vinod* (Bombay: Rajkamal Prakashan, 1952), 141-142.

৫৩. Law, *India as Described in Early Texts of Buddhism and Jainism*, 171.

৫৪. Majumdar, *Classical Accounts of India*, 231.

৫৫. Barua, *Barhut: Aspects of Life and Art,* Pl. XCVI.

৫৬. S.C. Kala, *Terracotta Figurines from Kausambi* (Allahabad: The Muncipal Museum, 1950), 50.

৫৭. B.N. Puri, *India in the Time of Patanjali* (Bombay: Bharatiya Vidya Bhavan, 1968), 102-105.

৫৮. A. Mitra Shastri, *India as seen in the Brhatsamhita of Varahamihira* (Delhi: Motilal Banarsidass Publishers, 1960), 259.

৫৯. H.C. Chakladar, *Social Life in Ancient India*, (Calcutta: Greater India Society, 1929), 162.

৬০. D.C. Mujumdar, ed., *Encyclopedia of Indian Physical Culture* (Baroda: Good Companions, 1950), 9.

৬১. Deshpande, *Physical Education in Ancient India*, 205.

৬২. Mujumdar, *Encyclopedia of Indian Physical Culture*, 2.

৬৩. Deshpande, *Physical Education in Ancient India*, 49.

৬৪. Ibid., 4.

৬৫. S. Beal, *The Romantic Legend of Sakya Buddha* (London: Trubner & Co., 1875), 71.

৬৬. Ronojoy Sen, *Nation at Play: A History of Sport in India* (New York: Columbia University Press, 2015), 19.

৬৭. H. Bolchmann, trans., *The Ain-I-Akbari* (Calcutta: Asiatic Society of Bengal, 1927), 292.

৬৮. M.N. Pearson, "Recreation in Mughal India," *British Journal of Sports History* I, no. 3 (1984): 343.

৬৯. Seema Alavi, "Of Badshahs, White Sahibs and Black Natives," *The Hindu*, May 2, 1999.

৭০. Sen, *Nation at Play*, 25-26.

৭১. Bolchmann, *The Ain-I-Akbari*, 309.

৭২. Ibid., 309-310.

৭৩. Bolchmann, *The Ain-I-Akbari*, 310.

৭৪. Mujumdar, *Encyclopedia of Indian Physical Culture*, 15.

৭৫. Robert Sewell, *A Forgotten Empire (Vijayanagar): A Contribution of the History of India* (London: Swan Sonnenschein, 1900), 271.

৭৬. Ibid., 378.

৭৭. Wheeler M. Thackston, trans., *The Baburname: Memories of Babur, Prince and Emperor* (Washington D.C: Simithsonian Institution, 1996), 416.

৭৮. Sen, *Nation at Play*, 28.

৭৯. B.J. Sandesara and R.N. Mehta, ed., *Mallapurana* (Baroda: Oriental Institute, 1964), 21.

৮০. Vena Das, *Structure and Cognition: Aspects of Hindu Caste and Ritual* (Delhi: Oxford University Press, 1987), 81-82.

৮১. Sandesara and Mehta, *Mallapurana*, 22.

৮২. Ibid., 24-25.

৮৩. George Orwell, *Burmese Days* (London: Penguin, 1989), 14.

৮৪. The First Fifty Years: Bombay Gymkhana, (Bombay: 1964), 2.

৮৫. Charles Allen, ed., *Plain Tales from the Raj* (London: Andre Deutsch, 1975), 101.

৮৬. Sen, *Nation at Play*, 35.

৮৭. Ibid., 47-48.

৮৮. Ibid., 50-52.

৮৯. Allen, *Plain Tales from the Raj*, 156.

৯০. Tony Mason and Eliza Riedi, *Sport and the Military: The British Armed Forces 1880-1960* (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 33.

৯১. Sen, *Nation at Play*, 37-38.

৯২. Ibid., 60-69.

৯৩. Ibid., 74.

৯৪. Boria Majumdar, *Cricket in Colonial India: 1780- 1947* (London: Routledge, 2008), 75.

৯৫. Arjun Appadurai, "Playing With Modernity: The Decolonization of Cricket," in *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*, Arjun Appadurai (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996), 93.

৯৬. Sen, *Nation at Play*, 47-49.

৯৭. বোরিয়া মজুমদার, *শতশিল্পে আলোকিত ভারতের ক্রীড়া ইতিহাস* (কলকাতা: দীপ প্রকাশন, ২০১৯), ১৭।

৯৮. Sen, *Nation at Play*, 53-56.

৯৯. Richard Cashman, *Patrons, Players and the Crowd: The Phenomenon of Indian Cricket* (New Delhi: Oriental Longman, 1980), 47.

১০০. Sen, *Nation at Play*, 93.

১০১. Ibid., 89-90.

১০২. Ashis Nandy, *The Tao of Cricket: On Games of Destiny and the Destiny of Games* (Oxford: Oxford University Press, 2001), 1.

১০৩. Cashman, *Patrons, Players and the Crowd*, 142.

১০৪. Appadurai, "Playing With Modernity: The Decolonization of Cricket," 102.

১০৫. Nandy, *The Tao of Cricket: On Games of Destiny and the Destiny of Games*, 21.

১০৬. Ramchandra Guha, *A Corner of a Foreign Field: The Indian History of a British Sport* (New Delhi: Penguin Books, 2014), 340.

১০৭. Ramchandra Guha, "The Serpent in the Garden," June 1, 2013, Available at espncricinfo.com.

১০৮. Mihir Bose, *The Magic of Indian Cricket: Cricket and Society in India* (London: Routledge, 2006), 86.

১০৯. Sen, *Nation at Play*, 52-56.

১১০. Ibid., 102-112.

১১১. Ibid., 121-133.

১১২. কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *খেলা যখন ইতিহাস* (কলকাতা: সেতু প্রকাশনী, ২০১৯), ৮৭-৯৭।

১১৩. বোরিয়া মজুমদার এবং নলিন মেহতা, *একশো কোটি মানুষের স্বপ্ন ভারতবর্ষ আর অলিম্পিক* (কলকাতা: দীপ প্রকাশন, ২০২০), ১৪৭-১৫১।

১১৪. Edward Arthur Henry Blunt, *The ICS: The Indian Civil Service* (London: Faber & Faber, 1937), 221.

১১৫. George John Younghusband, *Polo in India* (London: W.H. Allen, 1890), 2.

১১৬. Sen, *Nation at Play*, 38-44.

১১৭. Ibid., 78-81.

১১৮. Ibid., 44-47.

১১৯. Ibid., 165-185.

১২০. Ibid., 212.

১২১. মজুমদার এবং মেহতা, *একশো কোটি মানুষের স্বপ্ন ভারতবর্ষ আর অলিম্পিক*, ৩১১-৩১৩।

১২২. তদেব, ৩২৮-৩২৯।

১২৩. Sen, *Nation at Play*, 293.

১২৪. মজুমদার এবং মেহতা, *একশো কোটি মানুষের স্বপ্ন ভারতবর্ষ আর অলিম্পিক*, ৩৩০।

১২৫. মজুমদার, *শতশিল্পে আলোকিত ভারতের ক্রীড়া ইতিহাস*, ১৬৫।

১২৬. Sen, *Nation at Play*, 221-222.

১২৭. Ibid., 230.

চতুর্থ অধ্যায়:

জেলা রূপে নদীয়া

ও

তার ক্রীড়া পরিমণ্ডল

বাংলার সুপ্রাচীন জনপদ নদীয়া বহুমুখী সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ এক বিশেষ অঞ্চল। নদীয়ার ইতিহাস ও ঐতিহ্য শুধুমাত্র আঞ্চলিক ইতিবৃত্তের দিক থেকেই নয়, বাংলার জাতীয় জীবনধারার পরিচয় পাঠের দিক থেকেও এক মূল্যবান সম্পদ। প্রাচীন কাল থেকেই নদীয়া জ্ঞান ও গৌরবের গৌরবান্বিত পিঠস্থান হিসেবে সর্বত্র পরিচিত। নদীয়ার এই পরিচিতির কথা আমরা বিশেষভাবে জানতে পারি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে। ১৩৩১ বঙ্গাব্দের ১০ই আশ্বিন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, নদীয়া শাখার বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষনে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নদীয়া জেলার সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বলেছিলেন, “শিশুকাল থেকেই কৃষ্ণনগর নামটি আমার কাছে পরিচিত এবং সে পরিচয় ঘটেছিল আমার পিতামহীর মুখে নানা বিচিত্র গল্প ও ছড়ার মধ্যে দিয়ে। সাহিত্যরসের সে মধুর আস্বাদ এই প্রাচীন বয়সেও আমি ভুলি নাই। এই জনপদ যে একদিন শিল্পকলা ও সাহিত্যের কেন্দ্র ছিল, আমি নিশ্চয়ই জানি, এ কথা বললে অতিশয়োক্তি অপরাধ হয় না।”[১] এর থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে নদীয়া জেলার ইতিহাস কতটা সমৃদ্ধশালী। আর এই ইতিহাস কালের ক্রমবিবর্তনের ধারায় স্বাভাবিকভাবেই পরিবর্তিত হতে হতে সাম্প্রতিক রূপ লাভ করেছে। জেলা হিসেবে নদীয়ার আত্মপ্রকাশ মূলত ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনের সময় হলেও জনপদ হিসেবে এর অবস্থান অনেক প্রাচীন। যদিও নদীয়া জেলার নামকরণ, এর ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়ে গবেষক মহলে যথেষ্ট মতভেদ আছে। ইতিহাস বলতে যেমন আক্ষরিক অর্থে অতীত ঘটনাকে বোঝায়, তেমনি অতীত ঘটনাগুলি সর্বদা কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে, যেমন- ফরাসি বিপ্লব বলতে আমরা বুঝি ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সে সংঘটিত বিপ্লব। সুতরাং ইতিহাসের কোনো বিষয় যথার্থভাবে অনুধাবনের জন্য প্রয়োজন হয় ভূগোল সংক্রান্ত প্রাথমিক জ্ঞানের।[২] এই গবেষণা যেহেতু নদীয়া জেলার ক্রীড়া ইতিহাস ও ক্রীড়া সংগঠন নিয়ে, তাই এই সংক্রান্ত যাবতীয় আলোচনার পূর্বে আমাদের জেলার অতীত ইতিহাস ও জেলা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে হবে।

• ৪.২. নামকরণের আলোকে নদীয়া:

নদীয়া নামের উৎপত্তি তথা জেলার নামকরণের ক্ষেত্রে একাধিক মতামত বর্তমান, এমনকি জেলা বিশেষজ্ঞদের মধ্যে এই নিয়ে বিতর্ক ও মতান্তর রয়েছে। নদীয়ার নামকরণ সংক্রান্ত প্রথম যে মতটি প্রচলিত সেই মতানুসারে পূর্বে কোনো এক সময় অনেক নদী এই স্থানেই সাগরের সঙ্গে সঙ্গমিত হতো বলে এই স্থানকে 'নদীয়া' বা নদী বিশিষ্ট বলা হয়।[৩] তবে নদীয়া জেলার অন্যতম প্রাচীন জনপদ নবদ্বীপ নাম থেকেই যে নদীয়া নামের উৎপত্তি হয়েছে সেই বিষয়ে অধিকাংশ জেলা বিশেষজ্ঞ একমত।[৪]

নদীয়ার নামকরণের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় মতটি হলো নয়টি দ্বীপের সমষ্টি অর্থে 'নবদ্বীপ' এবং তার থেকে পরবর্তীতে নদীয়া নামের উৎপত্তি। এই মতের সমর্থক নরহরি চক্রবর্তী- এর মতে 'নবদ্বীপ' নাম থেকে 'নদীয়া' নামের সৃষ্টি এবং নয়টি দ্বীপের সমষ্টি থেকে 'নবদ্বীপ' নামের উৎপত্তি। "নবদ্বীপ পরিক্রমা পদ্ধতি" গ্রন্থে তিনি লিখেছেন-

"নদীয়া পৃথক গ্রাম নয়।
নবদ্বীপে, নবদ্বীপ বেষ্টিত যে হয়।।
নয় দ্বীপে নবদ্বীপ নাম।
পৃথক পৃথক কিন্তু হয় এক গ্রাম।।
বৈছে রাজধানী কোন স্থান।
যদাপি অনেক তথা হয় এক নাম।।"[৫]

উক্ত গ্রন্থে নরহরি চক্রবর্তী ভাগীরথীর পূর্ব ও পশ্চিম পারের নয়টি দ্বীপের কথা উল্লেখ করেছেন যার মধ্যে পূর্ব পারে অবস্থিত চারটি দ্বীপ হলো- অন্তদ্বীপ (মায়াপুর), সীমান্তদ্বীপ (সিমলা ও সরডাঙা), গোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা ও সুবর্ণ বিহার) ও মধ্যদ্বীপ (মাজদিয়া), এবং পশ্চিম পারে অবস্থিত পাঁচটি দ্বীপ হলো- কোলদ্বীপ

(কুলিয়া ও সমুদ্রগড়), ঋতুদ্বীপ (রাহুতপুর ও বিদ্যানগর), মোদদ্রুদ্বীপ (মহৎপুর), জহ্নুদ্বীপ (জানুয়ারিনগর) ও রুদ্রদ্বীপ (রুদ্রডাঙা)।[৬]

তৃতীয় মতানুসারে 'ন' বা 'নব' অর্থে নয় ও 'দীয়া' অর্থে দীপ বা প্রদীপ। কথিত আছে প্রাচীনকালে গঙ্গা মধ্যস্থলে একটি চর অবস্থিত ছিল যেখানে পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকেরা কৃষিকাজ ও পশুচারণ সহ নানা কারণে ধীরে ধীরে এসে বসতি স্থাপন করতে থাকেন। সেই সময় পর্বে একজন সন্ন্যাসী ঐ চরে রাত্রে নয়টি দীয়া বা দীপ জ্বেলে সাধনায় মগ্ন হতেন। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কৃষকবর্গের লোকেরা ও ভাগীরথী নদীতে যাতায়াতকারী নৌকারোহীরা রাত্রে সন্ন্যাসী কর্তৃক প্রজ্জ্বলিত সেই নয়টি দীপ বা দীয়া দূর থেকে পর্যবেক্ষণ করতে পারতো এবং তারা এই প্রদীপ লক্ষ করে গঙ্গা মধ্যস্থ এই চরের নামকরণ করেন 'ন-দীয়ার' চর বলে, যা ক্রমশ লোকমুখে প্রচারিত হয়ে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। অর্থাৎ 'নয়টি দীয়া' থেকে গঙ্গা মধ্যস্থ চরের নাম হয় নবদ্বীপ বা নদীয়া।[৭] লক্ষনীয় যে বাংলা ভাষার 'প্রদীপ' শব্দটির সংস্কৃত প্রতিশব্দ হলো 'দীয়া' এবং এ ক্ষেত্রে 'ন-দীয়া' শব্দের, 'দীয়া' শব্দটির যে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে তা মূলত সংস্কৃত ভাষা ভিত্তিক। সংস্কৃত ভাষা প্রধানত সেন বংশের রাজত্বকালে বাংলায় প্রসিদ্ধ লাভ করে এবং সম্ভবত সেই প্রভাবের ভিত্তিতেই তৎকালীন মানুষ প্রজ্বলিত প্রদীপকে দীয়া বলে অভিহিত করতেন। তবে সেন বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা হওয়ার বহু পূর্বেই নবদ্বীপের অস্তিত্ব ও জনবসতি বর্তমান ছিল এবং সন্ন্যাসী কর্তৃক নয়টি প্রদীপ প্রজ্বলিত করার কাহিনী সম্ভবত সেন বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা হওয়ার অনেক পূর্ববর্তী ঘটনা, কারণ এই বংশের শাসক লক্ষণ সেনের আমলে নবদ্বীপ ছিল এক জনাকীর্ণ সমৃদ্ধ নগর, অপরদিকে এই কাহিনী প্রচলিত হওয়ার সময় নবদ্বীপে নতুন বসতি স্থাপনের কথা বলা হয়েছে।

চতুর্থ মতে, 'নব' অর্থে নতুন এবং জল বিশিষ্ট ভূখণ্ড অর্থে 'দ্বীপ', এই দুই শব্দের সমষ্টি 'নবদ্বীপ' অর্থাৎ নতুন গঠিত দ্বীপ। "নবদ্বীপ তত্ত্ব" গ্রন্থে কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী জানিয়েছেন নবদ্বীপ হলো গঙ্গাগর্ভ থেকে উদ্ভূত নতুন দ্বীপ, আর তাই এই ভূখণ্ডের নাম হয়েছে নবদ্বীপ।[৮] কুমুদনাথ মল্লিক তাঁর "নদিয়া কাহিনী" গ্রন্থে জানিয়েছেন যে, প্রাচীনকালে নবদ্বীপ গঙ্গা মধ্যবর্তী চরভূমি ছিল এবং এই ভূখণ্ডকে বেষ্টন করে গঙ্গা ও জলঙ্গী প্রবাহিত হতো।[৯] পরবর্তীকালে নদীর গতিপথ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চর ভূমির

আয়তন বৃদ্ধি পেলে তা বসবাসের যোগ্য হয়ে উঠলে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মানুষেরা এই নদী বেষ্টিত চর ভূমিতে এসে বসতি গড়ে তুলতে থাকে যার ফলে এটি হয়ে ওঠে জনবসতিপূর্ণ এক বর্ধিষ্ণু গ্রাম যা নব-দ্বীপ নামে পরিচিত হয়ে ওঠে।[১০] ক্ষুদিরাম দাসের মতে নবদ্বীপের অর্থ নব উদ্ভূত দ্বীপ, যা ভাগীরথী ও জলঙ্গীর প্রবাহ দ্বারা বেষ্টিত দ্বীপকৃতি অঞ্চল, জলপথের দ্বারা বিচ্ছিন্ন নয়টি দ্বীপ নয়।[১১]

লক্ষনীয় যে নদীয়া জেলার নাম উৎপত্তি সংক্রান্ত যাবতীয় আলোচনা মূলত নবদ্বীপ শহরকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে এবং অধিকাংশ গবেষক ও জেলা বিশেষজ্ঞ সকলেই নবদ্বীপ থেকেই যে নদীয়া নামের উৎপত্তি হয়েছে তা মেনে নিয়েছেন। এই মতের একজন অন্যতম সমর্থক হলেন ক্ষুদিরাম দাস, তিনি তার “বৈষ্ণব রস প্রকাশ” গ্রন্থে জানিয়েছেন নদীয়ার নামের মূলে নবদ্বীপই ছিল।[১২] ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সময়ের ক্রম অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভাষার বিবর্তনের ফলে কীভাবে এক সময়ের নবদ্বীপ নামটি নদীয়া নামে রূপান্তরিত হয়েছে তার বর্ণনা তিনি দিয়েছেন এভাবে- নবদ্বীপ > ন-অদী-অ > নদীঅ > নদীয়া।[১৩] একইভাবে মোহিত রায় নবদ্বীপ থেকে নদীয়ার রূপান্তরের রূপটি বর্ণনা করেছেন এভাবে- নবদ্বীপ > ন-ব-দ্বীপ > ন-অ-দীয়া > নো-দিয়া-হ > নদিয়া।[১৪] “ক্ষিতিশবংশাবলীচরিত” গ্রন্থে দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়-ও নবদ্বীপ হতেই নদীয়া নামের উৎপত্তি হয়েছে বলে মত দিয়েছেন।[১৫] সুলতানি যুগের ইতিহাস রচয়িতা মিনহাজুদ্দিন সিরাজ ফার্সি ভাষায় রচিত “তবাকত-ই-নাসিরি” গ্রন্থে মুসলিম আক্রমণকারী বখতিয়ার খলজির বঙ্গ বিজয়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে বঙ্গদেশের রাজা লক্ষণ সেনের রাজধানী হিসেবে ‘নুদিয়া’ বা ‘নৌদিয়া’- এর উল্লেখ করেছেন।[১৬] প্রকৃতপক্ষে মুসলিম শাসনকালেই ফার্সি সরকারি ভাষা হিসেবে চালু হলে নদীয়া নামটি বহুল পরিচিত হয়, তবে দেশীয় সংস্কৃত পন্ডিতরা তাদের রচনায় নবদ্বীপ নামটি ব্যবহার করেছেন।[১৭]

প্রাথমিক পর্যায়ে নদীয়া বলতে শহর বা ক্ষুদ্র পরিসরের অঞ্চল কে বোঝালেও পরবর্তীতে তা ক্রম প্রসারিত হয়ে একটি বৃহত্তর ভৌগোলিক অঞ্চলের উপর প্রযুক্ত হয় এবং জেলা হিসেবে নদীয়া নামকরণ করা হয়। যদিও সময়ের পরিবর্তনের সাথে স্বাভাবিকভাবেই নদীয়ার ভৌগোলিক বিন্যাসে দেখা

দিয়েছে একাধিক পরিবর্তন। বিভিন্ন কাল পর্বে কখনও এর আয়তন বৃদ্ধি, কখনও বা এর আয়তনের সংকোচন ঘটেছে। 'নবদ্বীপ' নাম থেকেই যে 'নদীয়া' নামের উৎপত্তি তা মেনে নিতে আমাদের অসুবিধা নেই। নবদ্বীপ নামটি সম্ভবত পূর্বে প্রচলিত ছিল, যা সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত ও সংকুচিত হয়ে নদীয়া রূপ লাভ করে। যদিও বৃহত্তর জেলা হিসেবে নদীয়ার আত্মপ্রকাশ মূলত সাম্প্রতিক আধুনিক যুগের ঘটনা। উল্লেখ্য যে পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ জেলার নামকরণ জেলার মুখ্য সদর শহরের নামের ভিত্তিতে করা হলেও নদীয়া জেলা এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী কারণ নদীয়া জেলার মুখ্য সদর শহর কৃষ্ণনগর হলেও, এর নামকরণ করা হয়েছে জেলার ওপর এক গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন শহর নবদ্বীপকে ভিত্তি করে।

• ৪.৩. নবদ্বীপের অবস্থান সংক্রান্ত বিতর্ক:

যে নবদ্বীপ শহরকে কেন্দ্র করে নদীয়া জেলার নামের উৎপত্তি ঘটেছে তার অবস্থান নিয়েও বিতর্ক বর্তমান। সমগ্র বঙ্গ গঙ্গা নদী এবং তার অসংখ্য শাখানদী ও উপনদী গুলির দ্বারা সঞ্চিত পলি রাশির মাধ্যমে সৃষ্ট বলা যায়। বঙ্গদেশের ভূপ্রকৃতি মূলত নদীগুলির দ্বারা বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হয়েছে। নিম্ন প্রবাহে গঙ্গা এবং তার শাখানদী ও উপনদী গুলির গতিপথ পরিবর্তন এক অত্যন্ত স্বাভাবিক বিষয়। যার ফলে বিভিন্ন অঞ্চল তথা শহরের অবস্থানগত পরিবর্তনও সাধিত হতে দেখা যায়, আর এক্ষেত্রে নবদ্বীপও ব্যতিক্রমী নয়। গঙ্গা এবং তার শাখানদী ও উপনদী গুলির প্রবাহের মাধ্যমে সঞ্চিত পলি রাশির দ্বারা নবদ্বীপ শহরটি গঠিত এবং ভাগীরথী নদীর ঘনঘন গতিপথ পরিবর্তনের ফলে নদীয়া বা নবদ্বীপের অবস্থান কখনও ভাগীরথী নদীর পূর্বপাড়ে, আবার কখনও ভাগীরথী নদীর পশ্চিম পাড়ে হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বখতিয়ার খলজির নদীয়া আক্রমণের ঘটনা থেকে আমরা বর্ণনা শুরু করতে পারি। সুলতানি যুগের ঐতিহাসিক মিনহাজুদ্দিন সিরাজ ১২৪৩ সালে লক্ষণাবতীতে আসেন এবং পুনরায় দিল্লি ফিরে গিয়ে ১২৬০ সালে "তবাকাত-ই-নাসিরি" গ্রন্থ রচনা করেন, যেখানে তিনি বখতিয়ার খলজির নদীয়া বিজয়ের বর্ণনা দিয়েছেন মূলত হুসামুদ্দিন ও হিসামুদ্দিন নামে বখতিয়ারের নদীয়া আক্রমণের সঙ্গে যুক্ত দুই সৈনিকের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে।[১৮] যদিও প্রত্নতত্ত্ববিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অনেক পন্ডিতের মতে মিনহাজের বর্ণিত

'নৌদিয়া', এই নদীয়া নয় বরং বাংলাদেশের এক প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে এই 'নৌদিয়া' রাজশাহী জেলার গৌড় শহরের বিশ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। নিজ যুক্তির সমর্থনে তিনি দুটি বক্তব্য পেশ করেছেন, একদিকে পশ্চিম দিক দিয়ে বাংলায় প্রবেশের একমাত্র পথ তেলিয়াগড়ির পথে প্রথম পড়বে এই রাজশাহীর নৌদিয়া, অন্যদিকে এই নৌদিয়াতে প্রাক মুসলিম যুগের ধ্বংসাবশেষ প্রায় বিশ মাইল বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে পাওয়া গেছে। তবে অনিরুদ্ধ রায় এই মতের তীব্র বিরোধিতা করে বখতিয়ার খলজির বাংলা আক্রমণের পথটির আনুপুঙ্খিক বর্ণনা তুলে ধরে জানিয়েছেন যে, মিনহাজ বর্ণিত 'নৌদিয়া' বর্তমান নদীয়া অভিন্ন। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার, কালিকারঞ্জন কানুনগো, রমেশ চন্দ্র মজুমদার প্রমুখও মিনহাজের বর্ণিত 'নৌদিয়া' ও বর্তমান নবদ্বীপ বা নদীয়া কে অভিন্ন বলে মেনে নিয়েছেন।[১৯]

তবে এরপরেও নবদ্বীপ শহরটি গঙ্গা নদীর কোন পাড়ে অবস্থিত ছিল তাই নিয়েও মতদ্বন্দ্ব রয়েছে। মিনহাজ বখতিয়ার খলজির নৌদিয়া আক্রমণের যে বর্ণনা দিয়েছেন সেখানে তিনি বখতিয়ারের সেনাবাহিনী কর্তৃক নদী পার হওয়ার বর্ণনা দেননি, বরং রাজপ্রাসাদের পিছনে নদী ছিল বলে বর্ণনা দিয়েছেন, যে নদীপথে লক্ষণ সেন নদীয়া ত্যাগ করেছিলেন। এর মাধ্যমে আমরা ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে নদীয়ার স্থান নির্ণয় করতে পারি যা সম্ভবত গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত ছিল। প্রাচীনকালে গঙ্গার পূর্ব পাড় কে বঙ্গ এবং পশ্চিম পাড় কে রাঢ় বলা হত, অর্থাৎ মিনহাজ নদীয়া কে রাঢ় দেশের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।[২০] এর ঠিক চার শতাক পর সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ১৬৬০ সালে ভ্যান ডান ব্রুক তার রেখাচিত্রে নবদ্বীপ কে গঙ্গার পূর্ব পাড়ে অবস্থিত বলে দেখিয়েছেন।[২১] আবার "নবদ্বীপের সংস্কৃতি" প্রবন্ধে রামকান্ত চক্রবর্তী জানিয়েছেন যে চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে গঙ্গা নদী নবদ্বীপের উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে প্রবাহিত হতো।[২২] অন্যদিকে জেমস রেনেল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে তার মানচিত্রে নবদ্বীপ কে গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে স্থান দিয়েছেন।[২৩]

একইভাবে জলঙ্গী নদীর প্রবাহেরও ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। ভ্যান ড্যান ব্রুক-এর রেখাচিত্রে দেখানো হয়েছে যে জলঙ্গী নদী বর্তমান অবস্থার চেয়ে আরও দক্ষিণের দিক দিয়ে প্রভাবিত

হয়ে অম্বিকা নদীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, এখনকার মতো ভাগীরথীর সঙ্গে যুক্ত নয়। ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব কবিরাও তাদের রচনায় জলঙ্গী নদীর উল্লেখ করেননি, যার ফলে বলা যায় যে এই নদী তখনও শহর থেকে অনেক দূরে অবস্থিত ছিল।[২৪] ইংরেজ হলওয়েলের ১৭৬৫ সালের রেখাচিত্রে ও বর্ণনা থেকে জানা যায় যে জলঙ্গী আরও পশ্চিম দিকে সরে আসছিল এবং এর ফলে বর্তমানে যে স্থানে ভাগীরথী ও জলঙ্গী মিলিত হয়েছে তার কিছু উত্তরে উভয় নদী মিলিত হয়েছিল।[২৫] মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের জন্মভূমি হিসেবে পরিগণিত হওয়ায় নবদ্বীপের অবস্থান সংক্রান্ত বিতর্ক হাইকোর্টে মামলার রূপ লাভ করেছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতে। ১৮৯৬ সালে হাইকোর্টের রায়ে মায়াপুরই চৈতন্যের জন্মস্থান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। সুতরাং বলা যায় যে বর্তমান অবস্থানের চেয়ে নদীয়ার প্রাচীন অবস্থান ছিল অনেক ভিন্ন। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে নবদ্বীপের উত্তরে-পশ্চিমে ছিল ভাগীরথী এবং দক্ষিণে কিছু দূরে ছিল জলঙ্গী যার ফলে নবদ্বীপের চেহারা ছিল দ্বীপের মতো। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভাগীরথী নদীর উভয় পাশেই বসতি গড়ে ওঠে এবং নদীর গতিপথের ক্রমাগত পরিবর্তনের ফলে প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থান নির্ণয় করা আরও দুরূহ কাজ হয়ে ওঠে। নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ফলে সেন আমলের নদীয়ার প্রাসাদ ও পঞ্চরত্ন মন্দির যেটি বল্লাল ডিপি নামে পরিচিত, তা সবই পশ্চিম পাড়ে চলে যায়, আর এই শহরের বাকি অংশ নদীর গর্ভে চলে গিয়েছে বলে মনে হয়।[২৬]

• ৪.৪. ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে নদীয়া:

নদীয়ার ধারাবাহিক ইতিহাস বিশেষত প্রাচীন যুগের ইতিহাস রচনা অত্যন্ত দুরূহ এক কাজ। এক্ষেত্রে প্রাচীন নদীয়ার ইতিহাস পুনর্গঠন এর ক্ষেত্রে আমরা বৃহত্তর বাংলার ইতিহাসের ধারার সঙ্গে একে সম্পৃক্ত করে আলোচনা করতে পারি। বৃহত্তর বাংলার প্রাচীন ইতিহাসের আলোকে আমরা প্রাচীন নদীয়ার অনালোকিত অধ্যায় আলোকিত করে তুলতে পারি। প্রাচীন বাংলাদেশে কোনো কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় সত্তা ছিল না, বরং অসংখ্য ক্ষুদ্র অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। সপ্তম শতক পর্যন্ত বাংলাদেশে পুন্ড্র, গৌড়, রাঢ়, সুক্ষ, তাম্রলিপ্ত, সমতট, বঙ্গ, প্রভৃতি জনপদে বিভক্ত ছিল।[২৭] অর্থাৎ বাংলার কেন্দ্রীয় সত্তা লাভের পূর্বে বঙ্গ ছিল একটি

ক্ষুদ্র জনপদ।[২৮] এই জনপদ গুলি ছিল পরস্পর থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র।[২৯] মহাভারত, রঘুবংশ ও পুরাণের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে নবদ্বীপ ছিল পশ্চিমাংশে বঙ্গ ও পূর্বাংশের বঙ্গের মধ্যবর্তী সীমানায়। সুহমা ও বঙ্গ নামে দুই রাজ্য যথাক্রমে এই দুই অঞ্চলে শাসন করত এবং সম্ভবত পঞ্চম শতকে নবদ্বীপে বঙ্গ রাজার অধিপত্য স্থাপিত হয়।[৩০] শশাঙ্ক ৬০৩ সালে গৌড়ের রাজপদ লাভ করলে বাংলার বৃহত্তর অঞ্চল জুড়ে রাষ্ট্রীয় ঐক্য স্থাপিত হয়। সমগ্র নিম্ন বঙ্গ অঞ্চল শশাঙ্কের কর্তৃত্বাধীন হওয়ায় গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চলে অবস্থিত নদীয়া যে তার অধীনস্থ ছিল তা সহজেই অনুমেয়। বর্তমানে নদীয়ার পার্শ্ববর্তী জেলা মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত কর্ণসুবর্ণ ছিল শশাঙ্কের রাজধানী। এই সময় পর্বে নদীয়া, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম জেলার কিছু অংশ নিয়ে গঠিত ছিল শশাঙ্কের গৌড় রাজ্য।[৩১] তবে এই মত কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষের দ্বারা সমর্থিত নয়। সপ্তম শতকে বাংলা ভ্রমণকারী চৈনিক পর্যটক হিউ-এন-সাং নিম্ন গাঙ্গেয় অঞ্চলে দুইজন রাজার অস্তিত্বের কথা বলেছিলেন যাদের রাজ্যকে তিনি সমতট ও তাম্রলিপ্ত বলে বর্ণনা করেছেন। হিউ-এন-সাং বর্ণনা থেকে জানা যায় তৎকালীন নদীয়া সমতটের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সমতট সম্ভবত বঙ্গের অপর নাম।[৩২] ৬১৯ সালে শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলায় চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং তাঁর রাজ্য ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে একাধিক স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব ঘটে।[৩৩] শশাঙ্কের মৃত্যুর পরবর্তী বাংলাদেশে প্রায় দেড়শ বছর যে বিশৃঙ্খল অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তা ইতিহাসে মাৎসন্যায় নামে পরিচিত।[৩৪] এই অরাজকতার সময় পর্বে নদীয়ার ইতিহাস জানা যায় না। পাল রাজা ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসন অনুযায়ী বাংলার এই অরাজকতার অবসানের জন্য প্রবীণ নেতারা বা বিশিষ্টজনেরা ৭৫০ সালে গোপাল পাল কে রাজপদে আসীন করেন।[৩৫] পাল বংশের শাসনকালে জেলার সদর শহর কৃষ্ণনগরের অদূরে অবস্থিত 'সুবর্ণবিহার ঢিপি' পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনটিও অন্তর্ভুক্ত বলে অনেকে মনে করেন। এই অনুমান সত্য হলে নদীয়া অবশ্যই ধর্মপালের রাজ্যভুক্ত ছিল। ৮১০ সালে ধর্মপালের পুত্র দেবপাল পাল সিংহাসনে আরোহন করেন। নদীয়ার দুটি প্রাচীন জনবসতি কালীগঞ্জের দেবগ্রাম ও রানাঘাটের দেবগ্রাম রাজা দেবপালের স্মৃতি বহন করে।[৩৬] এই সমস্ত সাক্ষ্য দ্বারা সহজেই অনুমান করা যায় যে নদীয়া পাল শাসনে

তাদের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। সন্ধ্যাকর নন্দি রচিত "রামচরিত" গ্রন্থে বরেন্দ্রভূমি পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে যে সকল সহযোগী সামন্ত শাসক পাল শাসক রামপাল কে সাহায্য করেছিলেন তাদের নামের তালিকা প্রদান করা হয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম হিসেবে আমরা নদীয়ার দেবগ্রাম- এর বিক্রমরাজ কে চিহ্নিত করতে পারি।[৩৭]

নদীয়ার মোটামুটি ধারাবাহিক ইতিহাস আমরা লক্ষ করতে পারি বাংলায় সেন আমলের সময় থেকে। এই সেনরা প্রকৃতপক্ষে বঙ্গে বহিরাগত ছিলেন তাদের আদি নিবাস ছিল দাক্ষিণাত্য। সেনবংশের রাজা বিজয়সেনের রাজত্বকালে উমাপতিধর রচিত দেওপাড়া[৩৮] শিলালেখতে বলা হয়েছে দাক্ষিণাত্যের চন্দ্র বংশীয় রাজা বীরসেন তার পূর্বপুরুষ ছিলেন। লক্ষণসেনের মাধাইনগর তাম্রশাসনে সেন বংশের এক অধিপতি সামন্ত সেনকে কর্ণাট-ক্ষত্রিয় রূপে আখ্যাত করা হয়েছে, যা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে সেনরা আসলে দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক রাজ্যের অধিবাসী ছিলেন।[৩৯] উল্লেখ্য মাধাইনগর তাম্রশাসনে সেনদের কর্ণাট-ক্ষত্রিয় বলা হয়েছে যদিও দেওপাড়া লেখতে সেনদের শুধু ক্ষত্রিয় বলা হয়নি ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় বলা হয়েছে।[৪০] উমাপতি ধর রচিত দেওপাড়া প্রশস্তি থেকে জানা যায় যে সেন বংশের শাসক বিজয়সেনের পিতামহ সামন্তসেন গঙ্গা তীরবর্তী নিভৃত স্থানে বসতি নির্মাণ করেছিলেন।[৪১] হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতানুসারে সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা সামন্তসেন তার আদি নিবাস কর্নাটকে একাধিক যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সেখান থেকে পলায়ন করে বাংলায় আসেন এবং ভাগীরথী তীরবর্তী একটি ছোট অঞ্চলে নিজ কর্তৃত্ব স্থাপন করে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।[৪২] এই ভাগীরথী তীরবর্তী স্থানের অবস্থান সুনির্দিষ্ট ভাবে জানা না গেলেও সেন বংশের শাসক বিজয়সেনের রাজত্বকালের দুটি এবং তার পুত্র বল্লালসেনের রাজত্বকালের আটটি শিলালেখ ও তাম্রশাসনের প্রাপ্তিস্থান থেকে এই বিষয়ে ধারণা লাভ করা যায়। এই প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান গুলির প্রাপ্তি স্থান ছিল নদীয়ার পার্শ্ববর্তী বারাকপুর, দেওপাড়া, নৈহাট, গোবিন্দপুর প্রভৃতি।[৪৩] এছাড়াও সেন রাজা বল্লালসেন নির্মিত প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ এখনও নদীয়ার নবদ্বীপের নিকটবর্তী স্থানে বর্তমান।[৪৪] সেন আমলে রাজধানী স্থাপনের ফলে নদীয়া বা নবদ্বীপ- এর গুরুত্ব নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

১২০৩ সালে মুসলিম আক্রমণকারী বখতিয়ার খলজির বাংলা আক্রমণ ও বিজয়ের মধ্যে দিয়ে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূত্রপাত ঘটে। বখতিয়ার খলজির বাংলা আক্রমণের এক চিত্তাকর্ষক বর্ণনা দিয়েছেন মিনহাজুদ্দিন সিরাজ, তাঁর "তবাকত-ই-নাসিরি" গ্রন্থে। মিনহাজ জানিয়েছেন যে বখতিয়ার খলজি মাত্র ১৮ জন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে সেন রাজধানী 'নৌদিয়া' আক্রমণ ও দখল করেন। মিনহাজ বর্ণিত 'নৌদিয়া' বর্তমান নবদ্বীপ বলে অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মত, যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। সেই সময় সেন বংশীয় শাসক লক্ষণসেন তার একাধিক রাজধানীর মধ্যে অন্যতম নবদ্বীপে অবস্থান করছিলেন। মধ্যাহ্ন ভোজনে রত লক্ষণসেন আক্রমণের সংবাদ পেয়ে, তা প্রতিহত করার কোন চেষ্টা না করে প্রাসাদের পেছনের দরজা দিয়ে নৌকাযোগে পূর্ববঙ্গে পালিয়ে যান। যথার্থ প্রতিরোধের কোন প্রচেষ্টা ব্যতীত লক্ষণসেনের এই পলায়নের ঘটনার জন্য অনেকে তার বিরূপ সমালোচনা করে থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তখন নবদ্বীপ ছিল এক সমৃদ্ধ নগর তাই সেখানে অশ্ব বণিকদের আগমন ছিল এক স্বাভাবিক ঘটনা, আর এই কারণে বখতিয়ার খলজি তার ১৮ জন অশ্বারোহী সৈনিকসহ অশ্ব ব্যবসায়ির বেশে নবদ্বীপে প্রবেশ করলে কেউ তাদের সন্দেহ করেনি এবং এর ফলে তারা খুব সহজেই প্রাসাদের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পেরেছিল বিনা বাধায়। এর পরবর্তীতে যখন বখতিয়ার খলজি ও তার ১৮ জন অশ্বারোহী সৈনিক তাদের আসল রূপ ধারণ করে, ততক্ষণে বখতিয়ার খলজির বিশাল সেনাবাহিনী নবদ্বীপে এসে পৌঁছায় তখন প্রতিরোধের জন্য অনেক দেরি হয়ে গেছিল, ফলে লক্ষণসেন বিনা প্রতিরোধে পলায়ন করতে বাধ্য হন।[৪৫] সম্ভবত এই কারণেই ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় লক্ষণসেন সম্পর্কে বলেছেন, "লক্ষণ সেন কাপুরুষ ছিলেন না তিনি হতভাগ্য। সমাজ ও ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে, ইতিহাস চক্রের জটিল ও অমোঘ আবর্তনে বাংলার ইতিহাস শতাব্দী ধরিয়া যে অনিবার্য পরিণতির দিকে অগ্রসর হইতেছিল, লক্ষণ সেন তাহার শেষ অধ্যায় মাত্র।"[৪৬] নদীয়া দখলের পর্ব সম্পন্ন করে নবদ্বীপের রাজপ্রাসাদ ও নগর লুণ্ঠন এবং ধ্বংস করে বখতিয়ার খলজি উত্তরবঙ্গের দিকে যাত্রা করেন।

এর পরবর্তীতে বাংলায় দিল্লির সুলতানি শাসনের সূচনা হলেও তা স্থায়ী হয়নি পরবর্তীকালে বাংলার আঞ্চলিক শাসনকর্তারা দিল্লির কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে বারংবার স্বাধীনতা ঘোষণা করতে

থাকেন। যার চূড়ান্ত পরিনতিতে ১৩৪২ সালে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ বাংলায় স্বাধীন ইলিয়াস শাহী বংশের শাসনের সূচনা করেন।[৪৭] শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ চতুর্দশ শতব্দীতে লক্ষণাবতী, সাতগাঁও এবং সোনারগাঁও কে একত্রিত করে বাংলাকে রাষ্ট্রীয় সংহতি দান করেন এবং বাংলা নামে অভিহিত করেন।[৪৮] ইসলামীক শাসনকালে প্রশাসনিক কার্যের সুবিধার জন্য বাংলাকে একাধিক প্রশাসনিক এককে বিভক্ত করা হয় যথা- ইকলামী, খিত্তা, আরসাহ, ইকতা, দিয়ার প্রভৃতি।[৪৯] ফকরুদ্দিন মুবারকশাহের রাজত্বকালে সমগ্র বাংলা তার অধীনস্থ ছিল এবং নদীয়াও তার সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। নাসিরুদ্দিন মহম্মদ শাহ (১৪৩৫-১৪৩৬)- এর একটি লেখ সাতগাঁও থেকে পাওয়া গেছে, যা থেকে জানা যায় নদীয়া তার শাসনাধীন ছিল।[৫০] এর পরবর্তীতে বাংলায় হুসেন শাহী রাজ বংশের শাসনের সূচনা হলে, এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা আলাউদ্দিন হুসেন শাহ (১৪৯৩- ১৫১৯)- এর অধীনস্থ অঞ্চল হিসাবে নদীয়া শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে।[৫১] নবদ্বীপে ১৪৮৬ সালে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ঘটে এবং এর পরবর্তীতে বিভিন্ন বৈষ্ণব সাহিত্যে আমরা নবদ্বীপের বর্ণনা পাই। এর মধ্যে ১৫২৬ সালে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর পানিপথের প্রথম যুদ্ধে দিল্লির লোদি বংশীয় সুলতান ইব্রাহিম লোদি কে পরাজিত করে দিল্লিতে মুঘল শাসনের প্রতিষ্ঠা করেন। তবে মুঘল সম্রাট আকবরের সিংহাসন আরোহণের পূর্বে বাংলায় মুঘল শাসনের প্রভাব বিশেষ পড়েনি। যদিও আকবরের সিংহাসন আরোহণের পূর্বে দিল্লিতে শূর বংশীয় শাসনের প্রতিষ্ঠাতা আফগান নেতা শেরশাহ যখন বিহারের শাসক ছিলেন, তখন তিনি ১৫৩৮ সালে বাংলা আক্রমণ করে তৎকালীন হুসেন শাহী বংশের শাসক গিয়াসউদ্দিন মামুদ শাহ কে পরাজিত করে বাংলা দখল করেন।[৫২]

শেরশাহ কর্তৃক বিজয়ের পর বাংলা কিছুদিন দিল্লির শূর শাসনের অধীনে থাকলেও তা পুনরায় ১৫৬৪ সালে স্বাধীন হয়ে যায় যখন শেরশাহের প্রধান আমলাদের অন্যতম তাজ খান কাররানী বাংলায় স্বাধীন কররানী বংশের সূচনা করেন।[৫৩] কররানী বংশের শাসক দাউদ খান কররানী নদীয়ার কিছু অংশ সম্ভবত নিজ অধিকারভুক্ত করেছিলেন।[৫৪] ১৫৭৬ সালে কররানী বংশের শাসক দাউদ খান

কররানী পরাজিত করে মুঘল বাদশাহ সম্রাট আকবর বাংলাকে মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন।[৫৫] দাউদ খান ও আফগান শক্তিকে পরাজিত করে সম্রাট আকবর বাংলাকে মুঘল সাম্রাজ্য ভুক্ত করলেও সমগ্র বাংলাকে পরিপূর্ণ মুঘল নিয়ন্ত্রনে আনতে আরও দুই-দশকের মতো সময় লাগে।[৫৬] এই সময় পর্বে বাংলায় বারো-ভুঁইয়া নামক, বাংলার স্বাধীন ভূ-স্বামী জমিদারদের অন্যতম যশোরের প্রতাপাদিত্যের অধীনস্থ ছিল নদীয়ার পশ্চিম অংশ।[৫৭] মুঘল সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলে বাংলার বারো-ভূঁইয়ার অন্যতম বীর ছিলেন প্রতাপাদিত্য, যিনি যশোর, খুলনা, বাখরগঞ্জ, ও নদীয়ার দক্ষিণ অংশে নিয়ে নিজের প্রায় স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। যদিও শেষ পর্যন্ত তিনি মুঘলদের কাছে পরাজিত হন। আকবর কর্তৃক বাংলা বিজয়ের পর নতুন বিজিত এই অঞ্চলের প্রশাসনিক পুনর্গঠন অপরিহার্য হয়ে ওঠে। নব বিজিত বাংলা সুবাতে শাসন ও রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে সম্রাট আকবরের রাজস্ব মন্ত্রী টোডরমল ১৫৮২ সালে সমগ্র বাংলাকে ১৯ টি সরকার বা জেলা এবং ৬৮৯ টি মহল বা পরগণায় বিভক্ত করেন। এই প্রশাসনিক বিভাজনের ফলে নদীয়া সরকার সপ্তগ্রামের অন্তর্ভুক্ত হয়।[৫৮]

মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে নদীয়ার রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর পরবর্তীতে নদীয়া প্রকৃতপক্ষে একটি শহরের পরিবর্তে একটি বৃহত্তর অঞ্চল হিসেবে পরিগণিত হতে থাকে। আকবর কর্তৃক বিজিত ও প্রশাসনিকভাবে পুনর্গঠিত হওয়ার পরও তৎকালীন বঙ্গদেশে বেশ কয়েকজন ভূ-স্বামী ছিলেন যারা স্বাধীনভাবেই নিজেদের মতো করে অধীনস্থ অঞ্চলে শাসন পরিচালনা করতেন। এই ভূ-স্বামীদের মধ্যে অনেকেই বাংলায় মুঘল শাসন কে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে মুঘল সেনাপতি মানসিংহকে সাহায্য করেছিলেন এবং এর বিনিময়ে নিজেদের কর্তৃত্বাধীন অঞ্চলে ক্ষমতা ধরে রাখতে, তথা মুঘল প্রশাসনের স্বীকৃতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে নদীয়ার আন্দুলিয়া (বর্তমান আনুলিয়া)- এর জমিদার কাশীনাথ রায় নিহত হলে তার বিধবা স্ত্রী ও পুত্র নদীয়ার বাগোয়ান (বর্তমান বাংলাদেশে অবস্থিত)- এর জমিদার হরেকৃষ্ণ সমাদ্দারের আশ্রয় গ্রহণ করেন। হরেকৃষ্ণ সমাদ্দারের আশ্রয়ে কাশীনাথ রায়- এর পুত্রের নামকরণ করা হয় রামচন্দ্র সমাদ্দার।[৫৯] এই রামচন্দ্র সমাদ্দারের পুত্র ভবানন্দ ১০১৫ হিজরী সনে বা ১৬০৬ সালে মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর কর্তৃক প্রদত্ত ১৪

পরগনার ফরমানের বলে মহৎপুর, নদীয়া, মারুফদহ, লেপা, সুলতানপুর, কাশিমপুর, বয়শা, মশুন্ডা প্রভৃতি ১৪ টি পরগনার জমিদারি লাভ করেন।[৬০] এই ফরমান লাভ করার পর ভবানন্দ নদীয়ার রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ভবানন্দ মজুমদার নাম গ্রহণ করেন।[৬১] ১৭২৮ সালে সংস্কৃত ভাষায় রচিত "ক্ষিতীশবংশবলি চরিতং" গ্রন্থে বলা হয়েছে, ভবানন্দ শান্ডিল্য গোত্রজ ভট্টনারায়ণের কুড়ি তম অধস্তন বংশধর এবং কেশরকুলী গাঁঞ্চিভুক্তসিদ্ধ শ্রোত্রিয়। তিনি ১৬০৬ সালে মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর কর্তৃক প্রদত্ত ১৪ পরগনার সনদ (ফরমান) সূত্রে 'রাজা' উপাধি লাভ করে নদীয়া রাজ হন এবং নদীয়ার রাজবংশের সূচনা করেন। ভবানন্দের পূর্ব নাম ছিল দুর্গাদাস সমাদ্দার, তবে নদীয়ার রাজপদে আসীন হওয়ার পর তার নতুন নাম হয় ভবানন্দ মজুমদার। যদিও পরবর্তীতে নদীয়া রাজেরা 'রায়' উপাধি গ্রহণ করেন। নদীয়া রাজপদে ভবানন্দ আসীন ছিলেন বাইশ বছর (১৬০৬- ১৬২৮)। ভবানন্দ নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জ থানার মাটিয়ারিতে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। তার উত্তরাধিকারী রুদ্ররায় তৎকালীন নদীয়া রাজ্যের মধ্যবর্তী স্থানে রেউই নামক গ্রামে রাজধানী স্থাপন করেন, যে গ্রাম একই সঙ্গে নদীয়ার দুই প্রাচীন জনপদ হিসেবে পরিচিত নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল। মাটিয়ারী থেকে রেউই গ্রামে রাজধানী স্থানান্তরিত করে রুদ্র রায় এর নতুন নামকরণ করেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নামানুষারে কৃষ্ণনগর। রুদ্র রায়ের প্রথমা রানীর পুত্র রামচন্দ্র ও রামজীবন, দ্বিতীয় রানীর পুত্র রামকৃষ্ণ। ১৬৯৪ সালে রামচন্দ্র ও রামকৃষ্ণ স্বল্প কিছুদিনের জন্য নদীয়ার রাজা হন। রামজীবন ১৬৯৪ থেকে ১৭১৫ সাল পর্যন্ত নদীয়ার রাজপদে নিজ কর্তব্য পালন করেছিলেন। রামকৃষ্ণ ও রামজীবন নব্য প্রতিষ্ঠিত রাজধানী নগর কৃষ্ণনগরের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি করেন। রামজীবনের প্রথমা রানীর পুত্র রাজারাম ও কৃষ্ণরাম, দ্বিতীয়া রাণীর পুত্র হলেন রঘুরাম এবং তৃতীয়া রাণীর পুত্র হলেন রামগোপাল। রঘুরাম নদীয়া রাজপদে ১৭১৫- ১৭২৮ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। রঘুরামের পুত্র হলেন সুবিখ্যাত কৃষ্ণচন্দ্র রায় (১৭১০-১৭৮২)। কৃষ্ণচন্দ্র রায় ১৭২৮ থেকে ১৭৮২ সাল পর্যন্ত নদীয়া রাজপদে আসীন ছিলেন।[৬২] কৃষ্ণচন্দ্র রায় অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাসে এক বর্ণময় চরিত্র। কৃষ্ণচন্দ্রের শিক্ষানুরাগ, বিদ্যোৎসাহ ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অগাধ অনুরাগ এবং পৃষ্ঠপোষকতা তাকে বাংলার ইতিহাসে বিশিষ্টতা দান করেছে। তবে কৃষ্ণচন্দ্রের প্রধান পরিচয় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির

পৃষ্ঠপোষকতার জন্য এবং তিনি রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের সমাজপতিও ছিলেন। কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর, সাধক কবি রামপ্রসাদ সেন সহ বহু গুণাগুণীরা তার রাজসভায় সভাসদের পদ অলংকৃত করতেন। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর বঙ্গ সংস্কৃতির অন্যতম অভিকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন কৃষ্ণনগর তথা নদীয়াকে।[৬৩]

নদীয়া রাজের জমিদারির আয়তন বিভিন্ন সময় ক্রম বিস্তৃত হয়েছে। নদীয়ার রাজবংশের শাসকেরা মূলত অন্যান্য ঋণ খেলাপি জমিদারদের জমি কিনে এবং সেই ঋণ করের মাধ্যমে পরিশোধ করে নিজেদের অধিকৃত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করেছিলেন, যার প্রমাণ পাওয়া যায় মুঘল সম্রাট শাহজাহান ও ঔরঙ্গজেবের দুটি ফরমানে। নদীয়া রাজ রুদ্র রায় কলকাতা পরগনার এক-চতুরাংশ চৌধুরী হিসাবে ভাগ পান কর বাবদ ৬,২৬৫ টাকা প্রদানের বিনিময়ে।[৬৪] নদীয়ার জমিদারি বিভিন্ন রাজা বিশেষত গোপাল, রাঘব, রুদ্র ও রামকৃষ্ণের আমলে বাড়তে থাকে। কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে জমি মহলের সংখ্যা ৮৪ তে বেড়ে যায়, যার অন্তর্ভুক্ত ছিল ৪৯ টি পরগণা এবং ৩৫ টি কিসমত (কিসমত মানে ভাঙ্গা পরগণা)। অধিগ্রহণকারী মহল আয়ের ভিত্তিতে কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে দুই ভাগে বিভক্ত করা হতো। প্রথমভাগকে বলা হতো ‘মোদাখিল’ ও দ্বিতীয় ভাগকে বলা হতো ‘মোখারিজ’। কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে ১৭২৮ থেকে ১৭৬৫ সালের মধ্যে নদীয়ার রাজার মোদাখিল থেকে আয় ছিল ৮১,৫৯৭ টাকা এবং মোখারিজ থেকে আয় ছিল ৪৯,৩৯৪ টাকা। ১৭৪০ সালে কৃষ্ণ চন্দ্রের অধীনে ছিল ৩,০৯১ বিঘা জমি যা ছড়িয়েছিল ২৮ টি পরগণায়।[৬৫] রাজ্যের উত্তর সীমা মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ সীমা গঙ্গাসাগর, পূর্ব সীমা ধুনিয়াপুর এবং পশ্চিম সীমা ছিল ভাগীরথী নদী। এছাড়াও ভাগীরথীর পশ্চিম পাড়ে কুবেজপুর নামে একটি বড় পরগণা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অধিকারভুক্ত ছিল।[৬৬]

মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেব তার পুত্র আজিম-উস-সানকে ১৬৯৭ সালে বাংলার সুবাদার করে পাঠালেও, কিছুকালের মধ্যে মুর্শিদকুলি খাঁকে ১৭০২ সালে দেওয়ান পদের দায়িত্ব দেন। আজিম-উস-সানের সঙ্গে মুর্শিদকুলি খাঁর বিরোধের ফলে মুর্শিদকুলি দেওয়ানী দপ্তর ১৭০৪ সালে ঢাকা থেকে মুখসুদাবাদে স্থানান্তরিত করেন। মুর্শিদকুলি ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে মহল্লার পত্তন করেন এবং পূর্ব পাড়ে রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে রাজধানী মুখসুদাবাদের নামান্তর করেন মুর্শিদাবাদ।

এরপর মুর্শিদকুলি খাঁ বাংলায় নবাবী শাসনের প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৭২২ সালে তিনি প্রশাসনিক এলাকার পুনর্গঠন করেন। তিনি প্রশাসনিক একক 'সরকার'- এর নাম পাল্টে 'চাকলা' এবং 'মহাল'- এর নাম পাল্টে 'পরগনা' করেন। তার শাসনকালে চাকলা নদীয়ার সৃষ্টি হয়।[৬৭] বাংলার নবাবী শাসনকালে নদীয়া রাজগণ নবাবের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে নবাব কে বার্ষিক কর প্রদান করতেন।

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলা ইংরেজি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে পরাজিত হলে বাংলার স্বাধীন নবাবীর অবসান ঘটে। এরপর ১৭৬৫ সালে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের কাছ থেকে দেওয়ানি অধিকার লাভ করার মাধ্যমে ইংরেজি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ালি মামলার বিচার এবং রাজস্ব আদায়ের অধিকার অর্জন করে। এইভাবে নদীয়ার উপরেও ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দেওয়ানি লাভ করার পর নদীয়ার রাজস্ব পেতে থাকে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। নদীয়া রাজ কৃষ্ণচন্দ্র পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে ইংরেজদের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। ইংরেজদের পক্ষ অবলম্বনে পুরস্কার স্বরূপ কৃষ্ণচন্দ্র কে ক্লাইভ পলাশীর যুদ্ধে ব্যবহৃত কামান প্রদান করেন ও দিল্লির দরবার থেকে 'মহারাজেন্দ্র বাহাদুর' উপাধি পেতে সাহায্য করেন।[৬৮] ইংরেজ শাসনকালে বিভিন্ন সময় প্রশাসনিক কারণে নদীয়ার আকৃতির পরিবর্তন ঘটেছে এছাড়াও নতুন নতুন ভূখণ্ড অধিকার ও নদ-নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ফলেও নদীয়ার সীমারেখা পরিবর্তিত হয়েছে।[৬৯] কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শিবচন্দ্রের সময় থেকেই ইংরেজদের হাতে নদীয়ার রাজবংশের প্রতিপত্তি কমতে শুরু করে এবং রাজস্ব মেটাতে না পারায় তাঁর জমিদারির কিছু অংশ নিলামও হয়ে যায়। শিবচন্দ্রের পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রের আমলে জমিদারের পরিমাণ প্রায় অর্ধেক হয়ে যায়।[৭০] নদীয়ার সীমারেখা পরিবর্তনের যে ধারা তার সূচনা হয়েছিল বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংস- এর সময় থেকে। ওয়ারিং হেস্টিংস ১৭৭২ সালে বাংলাকে ১৯ টি জেলায় বিভক্ত করে প্রতিটি জেলার দায়িত্ব কালেক্টরদের উপর ন্যস্ত করেন। তিনি বাংলাকে যে ১৯ টি জেলায় বিভক্ত করেছিলেন সেগুলি হলো- হুগলী, মোহাম্মদশাহী, দিনাজপুর, নদীয়া, রংপুর, বীরভূম, যশোর, ঢাকা, রাজশাহী, লস্করপুর, রোকনপুর, ত্রিপুরা, নোয়াখালী, চুনাখালি, জাহাঙ্গিরপুর, চট্টগ্রাম, বর্ধমান, মেদিনীপুর, এবং কলকাতা।[৭১] এই পরিবর্তন অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী

হয়নি ১৭৭৩ সালে বাংলাকে জেলার পরিবর্তে পাঁচটি প্রদেশে বিভক্ত করা হয় এবং এই সময় পর্বে কলকাতা প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করা হয় নদীয়া কে, এই প্রশাসনিক গঠন ১৭৭৫ সাল পর্যন্ত কার্যকর ছিল।[৭২] বড়লাট হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার পর লর্ড কর্নওয়ালিশ, ১৭৮৬ সালে রাজস্ব ব্যবস্থার পুনর্গঠন করে রাজস্ব সংগ্রহ নিশ্চিত করতে এবং বাংলায় ইংরেজ শাসনকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করতে সমস্ত ভারতীয় আধিকারিকদের অপসারণ করে ইউরোপীয় আধিকারিক নিয়োগের নীতি প্রবর্তন করেন।[৭৩]

লর্ড কর্নওয়ালিশ- এর উদ্যোগে বাংলায় স্থায়ীভাবে জেলা ব্যবস্থার সূচনা ঘটে। তিনি ১৭৮৭ সালে পূর্বের দেওয়ান শাসিত ২৮ টি জেলাকে পুনরবিন্যস্ত করে ১৪ টি জেলা তৈরি করেন যথা- দিনাজপুর, রংপুর, বীরভূম, যশোর, ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, ভুলুয়া, ময়মনসিংহ, ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, বর্ধমান, মেদিনীপুর এবং নদীয়া।[৭৪] ১৭৮৭ সালে নদীয়া জেলা গঠিত হয় ছটি মহকুমা নিয়ে, এই ছটি মহকুমা ছিল- কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর, চুয়াডাঙ্গা, বনগ্রাম, কুষ্টিয়া এবং মেহেরপুর। এইভাবে ১৭৮৭ সালে নদীয়া স্থায়ীভাবে প্রশাসনিক স্তরে পৃথক জেলার মর্যাদা লাভ করে যা আজও বর্তমান। নদীয়া জেলার সর্বপ্রথম কালেক্টর হিসেবে ১৭৮৭ সালে নিযুক্ত হন এম.এফ. রেডফারন এবং তার সহযোগী হিসেবে নিযুক্ত হন মি.জি. চেরি।[৭৫] এর পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে নদীয়ার আয়তনের পরিবর্তন ঘটেছে। ১৭৯৪ সালে যশোর, ২৪ পরগনা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, রাজশাহী এবং ঢাকা জেলার সীমানা পুনর্গঠিত করা হয়।[৭৬] ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে বসিরহাট ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল যশোর জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে নদীয়ার কিছু অংশ হুগলি জেলার সঙ্গে এবং ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দে কিছু অংশ মুর্শিদাবাদ জেলার সঙ্গে যুক্ত হয়। ১৮০২ সালে আনোয়ারপুর মৌজার কিছু অংশ, ১৮২০ সালে কোটচাঁদপুর মৌজার কিছু অংশ নদীয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে পার্শ্ববর্তী জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়।[৭৭] ১৮২৩ সালে মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়াকে যশোর থেকে বিচ্ছিন্ন করে নদীয়া জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়।[৭৮] ১৮৫৪ সালে কৃষ্ণনগর শহরকে জেলার মুখ্য সদর শহর হিসেবে গ্রহণ করে নদীয়া ডিভিশন গঠন করা হয়।[৭৯] চার্লস গ্রান্ট ১৮৬০ সালে নদীয়া বিভাগকে চারটি ডিসট্রিক্ট ও ১৮ টি সাব-ডিভিশনে বিভক্ত করেন। এই ১৮ টি সাব-ডিভিশন ছিল- কুষ্টিয়া,

মেহেরপুর, ঝিনেদহ, চুয়াডাঙা, কৃষ্ণনগর (সদর), মাগুরা, কোটচাঁদপুর, নড়াইল, যশোহর, বনগ্রাম, শান্তিপুর, খুলনা, সাতক্ষীরা, বসিরহাট, বারাসাত, আলিপুর, পোর্ট মাতলা (বর্তমান বারুইপুর), ডায়মন্ড হারবার। ঔপনিবেশিক শাসনকালে মূলত কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর ও বনগাঁ মহকুমা নিয়ে নদীয়া জেলা গঠিত ছিল। ১৮৮২ সালে বনগাঁ মহকুমা যশোরের সঙ্গে এবং ১৮৮৮ সালে নবদ্বীপের উত্তরে অবস্থিত অগ্রদ্বীপ অঞ্চলটি নদীয়া জেলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে বর্ধমান জেলার সাথে যুক্ত করা হয়।[৮০]

নদীয়া জেলার গঠনে সবথেকে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের সময়। ১৯৪৭ সালের ১৮ই জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতের স্বাধীনতা আইন পাস হয়। এই আইনে ভারতের স্বাধীনতার কথা বলা হলেও, একই সঙ্গে ১৯৪৭ সালের ৩রা জুনের মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা অনুসারে ভারত বিভাজনেরও অনুমোদন প্রদান করা হয়। মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা অনুসারে ভারত দ্বিখণ্ডিত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটে। ভারত একটিমাত্র ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে থাকলেও নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রটি দুটি পৃথক ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে পড়ে। এই বিভাজনের ক্ষেত্রে মূল সমস্যা সৃষ্টি হয় পাঞ্জাব ও বাংলা প্রদেশ দুটিকে নিয়ে। এই দুই প্রদেশে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও তা সম্পূর্ণ রূপে মুসলিম অধ্যুষিত ছিল না। দেশভাগের সময় বাংলার মোট জনসংখ্যার ৫৪.৪ শতাংশ এবং পাঞ্জাবে মোট জনসংখ্যার ৫৫.৭ শতাংশ ছিল মুসলিম। এর পরিণতিতে ভারত বিভাজনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশ দুটিও দ্বিখণ্ডিত হয়।[৮১] বিখ্যাত ইংরেজ ব্যারিস্টার স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফের সভাপতিত্বে গঠিত সীমানা কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাজনের মাধ্যমে গঠিত পশ্চিম পাঞ্জাব ও পূর্ব বাংলা প্রদেশ দুটি পাকিস্তানের সঙ্গে এবং পূর্ব পাঞ্জাব ও পশ্চিম বাংলা ভারতবর্ষের সঙ্গে যুক্ত হয়। কলকাতা সহ সম্পূর্ণ বর্ধমান ডিভিশন ও দার্জিলিং জেলা নিয়ে গঠিত হয় পশ্চিমবঙ্গ, যার সঙ্গে পরবর্তীতে যুক্ত হয় কোচবিহার দেশীয় রাজ্য। পূর্ববঙ্গ নিয়ে গঠিত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয় সম্পূর্ণ চট্টগ্রাম ডিভিশন ও ঢাকা ডিভিশন, রাজশাহী ডিভিশনের রাজশাহী, রংপুর, বগুড়া, পাবনা প্রভৃতি জেলা এবং প্রেসিডেন্সি ডিভিশনের খুলনা জেলা। এই বিভাজনের ফলে নদীয়া জেলাও খন্ডিত হয়। নদীয়া জেলার চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়া মহকুমা দুটির সম্পূর্ণ

এলাকা এবং মেহেরপুর মহকুমার বৃহদাংশ নদীয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে নব গঠিত পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করা হয় এবং সেই বিচ্ছিন্ন করা অংশ নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের কুষ্টিয়া জেলা গড়ে ওঠে।[৮২] দেশভাগ পরবর্তীতে নদীয়া জেলার যে সকল থানা গুলি পূর্ব পাকিস্তানের কুষ্টিয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত হয় বলে তৎকালীন অমৃতবাজার পত্রিকায় বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলি হলো- খোকসা, কুমারখালী, কুষ্টিয়া, মিরপুর, আলমডাঙা, ভেড়ামারা, গাঙ্গনি, দামুরহুদা, চুয়াডাঙা, জীবননগর, মেহেরপুর এবং দৌলতপুর থানার অংশ বিশেষ।[৮৩]

দেশভাগজনিত কারণে নদীয়া জেলার বৃহত্তর অংশ পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে চলে যাওয়ায় এক জটিল বিতর্কের সূত্রপাত হয়। এই বিতর্কের সমাধানের জন্য অবিভক্ত নদীয়ার কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙা, ও মেহেরপুর মহকুমা পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করা হয় এবং অবশিষ্ট নদীয়ার কৃষ্ণনগর ও রানাঘাট মহকুমা দুটিকে নবদ্বীপ জেলা নাম দিয়ে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই বিভাজনের ফলে নদীয়া জেলার বিভাজিত সীমান্ত অঞ্চলগুলি হলো- দৌলতপুর ও করিমপুর, মেহেরপুর ও করিমপুর, গাঙানি ও করিমপুর, মেহেরপুর ও তেহট্ট, মেহেরপুর ও চাপড়া, দামুরহুদা ও চাপড়া, দামুরহুদা ও কৃষ্ণগঞ্জ, জীবননগর ও হাঁসখালী, মহেশপুর ও হাঁসখালী, মহেশপুর ও রানাঘাট।[৮৪] স্বাধীনতা পরবর্তীকালে নদীয়া জেলার ভারত ও পাকিস্তানের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তি ও নামকরণ নিয়ে দেখা দেওয়া এক বিস্ময়কর জটিলতার ফলে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করলেও নদীয়া জেলা প্রকৃত অর্থে ওই দিন স্বাধীনতা লাভ করেনি। দেশভাগ পরবর্তী প্রথম তিনদিন যেহেতু নদীয়া জেলার বৃহত্তর অংশ পূর্ব পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, সেহেতু পূর্ব পাকিস্তান ভুক্ত অংশ নদীয়া এবং ভারতবর্ষ ভুক্ত অংশ নবদ্বীপ হিসেবে পরিগণিত হয়।[৮৫] এরপর ১৯৪৭ সালের ১৮ই আগস্ট স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ কমিশনের সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হলে নদীয়া জেলার পূর্ব পাকিস্তান ভুক্ত অংশটি জেলা সদরের নামানুসারে নামকরণ করা হয় কুষ্টিয়া এবং ভারতভুক্ত অংশটির নামকরণ করা হয় নবদ্বীপ। অর্থাৎ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের তিনদিন পর ১৯৪৭ সালের ১৮ই আগস্ট নবদ্বীপ বা নদীয়া জেলা স্বাধীন ভারতের মানচিত্রে যুক্ত হয়, ফলে এই দিনটি প্রকৃত অর্থে নদীয়ার স্বাধীনতা দিবস। পরবর্তীতে ১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ভারত ভুক্ত নবদ্বীপ জেলার নাম পরিবর্তন করে নদীয়া করা হয়।[৮৬] এই বিজ্ঞপ্তি

অনুসারে কৃষ্ণনগর, কৃষ্ণগঞ্জ, করিমপুর, তেহট্ট ও হাঁসখালি থানা নিয়ে কৃষ্ণনগর মহকুমা এবং রানাঘাট, চাকদহ, শান্তিপুর ও হরিণঘাটা থানা নিয়ে রানাঘাট মহকুমা গঠিত হয়। ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে এই জেলার করিমপুর থানার টলাটলি ও পরাশপুর মৌজা দুটি পার্শ্ববর্তী মুর্শিদাবাদ জেলার সাথে যুক্ত করা হয়।[৮৭] আবার ১৯৮৩ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে রানাঘাট মহাকুমার অন্তর্ভুক্ত হরিণঘাটা, চাকদহ ও কল্যাণী থানা নিয়ে নতুন কল্যাণী মহকুমা গঠিত হয়।[৮৮] বর্তমানে ২০১১ সালের পরিসংখ্যান অনুসারে নদীয়া জেলা কৃষ্ণনগর সদর, রানাঘাট, তেহট্ট এবং কল্যাণী এই চারটি মহাকুমা নিয়ে গঠিত। সর্বশেষ ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে নদীয়া জেলায় ৮ পৌরসভা, ২১টি থানা, ১৭টি ব্লক, ১৭টি পঞ্চায়েত সমিতি এবং ১৮৭টি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে।[৮৯]

• ৪.৫. জেলার ভৌগোলিক পরিমণ্ডল:

নদীয়া জেলার অবস্থান দক্ষিণবঙ্গের নিম্নগাঙ্গেয় সমভূমিতে। নদীয়া জেলা একটি নদীমাতৃক অঞ্চল। জেলার প্রধান তিনটি নদী হল ভাগীরথী, মাথাভাঙ্গা ও জলঙ্গী। এই তিনটি নদীকে একত্রে 'নদীয়ার নদী' (Nadia River) বলে অভিহিত করা হতো।[৯০] এছাড়াও নদীয়াতে রয়েছে অসংখ্য ছোট-ছোট উপনদী ও শাখা নদী। নদীয়ার নদী গুলির প্রায় সবগুলি পদ্মা নদীর শাখা নদী। জেলার পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে প্রবাহিত ভাগীরথী নদী ব্যতীত জেলার অধিকাংশ নদীগুলির উৎস ও চলাচলের একটি বৃহৎ অংশ রয়েছে জেলাতে। এই ছোট নদী গুলি হলো ইছামতি, গড়াই, চূর্ণী, কালীগঙ্গা, কুমার, হিসনা, ভৈরব, চিত্রা, নবগঙ্গা, কাজলা, ছেউটিয়া।[৯১] তবে দেশভাগের দরুণ নদীয়া দ্বি-বিভক্ত হলে অবিভক্ত নদীয়ার অধিকাংশ নদীগুলি পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত কুষ্টিয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। ভারতভুক্ত নদীয়ায় থেকে যায় কেবল জলঙ্গী, মাথাভাঙ্গা, ইছামতি, চূর্ণী নদীগুলি। এমনকি এই নদী গুলির মধ্যেও মাথাভাঙ্গা ও ইছামতি অনেকাংশ বর্তমানে ভারত ও বাংলাদেশের সীমান্ত রেখা হিসেবে, দুই দেশের জলসীমা রূপে চিহ্নিত হয়েছে। সুপ্রাচীন কাল থেকেই নদীয়ার নদী পথগুলি পণ্য পরিবহনের একটা স্বাভাবিক মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হতো এবং পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত নদীগুলির মাধ্যমে সহজেই বাজরা, নৌকা ও ভেলা ভাসিয়ে নদীয়ার বিভিন্ন স্থানের মধ্যে

যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হতো।[৯২] দেশভাগের পরবর্তীতে নদীয়ার নদীগুলি যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে তাদের গুরুত্ব হারায়। অধিকাংশ নদীগুলি দুই দেশের মধ্যে খণ্ডিত হওয়ায় সেগুলি পরিবহন উপযুক্ততা হারাই এবং সীমান্ত বিভাজনকারী নদীগুলির জলকে নদী পারাপারকারী সাঁকো, বাঁধ বা গৃহ নির্মাণের দ্বারা আটকে দেওয়ার ফলে নদীগুলির স্বাভাবিক জলপ্রবাহ রুদ্ধ হয়ে এক একটি হ্রদ বা মজে যাওয়া জলাশয়ে পরিণত হয়েছে, যে নদীগুলির অধিকাংশ প্রবাহ পথে বছরের অধিকাংশ সময় উপযুক্ত জল প্রবাহ থাকে না। এরকম একটি নদী হলো করিমপুরের কুমার নদী, যার উৎস মুখে ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৭ সালের মধ্যে বাঁধ দেওয়ার ফলে নদীর প্রবাহ পথের পরিবর্তন ঘটে এবং কয়েক বছরের মধ্যে এই নদী নৌকা চলাচলের জন্য উপযুক্ত নাব্যতা হারায়।[৯৩] একইভাবে ইন্দুমতি নদী যা নদীয়ার বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী গেদে অঞ্চল থেকে বেরিয়ে বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পুনরায় নদীয়ার টুঙ্গির কাছে প্রবেশ করে ভাজনঘাটের কাছে ইছামতি নদীতে মিশেছে, সেই নদীতে ভারত ও বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে একাধিক বাঁধ প্রদান এবং নদী বক্ষে চাষের প্রচেষ্টায় আল দেবার ফলে ক্রমশ বদ্ধ জলাশয়ে পরিণত হয়েছে।[৯৪] ভৈরব নদী যা করিমপুর- এর কাছে মুক্তারপুর, গন্ধরাজপুর, মরুটিয়া, কাজিপাড়া হয়ে চুয়াডাঙার বিস্তীর্ণ অঞ্চল সহ প্রায় ১০০ কিমি দৈর্ঘ্যের অঞ্চল জুড়ে প্রবাহিত হতো, তা ১৯৩০- এর দশক থেকে মজতে থাকে এবং পরবর্তী তিন দশকের মধ্যে নদীটির অস্তিত্ব প্রায় বিপন্ন হয়ে যায়।[৯৫] চূর্ণী নদীটিতে বাংলাদেশের দর্শনা চিনিকলের সারা বছরের জমিয়ে রাখা রাসায়নিক বজ্র মাথাভাঙ্গা নদীর মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করায় বছরের বিভিন্ন সময় নদীটি ব্যবহার ও জলজ প্রাণীর বসবাসের জন্য উপযুক্ত থাকে না।[৯৬]

নদীয়া জেলা প্রকৃতপক্ষে নরম পলি দ্বারা গঠিত বৃহত্তম বদ্বীপ অঞ্চলের অংশ, আর এই পলি মাটি আসতো প্রধানত ভাগীরথী, জলঙ্গী সহ নদীয়ার একাধিক নদীগুলি থেকে। পলি মাটি সমভূমিতে মাঝে মাঝেই পুকুর, বিল, হ্রদ ও মরা নদী অন্যতম ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য।[৯৭] দেশভাগের পূর্বে অবিভক্ত নদীয়ায় ১৪৭ টি ছোট বড় বিল বা জলাশয় ছিল, যার মধ্যে ৭০ টি বিল দেশভাগের পর নবগঠিত কুষ্টিয়া

জেলার অন্তর্গত হয়। ১৯৪০ থেকে ১৯৭০- এর দশকের মধ্যবর্তী সময়ে নদীয়ার সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত একাধিক জলাশয় গুলির ওপর বেশ কয়েকটি বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছিল, যেগুলি বর্তমানে সীমান্তে প্রাকৃতিক সীমানা হিসেবে রয়ে গেছে। এই বাঁধ গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো- বিজয়পুর বাঁধ, ইছামতিপাড়া বাঁধ, নোনাগঞ্জ বাঁধ, শোনাঘাটা বাঁধ, স্বর্ণখালি বাঁধ, খালবোয়ালিয়া বাঁধ, ভেড়িপাড়া বাঁধ, কামারখালি বাঁধ, জাহাঙ্গীরপুর-ফকিরডাঙা বাঁধ ইত্যাদি।[৯৮]

বর্তমানে নদীয়াতে বিশেষ বনভূমি না থাকলেও পূর্বে সুন্দরবন থেকে বিস্তৃত বনাঞ্চল নদীয়া জেলার পারমদন, রানাঘাট, হাসখালি, চাপড়া ও করিমপুর- এর উপর দিয়ে বিস্তৃত ছিল বলে জানাযায়।[৯৯] অষ্টাদশ শতাব্দীতেও নদীয়ার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বিস্তৃত বনাঞ্চল ছিল বলে জানা যায়, যেখানে নদীয়া রাজ কৃষ্ণচন্দ্র শিকারে যেতেন। স্টেফার্নি- এর ১৭৮৫ সালের বর্ণনা থেকে জানা যায়, বর্তমানে চাকদহ থানা অঞ্চলেও বাঘ এবং অন্যান্য বন্য জন্তুর আবাস ছিল তৎকালীন সময়ে। ১৮২৪ সালে বিশপ হিবারের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে বর্তমান কৃষ্ণগঞ্জ থানা অঞ্চলে গভীর অরণ্য ছিল। এমনকি ১৯৪২ সাল পর্যন্ত বেতাই অঞ্চলেও গভীর অরণ্য বর্তমান ছিল। তবে স্বাধীনতা উত্তর কালে পূর্ববঙ্গ থেকে বিপুল পরিমাণে জনগণের আগমনের ফলে বনাঞ্চল পরিষ্কার করে ব্যাপক জনবসতি গড়ে ওঠে, যার দরুন বর্তমানে নদীয়ায় বিশেষ বনাঞ্চল নেই বললেই চলে। যদিও ১৯৪৭ সালের পরে রাজ্য বনবিভাগের তত্ত্বাবধানে জেলায় ছটি সরকার অধিকৃত অঞ্চলে বনাঞ্চল তৈরি করে সংরক্ষিত করা হয়। সরকারি জমিতে বৃক্ষ রোপনের মাধ্যমে তৈরি সংরক্ষিত বনাঞ্চল গুলি যথাক্রমে বেথুয়াডহরি, রানাঘাটের হিজুলি, দেবগ্রাম, মাহুতপুর, বাহাদুরপুর এবং রাধাকান্তপুরে অবস্থিত।[১০০] জেলার জলবায়ু মূলত গ্রীষ্ম প্রধান এবং গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পশ্চিম ও শীতকালে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু এখানে প্রবাহিত হয়।

• ৪.৬. বর্তমানে নদীয়ার ভৌগোলিক সীমানা:

বর্তমানে নদীয়া ভারতবর্ষের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের এক সীমান্তবর্তী জেলা, যার ভৌগলিক পরিধি ২২° ৫৩" থেকে ২৪° ১১" উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮° ০৯" থেকে ৮৮° ৪৮" পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে

বিস্তৃত।[১০১] বর্তমানে বাংলাদেশের সঙ্গে এই জেলার প্রায় ২৬৫ কিমি দীর্ঘ আন্তর্জাতিক সীমানা রয়েছে। নদীয়া জেলার উত্তরে বাংলাদেশের পাবনা ও রাজশাহী জেলা, উত্তর-পশ্চিমে মুর্শিদাবাদ জেলা, পশ্চিমে বর্ধমান ও হুগলি জেলা, দক্ষিনে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা, দক্ষিণ-পূর্বে বাংলাদেশের যশোর জেলা, এবং পূর্বে যশোর ও কুষ্টিয়া জেলা অবস্থিত। বর্তমানে এই জেলার আয়তন ৩৯২৭ বর্গ. কিমি এবং তা সমুদ্র থেকে ৪৬ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। জেলার উত্তর-দক্ষিণে আয়তন ১৩৫ কিমি এবং পূর্ব-পশ্চিমে আয়তন ৪৫ কিমি।[১০২] কর্কটক্রান্তি রেখা যা জেলা টিকে প্রায় সমান দুটি ভাগে ভাগ করেছে, তা পূর্ব দিকে মাজদিয়ার উত্তর-পশ্চিমে চাপড়া, নবীননগর, মধুপুর এবং কৃষ্ণনগরে উত্তরে ঘূর্ণি, গোডাউন, কালিদহ, পানি নালা, হরনগর, আনন্দনগর, ভক্তনগর, হাঁসডাঙ্গা, বনগ্রাম, মায়াকোল, চৌগাছা এবং বাহাদুরপুর- এর উপর দিয়ে গেছে।[১০৩]

• ৪.৭. জেলার অর্থনৈতিক পরিমণ্ডল:

নদীয়ার ভূপৃষ্ঠ যেহেতু নদীর পলি মাটির দ্বারা গঠিত এখানে কৃষি প্রধান জীবিকা। মূলত পলি মাটির উপর নির্ভর করেই জেলার দুই ফসলি থেকে তিন ফসলি চাষযোগ্য জমি গড়ে উঠেছে। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে জেলার মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪৭ শতাংশই কৃষি কাজের সঙ্গে যুক্ত, এদের মধ্যে প্রায় ১৭ শতাংশ কৃষক এবং ৩০ শতাংশ কৃষি শ্রমিক হিসেবে নিযুক্ত।[১০৪] কৃষিজ ফসলের মধ্যে ধান, গম, বিভিন্ন ধরনের ডাল ও পাট হলো প্রধান।[১০৫] এছাড়াও বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি ও ফুল চাষ করা হয়ে থাকে জেলায়। ঔপনিবেশিক শাসনকালে নদীয়া জেলায় ব্যাপক পরিমাণে নীল চাষ করা হতো এবং নদীয়ার সুখসাগর নীলকুঠি ছিল সেই সময়ের বিখ্যাত নীল ব্যবসা কেন্দ্র।[১০৬] কৃষিকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় জল সেঁচের প্রধান মাধ্যম নদী হলেও, ভূগর্ভস্থ জলও ব্যবহার করা হয়।[১০৭] কৃষি জেলার মানুষের প্রধান জীবিকা হলেও বেশকিছু শিল্প প্রাচীনকাল থেকেই গড়ে উঠেছিল। শান্তিপুর ও ফুলিয়া প্রাচীনকাল থেকেই উন্নতমানের তাঁত বস্ত্র তৈরির জন্য সুখ্যাত। বর্তমানে এই বস্ত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রে কিছুটা ভাটা লক্ষ করা গেলেও তাঁতিদের পুরুষানুক্রমিক ঐতিহ্য আজও ম্লান হয়ে যায়নি। কাঁসার বাসন-

পত্র ও মৃৎশিল্প নির্মাণের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী শিল্প আজও জেলায় বর্তমান।[১০৮] বিশেষত কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প জগৎ বিখ্যাত। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প জলঙ্গী নদী তীরবর্তী ঘূর্ণি, ষষ্ঠীতলা, কুমোর পাড়া, আনন্দময়ীতলা, রথতলা, নতুনবাজার প্রকৃতি অঞ্চলে বংশ পরম্পরায় চলে আসছে। নদীয়ার মিষ্টান্ন শিল্পও বিখ্যাত। বিশেষ করে কৃষ্ণনগরের সরপুরিয়া, সরভাজা, সরতক্তি, শান্তিপুরের নিখুঁতি, রানাঘাটের পান্তুয়া, মুড়াগাছার ছানার জিলিপি, মাটিয়ারির রসগোল্লা, বেতাই- এর কাঁচা গোল্লা, নবদ্বীপের লাল দই ও লাল চমচম ইত্যাদি মিষ্টি খ্যাতিসম্পন্ন। নদীয়া জেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্র হলো রানাঘাট শহর। নদীয়া থেকে মূলত কৃষিজাত পণ্য বিশেষত শাকসবজি কলকাতা শহরে রপ্তানি করা হয়ে থাকে, তবে জেলার প্রধান রপ্তানিকৃত কৃষিজ পণ্য হলো পাট। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প বিশেষত মাটির মূর্তিগুলির চাহিদা শুধুমাত্র ভারতের বাজারেই নয় আন্তর্জাতিক বাজারেও রয়েছে।[১০৯]

• ৪.৮. জেলার সামাজিক পরিমণ্ডল:

২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে নদীয়া জেলার জনসংখ্যা ৫১,৬৭,৬০০ জন এবং জনঘনত্ব প্রতি বর্গ.কিমি-তে ১৩০০ জন।[১১০] এই জনসংখ্যার ২৬,৫৩,৭৬৮ জন পুরুষ এবং ২৫,১৩,৮৩২ জন মহিলা। জেলার মোট জনসংখ্যার ৭২.২ শতাংশ মানুষ গ্রামে বসবাস করে এবং ২৭.৮ শতাংশ মানুষ শহরে বসবাস করে। জেলায় পুরুষদের মধ্যে সাক্ষরতার হার ৭৮.৮ শতাংশ এবং মহিলাদের মধ্যে সাক্ষরতার হার ৭১ শতাংশ। জেলার মোট জনসংখ্যার ৭২.২ শতাংশ মানুষ হিন্দু, ২৬.৮ শতাংশ মানুষ মুসলিম, ০.৭ শতাংশ মানুষ খ্রিষ্টান, এবং ০.৩ শতাংশ মানুষ অন্যান্য ধর্মালম্বী।[১১১] এছাড়াও জেলার মোট জনসংখ্যার ২৯.৯৩ শতাংশ মানুষ তপশিলি জাতি এবং ২.৭২ শতাংশ মানুষ তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত।[১১২] ১৯৪১ সালে যেখানে জেলার জনসংখ্যা ছিল ৮,৪০,৩০৩ জন, এরপর দেশভাগ পরবর্তীকালে ১৯৫১ সালে জেলার জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১১,৪৪,৯২৭ জন, অর্থাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ৪৯.৫৬ শতাংশ। ১৯৬১, ১৯৭১, ১৯৮১, ১৯৯১ ও ২০০১ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ৩০.১৪, ২৯.৯১, ৩৩.২৯, ২৯.৮২, ১৯.৫৮ শতাংশ।[১১৩] এই বিপুল পরিমাণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির পশ্চাতে প্রধান কারণ ছিল পূর্ব পাকিস্তান

বতর্মান বাংলাদেশ থেকে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্ত মানুষের আগমন।[১১৪] প্রাচীনকাল থেকে নদীয়ায় মানুষের ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে বৈচিত্র লক্ষ করা যায়। পাল রাজত্বে নদীয়ায় বৌদ্ধ ধর্ম প্রভাব বিস্তার করেছিল যার সাক্ষ্য বহন করে তেহট্ট থানার বরেয়া গ্রামে প্রাপ্ত দশম শতকের কষ্টিপাথরের নির্মিত পদ্মাসনে উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তিটি।[১১৫] কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী "নবদ্বীপ মহিমা" গ্রন্থে নদীয়ায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবের কথা উল্লেখ করে জানিয়েছেন যে নবদ্বীপের শিবমূর্তিগুলি বৌদ্ধ প্রভাবে প্রভাবিত ছিল।[১১৬] পাল রাজত্বে নদীয়ায় বৌদ্ধ ধর্ম প্রভাব বিস্তার করলেও পাল রাজত্বের শেষ দিকে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব হ্রাস পায় এবং তা শিব ও ধর্ম ঠাকুরের পূজাতে পরিবর্তিত হয়। বিশেষত এই সময় পর্বে লৌকিক ধর্ম হিসেবে নদীয়ার লোকসমাজে ধর্ম ঠাকুরের আরাধনা বিশেষ ভাবে প্রচলিত হয়েছিল।[১১৭] সেন বংশের রাজত্বকালে বাংলায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ভিত্তি শক্তিশালী হয়। সেন আমল থেকেই নবদ্বীপ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও নব্য ন্যায় দর্শন চর্চার কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এই সময় পর্বে গৌণ ধর্ম চর্চা হিসেবে বৈষ্ণব ধর্মচর্চাও যে নদীয়ায় প্রচলিত ছিল তার সাক্ষ্য পাওয়া যায়।[১১৮] ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নদীয়ায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে ইসলাম ধর্ম জেলায় প্রসার লাভ করে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে নদীয়ায় চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে, নদীয়া হয়ে ওঠে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মচর্চার কেন্দ্র, যার নিদর্শন লক্ষ করা যায় চৈতন্যের জীবনী মূলক সাহিত্যে।[১১৯] বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য-বৈষ্ণব ও ইসলামীয় ধর্ম-সংস্কৃতির সংমিশ্রনের ফলে নদীয়ায় ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে গড়ে ওঠে নানা গৌণ ধর্ম। এই গৌন ধর্ম গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- আউলেচাঁদ প্রতিষ্ঠিত কর্তাভাজা, সাহেবধনী প্রতিষ্ঠিত সাহেবধনী বা দীনদয়ালের ঘর, বলরাম হারি প্রতিষ্ঠিত বলরামী, খুশি বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত খুশি বিশ্বাসী এবং লালন শাহ প্রতিষ্ঠিত বাউল ধারা।[১২০]

• ৪.৯. জেলার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল:

ঐতিহ্যমন্ডিত বঙ্গ সংস্কৃতির সাংস্কৃতিক বলয়ে নদীয়া জেলা একটি গৌরবময় স্থানের অধিকারী। প্রকৃতপক্ষে শ্রী চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব থেকেই নদীয়া ছিল একটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সমৃদ্ধ স্থান। বিশেষত নবদ্বীপ শহরের সাহিত্য, ন্যায়, দর্শন ও জ্যোতিষ প্রভৃতি চর্চায় বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। নবদ্বীপের রঘুনাথ

শিরোমণি, বাসুদেব সার্বভৌম- এর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি গোটা বাংলায় পরিচিত ছিল। নবদ্বীপের গৌরব কীর্তন করতে গিয়ে বৃন্দাবন দাস চৈতন্য ভাগবতে লিখেছেন-

“সভে মহাঅধ্যাপক করি গব্ব ধরে।
বালোকেও ভট্টাচার্য্য সনে কথা করে।
নানা দেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে বিদ্যা রস পায়।
অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়।”[১২১]

ফলে সহজেই অনুমান করা যায় যে নবদ্বীপের বিদ্যাচর্চার খ্যাতি বহু ব্যাপ্ত ছিল এবং ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে বহু সংখ্যক মানুষ জ্ঞান লাভের জন্য নবদ্বীপে আসতেন।[১২২] নবদ্বীপে আবির্ভাব ঘটেছিল শ্রী চৈতন্যদেবের যিনি বৈষ্ণব ধর্ম ও সংস্কৃতির মাধ্যমে মানুষের মিলন মিশ্রণের বার্তা প্রচার করেছিলেন। তিনি তার কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে আন্দোলিত করেছিলেন সমাজ, সাহিত্য, ধর্ম, রাজনীতি ও সংস্কৃতির শাখাকে। নদীয়ার বহু নাগরিক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাদের উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। ষোড়শ শতাব্দীতে শান্তিপুরের কাছাকাছি ফুলিয়া নিবাসী কৃত্তিবাস সহজ সরল ভাষায় পয়ার ত্রিপদী ছন্দে বাংলা ভাষায় রামায়ণ রচনা করেন। গঙ্গাদাস পন্ডিত, শান্তিপুরের অদ্বৈতাচার্য, মাধবাচার্য প্রমুখরা বৈষ্ণব সাহিত্য ভান্ডারকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। বাংলা সাহিত্যের ভান্ডারকে সুমধুর পদাবলী সংগীতে মুখরিত করেছেন- নবদ্বীপের জগানন্দ, গোবিন্দ, মাধব ঘোষ, ফুলিয়ার বংশীবদন, কাঁচরাপাড়ার শিবানন্দ সেন, কৃষ্ণনগরের নিকটস্থ দোগাছিয়া গ্রামের বলরাম দাস প্রমুখ বৈষ্ণব কবি-সাহিত্যিক। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নদীয়া রাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় নিযুক্ত কবিরা নদীয়াবাসী না হলেও, তাদের প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল নদীয়ায় কৃষ্ণচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায়। কবি ভারতচন্দ্রের কাব্য প্রতিভার বিকাশ ঘটেছিল মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় যার প্রতিভা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “রাজসভার কবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল গান রাজকণ্ঠের মনিমালার মতো- যেমন তাহার উজ্জ্বলতা তেমনি তাহার কারুকার্য।”[১২৩]

গুণাগ্রহী রাজা ভারতচন্দ্র কে 'গুনাকর' বা 'গুনেরআকর' আখ্যা দিয়েছিলেন।[১২৪] কৃষ্ণচন্দ্রের সভার বিদূষক গোপাল ভাঁড়ের গল্পগুলির মূল আকর্ষক বিষয় সম্পর্কে ড. অজিতকুমার ঘোষ তার বঙ্গ সাহিত্যের হাস্যরসের ধারায় লিখেছেন, "গোপালের বাগবৈদগ্ধ্য, তাহার তীব্র শ্লেষাত্মক উক্তি ও ব্যঙ্গকষায়িত গূঢ়ার্থক ইঙ্গিত।"[১২৫] সাধক কবি রামপ্রসাদ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় উপস্থিতি থাকার পাশাপাশি মহারাজার কাছ থেকে 'কবিরঞ্জন' উপাধিও লাভ করেছিলেন।

আধুনিক কালেও বহু কবি সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটেছে নদীয়ায়। নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র ছিলেন নদীয়াবাসী তার বাড়ি ছিল বনগাঁর কাছে চৌবেরিয়া গ্রামে। তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন তার "নীলদর্পণ" নাটকের জন্য। দীনবন্ধু মিত্রের সমসাময়িক কার্তিকেয়চন্দ্র দেওয়ানের "আত্মজীবনীচরিত" ও "ক্ষিতিশবংশাবলীচরিত" সমকালীন সময়ের বিশেষ গবেষণা সমৃদ্ধ গ্রন্থ। নদীয়া জেলার বিল্বগ্রামে জন্মগ্রহণকারী মদনমোহন তর্কালংকার স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন। তিনি তার দুই কন্যাকে বেথুন স্কুলে ভর্তি করেছিলেন যাবতীয় সামাজিক বিধি-নিষেধকে অগ্রাহ্য করে। শিশু শিক্ষার উপযুক্ত গ্রন্থের অভাব পূরণ করতে তিনি শিশু শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর নদীয়ার সাহিত্য সাধকদের মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। দ্বিজেন্দ্রলাল রচিত ঐতিহাসিক নাটক "শাহজাহান", "চন্দ্রগুপ্ত", "মেবার পতন", "নুরজাহান" প্রকৃতপক্ষে যুগোতীর্ণ নাটক।[১২৬] নদীয়ার চুপীগ্রামের অক্ষয় দত্তের বিখ্যাত গ্রন্থ "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" প্রকাশিত হলে বাংলা সাহিত্যিধারায় এক নতুন ধারার সূচনা হয়, যদিও তিনি ছিলেন বিজ্ঞান সচেতন বস্তুবাদী লেখক। ড. সুকুমার সেন তার সাহিত্য কর্ম সম্পর্কে বলেছেন, "পাশ্চাত্য প্রথায় বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বাঙ্গালা ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন ও প্রচার সার্থকভাবে করেন সর্বপ্রথম অক্ষয় কুমার।"[১২৭] নদীয়া জেলার কুমারখালী গ্রামের হরিনাথ মজুমদার 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' পত্রিকা প্রকাশ করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করলেও তার প্রকৃত পরিচয় সুলেখক ও বাউল কবি হিসেবে। প্রমথ চৌধুরী নদীয়া জেলায় জন্মগ্রহণ না করলেও তিনি কৃষ্ণনগরকেই নিজের জন্মভূমি বলে মনে করে নিজেকে কৃষ্ণ নাগরিক বলে অভিহিত করেছেন। নদীয়ার রবীন্দ্র পরিমন্ডলের সমসাময়িক কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন-

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, শান্তিপুরের করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। এর পরবর্তী যুগের কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বাগচী, কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, দিলীপ কুমার রায়, আমিয় সান্যাল, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময়ী দেবী, নারায়ণ সান্যাল, দেবনারায়ণ গুপ্ত, সুধীর চক্রবর্তী, মোহিত রায়, জয় গোস্বামি প্রমুখ।

• ৪.১০. স্বাধীনতা সংগ্রামে নদীয়া:

নদীয়ার বহু অধিবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামী রূপে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। ব্রিটিশ শাসনকালে সংঘটিত কৃষক আন্দোলন গুলির মধ্যে অন্যতম ১৮৫৯- এর নীল বিদ্রোহের সূচনা প্রকৃতপক্ষে নদীয়া থেকেই শুরু হয়েছিল। এই প্রতিবাদ আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস, দিগম্বর বিশ্বাস, বিশ্বনাথ সর্দার, মেঘাই সর্দার, ইসুব বিশ্বাস, বৃন্দাবন দত্ত প্রমুখ। আসাননগর- এর কৃষক নেতা বিশ্বনাথ সরদার নদীয়া জেলা শাসকের বাংলোর পাশে ফেডির নীলকুঠি আক্রমণ করেন। বিশ্বনাথ সর্দারের প্রধান সহযোগী মেঘাই সর্দার একদিকে আদিবাসী আর অন্যদিকে কৃষক সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে আন্দোলনের মুখ হয়ে উঠেছিলেন।[১২৮] বেতাই গ্রামের ইসব বিশ্বাস ও বৃন্দাবন দত্তের নেতৃত্বে বিদ্রোহীরা নীলকর আর্চিবোল্ডের নীলকুঠি ধ্বংস করে। চৌগাছার বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাসের নেতৃত্বে বিদ্রোহ আরও সংগঠিত হয়। রানাঘাটের জমিদার শ্রী গোপাল পাল চৌধুরী ও চুয়াডাঙার চন্ডিপুরের জমিদার শ্রীহরি রায় বিদ্রোহের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন।[১২৯]

১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা যখন সারা বাংলা আন্দোলনের মুখরিত, তখন নদীয়ার জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব দান করে তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষ্ণনগরে জনসভার আয়োজন করেন। ১৯২০ সালে নদীয়ার ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কৃষক আন্দোলনকে সঙ্ঘবদ্ধ রূপ দেওয়ার জন্য চুয়াডাঙার কাপাসডাঙ্গা গ্রামে প্রথম জেলা কৃষক সম্মেলন ডাকা হয় এবং নদীয়ার বিভিন্ন স্থানে বঙ্গীয় রায়ত সমিতির মাধ্যমে উঠবন্দি প্রথার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা হয়। বিপ্লবী যতীন দাস একনাগাড়ে ৬৪ দিন অনশনের

পর ১৯২৯ সালে ১৩ই সেপ্টেম্বর মৃত্যু বরণ করলে কৃষ্ণনগরে রাজবন্দী দিবস পালিত হয় এবং একটি শোভাযাত্রা বার হয়, যার ফলে শোভাযাত্রা থেকে রাজদ্রোহের অভিযোগে তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, গোবিন্দপদ দত্ত, তারকদাস মুখোপাধ্যায়, মহাদেব সরকার প্রমুখকে ১২৪(ক) ধারায় গ্রেফতার করা হয়।[১৩০] ১৯৩০- এর দশকে বিপ্লবী চরমপন্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কৃষ্ণনগরে সনদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ১৯৩১ সালের ১৬ই মার্চ কৃষ্ণনগর পুলিশ সুপারিন্টেডেন্ট ও কোতোয়ালী থানাতে বোমা নিক্ষেপ করা হয়। এই সময়ে শহরের বিভিন্ন স্থানে সরকার বিরোধী পোস্টার দেওয়া হয় যার সাথে গুপ্ত সমিতির মেয়েরাও যুক্ত ছিলেন যার অন্যতম সদস্য ছিলেন পারুল মুখার্জি। এছাড়াও আব্দুল মান্নান নামে আরেক বিপ্লবীর নাম জানা যায় এবং এই তিন বিপ্লবীর নামে দীর্ঘদিন কৃষ্ণনগর বোমা মামলা চলে।[১৩১] ১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারি কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয় পতাকা উত্তোলনে বাধা দান কে কেন্দ্র করে ছাত্র বিক্ষোভ শুরু হয়। ১৯৩৪ সালে বেআইনিভাবে অস্ত্র রাখার অভিযোগে অমৃতেন্দু মুখার্জি, সুকুমার গুপ্ত, স্মরণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরীশংকর চক্রবর্তী প্রমুখরা গ্রেপ্তার হন এবং এর মধ্যে অন্যরা মুক্তি পেলেও অমৃতেন্দু মুখার্জি আন্দামানের সেলুলার জেলে নির্বাসিত হন, যেখান থেকে তিনি ১৯৩৯ সালে মুক্ত হন। নবদ্বীপের বিভিন্ন স্থানে ১৯৩৮-১৯৩৯ সালে চর জমি দখলের প্রতিবাদে, বেআইনি তোলা আদায়ের প্রতিবাদে, জলাশয় গুলি চাষি ও জেলেদের ব্যবহারের দাবিতে আন্দোলন হয়, যে আন্দোলনের প্রধান দাবী ছিল- "জাল যার জল তার", ও "লাঙ্গল যার জমি তার"।[১৩২] ১৯৪২ সালে আগস্ট আন্দোলনের সময় জাতীয় নেতৃত্ববৃন্দের গ্রেফতারের প্রতিবাদে নদীয়ার বিভিন্ন শহর যথা শান্তিপুর, রানাঘাট ও কৃষ্ণনগরে ১৪৪ ধারা অমান্য করে হরতাল পালিত হয়।

- **৪.১১. স্বাধীনতা উত্তর কালে জেলার রাজনৈতিক পরিমণ্ডল:**

স্বাধীনতা উত্তর কালে নদীয়ার রাজনীতি মূলত পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তর রাজনীতির আবর্তে, আবর্তিত হয়েছে। কলকাতায় ট্রাম এর ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে ১৯৫৩ সালে বামপন্থীদের 'এক পয়সার লড়াই' মূলত কলকাতা ও শহরতলী ভিত্তিক আন্দোলন হলেও, কলকাতা সংলগ্ন জেলাগুলিতে বিশেষত নদীয়ায় এই আন্দোলনের

প্রভাব লক্ষ করা যায়।[১৩৩] এই আন্দোলনের পেছনে বস্তিবাসী উদ্বাস্তুদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল বলে প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী জানিয়েছেন, ফলে উদ্বাস্তু সমাগমের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে নদীয়ায় এই আন্দোলনের প্রভাব লক্ষ করা যায়। ১৯৫৯- এর খাদ্য আন্দোলন মূলত কলকাতাতে শুরু হলেও পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের হাত ধরে এই আন্দোলন ক্রমশ ২৪ পরগনা, নদীয়া, হাওড়া জেলাগুলিতেও ছড়িয়ে পড়ে।[১৩৪] ১৯৭০- এর দশকে উত্তরবঙ্গে শুরু হওয়ার নকশালপন্থী আন্দোলন ক্রমশ দক্ষিণবঙ্গে ছড়িয়ে পড়লে নদীয়া এই আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্র হয়ে ওঠে। নদীয়ার শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর এবং সংলগ্ন অঞ্চল হয়ে ওঠে নকশালপন্থীদের আশ্রয়স্থল এবং কর্মক্ষেত্র, যাদের প্রধান কর্মসূচির অন্তর্গত ছিল অতর্কিত আক্রমণ, খুন, মূর্তি ভাঙ্গা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আক্রমণ ইত্যাদি।[১৩৫] ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে নদীয়ায় বিপুল পরিমাণ উদ্বাস্তু মানুষের সমাগম ঘটে যার ফলে সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির প্রধান কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্র হয়ে ওঠে উদ্বাস্তু কলোনি গুলি।[১৩৬] ১৯৭৭- এর পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসলে সেই সরকার কর্তৃক সম্পাদিত ভূমি সংস্কারের মতো কর্মসূচি গুলি নদীয়া জেলায়ও কার্যকর হয়েছিল। মূলত কৃষি জমিতে বিদ্যুতের দাবিতে কৃষকেরা ১৯৮৮ সালে নদীয়ার শান্তিপুরে আন্দোলন শুরু করেছিল।[১৩৭]

• ৪.১২. জেলার ক্রীড়া পরিমণ্ডল:

জেলায় পাশ্চাত্য ক্রীড়ার প্রসার ঘটে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে নদীয়া জেলায় ক্রীড়া সংস্কৃতি তথা আধুনিক পাশ্চাত্য খেলাধুলার প্রসারের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকারি আধিকারিকেরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। নদীয়া জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা জর্জ- এর পৃষ্ঠপোষকতায় যথাক্রমে ১৮৯২-৯৩ ও ১৮৯৩-৯৪ সালে কৃষ্ণনগরে অ্যাথলেটিক্সের প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়।[১৩৮] নদীয়া জেলায় নিযুক্ত ব্রিটিশ আধিকারিকেরা যারা জেলায় ক্রীড়া সংস্কৃতি তথা আধুনিক পাশ্চাত্য খেলাধুলার প্রসারের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছিলেন তারা হলেন আই.সি.এস, জে.এইচ.ই গ্যারেট (J.H.E Garret) ও এম.

হ্যান্ডলি (M. Handley)।[১৩৯] প্রাথমিক পর্যায়ে জেলায় পাশ্চাত্য খেলাধুলা গুলি মূলত স্কুল ও কলেজগুলোতে প্রসার লাভ করেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ব্রিটিশ সরকারের তরফ থেকে বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রদের সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হিসেবে গড়ে তুলতে শারীরিক কসরত তথা খেলাধুলার প্রচলনের বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হতে থাকে। ১৮৯২-৯৩ সালে নদীয়া জেলা বোর্ড বাংলার প্রথম জেলা বোর্ড[১৪০] হিসেবে তার অধীনস্থ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় গুলিতে ছাত্রদের জন্য বেশ কিছু শারীরিক কসরত তথা খেলাধুলার প্রচলন করে।[১৪১] কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজে জিমন্যাস্টিকের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হতো ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে এবং তা ছাত্রদের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল ও বহু ছাত্র তাতে অংশগ্রহণও করত নিয়মিত।[১৪২] এই পর্যায়ে আধুনিক পাশ্চাত্য খেলাধুলা গুলি ছিল জেলার প্রধান শহর কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর, রানাঘাট ও নবদ্বীপ কেন্দ্রিক। এই গবেষণা কার্যের সময়কালের সূচনা ঘটেছে ১৯৬৭ সাল থেকে, ফলে এখানে মূলত ১৯৬৭ সালের পূর্বে জেলার ক্রীড়া ইতিহাস সংক্ষিপ্ত ভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

- ## ৪.১২.১. কৃষ্ণনগর:

ব্রিটিশদের দ্বারা নদীয়া জেলা গড়ে ওঠার পর এর প্রধান সদর শহর ও প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল কৃষ্ণনগর, এছাড়াও নদীয়া রাজদের রাজধানী ছিল কৃষ্ণনগর। এর ফলে ঐতিহাসিকভাবেই শহরটি ছিল বেশ সমৃদ্ধ এবং একই সঙ্গে বহু প্রভাবশালী ও বিত্তবান মানুষের বাস ছিল এই শহরে। এই ঐতিহাসিক সমৃদ্ধতার দরুন পাশ্চাত্য ক্রীড়া গুলি প্রথম জেলার এই শহরে প্রসার লাভ করে এবং প্রাথমিক পর্যায়ে এই শহরের একাধিক বাসিন্দা পাশ্চাত্য খেলাধুলায় নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। ১৮৯০ সালে সরোজরঞ্জন বসু ও শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরীর প্রচেষ্টায় কৃষ্ণনগরে প্রথম টাউন ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়, যদিও কৃষ্ণনগরে তখনও নিয়মিতভাবে ফুটবল খেলা চালু হয়নি। ফুটবল খেলার জন্য এর পরে রয়্যাল স্পোর্টিং ক্লাব গড়ে ওঠে। এছাড়াও ডায়ানা ক্লাব, সবুজ সংঘ, মিনার্ভা স্পোর্টিং, অনন্ত হরি ক্লাব, মুসলিম ক্লাব এবং ১৯১৮ সালে অ্যাথলেটিক ক্লাব এক্সারসাইজ ক্লাব রূপে গড়ে ওঠে, যদি এই সমস্ত ক্লাবগুলি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

১৯২৭ সালে নদীয়া পুলিশ দল নিয়মিত ফুটবল খেলার শুরু করে। প্রাথমিক পর্যায়ে পাশ্চাত্য খেলাধুলা গুলি মূলত স্কুল ও কলেজগুলোতে প্রসার লাভ করেছিল এবং প্রায় অধিকাংশ খেলোয়াড়ই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল, সি.এম.এস স্কুল, কৃষ্ণনগর কলেজ বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। ১৯৩০ সাল থেকে টাউন ক্লাব, নদীয়া পুলিশ, ফ্রেন্ডস ইলেভেন, সি.এম.এস স্কুল, কলেজিয়েট স্কুল এবং কৃষ্ণনগর কলেজের দুটো দল নিয়ে নিয়মিত ফুটবল খেলা শুরু হয়। এরপর ফুটবল খেলা ক্রমশ জনপ্রিয়তা লাভ করলে একে একে অমর ভারতী সংঘ, হিরো কৃষ্ণনগর সাউথ ক্লাব, অগ্রণী সংঘ প্রভৃতি ক্লাব ১৯৫৩ সালের মধ্যে গড়ে ওঠে এবং এর পরবর্তীতে আই.টি.সি.বি.পি.সি টেকনিক্যাল স্কুল, কৃষ্ণনগর শক্তি সংঘ, কৃষ্ণনগর তরুণ সংঘ, চিত্তরঞ্জন মেমোরিয়াল ক্লাব, বজ্র সংঘ, শ্রীরাম কৃষ্ণ পাঠাগার, বাঘাযতীন সংঘ, শিমুলতলা যুব সংঘ ইত্যাদি ক্লাব গড়ে ওঠে, যদিও এর মধ্যে অনেক ক্লাবই পরবর্তীতে অবলুপ্ত হয়ে যায়।[১৪৩]

কৃষ্ণনগরের খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য ছিলেন নির্মল চ্যাটার্জি যিনি অক্সফোর্ড ব্লু হয়ে দেশ-বিদেশে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। ১৯০৫ সালের ট্রেডার্স কাপ বিজয়ী মোহনবাগানে ফুটবল খেলেন কৃষ্ণনগরের বৈদ্যনাথ দাক্ষী। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে কলকাতার অন্যতম শক্তিশালী ক্লাব শোভাবাজারের পক্ষে ১৯০৭-০৮ সালে জ্ঞানেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী এবং ১৯০৮-০৯ সালে কালী ভট্টাচার্য খেলেছিলেন। একই সময়ে ললিত বন্দোপাধ্যায়, কালা বৈরাগ্য প্রমুখরা কলকাতার কোনো বড় ক্লাবে না খেললেও কৃষ্ণনগরে নিজেদের ফুটবল প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিল। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে রূপচাঁদ দফাদারের খ্যাতি ফুটবলে কৃষ্ণনগরের সীমা অতিক্রম করে সমগ্র বাংলাকে উদ্বেলিত করেছিল। ১৯১৯ সালে রূপচাঁদ দফাদার এরিয়ান্স ক্লাবে যোগদান করেন এবং পরবর্তীতে তিনি মোহনবাগানে যোগদান করে দীর্ঘকাল অতি সুনামের সঙ্গে ফুটবল খেলেন, পরে পুনরায় তিনি এরিয়ান্স ক্লাবে ফিরে যান। সেন্টার ফরওয়ার্ডে খেলা এই প্রতিভাবান খেলোয়াড়ের একমাত্র গোলে এরিয়ান্স বনাম ডালহৌসির খেলায়, এরিয়ান্স জয় লাভ করে দ্বিতীয় বিভাগে অবনমনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। যদিও উক্ত খেলায় তিনি সাংঘাতিকভাবে আহত হন যার ফলে কলকাতার মাঠে তার খেলার চির অবসান ঘটে। দ্বিতীয় দশকের

খ্যাতনামা খেলোয়াড়দের মধ্যে মাদারবক্স ১৯১৬ সালে এবং ধীরা মিত্র ১৯২০ সালে এরিয়াঙ্গে খেলেন। এছাড়া এই দশকের অন্যান্য খেলোয়াড় যারা কলকাতাতে না খেললেও ফুটবলে নিজেদের প্রতিভা দেখিয়েছিলেন তারা হলেন- সুধীন মৌলিক, জুয়েল বিশ্বাস, সত্য ব্যানার্জি, বসন্ত চৌধুরী প্রমুখ। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে কৃষ্ণনগরের অনেক প্রতিভাবান ফুটবল খেলোয়াড় কলকাতার মাঠে নিয়মিত খেলতেন। এই দশকে কোন কোন সময় এরিয়াঙ্গ ক্লাবেরহয়ে খেলা ১১ জনের মধ্যে ৮-৯ ছিলেন কৃষ্ণনগরের ফুটবলার। এরিয়াঙ্গের পক্ষে যারা খেলেছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- গঙ্গেশ দাস, সুরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, নগেন ঘোষ, রবিন গুপ্ত, সুখদা চট্টোপাধ্যায়, ফনি বাগচি, জ্ঞান সান্যাল, অশ্বিনী মৈত্র, বলাইদাস চ্যাটার্জী, যামিনী সান্যাল প্রমুখ।[১৪৪] ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে জ্ঞানতোষ চ্যাটার্জি, রবীন ঘোষ (১৯২৭-৩২), ভবানীপুর ক্লাবে ননী চ্যাটার্জী (১৯২৮-৩৫) এবং জর্জ টেলিগ্রাফে প্রণয়কৃষ্ণ বিশ্বাস (১৯২৮ থেকে ৩২) ও কাশী মজুমদার (১৯২৮-৩৫) খেলেছিলেন।[১৪৫] চারের দশকে সবচেয়ে নামি ফুটবলার হলেন সত্যেন্দ্রনাথ গুঁই। সত্যেন্দ্রনাথ গুঁই ১৯২৭-৩৩ সাল পর্যন্ত কলকাতায় ভবানীপুর ক্লাবে, ১৯৩৪-৪২ সাল পর্যন্ত মোহনবাগান ক্লাবে ও এর মধ্যবর্তী এক বছর ১৯৩৮ সালে ভবানীপুর ক্লাবে খেলেন এবং মোহনবাগান ও ভবানীপুর উভয় ক্লাবের অধিনায়কত্বও করেছিলেন। ভারতীয় ফুটবল দলের খেলোয়াড় হিসেবে ১৯৩২ সালে তিনি সিংহল ভ্রমণ করেন এবং ১৯৩৬ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার সফরকারী ভারতীয় দলে নির্বাচিত হলেও দলের সঙ্গে যেতে পারেননি। ১৯৩৯ ও ১৯৪০ সালে আন্তর্জাতিক খেলায় তিনি ভারতীয় দলের অন্তর্ভুক্ত হন এবং ১৯৪০ সালে ভারতীয় হিন্দু দলের অধিনায়কত্বও করেন।[১৪৬] দ্বিজেন সান্যাল ১৯৪৫ সালে মোহনবাগান ক্লাবে ফুটবল খেলেছিলেন। পঞ্চাশের দশকে খ্যাতি লাভ করা ফুটবল প্লেয়ারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ধর্ম মজুমদার, হৃদয় দাস, ভূপেন দাস, মনি দাস, শান্তি ঘোষ, প্রমথ বসু এবং এরা সকলেই কলকাতার অ্যালবার্ট ক্লাবে খেলতেন। সুরঞ্জন বিশ্বাস ও চাঁদু সেনগুপ্ত জর্জ টেলিগ্রাফে ফুটবল খেলেন। ষাট-এর দশকে যারা ফুটবলের কর্ণধার ছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন নিশীথ বিশ্বাস, মন্টু মৌলিক, তুষার চৌধুরী, সুজয় সর্বাধিকারী, শচীন বিশ্বাস, প্রণব সরকার, বুদ্ধদেব সরকার, সোনা বিশ্বাস, মলয় মিত্র, শচীন সিংহ, প্রবোধ বিশ্বাস প্রমুখ।[১৪৭]

নীলকুঠির ক্রফোর্ড সাহেব কর্তৃক প্রদত্ত একটি শীল্ড কে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া ক্রফোর্ড শীল্ড সম্ভবত কৃষ্ণনগরের প্রাচীনতম ফুটবল টুর্নামেন্ট, যা ১৯২৮ সাল পর্যন্ত নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই প্রতিযোগিতায় মূলত স্কুল ও কলেজের ফুটবল দলগুলি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করত। কৃষ্ণনগর কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক ভবেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ১৯২৮ সাল থেকে যদুনাথ রায় বাহাদুর কাপ শুরু হয়, যেখানে কলকাতা ও হুগলি থেকে বিভিন্ন কলেজর দল ফুটবল খেলতে আসতো। ঈশান চন্দ্র দাক্ষী পরিচালিত প্রভাস শীল্ডে বাইরের বহু খ্যাতনামা দল খেলতে আসায় এই প্রতিযোগিতা বাংলায় বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। এই শীল্ডের প্রথম বছরের খেলা কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজের মাঠে অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে ফাইনাল খেলা হয়েছিল কৃষ্ণনগর টাউন ক্লাব ও প্রেসিডেন্সি কলেজের মধ্যে এবং কৃষ্ণনগর টাউন ক্লাব শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হয়েছিল। এর পরবর্তীতে ১৯৩৪ সাল বাদে, ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত এই শীল্ডের খেলা কৃষ্ণনগর টাউন মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কৃষ্ণনগরের লীগ প্রথার খেলা শুরু করেন বলাই চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যিনি টাউন লীগ নামে ফুটবল লীগের প্রবর্তন করেন। রূপচাঁদ দফাদারের সুযোগ্য নেতৃত্বে ১৯৩০ সাল থেকে এই লীগ খেলা চলতে থাকে। এই লীগের নিয়ম-কানুন আস্তে আস্তে লীগের পরিচালন সভার দ্বারা অনুমোদনের মাধ্যমে প্রণীত হয়, এক্ষেত্রে কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষরা বিশেষত জে.এম. সেনের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জে.এম. সেনের পরিচালনায় ফুটবল লীগ আস্তে আস্তে সুসংগঠিত হয় এবং ফুটবলে তিনটি বিভাগ সৃষ্টি হয়। ১৯৫৭ সাল থেকে পাকাপাকিভাবে অবনমন ও উন্নয়নের ব্যবস্থা করে জেলা লীগ শুরু হয়। এই একই বছরে কৃষ্ণনগর স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন বয়েজ লীগ নামে এক যুব-ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করে যা চার বছর চলেছিল।[১৪৮]

কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ এগারটন স্মিথ- এর উৎসাহ ও উদ্যোগে ১৯২৪ সাল থেকে কলেজে ক্রিকেট খেলার শুরু হয় এবং সি.এম.এস স্কুলের প্রাক্তন অধ্যক্ষ বীল সাহেব তার স্কুলে নিয়মিত ক্রিকেট শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। কৃষ্ণনগরের খেলোয়াড়দের নিয়ে গঠিত নদীয়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন ১৯৩৯ সালে কোচবিহার কাপে অংশগ্রহণ করে এবং স্পোটিং ইউনিয়নের কাছে ৫ উইকেটে পরাজিত হয়। ক্রিকেট খেলা এইভাবে চললেও ১৯৫০ সাল পর্যন্ত কৃষ্ণনগরে নিয়মিত কোনো

ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ছিল না। এই সময় পর্বে কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজ, কলেজিয়েট স্কুল, অমর ভারতী সংঘ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগারই ক্রিকেট খেলতো। ১৯৫০ সালে গণেশ চন্দ্র ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে কৃষ্ণনগর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়, তিনি ছিলেন এই সংগঠনের সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক ছিলেন দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী ও প্রবোধ চন্দ্র বিশ্বাস। এই সংগঠনের পরিচালনায় ১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৫৩-৫৪ সাল পর্যন্ত কৃষ্ণনগর ক্রিকেট লীগ খেলা হয়েছিল। এই লীগে অংশগ্রহণকারী দলগুলি ছিল- গণেশ বাবুর কৃষ্ণনগর ক্রিকেট ক্লাব, কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজ, অমর ভারতী সংঘ, হীরোজ ক্লাব এবং শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগার। গনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য ছিলেন ক্রিকেটের নবযুগের স্রষ্টা। তার উদ্যোগেই কলকাতার দল গুলোকে প্রীতি ক্রিকেট খেলার জন্য আমন্ত্রণ করে কৃষ্ণনগরে আনা হতে থাকে এবং তার উদ্যোগে ১৯৫২ সালে নদীয়া জেলা প্রথম আন্তঃজেলা ক্রিকেটে অংশগ্রহণ করে। বিখ্যাত ক্রিকেটার নির্মল চ্যাটার্জি এই খেলায় নদীয়ার প্রতিনিধিত্ব করেন এবং ১৯৫৮ সালে অমীয় দাসের নেতৃত্বে নদীয়া আন্তঃজেলা ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ন হয়। এই পর্বে কৃষ্ণনগরে যারা ক্রিকেটে সুনাম অর্জন করেছিলেন তারা হলেন- রূপচাঁদ দফাদার, বীরেন পাল চৌধুরী, ধীরেন পাল চৌধুরী, অবনী রায়, অজিত দফাদার, চিত্ত সেনগুপ্ত, নীরদ বিশ্বাস, সুর প্রসাদ চ্যাটার্জী প্রমুখ।[১৪৯]

১৯৩০ সাল থেকে হকি লীগ শুরু হয় কৃষ্ণনগরে এবং এই লীগে অংশগ্রহণকারী দলগুলি হলো- কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজের দুটো দল, সি.এম.এস ও কলেজিয়েট স্কুল, টাউন ক্লাব এবং পুলিশ দল। ১৯৩৪ সালে কৃষ্ণনগরের সেঞ্চুরি ক্লাব কলকাতার বেটন কাপে অংশগ্রহণ করে স্পোর্টিং ইউনিয়নের কাছে ২- ১ গোলে পরাজিত হয়। বিশ্বজিৎ ব্যানার্জি ১৯৪৭-৪৮ সালে কৃষ্ণনগরে হকি খেলায় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং তিনি ইস্টবেঙ্গল হকি টিমের অধিনায়কত্ব প্রদান করেছিলেন। কালা ঘোষ, নীরোদ বসু, নীহার বিশ্বাস, কার্তিক ঘোষ, ডঃ শিশির সেনগুপ্ত, বীরেন পালচৌধুরী, রণেন মিত্র, প্রমথ বসু, কালী রায়, শান্তি ঘোষ, নিশীথ বিশ্বাস, স্বপন ঘোষ প্রমুখরা এই সময় হকি খেলায় বিশেষ সুনাম অর্জন করেছিলেন। ১৯৫০ সালে অমর ভারতী সংঘের উদ্যোগে কৃষ্ণনগরে প্রথম হকি অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়, যার প্রথম সভাপতি, সম্পাদক এবং সহ-সম্পাদক হন যথাক্রমে ডঃ সুরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়,

দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী, গোবিন্দ প্রসাদ দত্ত। এই সময় থেকেই কৃষ্ণনগরের নিয়মিত হকি লীগ শুরু হয় নদীয়া পুলিশ, হীরোজ ক্লাব, কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজ, টাউন ক্লাব, অমর ভারতী সংঘ, অনন্ত হরি স্মৃতি সংঘ দলগুলিকে নিয়ে। ১৯৫০-৬০- এর দশকের উল্লেখযোগ্য হকি খেলোয়ারদের মধ্যে রয়েছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধিনায়ক শ্যামা দাক্ষী, তুষার চৌধুরী, সুজয় সর্বাধিকারী, কালীগোপাল পাল, অমল ঠাকুর এবং নিশীথ বিশ্বাস প্রমুখ।[১৫০]

কৃষ্ণনগরের সংগঠিত ভলিবল খেলার সূচনা হয় ১৯৫০ সালে কৃষ্ণনগর ভলিবল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে, এই সংস্থার সভাপতি ছিলেন দেবনাথ স্কুলের ক্রীড়া শিক্ষক পাচু গোপাল রায়, সহ-সভাপতি ছিলেন ঘূর্ণির অধ্যাপক সন্তোষ রায়, সম্পাদক ছিলেন দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী এবং সহসম্পাদক ছিলেন সত্যেন গাঙ্গুলী। ১৯৫০ সালে প্রথম কলকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে আন্তঃজেলা ভলিবল প্রতিযোগিতার সূচনা হলে, কৃষ্ণনগর ভলিবল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে একটি দল নদীয়া জেলার প্রতিনিধিত্ব করে, যার খেলোয়াড়রা ছিলেন শচীন মুখার্জি (অধিনায়ক), অতুল মোদক, প্রভাস গুঁই, কমল গুহ, সুনীল চক্রবর্তী ও অমর সান্যাল প্রমুখরা। ১৯৫২ সালের ধীরেন হালদার কর্তৃক প্রদত্ত একটি শীল্ড কে আশ্রয় করে ক্ষিতীশ চন্দ্র স্মৃতি নক আউট ভলিবল প্রতিযোগিতা শুরু হয়, যেখানে নদীয়ার দলগুলি ছাড়াও কলকাতা এবং অন্যান্য জায়গার দলগুলিও অংশগ্রহণ করতে আসত। এই প্রতিযোগিতা কমিটির সভাপতি ছিলেন কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ এবং সম্পাদক ছিলেন দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী। কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত উকিল প্রফুল্ল কুমার হালদারের স্মৃতি রক্ষার্থে তার পুত্র বনরঞ্জন হালদার এই প্রতিযোগিতার রানার্সআপ কাপটি প্রদান করেন। এই প্রতিযোগিতা ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়েছিল।[১৫১]

অ্যাথলিট হিসেবেও কৃষ্ণনগরের অনেকে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। রূপচাঁদ দফাদার লং জাম্পে বাংলায় রেকর্ড করেন। এছাড়া দূরপাল্লার দৌড়ে ফনিভূষণ গুঁই (১৯১৭-১৮), নলিনী সান্যাল (১৯২১-২২), উমা ব্যানার্জি (১৯২৪-২৫), কালা ঘোষ (১৯২৪), সত্যেন গুঁই, হৃদয় দাস, সুর প্রসাদ চ্যাটার্জী, নবকুমার ঘোষ, হাই জাম্পে শচীন মুখার্জি, পোলভল্টে সমর মুখার্জি (বাংলার রেকর্ডের অধিকারী), বর্ষা নিক্ষেপে জ্ঞানরঞ্জন বিশ্বাস, সুভাষ বিশ্বাস এবং বিকাশ বিশ্বাস বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছিলেন।

কৃষ্ণনগরের মেয়ে শিখাশ্যামা রায়চৌধুরী ১৯৬৪ সালে নিখিল ভারত অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন।[১৫২]

কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরির মাঠ, কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল ও কৃষ্ণনগর ক্লাবে টেনিস খেলার কোর্টে একদা নিয়মিত টেনিস খেলা অনুষ্ঠিত হলেও, এই খেলা বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেনি এবং এই খেলায় কোন খ্যাতনামা খেলোয়াড়েরও আবির্ভাব ঘটেনি।

• ৪.১২.২. শান্তিপুর:

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকেই শান্তিপুরে পাশ্চাত্য খেলাধুলার প্রচলন ঘটে এবং ন্যাশনাল ক্লাব, সূত্রাগড় স্পোর্টিং ক্লাব, শান্তিপুর মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, ওয়াশিংটন ক্লাব, জি.এ.আই ও অ্যাসোসিয়েশন ক্লাব ইত্যাদি গড়ে ওঠে। এইসব ক্লাবগুলিতে তখন মূলত ফুটবল খেলা সর্বাধিক প্রচলিত ছিল। সর্বশ্রী বোনা ব্রহ্মচারী, সত্য মুখার্জী, লক্ষ্মী চ্যাটার্জী প্রমুখরা হলেন সেই সময়কার উল্লেখযোগ্য খেলোয়াড়, যারা অনেকেই কলকাতার বহু নামকরা ক্লাবে ফুটবল খেলেছিলেন। বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের উল্লেখযোগ্য ফুটবল খেলোয়াড়রা হলেন- প্রভাস রায়, কাশীনাথ গোস্বামী, কালাচাঁদ রায়, রনজিত গোস্বামী, রামরতি লাহিড়ী, সন্তোষ গাঙ্গুলী, অজিত নন্দী, সুনীল প্রামাণিক, বসন্ত প্রামাণিক, শচীন প্রামাণিক, অরুণেশ ভবানী প্রমুখ। এই সময়ে স্থানীয় খেলা গুলি পরিচালনা করত শান্তিপুর স্পোটিং অ্যাসোসিয়েশন, ১৯৫০-৫১ সালে সংস্থার পরিচালক ছিলেন খগেন্দ্রনাথ কর্মকার এবং ১৯৫২ সালে সম্পাদক হন হারীন মুনসী। ফুটবলে এই সময় তিনটি ডিভিশনে মোট ছত্রিশটি দল অংশগ্রহণ করত। যে সমস্ত ক্লাব এই ফুটবল প্রতিযোগিতায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিল সেগুলি হলো- সবুজ সংঘ, সূত্রাগড় স্পোর্টিং ক্লাব, স্পোটিং ইউনিয়ন, ন্যাশনাল ক্লাব ও জি.এ.আই ইত্যাদি।[১৫৩]

বিংশ শতাব্দীর ৪০ ও ৫০- এর দশকেই শান্তিপুরে হকি, কাবাডি, ক্রিকেট ও ভলিবল লীগ খেলা শুরু হয়। এই সময় শান্তিপুরের সবুজ সংঘ ক্লাব নদীয়া জেলা হকি প্রতিযোগিতায় জেলার যুগ্ম বিজয়ীর সম্মান লাভ করে। ভলিবলে শান্তিপুরের মহাবীর মুখার্জি আন্তঃজেলা ভলিবল লীগে এই সময়

অংশ নেন।[১৫৪] এই সময় শান্তিপুরে অ্যাথলেটিক্সেরও প্রসার ঘটে। শান্তিপুরের বাসিন্দা শিশির চ্যাটার্জী, গোবিন্দ চ্যাটার্জী, সুনীল চ্যাটার্জী, প্রভাস রায়, মুকুল দাশগুপ্ত, সুনীল বিশ্বাস, নীলিমা মজুমদার, অঞ্জলি সেন, স্বদেশ ধর প্রমুখরা অ্যাথলেটিক্সে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল। বিশেষত স্বদেশ ধর রাজ্য অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় হপস্টেপ অ্যান্ড জাম্পে প্রথম স্থান অধিকার করে রেকর্ড ভঙ্গ করেন এবং পরবর্তীতে জব্বলপুরে অনুষ্ঠিত জাতীয় অলিম্পিকে পশ্চিমবঙ্গের হয়ে অংশ নেন ও জুনিয়র গ্রুপে দীর্ঘ লম্ফনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।[১৫৫] ফুটবল খেলার মান উন্নয়নের জন্য জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে নিখিল নন্দী, ল্যাংচা মিত্র, বিশ্বনাথ সরকার- এর মতো প্রসিদ্ধ প্রশিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ শিবিরের ব্যবস্থা করা হয়েছে শান্তিপুরে।[১৫৬]

- **৪.১২.৩. রানাঘাট:**

বিংশ শতাব্দীতে রানাঘাটে পাশ্চাত্য খেলার প্রচলন ঘটে, বিশেষত ফুটবল খেলার মান বিশেষ উন্নত ছিল। বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে রানাঘাটের অজিত নন্দী ফুটবল খেলায় সারা ভারতে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে রানাঘাটের নন্দী ব্রাদার্স ফুটবল ইতিহাসে অনন্য নজির স্থাপন করেছিল। জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতা অজিত নন্দী ১৯৩৮ সালে ভারতীয় ফুটবল দলে নির্বাচিত হয়ে অস্ট্রেলিয়া সফর করেন, দ্বিতীয় ভ্রাতা অনিল নন্দী ১৯৪৮ সালে অলিম্পিকে ভারতীয় ফুটবল দলের হয়ে খেলেন, তৃতীয় ভ্রাতা নিখিল নন্দী ১৯৫৬ সালে মেলবর্ণে অনুষ্ঠিত অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ বিজয়ী ভারতীয় ফুটবল দলের প্রতিনিধিত্ব করেন, চতুর্থ ভ্রাতা সুনীল নন্দী বাংলার হয়ে খেলেছেন। নদীয়া জেলার ফুটবল জগতে নন্দী ব্রাদার্স নামে পরিচিত এই ভাইদের অনন্য নজির জেলা তো বটেই সমগ্র বাংলা এমনকি ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও এক বিরল গৌরব জনক দৃষ্টান্ত, যার দ্বিতীয় কোনো উদাহরণ পাওয়া যায় না। নিখিল নন্দী ১৯৫২ সালে আন্তঃজেলা প্রতিযোগিতায় বিজয়ী নদীয়া ফুটবল দলের খেলোয়াড় ছিলেন এবং এর পরবর্তীতে আরও বেশ কয়েকবার তিনি ফুটবলে নদীয়ার প্রতিনিধিত্ব করেন। এছাড়াও নিখিল নন্দী ব্রাজিল থেকে ফুটবল কোচিং শিক্ষা গ্রহণ করে, দেশে ফিরে এসে কৃষ্ণনগরে সর্বপ্রথম আধুনিক পদ্ধতিতে কোচিং শুরু করেন। বিংশ শতাব্দীর

ষাটের দশকে রানাঘাটের অবনী বসু ছিলেন নদীয়ার এক প্রসিদ্ধ গোলরক্ষক, যিনি মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে সুনামের সঙ্গে ফুটবল খেলেছিলেন। এছাড়াও অবনী বসু বাংলার ফুটবল দলে প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ও নদীয়া জেলা দলের অধিনায়কত্বের দায়িত্বও পালন করেছেন। রানাঘাটের মিথুন সরকার ইন্ডিয়ান নেভি দলের গোলরক্ষক রূপে সুনাম অর্জন করেছিলেন এবং সুধাংশু পালিত (ঠাকুর) গোলরক্ষক হিসেবে জেলায় বিশেষ সুনাম অর্জন করেছিলেন।[১৫৭] কৃষ্ণ মিত্র কলকাতার মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে নিয়মিত ফুটবল খেলেছেন। শহরের বাসিন্দ সুধীর রায় এরিয়ান্সে কয়েক বছর ফুটবল খেলেছিলেন। কমল চ্যাটার্জী ফুটবল ও ক্রিকেটে নদীয়ার অধিনায়কত্ব করেন এবং ভলিবলেও নদীয়ার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তিনি পরবর্তীতে ফিজিক্যাল এডুকেশনে ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেন এবং বহরমপুর কলেজের ক্রীড়া শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। অ্যাথলেটিক্সেও রানাঘাট শহরের একাধিক বাসিন্দা নিজেদের প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- দূরপাল্লার দৌড়ে বিলে প্রমাণিক, স্বল্প পাল্লার দৌড়ে বিশ্বনাথ পাল প্রমুখ। এছাড়া মহিলা অ্যাথলিট হিসাবে শহরের চন্দনা বিশ্বাস সর্বভারতীয় স্তরে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছেন।[১৫৮]

- **৪.১২.৪. অন্যান্য অঞ্চল:**

প্রাথমিক পর্যায়ে পাশ্চাত্য খেলাধুলার প্রসার প্রধানত জেলার প্রধান শহরকেন্দ্রিক হলেও, জেলার অন্যান্য অঞ্চলও এই পর্বে কিছুটা অগ্রগতির পরিচয় দিয়েছিল এবং কিছু প্রতিভাবান খেলোয়াড় এই সমস্ত অঞ্চল থেকে উঠে এসেছিল। বিংশ শতাব্দীর ৬০- এর দশকে রানাঘাটের নিকটবর্তী পায়রাডাঙ্গার বাসিন্দা শ্যামল বসু ইন্ডিয়ান নেভি দলের গোলরক্ষক ছিলেন এবং তিনি বাংলার ফুটবল দলেরও প্রতিনিধিত্ব করেছেন। নবদ্বীপের বাসিন্দা রনজিৎ মুখার্জি কলকাতার প্রথম ডিভিশনে দীর্ঘকাল ফুটবল খেলেছেন এবং নদীয়া জেলা ফুটবল দলের অধিনায়কত্বও করেছেন।[১৫৯] বেথুয়াডহরীর বাসিন্দা দেবাশীষ মন্ডল ১৯৬৪ সালে টোকিও অলিম্পিকে জিমন্যাস্টিক বিভাগে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন, যিনি সম্ভবত জিমন্যাস্টিক বিভাগে অলিম্পিকে অংশগ্রহণকারী প্রথম ও একমাত্র বাংলার খেলোয়াড়।[১৬০]

• ৪.১৩. পর্যবেক্ষণ:

সুতরাং প্রাথমিক পর্যায়ে নদীয়া জেলায় পাশ্চাত্য খেলাধুলা গুলি শহরকেন্দ্রিক ছিল বিশেষত রানাঘাট, কৃষ্ণনগর ও শান্তিপুরের মতো শহর গুলিতে সীমাবদ্ধ। এই শহর গুলি বাদে জেলার অন্যান্য অঞ্চলে খেলাধুলার কিছুটা অগ্রগতি ঘটলেও তা সার্বিক বা ব্যাপক ছিল না। পাশ্চাত্য খেলাধুলার মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে ফুটবল ছিল সবথেকে জনপ্রিয় এবং প্রধানত এই খেলাকে কেন্দ্র করেই একাধিক ক্লাব গড়ে উঠেছিল। ফুটবলের পাশাপাশি পাশ্চাত্য খেলাধুলা গুলির মধ্যে ক্রিকেট, হকি, ভলিবল, টেনিস ও অ্যাথলেটিক্স- এর মতো খেলা গুলিও জেলায় প্রসার লাভ করে এবং জনপ্রিয় হয়। তবে টেনিস খেলাটি প্রধানত কৃষ্ণনগরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং পরবর্তীতে এই খেলা জেলা থেকে সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত হয়ে যায়। হকি খেলাটি প্রাথমিক পর্যায়ে জেলায় বিশেষ জনপ্রিয় ছিল এবং এই খেলাকে কেন্দ্র করে একাধিক প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হতো, তবে এই খেলাটি ক্রমশ তার জনপ্রিয়তা হারায়। ক্রমে ফুটবল ও ক্রিকেট জেলার প্রধান দুই জনপ্রিয় খেলায় পরিণত হয়। অ্যাথলেটিক্স খেলাটিও জেলায় ক্রমশ জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং পরবর্তীতে জেলার বহু প্রতিভাবান খেলোয়াড় এই খেলায় নিজেদের প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে। দেশীয় খেলা হিসেবে কবাডি শহরাঞ্চলে বিশেষ প্রচলিত না হলেও গ্রামাঞ্চলে যথেষ্ট জনপ্রিয়। নদীয়ার বাসিন্দা ইনসান আলী, ভারতীয় কবাডি দলের হয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণও করেছেন।[১৬১] কবাডি অ্যাসোসিয়েশন খেলাটিকে কোনো রকমে চালু রাখলেও, এক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার ও জনপ্রিয়তার বিশেষ অভাব লক্ষ্য করা যায়। ১৯৩৭ সালে জেলার প্রধান ক্রীড়া নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে নদীয়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়, যা স্বাধীনতা লাভের পরবর্তীতে ১৯৫২ সালে নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন নামে পুনর্গঠিত হয়। এই সংগঠনে অধীনেই পরবর্তীতে নদীয়া জেলার যাবতীয় খেলাধুলা অনুষ্ঠিত হয়েছে, যা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

• টীকা ও সূত্র নির্দেশ:

১. পার্শ্বনাথ রায়চৌধুরী, "নদীয়া জেলার সাহিত্য ও সাহিত্যিক," *নদিয়া জেলা গ্রন্থাগার সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ স্মারকগ্রন্থ ১৯৯৫-২০০৫*, সম্পা। অশোকসিংহ মহাপাত্র ও অপূর্ব কুন্ডু (কৃষ্ণনগর: ২০১০), ৫৮।

২. E. Sreedharan, *A Manual of Historical Research Methodology* (Kerala: Oriental Black Swan, 2017), 27.

৩. কুমুদনাথ মল্লিক, *নদীয়া কাহিনী*, সম্পা. মোহিত রায় (কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৯৮), ২।

৪. তদেব, ৩।

৫. নরহরি চক্রবর্তী, *নবদ্বীপ পরিক্রমা পদ্ধতি*, প্রথম অংশ, সম্পা। নগেন্দ্রনাথ বসু (কলকাতা: সাহিত্য পরিষদ মন্দির, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ), ৫।

৬. শিবানী রায় (মন্ডল), *আদিবাসী ভাষা ও সংস্কৃতি: প্রসঙ্গ নদীয়া জেলা* (কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০০২), ১৫।

৭. মল্লিক, *নদিয়া কাহিনী*, সম্পা. কমল চৌধুরী, ২৭৫।

৮. কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী, *নবদ্বীপ তত্ত্ব*, সম্পা। শান্তিরঞ্জন দেব (নবদ্বীপ: নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ, ২০১৮), ১৭।

৯. কুমুদনাথ মল্লিক, *নদিয়া কাহিনী*, সম্পা। কমল চৌধুরী (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১৫), ২৭৫।

১০. রায় (মন্ডল), *আদিবাসী ভাষা ও সংস্কৃতি*, ১৬।

১১. ক্ষুদিরাম দাস, *বৈষ্ণব-রস-প্রকাশ* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১৮), ৩২৪।

১২. তদেব, ৩২৪।

১৩. তদেব, ৩২৫।

১৪. মোহিত রায়, *নদীয়ার স্থাননাম* (কলকাতা: অমর ভারতী, ১৯৮৫), ৪৪।

১৫. কার্তিকেয়চন্দ্র রায়, *ক্ষিতিশবংশাবলীচরিত,* সম্পা। মহিত রায় (কলকাতা: মঞ্জুষা, ১৯৮৬), ৪৫।

১৬. সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, "নবদ্বীপ ও নদীয়া নামের উৎপত্তি ও প্রাচীনত্ব," *নদীয়া চর্চা,* সম্পা। মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল (কলকাতা: অমর ভারতী, ২০১৪), ৪৬।

১৭. তদেব, ৪৭।

১৮. অনিরুদ্ধ রায়, *মধ্যযুগের ভারতীয় শহর* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৮), ১৩০।

১৯. তদেব, ১৩১-১৩২।

২০. তদেব, ১৩৩।

২১. তদেব, ১৫৯।

২২. যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, সম্পা।, *আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চায় নদীয়া* (নদীয়া: নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ, ২০০৭), ১১।

২৩. রায়, *মধ্যযুগের ভারতীয় শহর,* ১৫৯।

২৪. তদেব, ১৫৯।

২৫. অলোক কুমার বিশ্বাস, "নদীয়ার বিবর্তন," *ইতিহাস অনুসন্ধান (২৭ তম),* (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০১৩), ৫৯৫।

২৬. রায়, *মধ্যযুগের ভারতীয় শহর,* ১৩৩।

২৭. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালির ইতিহাস (আদিপর্ব),* পঞ্চম সংস্করণ। (কলকাতা: দে'জ পাবলিশার্স, ১৪১২ বঙ্গাব্দ), ১২২।

২৮. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস: প্রাচীন যুগ* (কলকাতা: জেনারেল পিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯১২), ১।

২৯. রায়, *বাঙালির ইতিহাস (আদিপর্ব)*, ১২২।

৩০. J.H.E. Garrett, *Bengal District Gazetters Nadia* (Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot., 1910), 22.

৩১. বিশ্বাস, "নদীয়ার বিবর্তন," ৫৯৯।

৩২. Garrett, *Bengal District Gazetters Nadia*, 22-23.

৩৩. রায় (মন্ডল), *আদিবাসী ভাষা ও সংস্কৃতি*, ২১।

৩৪. সিরাজুল ইসলাম, সম্পা।, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, প্রথম খন্ড। (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ১৯৯৩), ৫৪।

৩৫. মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ২২০-২২১।

৩৬. মোহিত রায়, "ইতিহাসের রূপরেখায় নদিয়া ও নদিয়ার পুরাকীর্তি," *পশ্চিমবঙ্গ- নদিয়া জেলা সংখ্যা* (কলকাতা: তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯৭), ৪৫।

৩৭. তদেব, ৪৫।

৩৮. মেটকাফ (C.T. Metcalf) ১৮৬৫ সালে বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত রাজশাহী জেলার দেওপাড়া নামক গ্রামের সন্নিকট থেকে লেখটি আবিষ্কার করেন।

৩৯. দিলীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, *ভারত ইতিহাসের সন্ধানে*, দ্বিতীয় খন্ড। (কলকাতা: সাহিত্যলোক, ২০১৭), ৪১১।

৪০. তদেব, ৪১১-৪১২।

৪১. Nani Gopal Majumdar, *Inscription in Bengal* (Rajshahi Bangladesh: The Varendra Research Society, 1929), 44-47.

৪২. Haraprasad Shastri, *School History of India* (Calcutta: Calcutta Sanskrit Press Depository, 1899), 35

৪৩. গৌরীপদ চট্টোপাধ্যায়, *দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড। (মেদিনীপুর: কাকলী প্রকাশনী, ১৯৮৭), ৭৩।

৪৪. রায়, *মধ্যযুগের ভারতীয় শহর*, ১৩৩।

৪৫. তদেব, ১৩২।

৪৬. রায়, *বাঙালির ইতিহাস (আদিপর্ব)*, ৫৩৭।

৪৭. অনিরুদ্ধ রায়, *মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাস* (কলকাতা: ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, ২০১৮), ২২৪।

৪৮. আব্দুল করিম, *বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭), ১১।

৪৯. তদেব, ২২।

৫০. রায়, "ইতিহাসের রূপরেখায় নদিয়া ও নদিয়ার পুরাকীর্তি," ৪৭।

৫১. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার ইতিহাস*, দ্বিতীয় খন্ড। (কলকাতা: বইপত্র, ২০১৩), ১৪৩।

৫২. রায়, *মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাস*, ২৫৪-২৫৬।

৫৩. তদেব, ২৫৬।

৫৪. রায়, "ইতিহাসের রূপরেখায় নদিয়া ও নদিয়ার পুরাকীর্তি," ৪৮।

৫৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার ইতিহাস*, ২১৯।

৫৬. রায়, *মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাস*, ২৬২।

৫৭. রায়, "ইতিহাসের রূপরেখায় নদিয়া ও নদিয়ার পুরাকীর্তি," ৪৮।

৫৮. মল্লিক, *নদিয়া কাহিনী*, সম্পা. চৌধুরী কমল, ২৮৫।

৫৯. রায়, "ইতিহাসের রূপরেখায় নদিয়া ও নদিয়ার পুরাকীর্তি," ৪৮।

৬০. দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, "বারোদোল মেলা, অন্নপূর্ণাপুজা এবং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র," *মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও সমকাল*, সম্পা। সরকার শৈবাল (কৃষ্ণনগর: মুদ্রা, ২০১৯), ৫৪৯।

৬১. রায়, "ইতিহাসের রূপরেখায় নদিয়া ও নদিয়ার পুরাকীর্তি," ৪৮।

৬২. তদেব, ৪৮।

৬৩. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, "কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা: অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার এক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র," *মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও সমকাল*, সম্পা। সরকার শৈবাল (কৃষ্ণনগর: মুদ্রা, ২০১৯), ৩-১২।

৬৪. অচিরাংশু আচার্য, "কৃষ্ণচন্দ্র ও জমিদারি: একটি অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ," *মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও সমকাল*, সম্পা। সরকার শৈবাল (কৃষ্ণনগর: মুদ্রা, ২০১৯), ১৩৬।

৬৫. তদেব, ১৩৬।

৬৬. কার্তিকেয়চন্দ্র রায়, *ক্ষিতিশবংশাবলীচরিত*, সম্পা। মহিত রায় (কলকাতা: মঞ্জুষা, ১৯৮৬), ৪।

৬৭. চৌধুরী, *আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চায়, নদীয়া*, ২৬।

৬৮. Garrett, *Bengal District Gazetters Nadia*, 160.

৬৯. R.M.C. Bahadur, *A Summary of The Changes in The Jurisdiction of Districts in Bengal 1757-1916* (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1918), 23.

৭০. সুব্রত পাল, "কৃষ্ণনগর রাজবাড়ি," *মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও সমকাল*, সম্পা। সরকার শৈবাল (কৃষ্ণনগর: মুদ্রা, ২০১৯), ৫৩৭।

৭১. Bahadur, *A Summary of The Changes in The Jurisdiction of Districts in Bengal 1757-1916*, 10.

৭২. ইসলাম, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, ১৫৯।

৭৩. তদেব, ১৬০।

৭৪. Bahadur, *A Summary of The Changes in The Jurisdiction of Districts in Bengal 1757-1916*, 14.

৭৫. Durgadas Majumdar, *West Bengal District Gazetters: Nadia* (Calcutta: Information and Public Relation Department, 1978), 38.

৭৬. Bahadur, *A Summary of The Changes in The Jurisdiction of Districts in Bengal 1757-1916*, 45.

৭৭. বিশ্বাস, "নদীয়ার বিবর্তন," ৬০২।

৭৮. Bahadur, *A Summary of The Changes in The Jurisdiction of Districts in Bengal 1757-1916*, 45.

৭৯. *District Census Handbook Nadia 2011*, Series 20, Part XII-A (West Bengal: Directorate of Census Operations, 2011), 8.

৮০. মল্লিক, *নদিয়া কাহিনী*, সম্পা। কমল চৌধুরী, ৩১৮।

৮১. *Census of India 1951.*

৮২. *District Census Handbook Nadia 2011*, Series 20, Part XII-A (West Bengal: Directorate of Census Operations, 2011), 8.

৮৩. *Amritabazar Patrika*, 18 August, 1947.

৮৪. Majumdar, *West Bengal District Gazetters: Nadia*, 2.

৮৫. *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ৪ঠা জানুয়ারি, ১৯৪৮।

৮৬. নিতাই ঘোষ, *ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে নদীয়া* (কলকাতা: বসু মুদ্রণ, ২০০৮), ৩৬।

৮৭. *Nadia District Statistical Handbook 1991*, Table: Block, Area.

৮৮. *District Census Handbook Nadia 2011*, Series 20, Part XII-A (West Bengal: Directorate of Census Operations, 2011), 10.

৮৯. *District Census Handbook Nadia 2011*, Series 20, Part XII-A (West Bengal: Directorate of Census Operations, 2011), 10.

৯০. Majumdar, *West Bengal District Gazetters: Nadia*, 5.

৯১. Garrett, *Bengal District Gazetters Nadia*, 4-17.

৯২. সোমব্রত সরকার, *নদীয়ায় রবীন্দ্রনাথ* (কলকাতা: পত্রলেখা, ২০১১), ৩০, ৪২, ৫১।

৯৩. সুপ্রতিম কর্মকার, *নদীয়ার নদী ও জলাভূমির কথা* (কলকাতা: জে. এন. চক্রবর্তী, ২০১১), ২৯।

৯৪. তদেব, ৩৭।

৯৫. তদেব, ৩৭।

৯৬. তদেব, ৩৩।

৯৭. ঘোষ, *ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে নদীয়া*, ৩৭।

৯৮. কর্মকার, *নদীয়ার নদী ও জলাভূমির কথা*, ৫৩।

৯৯. *District Census Handbook Nadia 2011*, Series 20, Part XII-A (West Bengal: Directorate of Census Operations, 2011), 14.

১০০. Majumdar, *West Bengal District Gazetters: Nadia*, 24-25.

১০১. *District Census Handbook Nadia 2011*, Series 20, Part XII-B (West Bengal: Directorate of Census Operations, 2011), 12.

১০২. *District Census Handbook Nadia 2011*, Series 20, Part XII-A (West Bengal: Directorate of Census Operations, 2011), 13.

১০৩. কুমুদনাথ মল্লিক, *নদিয়া কাহিনী*, সম্পা। কবীর বিলু (ঢাকা: বইপত্র, ১৯৯৮), ৩৮১।

১০৪. *District Census Handbook Nadia 2011*, Series 20, Part XII-B (West Bengal: Directorate of Census Operations, 2011), 17.

১০৫. *District Census Handbook Nadia 2011*, Series 20, Part XII-B (West Bengal: Directorate of Census Operations, 2011), 18.

১০৬. ঘোষ, *ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে নদীয়া*, ৬৪-৬৫।

১০৭. *District Census Handbook Nadia 2011*, Series 20, Part XII-A (West Bengal: Directorate of Census Operations, 2011), 19.

১০৮. *District Census Handbook Nadia 2011*, Series 20, Part XII-A (West Bengal: Directorate of Census Operations, 2011), 20-21.

১০৯. *District Census Handbook Nadia 2011*, Series 20, Part XII-A (West Bengal: Directorate of Census Operations, 2011), 21.

১১০. *District Census Handbook Nadia 2011*, Series 20, Part XII-B (West Bengal: Directorate of Census Operations, 2011), 16.

১১১. *District Census Handbook Nadia 2011*, Series 20, Part XII-A (West Bengal: Directorate of Census Operations, 2011), 41-45.

১১২. *District Census Handbook Nadia 2011*, Series 20, Part XII-B (West Bengal: Directorate of Census Operations, 2011), 17.

১১৩. *District Census Handbook: 1941-2001.*

১১৪. মুনতাসীর মামুন, *বাংলাদেশ বাঙালীমানস: রাষ্ট্র গঠন ও আধুনিকতা*, প্রথম প্রকাশ (কলকাতা: কৃষ্টি, ২০১২), ৯।

১১৫. রায়, "ইতিহাসের রূপরেখায় নদিয়া ও নদিয়ার পুরাকীর্তি," ৫২।

১১৬. তদেব, ৫২।

১১৭. চৌধুরী, *আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চায় নদীয়া*, ৭২।

১১৮. সত্যেন্দ্রলাল মজুমদার, *শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান বিতর্ক তার ত্রুটি ও সমাধান* (নবদ্বীপ: পুস্তক বিপনি, ১৪০২ বঙ্গাব্দ), ১৮।

১১৯. তদেব, ১৫।

১২০. চৌধুরী, *আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চায় নদীয়া*, ৮৪।

১২১. বৃন্দাবন দাস, *চৈতন্য ভাগবত*, (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮৩), ২৩।

১২২. প্রদ্যোতকুমার গোস্বামী, *নবদ্বীপের সমাজ ও সংস্কৃতি* (কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০০৬), ৫৩।

১২৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্ররচনাবলী*, তৃতীয় খন্ড। (কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, ১৪১০ বঙ্গাব্দ), ৭৮৮।

১২৪. চট্টোপাধ্যায়, "কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা: অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার এক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র," ৫।

১২৫. রায়চৌধুরী, "নদীয়া জেলার সাহিত্য ও সাহিত্যিক," ৬১।

১২৬. অজিত দাস, "নদিয়ার সাহিত্য সাধনা: প্রবণতা ও প্রেক্ষিত," *পশ্চিমবঙ্গ- নদিয়া জেলা সংখ্যা*, (কলকাতা: তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯৭), ১২৭-১৩৩।

১২৭. রায়চৌধুরী, "নদীয়া জেলার সাহিত্য ও সাহিত্যিক," ৬৫।

১২৮. কাজল মিত্র, সম্পা।, *সার্ধশতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ* (কৃষ্ণনগর: কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরী, ২০০৭), ১৮৩।

১২৯. তদেব, ১৮৬।

১৩০. চৌধুরী, "নদীয়া জেলার সাহিত্য ও সাহিত্যিক," ৭৪।

১৩১. তদেব, ৭২।

১৩২. অমৃতেন্দু মুখোপাধ্যায়, "কৃষক আন্দোলনে নদিয়া জেলা," *পশ্চিমবঙ্গ- নদিয়া জেলা সংখ্যা* (কলকাতা: তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯৭), ৬৪-৬৫।

১৩৩. *দৈনিক বসুমতি*, ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৫৩।

১৩৪. সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিক্ষুব্ধ বাংলা: পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী রাজনীতি*, প্রথম প্রকাশ. (কলকাতা: রেডিক্যাল ইম্প্রেশন, ২০১৪), ৫১।

১৩৫. তদেব, ৮৭।

১৩৬. *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ২০ সেপ্টেম্বর ও ২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১।

১৩৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিক্ষুব্ধ বাংলা*, ১০০।

১৩৮. General Report on Public Instruction in Bengal for 1892-93, in General (Edn.), November 1893, Proceeding Nos. 1-5, File-8R-4; General Report on Public Instruction in Bengal for 1893-94, in General (Edn.), December 1894, Proceeding Nos. 1-9, File-8R-10.

১৩৯. General Report on Public Instruction in Bengal for 1894-95, in General (Edn.), November 1895, Proceeding Nos. 17-20, File-8R-2.

১৪০. মেদিনীপুরের জেলা বোর্ডও এই একই সময়ে তার অধীনস্থ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় গুলিতে ছাত্রদের জন্য বেশ কিছু শারীরিক কসরত তথা খেলাধুলার প্রচলন করে।- General Report on Public Instruction in Bengal for 1892-93, in General (Edn.), November 1893, Proceeding Nos. 1-5, File-8R-4.

১৪১. General Report on Public Instruction in Bengal for 1892-93, in General (Edn.), November 1893, Proceeding Nos. 1-5, File-8R-4.

১৪২. General Report on Public Instruction in Bengal for 1890-91, in General (Edn.), November 1891, Proceeding Nos. 1-4, File-6R-3.

১৪৩. নীহার রঞ্জন বিশ্বাস, "কৃষ্ণনগরের খেলাধূলা," *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা আগস্ট, ১৯৭৪।

১৪৪. নীহার রঞ্জন বিশ্বাস, "কৃষ্ণনগরের খেলাধূলা," *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা আগস্ট, ১৯৭৪।

১৪৫. এস.এম বদরুদ্দীন, "নদিয়ার খেলাধূলা- অতীত ও বর্তমান," *পশ্চিমবঙ্গ- নদিয়া জেলা সংখ্যা* (কলকাতা: তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯৭), ১৭৮।

১৪৬. তদেব, ১৭৮।

১৪৭. নীহার রঞ্জন বিশ্বাস, "কৃষ্ণনগরের খেলাধূলা," *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা আগস্ট, ১৯৭৪।

১৪৮. নীহার রঞ্জন বিশ্বাস, "কৃষ্ণনগরের খেলাধূলা," *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১৫ই আগস্ট, ১৯৭৪।

১৪৯. নীহার রঞ্জন বিশ্বাস, "কৃষ্ণনগরের খেলাধূলা," *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১৫ই আগস্ট, ১৯৭৪।

১৫০. নীহার রঞ্জন বিশ্বাস, "কৃষ্ণনগরের খেলাধূলা," *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১৫ই আগস্ট, ১৯৭৪।

১৫১. নীহার রঞ্জন বিশ্বাস, "কৃষ্ণনগরের খেলাধূলা," *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪।

১৫২. নীহার রঞ্জন বিশ্বাস, "কৃষ্ণনগরের খেলাধূলা," *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১৫ ই অক্টোবর, ১৯৭৪।

১৫৩. ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, "খেলাধূলায় শান্তিপুর," *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১৫ই অক্টোবর, ১৯৭৪।

১৫৪. ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, "খেলাধূলায় শান্তিপুর," *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১৫ই অক্টোবর, ১৯৭৪।

১৫৫. ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, "খেলাধূলায় শান্তিপুর," *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১৫ই অক্টোবর, ১৯৭৪।

১৫৬. ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, "খেলাধূলায় শান্তিপুর," *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা নভেম্বর, ১৯৭৪।

১৫৭. বদরুদ্দীন, "নদিয়ার খেলাধূলা- অতীত ও বর্তমান," ১৭৮।

১৫৮. তদেব, ১৭৯।

১৫৯. তদেব, ১৭৮-১৭৯।

১৬০. *The Times of India*, 20th April, 2016.

১৬১. বদরুদ্দীন, "নদিয়ার খেলাধূলা- অতীত ও বর্তমান," ১৮২।

পঞ্চম অধ্যায়:

নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা

বা

নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের ইতিহাস

নদীয়া জেলার ক্রীড়া ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা (Nadia District Sport Association)- এর কথা। এটি নদীয়া জেলার সর্বোচ্চ ক্রীড়া সংস্থা যার তত্ত্বাবধানে ও অনুমোদনে জেলার প্রায় সমস্ত ক্রীড়া কর্মসূচি এবং খেলাধুলা আয়োজিত হয়ে থাকে। এই সংস্থা জেলার সমস্ত ক্রীড়া সংগঠনের তত্ত্বাবধায়ক ও নিয়ন্ত্রক হিসেবে ভূমিকা পালন করে থাকে। নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা রাজ্য ও জাতীয় স্তরের একাধিক ক্রীড়া সংস্থার দ্বারা অনুমোদিত। জেলার সমস্ত ক্লাবকে জেলা ক্রীড়া সংস্থার দ্বারা নির্ধারিত নির্দিষ্ট শর্ত পূরণের মাধ্যমে প্রতিবছর তাদের ক্রীড়া কর্মসূচি পরিচালনার জন্য অনুমোদন লাভ করতে হয়। জেলার সমস্ত ক্লাবের খেলোয়াড়দের জেলা ক্রীড়া সংস্থার অনুমোদন লাভ করতে হয়, যার অনুমোদন বলে তারা রাজ্য ও জাতীয় স্তরের বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহণের বৈধতা লাভ করে। ক্লাব ও খেলোয়াড়গণ যথার্থ ক্রীড়া সংক্রান্ত নিয়মাবলী পালন করছে কিনা তার উপর নজর রাখা এবং প্রয়োজনে ক্লাব ও খেলোয়াড়দের অসৎ আচরণের বিরুদ্ধে আইন অনুসারে ব্যবস্থা ও শাস্তি প্রদানেরও ব্যবস্থা করে থাকে সংস্থা। জেলার সমস্ত ক্লাব ও খেলোয়াড়দের উপর অপ্রতিহত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও জেলা ক্রীড়া সংস্থা মূলত অভিভাবক সুলভ পরামর্শদাতা ও নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে থাকে। জেলার প্রধান ক্রীড়া সংস্থা হিসেবে নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রতিষ্ঠা, সংস্থার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী, সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী ও জেলায় ক্রীড়া সম্প্রসারণে সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে এই অধ্যায়ে। এছাড়াও ভারতের এক প্রান্তিক জেলা ক্রীড়া সংস্থা হয়েও খেলার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে এক্ষেত্রে বাংলাদেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জেলা সংস্থা রেখেছে তার এবং বৃহত্তর সামাজিক সচেতনতামূলক কার্যে খেলাধুলাকে এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করার যে দৃষ্টান্ত জেলা ক্রীড়া সংস্থা তুলে ধরেছে তার সুচারু বর্ণনা দেওয়া হয়েছে উক্ত অধ্যায়ে।

• ৫.২. প্রতিষ্ঠা ও নামকরণ:

জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রতিষ্ঠা ঘটে ঔপনিবেশিক শাসনকালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার কর্তৃক ১৯৩৭ সালে এবং প্রতিষ্ঠার সময় এই সংস্থার নাম ছিল নদীয়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন (Nadia Sporting Association)। প্রতিষ্ঠার সময় এই সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন যথাক্রমে পদাধিকার বলে নদীয়া জেলার তৎকালীন জেলা শাসক আই.সি.এস, এম.এম. স্টিয়ার্ট (M.M. Stewart) এবং তৎকালীন কৃষ্ণনগর পৌরসভার পৌরপিতা সুধীন্দ্র চন্দ্র মল্লিক।[১] ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার কর্তৃক এই সংগঠন গড়ে তোলার পশ্চাতে তাদের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক উদ্দেশ্য কাজ করেছিল। ঊনবিংশ শতকের সূচনা লগ্ন থেকে ভারতে যে ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ঢেউ উঠেছিল নদীয়া জেলাও তার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল, বিশেষত যুব সমাজ এই সময় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের বহু সংখ্যায় যুক্ত হয়ে পড়েছিল। ব্রিটিশ সরকার মূলত যুব সমাজের মধ্যে এই ক্রমবর্ধমান জাতীয়তাবাদী ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব দূর করে তাদের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে দূরে রাখার মাধ্যম হিসেবে খেলাধুলাকে ব্যবহার করতে চেয়েছিল। খেলাধুলা মূলক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে জেলার যুব সমাজকে খেলাধুলায় কৃতিত্ব অর্জনের পশ্চাতে ব্যস্ত রেখে, তাদের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে রাখার ঔপনিবেশিক উদ্দেশ্যরই চূড়ান্ত পরিণতি এই সংস্থা, ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই এই সংস্থা সূচনা লগ্ন থেকেই পাশ্চাত্য খেলাধুলাকে কেন্দ্র করে নিজ ক্রীড়া কর্মসূচি পরিচালিত করতে থাকে।[২] ছাত্রদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রসার রোধ করার একটি কার্যকারী মাধ্যম হিসেবে তাদের মধ্যে আধুনিক তথা পাশ্চাত্য খেলাধুলার প্রসার ঘটানো যে ব্রিটিশ সরকারের একটি অত্যন্ত চতুর পদক্ষেপ ছিল সেই বিষয়ে আমরা সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারি তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৩২-৩৭ সালের মধ্যবর্তী সময়ের বাংলা প্রদেশের শিক্ষার অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন থেকে। এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন জেলায় বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদকে নিয়ন্ত্রণের জন্য যে সকল গোয়েন্দারা নিযুক্ত তারা জানিয়েছেন গ্রামীণ স্কুলগুলিতে ছাত্রদের জীবনের বৈচিত্র্যহীনতা ও একঘেয়েমি

তাদের বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রমে যুক্ত হওয়ার অন্যতম কারণ ফলে সরকারের উচিত এই সমস্ত ছাত্রদের মধ্যে খেলাধুলার প্রচলন ও প্রসার ঘটানো যা ছাত্রদের ক্রীড়া সাফল্য অর্জনের প্রতি উৎসাহিত করে বিপ্লবী কার্যক্রম থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে বলে তাদের অভিমত। তৎকালীন বাংলার সরকারও এই তত্ত্বকে মেনে নিয়ে গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচী খাতে ভারত সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থের একটি অংশ ব্যয় করে প্রদেশের গ্রামীন স্কুল গুলিতে খেলার মাঠ তথা ক্রীড়া ব্যবস্থাপনা প্রদান করতে।[৩] জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে ছাত্র সমাজকে দূরে সরিয়ে রাখতে খেলাধুলাকে একটি মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করার যে ব্রিটিশ উদ্যোগ সে বিষয়ে তৎকালীন জাতীয়তাবাদী নেতা তথা দেশীয় জনগণও যে যথেষ্ট সচেতন ছিল তার উদাহরণ পাওয়া যায় তৎকালীন সময়ে প্রকাশিত একাধিক সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে। **১৯৩৭** সালে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ইউথ ওয়েলফেয়ার কমিটি (Youth Welfare Committee) গঠন করা হয় এবং প্রদেশের ছাত্রদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এই কমিটির প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।[৪] ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক এই কমিটি গঠনের বিরুদ্ধে বর্ণনা দিতে গিয়ে দেশ পত্রিকা উল্লেখ করে যে এই কমিটির প্রধান উদ্দেশ্য ছাত্রদের কার্যক্রমের উপর নজরদারি করা এবং খেলাধুলার প্রসারের নামে তাদের মধ্যে ব্রিটিশ প্রভুদের প্রতি আনুগত্যের ভাব গড়ে তোলা।[৫] তৎকালীন আনন্দবাজার পত্রিকা আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে সরকারের এই উদ্যোগের পশ্চাতে প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে দমিত করার আকাঙ্ক্ষাকে চিহ্নিত করে।[৬]

১৯৩৭ সালে সংস্থা গঠিত হওয়ার পর যাবতীয় খেলাধুলা সংক্রান্ত কার্য পরিচালনার জন্য কৃষ্ণনগরে একটি খেলার মাঠ পাঁচ বছরের মেয়াদে ভাড়া নেওয়া হয়। এই মাঠটি সেই সময় পরিচিত হয়ে ওঠে অ্যাসোসিয়েশনের খেলার মাঠ (Association Playground) নামে এবং মূলত এই মাঠে বিভিন্ন ধরনের ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতে থাকে এই সময়। তৎকালীন সময় বাংলার অন্যতম জনপ্রিয় ফুটবল প্রতিযোগিতা প্রভাস চন্দ্র মেমোরিয়াল ফুটবল টুর্নামেন্ট (Provash Chandra Memorial Football Tournament) এই মাঠে অনুষ্ঠিত হয়।[৭] সংগঠনের তত্ত্বাবধানে **১৯৩৮** সালে নদীয়া জেলায়

প্রথম শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় কৃষ্ণনগর সরকারি মহাবিদ্যালয়ের মাঠে এবং ওই একই বছর সংগঠন সেই সময় পর্বে কলকাতায় অনুষ্ঠিত একমাত্র ক্রিকেট প্রতিযোগিতা হিসেবে কুচবিহার কাপে অংশগ্রহণ করে। তবে ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক তথা সামগ্রিক পরিস্থিতি সংগঠনের কাজের ক্ষেত্রে প্রতিকূল হয়ে ওঠে। এই সময় পর্বে সংগঠন প্রায় নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় এমনকি পূর্বে সংগঠনের ক্রীড়া সংক্রান্ত কার্য সম্পাদনের জন্য যে খেলার মাঠ কৃষ্ণনগরে ভাড়া নেওয়া হয়েছিল পাঁচ বছরের মেয়াদে তার চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও তা পুনরায় নবীকরণ করা হয়নি।[৮]

১৯৪৮ সালে সংগঠন কে পুনরুজ্জীবিত করা হয় এবং এর নতুন নামকরণ করা হয় নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন (Nadia District Sporting Association)। এরপর ১৯৫২ সালে সংগঠনের নাম পুনরায় পরিবর্তিত হয় এবং এর নতুন নামকরণ করা হয় নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন (Nadia District Sports Association), যে নাম বর্তমানেও একই রয়ে গেছে। ১৯৫২ সালে পুনরুজ্জীবিত সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হন কুমারেশ চন্দ্র এবং সভাপতি হন পদাধিকার বলে তৎকালীন জেলা শাসক। নবগঠিত এই সংস্থা প্রথমে ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (Indian Football Association) ও তার পরবর্তীতে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (Cricket Association of Bengal)- এর দ্বারা অনুমোদন লাভ করে। বর্তমানে এই সংস্থা রাজ্যস্তরের প্রায় ১০টি ক্রীড়া নিয়ন্ত্রক সংস্থা, যারা বিভিন্ন খেলাধুলায় নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে তাদের দ্বারা অনুমোদিত।[৯]

• ৫.৩. জেলা স্টেডিয়ামের নির্মাণ:

প্রতিষ্ঠার সময় থেকে সংগঠনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নিজস্ব একটি খেলার ময়দান ও সেই ময়দানকে কেন্দ্র করে স্টেডিয়াম স্থাপন। পূর্বে উল্লেখিত যে ময়দান জেলা ক্রীড়া সংস্থা পাঁচ বছরের মেয়াদে ভাড়া নিয়ে তার কার্য পরিচালনা করত এবং যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সংস্থা কর্তৃক পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও পুনরায় চুক্তি পুনর্নবীকরণ না হওয়ার জন্য কৃষ্ণনগর টাউন ক্লাবের নিয়ন্ত্রণে ছিল, সেই মাঠ

১৯৬৫ সালে নিজ মালিকানাতে আনতে সক্ষম হয় জেলা ক্রীড়া সংস্থা। এই খেলার মাঠে স্টেডিয়াম নির্মাণের অনুমতি ও অনুদান লাভের জন্য ওই বছরই স্টেট কাউন্সিল অফ স্পোর্টসের (State Council of Sports) কাছে আবেদন করা হলে সেই আবেদন গৃহীত হয়। কিন্তু ১৯৬৬ সালে ভারত-পাক যুদ্ধ শুরু হলে সরকার কর্তৃক আর্থিক অনুদান প্রদান স্থগিত রাখার জন্য স্টেডিয়ামের নির্মাণকার্য ব্যাহত হয়। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ক্রীড়া ক্ষেত্র কখনোই সমাজ বহির্ভূত বিষয় নয় দেশ ও সমাজের বিভিন্ন ঘটনা ক্রীড়া ক্ষেত্রকেও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে থাকে, এমনকি দেশের প্রান্তিক অঞ্চলেও তার প্রভাব অনুভূত হয়। তবে সরকারি আর্থিক অনুদান পাওয়া না গেলেও সংস্থা নিজস্ব উদ্যোগে সংস্থার সদস্য ও স্থানীয় ক্রীড়া অনুরাগী মানুষদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহের জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠে। এই প্রয়াস এর ফল স্বরূপ সংস্থা স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য যে অর্থ সংগ্রহ করে তার মাধ্যমে নির্মাণকার্য ধীর কিন্তু সুস্থিত ভাবে অগ্রসর হতে থাকে। যার পরিণতিতে ১৯৬৭ সালের ২৩শে জানুয়ারি স্টেডিয়ামের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় এবং সংস্থার নিজস্ব সংগৃহীত অর্থেই স্টেডিয়ামের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। জেলা স্টেডিয়ামের নির্মাণ কার্য শুরু হওয়ার অল্প কিছুদিন পরেই দেশে যুদ্ধ জনিত পরিস্থিতি দূর হলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৫০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করে নির্মাণকার্য সম্পাদনের জন্য। এছাড়াও সরকারের তরফ থেকে বিভিন্ন সময় স্টেডিয়ামের কলেবর বৃদ্ধির জন্য আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয় যার চূড়ান্ত রূপ হল বর্তমানে জেলা স্টেডিয়াম, যা একই সঙ্গে জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রধান কার্যালয়। বর্তমানে স্টেডিয়াম ৪০০০ জন দর্শক সম্বলিত গ্যালারি, তিন তলা কার্যালয় ভবন ও ৩০ টি ভাড়া দেওয়া দোকান নিয়ে গঠিত।[১০] ২০১৫ সালের ২৮শে মে জেলা ক্রীড়া সংস্থার গভর্নিং বডির সভায় সভাপতি তথা তৎকালীন জেলাশাসক পি.বি. সালিম জেলা স্টেডিয়ামের নতুন নামকরণের প্রস্তাব পেশ করেন কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত সাহিত্যিক দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নামানুসারে। সভার সভাপতি জেলা শাসকের উপস্থিতিতে জেলা স্টেডিয়ামের নতুন পরিচিতি ডি.এল. রায় মেমোরিয়াল ডিস্ট্রিক্ট স্টেডিয়াম (D.L. Roy Memorial District Stadium)- এর প্রস্তাব সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয় এবং অনুষ্ঠানের দিন ঠিক হয়। অনুষ্ঠানের দিন অর্থাৎ ১০ই জুন ২০১৫ সালে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নব কলেবরে সজ্জিত স্টেডিয়ামের শুভ উদ্বোধন করেন নদীয়া জেলা

পরিষদের সভাপতি বাণীকুমার রায় এবং স্টেডিয়ামের প্রবেশদ্বারে নতুন ফলকের উন্মোচন করেন সংস্থার সভাপতি তথা জেলা শাসক পি.বি. সালিম।[১১]

• ৫.৪. নিয়ম সংহিতা রচনা ও সেই সংক্রান্ত জটিলতা:

১৯৪৮ সালে জেলা ক্রীড়া সংস্থার পুনর্জীবনের পর স্বাধীন দেশের নবগঠিত আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সংস্থার একটি নতুন নিয়ম সংহিতা রচনা আবশ্যিক হয়ে ওঠে। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে জেলা ক্রীড়া সংস্থার গোড়াপত্তন ঘটে ১৯৩৭ সালে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকারের অধীনে, ফলত এই সংস্থা মূলত এক ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার যেখানে কখনোই কোন প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থাপনা ছিল না। এই সংস্থার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হতেন যথাক্রমে পদাধিকার বলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কৃষ্ণনগর পৌরসভার পৌরপিতা। এছাড়া সংস্থায় অন্য কোন ক্লাব বা জন প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু দেশ স্বাধীনতা লাভের পর স্বাধীন দেশের স্বাধীন ও সাংবিধানিক আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জেলা ক্রীড়া সংস্থার একটি নিয়ম সংহিতা রচনা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। ইতিমধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতকের গোড়ার দিক থেকে জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষত রানাঘাট, চাকদহ, কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, শান্তিপুর অঞ্চলে খেলাধুলার প্রসার ঘটে এবং বহু নতুন ক্লাব গড়ে উঠতে থাকে সমগ্র জেলায়। খুব স্বাভাবিকভাবে এই ক্লাবগুলি ভেবেছিল জেলা ক্রীড়া সংস্থার নতুন নিয়ম সংহিতা অনুসারে তারা জেলা ক্রীড়া সংস্থার গভর্নিং বডি সহ বিভিন্ন কার্যকারী কমিটিতে নিজেদের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পাবে। ১৯৫০ সালের মধ্যে জেলার কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, রানাঘাট, চাকদহ, মাজদিয়া প্রভৃতি স্থানে প্রধানত ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে ক্লাব গড়ে উঠলে এসব স্থানে লীগ প্রথায় খেলা শুরু হয়। উক্ত ছয়টি স্থানের লীগের একটি বা দুইটি করে ক্লাব নিয়ে ১৯৫১ সাল থেকে জেলা সংস্থার তত্ত্বাবধানে আন্তঃক্লাব ফুটবল প্রতিযোগিতার সূচনা হয়। জেলা ক্রীড়া সংস্থার অ্যাথলেটিক স্পোর্টস অনুষ্ঠান (বার্ষিক) ১৯৫১ সালে শান্তিপুরে ও ১৯৫২ সালে চাকদহে অনুষ্ঠিত হলে রানাঘাট মহকুমায় খেলাধুলার বিশেষ প্রসার ঘটে। তবে আশ্চর্যের বিষয় জেলা ক্রীড়া সংস্থার গভর্নিং বডিতে রানাঘাট মহাকুমার একমাত্র একটি প্রতিনিধি ছিলেন অনিল প্রামাণিক,

যদিও তিনি ছিলেন জেলা সংস্থার ৮ জন আজীবন সদস্যদের মধ্যে একজন। রানাঘাট মহকুমায় এই সময় প্রথম শ্রেণীভুক্ত ক্লাব ছিল যথাক্রমে দুইটি- শান্তিপুর স্পোর্টিং ইউনিয়ন ও রানাঘাট বিশ্বাসপাড়া ক্লাব। এই মহাকুমার ক্লাবগুলি এবং আঞ্চলিক ক্রীড়া সংগঠকরা জেলা ক্রীড়া সংস্থার গভর্নিং বডিতে অধিকতর প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজন অনুভব করেন।[১২]

১৯৫১ সালে জেলা ক্রীড়া সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভায় রানাঘাট মহকুমা থেকে কেবলমাত্র তিনজন নতুন প্রতিনিধিকে জেলা ক্রীড়া সংস্থার গভর্নিং বডিতে স্থান দেওয়া হয়, যারা হলেন- রানাঘাটের হিরন্ময় তরফদার ও মণিমোহন ঘোষ এবং চাকদহের পূর্ণচন্দ্র বাকচী। এই সময় থেকে গঠনতন্ত্র সংশোধনের দাবি জোড়ালো হয়ে ওঠে এবং দীর্ঘ টালবাহানার পর **১৯৫২** সালে গঠনতন্ত্র সংশোধিত হয়। যদিও সংশোধিত এই গঠনতন্ত্রে ক্লাবের প্রতিনিধি সংখ্যা না বাড়ায় অধিকাংশ ক্লাব ও সংগঠক হতাশ হন। ইতিমধ্যে **১৯৫২** সালের আগস্ট মাসে আই.এফ.এ শিল্ড প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য খেলোয়াড় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রানাঘাট মহকুমার ক্লাবগুলি আগে থেকেই বিক্ষুব্ধ ছিল। বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য জেলা শাসক ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি নভেম্বর মাসের ২৩ তারিখে গভর্নিং বডির এক সভা ডাকেন, যদিও গঠনতন্ত্রের কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়নি। গঠনতন্ত্রের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত না হওয়ায় বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর একটি অস্থায়ী কমিটির **১৯৫৩** সালের **১৮ই** জানুয়ারি তারিখের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ওই বছরেরই ফেব্রুয়ারি মাসের ৮ তারিখে রানাঘাট স্বাস্থ্যোন্নতি সভাগৃহে জেলার সমস্ত বিক্ষুব্ধ ক্লাবের প্রতিনিধি এক সম্মেলনে মিলিত হয় এবং ওই সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয় যে জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় জেলার খেলাধুলার সর্বাঙ্গীন উন্নতি সভাপতি কুমারেশ চন্দ্রের স্বৈরাচার ও একনায়কতন্ত্রের দরুন নিদারুণভাবে বাধা প্রাপ্ত। একই সঙ্গে এই সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় কোন পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব নয় ফলে জেলার বিক্ষুব্ধ ক্লাবগুলিকে নিয়ে 'স্পোর্টস ফেডারেশন' (Sports Federation) নামে একটি নতুন স্বাধীন সংস্থা সংগঠিত করা হবে। নতুন এই সংস্থা গঠিত হওয়ার ফলে জেলার ক্লাবগুলি অ্যাসোসিয়েশন ও ফেডারেশন- এই দুই সংস্থার অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং একই সঙ্গে কিছু ক্লাব কোন পক্ষই গ্রহণ করেনি। চাকদহ অঞ্চলের

কোনো ক্লাবই অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে ছিল না এবং রানাঘাটের একটিমাত্র ক্লাব ও নবদ্বীপের দুটি ক্লাব অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে ছিল। ফেডারেশন তার নিজ কার্যাবলী পরিচালনার জন্য নিজস্ব গঠনতন্ত্র রচনা করে তার অধীনস্থ ক্লাবগুলিকে পাঠায়। ফেডারেশন জেলা শাসক কে সভাপতি, তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও নফরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে সহ-সভাপতি, অনিল প্রামাণিককে সম্পাদক ও জ্যোতির্ময় মিত্রকে সহ-সম্পাদক হিসেবে নির্বাচন করে। ইতিমধ্যে জেলাশাসক বি.আর. গুপ্ত ও রায়বাহাদুর পূর্ণচন্দ্র বাগচী ১৯৫৩ সালের ১২ই মে তারিখে যথাক্রমে অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ও সহ-সভাপতির পদ পরিত্যাগ করেন। এমনকি জেলাশাসক তার পদত্যাগের অনুলিপি অ্যাসোসিয়েশনের গভর্নিং বডির সকল সদস্যকে ও আই.এফ.এ কে পাঠান এবং একই সঙ্গে তিনি পদত্যাগ পত্রে উল্লেখ করেন যে তার পদত্যাগের মাধ্যমে অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে সরকারের সমস্ত সংস্রবের অবসান ঘটলো। ফেডারেশন সক্রিয় হয়ে নিজস্ব সংগঠকদের কর্ম তৎপরতাই সমগ্র জেলায় খেলাধুলার এক জোয়ার আনে। জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে সংগঠিত খেলাধুলার প্রসার, নতুন নতুন ক্লাব সংগঠনে সাহায্য দান, ফুটবল ও অ্যাথলেটিক্স ছাড়াও ভলিবল, ক্রিকেট, কবাডি, সাঁতার প্রভৃতি খেলাধুলার উন্নয়ন ফেডারেশনের কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিভিন্ন খেলাধুলা কে কেন্দ্র করে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় এবং বিভিন্ন খেলাধুলার জন্য যে রাজ্য সংস্থা রয়েছে তাদের নিকট অনুমোদনের জন্য আবেদন করা হয়। রাজ্য স্তরের ক্রীড়া সংস্থাগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ অ্যামেচার অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন, পশ্চিমবঙ্গ ভলিবল ফেডারেশন, বেঙ্গল অ্যামেচার সুইমিং অ্যাসোসিয়েশন জেলা ফেডারেশনকে স্বীকৃতি দান করে। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ জেলা স্পোর্টস ফেডারেশন এবং পশ্চিমবঙ্গ আম্পায়ারস ও রেফারিজ অ্যাসোসিয়েশনও জেলা ফেডারেশন কে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে। জেলা ফেডারেশন নদীয়া রেফারিজ অ্যাসোসিয়েশনও গঠন করে।

ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় জেলার বিভিন্ন অঞ্চল কর্ম তৎপর হয়ে ওঠে। রানাঘাট আঞ্চলে ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল, অ্যাথলেটিক্স ও সাঁতার প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয় এবং রানাঘাট আঞ্চলিক ক্রীড়া সংস্থার কর্মীদের মধ্যে যাদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য তারা হলেন – সর্বশ্রী সুধীর চৌধুরী, অপরেশ বিশ্বাস, হিরণময় তরফদার, মণিমোহন ঘোষ, হৃদয়তোষ বিশ্বাস, সুধাংশু নন্দী, হরিপ্রসাদ কুন্ডু, নারায়ণ

চন্দ্র গোস্বামী প্রমুখ। এছাড়াও রানাঘাট মহকুমার তৎকালীন মহকুমা শাসক সহ ডঃ বিনয় চ্যাটার্জী, সর্বশ্রী বিমল চ্যাটার্জী, ললিতমোহন বসু, বিশ্বনাথ গোস্বামী, মৃণাল দত্ত, মণিলাল চ্যাটার্জী, অমিয় ঘোষ প্রমুখরা রানাঘাট মহকুমায় ফেডারেশনের কার্যে নানাভাবে সহযোগিতা করেন। কৃষ্ণগঞ্জ আঞ্চলিক ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে এই অঞ্চলে সর্বশ্রী রমেশ সান্যাল, দেবীপ্রসাদ ভাদুড়ী, সমর ঘোষ প্রমুখ সংগঠকেরা ক্রীড়া প্রসারে উদ্যোগী হন এবং তাদের পরিচালনায় এই অঞ্চলে ফুটবল, ভলিবল ও অ্যাথলেটিক্স খেলার ব্যবস্থা হয়। হাঁসখালি আঞ্চলিক ক্রীড়া সংস্থার ড. গোপেন বিশ্বাস, সর্বশ্রী রমেন মল্লিক, ফণিভূষণ মন্ডল, নিরঞ্জন দত্ত প্রমুখের চেষ্টায় হাঁসখালি ও বাদকুল্লা অঞ্চলে ফুটবল, ভলিবল ও অ্যাথলেটিক্স- এর প্রসার ঘটে। নবদ্বীপ আঞ্চলিক ক্রীড়া সংস্থার রায়বাহাদুর পূর্ণচন্দ্র বাগচী, সর্বশ্রী তিলকড়ি বাগচী, পিকু বাগচী, সুধাময় সেন, তুষার পাল, শংকর সান্যাল, অধ্যাপক সত্য দাস প্রমুখ ক্রীড়া সংগঠকদের প্রচেষ্টায় এই অঞ্চলে ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল, প্রভৃতি খেলাধুলার প্রতিযোগিতা পরিচালিত হয়। চাকদহ আঞ্চলিক ক্রীড়া সংস্থায় সর্বশ্রী সুশীল ঢোল, জ্যোতির্ময় মিত্র, সুধাংশু শেখর ব্যানার্জী, পূর্ণচন্দ্র বাকচী প্রমুখ ক্রীড়া সংগঠকরা সক্রিয় ছিলেন। শান্তিপুর আঞ্চলিক ক্রীড়া সংস্থায় সর্বশ্রী অনিল প্রামাণিক, মণিলাল কুণ্ডু, মদনমোহন দালাল প্রমুখ ক্রীড়া সংগঠকরা ছিলেন প্রধান এবং এখানে ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল ও অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা পরিচালিত হয়। কৃষ্ণনগরে সর্বশ্রী নীহাররঞ্জন বিশ্বাস, চিত্র সেনগুপ্ত, রবি সেনগুপ্ত, দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী, স্মৃতিময় সিংহ, গোবিন্দ দত্ত প্রমুখ ক্রীড়া সংগঠরা ফেডারেশনের পক্ষে সক্রিয় ছিলেন।[১৩]

জেলা শাসকের অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি পদ থেকে পদত্যাগ ও ফেডারেশনের পদ গ্রহণের ফলে আই.এফ.এ বিশেষ অসুবিধায় পড়ে। আই.এফ.এ- এর সম্পাদক এস. দত্তরায় অ্যাসোসিয়েশনের কুমারেশ চন্দ্রের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তিনি অবস্থার চাপে জেলার ফেডারেশন বনাম অ্যাসোসিয়েশন দ্বন্দ্বের মীমাংসার জন্য এক অনুসন্ধান কমিটি প্রেরণে বাধ্য হন। কুমার ব্যানার্জী এই একক কমিটির সদস্যরূপে জেলা পরিদর্শন করলে ফেডারেশনের সহ-সভাপতি শংকরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পাগলাচণ্ডীতে নিজ ভবনে উভয় পক্ষকে সমবেত করে মীমাংসার চেষ্টা করেন, যদিও তা ফলপ্রসূ হয়নি। পরিস্থিতির চাপে অ্যাসোসিয়েশন ১৯৫৪- এর এপ্রিল মাসে গঠনতন্ত্রের সংশোধন করে এবং শংকরদাস বন্দোপাধ্যায়

সভাপতি ও রূপচাঁদ দফাদারকে সম্পাদক করা হয়। গঠনতন্ত্রের সংশোধন সত্ত্বেও ফেডারেশনপন্থীরা এতে উৎসাহ বোধ করেনি কারণ তাদের মূল দাবি ব্যক্তি প্রাধান্য মুক্ত গণতান্ত্রিক নিয়মতান্ত্রিক গঠনতন্ত্র রচনা ও জেলা সংস্থার কেন্দ্রীয় অফিস জেলার সদরে স্থানান্তরিত করণের প্রতিশ্রুতি সংশোধিত গঠনতন্ত্রে স্থান পায়নি। ইতিমধ্যে জেলাশাসক বি.আর. গুপ্তা অ্যাসোসিয়েশন থেকে সংসর্গ হীন অবস্থায় থাকাকালীন এবং ফেডারেশনের সভাপতি থাকা অবস্থায় বদলি হয়ে জেলা ত্যাগ করেন। নতুন জেলাশাসক হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার পর এস.দত্ত. মজুমদার উভয় সংস্থার মধ্যে বিরোধের মীমাংসা করতে সচেষ্ট হয়ে উভয় সংস্থার নেতৃত্ববৃন্দের উপস্থিতিতে এবং উভয় পক্ষের গ্রহণযোগ্য গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করে, অ্যাসোসিয়েশন ও ফেডারেশনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসে। নতুন এই সংশোধিত গঠনতন্ত্রে উভয়ই সংস্থার সমস্ত অনুমোদিত ক্লাব স্বীকৃতি পায় ও অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় অফিস জেলার সদরে স্থানান্তরিত করার অন্যতম মূল দাবিও স্বীকৃতি পায়। নতুন গঠনতন্ত্রে নদীয়া জেলা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের নামই বলবৎ হয় এবং ফেডারেশনের অবলুপ্তি ঘটে। এই নতুন গঠনতন্ত্র অনুযায়ী অনুষ্ঠিত ১৯৫৫ সালের মে মাসের নির্বাচনে পূর্বতন ফেডারেশন পন্থীরা গরিষ্ঠতা পাওয়া সত্ত্বেও অ্যাসোসিয়েশন পন্থীদের দ্বারা মনোনীত রূপচাঁদ দফাদারকে সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত করে প্রকৃতপক্ষে সৌহার্দ্য ও খেলোয়াড়ী মনোভাবের এক অনন্য নজির স্থাপন করে।[১৪]

প্রকৃতপক্ষে উভয় সংস্থার সংগঠক ও কর্মীবৃন্দই বোঝাপড়ার মাধ্যমে সমন্বয়ের জন্য আগ্রহান্বিত ছিলেন। অল্প সংখ্যক ক্লাব থাকায় ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৫ সালের মধ্যে অ্যাসোসিয়েশন কার্যত কাগজী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। অপরপক্ষে ফেডারেশনের পক্ষে জেলার অধিকাংশ ক্লাব থাকা সত্ত্বেও আই.এফ.এ- এর অনুমোদন না পাওয়ার ফলে কর্মীদের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল। ফলে দুই সংস্থার মধ্যে সমন্বয় যথার্থই আন্তরিক হয়েছিল। নতুন গঠনতন্ত্র অনুসারে গঠিত ১৯৫৫-৫৬ সালের নব নির্বাচিত গভর্নিং বডিতে আসা সকলেই অর্পিত দায়িত্ব আন্তরিক ভাবে পালন করেন কোন বিরোধ ছাড়াই। নতুন ব্যবস্থায় কে অ্যাসোসিয়েশন পন্থী, আরকে ফেডারেশন পন্থী ছিলেন তা আর নির্ধারণের উপায় থাকলো না। তবে ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশনের মধ্যে বিরোধীর স্থায়ী ফল জেলা ক্রীড়া ক্ষেত্রে রয়ে গেল ১৯৫৫ সালে

নতুন গঠনতন্ত্র রচনার মাধ্যমে, যা গঠনতন্ত্র তথা জেলা ক্রীড়া সংস্থা থেকে একনায়কতন্ত্র ও স্বৈরাচারকে দূর করে নিয়ম তান্ত্রিক এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে স্থায়ী রূপে প্রতিষ্ঠা করে।[১৫] জেলা ক্রীড়া সংস্থার নিয়মসংহিতার গণতান্ত্রিকরণের জন্য এই আন্দোলনস্বরূপ সংঘাত সদ্য স্বাধীনতা লাভ করা দেশের জনগণের মধ্যে সঞ্চারিত অধিকারবোধ ও গণতান্ত্রিক সচেতনতার দ্বোতক। একইভাবে নিয়মসংহতাই সংগঠনের অনুমোদন প্রাপ্ত ক্রীড়া ক্লাবের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, ক্লাবকে অবশ্যই ক্রীড়া অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে এবং এই খেলাধুলায় অংশগ্রহণ হতে হবে মুক্ত অর্থাৎ জাতি, ধর্ম, বর্ণ বা পেশার ভিত্তিতে কাউকে অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত করা যাবে না, যা বহুলাংশে ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত সাম্যের আদর্শকে তুলে ধরে।[১৬]

• ৫.৫. বাংলাদেশের সঙ্গে মিত্রতার অনন্য নজির:

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করলেও তার পরিণতিতে তাকে হতে হয়েছিল খন্ডিত। ভারতবর্ষের পূর্ব প্রান্তের প্রদেশ বাংলা দ্বিখন্ডিত হয় এবং ভারতের অন্তর্ভুক্ত প্রদেশ পশ্চিমবঙ্গ ও পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত পূর্ববঙ্গ পরিচিত হয় পূর্ব পাকিস্তান নামে। রাষ্ট্র গঠনের ইতিহাসে স্বাধীন পাকিস্তান গঠন ছিল এক অভূতপূর্ব ঘটনা কারণ এই দুই অংশ অর্থাৎ পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে ছিল বিস্তৃত এক বিদেশী ভূখণ্ড। এই ভৌগলিক বিচ্ছিন্নতা ছাড়াও এই দুই অংশের ভাষা, সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার, ঐতিহ্য এবং অর্থনীতির মধ্যেও ছিল বিস্তার ব্যবধান। পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের সম্পর্ক ছিল মূলত ঔপনিবেশিক যেখানে পূর্ব পাকিস্তানের উপর সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য স্থাপনের প্রয়াস ছিল সুস্পষ্ট। খুব স্বাভাবিকভাবেই পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ এই আধিপত্য স্থাপনের প্রয়াসকে মেনে নেয়নি এবং ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নেই সর্ব প্রথম পাকিস্তান রাষ্ট্রের উভয় অংশের মধ্যে সংঘাতের সূচনা হয়।[১৭] আর এই সংঘাতের চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে ১৯৭১-এর ২৬শে মার্চ সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্র হিসেবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্যে দিয়ে যে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হয়, তার পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানের আত্মসমর্পণ ও নতুন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের উদ্ভবের মধ্যে দিয়ে।[১৮]

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যেমন ছিল এক বিস্তার ব্যবধান তেমনি পূর্ব পাকিস্তান তথা পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে ছিল ভৌগোলিক, আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহ্যগত দিক থেকে ব্যাপক নৈকট্য। পূর্ব পাকিস্তান থেকে ১৯৪৬ সালের নোয়াখালীর দাঙ্গার পর থেকে যে হিন্দু উদ্বাস্তুদের আগমনের সূচনা হয়, পশ্চিমবঙ্গে তা একাধিক পর্যায়ে চলতে থাকা এক অন্তহীন ধারার রূপ নেয়।[১৯] দেশভাগ ও তার পরবর্তী উদ্বাস্তু সমস্যা স্বাধীনতা পরবর্তী সমাজে নিয়ে এসেছিল নতুন সামাজিক দ্বন্দ্ব। যারা প্রায় সর্বহারা হয়ে পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিল তাদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের আদি অধিবাসীদের নানা আর্থসামাজিক কারণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে আর ক্রীড়া ক্ষেত্রে এই দ্বন্দ্বের সার্থক প্রতিফলক হয়ে ওঠে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল ফুটবল ক্লাবের মধ্যে প্রতিযোগিতা।[২০] যদিও এক্ষেত্রে সহযোগিতার দৃষ্টান্তও প্রচুর পাওয়া যায়, যার এক উজ্জ্বল উদাহরণ ক্রীড়া ক্ষেত্রে স্থাপন করেছে নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা। নদীয়া সীমান্তবর্তী জেলা হাওয়াই স্বাভাবিকভাবেই এখানে শরণার্থী আগমন বহু সংখ্যায় ঘটে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হলে পশ্চিমবঙ্গের জনগণ খুব স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা কামী জনগণের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ছিল। পশ্চিমবঙ্গের মানুষজন বিভিন্ন উপায়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করতে উদ্যোগী হয়েছিল এবং এক্ষেত্রে খেলার মাঠও হয়ে উঠেছিল এক মাধ্যম। পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় গ্রহণকারী মুক্তি যোদ্ধারা তাদের নব উত্থিত জাতীয়তাবাদ প্রকাশের সফল সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র এবং বিশ্বের দরবারে তাদের মুক্তিযুদ্ধকে পৌঁছে দেওয়ার ও বিশ্ব সমর্থন লাভের একটি মাধ্যম হিসেবে খেলার মাঠকে বিশেষত ফুটবলকে গ্রহণ করেছিল। পূর্ব পাকিস্তানের বহু বাঙালি খেলোয়াড় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং অনেকে পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে আসেন ও কলকাতায় নবগঠিত স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের সমর্থনে হাত মেলান। পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় গ্রহণকারী বেশ কিছু পূর্ব পাকিস্তানের ফুটবল খেলোয়াড় “বাংলাদেশ ক্রীড়া সমিতি” প্রতিষ্ঠা করেন। এই ক্রীড়া সমিতি স্থির করে যে তারা বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শনী ফুটবল খেলায় অংশগ্রহণ করবে। এই প্রদর্শনী খেলার পশ্চাতে দুটি উদ্দেশ্য কাজ করেছিল প্রথমত, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে প্রচার ও জনসমর্থন তৈরি করা এবং দ্বিতীয়ত, প্রদর্শনী খেলার মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ মুক্তিযুদ্ধের সাহায্যে দান করা। স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের অধিনায়ক

জাকারিয়া পিন্টু তার আত্মজীবনীমূলক রচনায় এই ফুটবল দল গঠনের বর্ণনা দিয়েছেন যেখানে বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের ভূমিকা ও অবদানের কথাও বর্ণিত হয়েছে।[২১] তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত খেলোয়াড়দের নিয়ে ১৯৭১ সালের জুন মাসে ফুটবলের অনুশীলন পর্ব শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত কলকাতার লেক সার্কাস মাঠে এক ট্রায়াল এর মাধ্যমে চূড়ান্ত দল গঠিত হয় যার অধিনায়ক ও সহ-অধিনায়ক নির্বাচিত হন যথাক্রমে জাকারিয়া পিন্টু ও প্রতাপ সংকর হাজরা এবং তাদের ম্যানেজার ও কোচ হন যথাক্রমে তনভীর মাজহার তান্না ও ননী বসাক।[২২] জাকারিয়া পিন্টুর নেতৃত্বে গঠিত বাংলা ফুটবল দল ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে মোট ১৬ টি প্রদর্শনী খেলায় অংশগ্রহণ করে।[২৩]

বাংলা দলের প্রথম খেলাটি অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭১ সালের ২৫শে জুলাই কৃষ্ণনগর স্টেডিয়ামে নদীয়া একাদশের বিরুদ্ধে। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় যে এই খেলার দিনটিকে নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে বিতর্ক লক্ষ করা যায়, যার উল্লেখ করেছেন ইতিহাসবিদ কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার "খেলা যখন ইতিহাস" গ্রন্থে।[২৪] নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার তরফ থেকে এই খেলার প্রবেশ মূল্য হিসেবে টিকিটের দাম ৫০ পয়সা ধার্য করা হয় এবং লব্ধ অর্থ সমস্তটাই বাংলাদেশের সরকারের হাতে মুক্তিযুদ্ধের সাহায্যার্থে প্রদান করা হবে বলে স্থির হয়। যাতে সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা যায় সেই উদ্দেশ্যে এই প্রদর্শনী খেলায় সর্বপ্রকার বিনামূল্যে প্রবেশের ব্যবস্থা বা ফ্রী পাশের ব্যবস্থা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় জেলা ক্রীড়া সংস্থার তরফ থেকে।[২৫] খেলাটির প্রচারে বাংলাদেশের ফুটবল দলের খেলোয়াড়দের ছবিসহ পোস্টার দেওয়ার ফলে প্রদর্শনী খেলাটাকে কেন্দ্র করে জনমানসে আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। স্বাধীন বাংলাদেশ রেডিওতে খেলার খবর প্রচার করা হলে নদীয়ার পার্শ্ববর্তী তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত কুষ্টিয়া জেলা থেকেও বহু মানুষের সমাগম ঘটে খেলার মাঠে।[২৬] এই খেলা প্রদর্শনের জন্য কৃষ্ণনগরের জেলা স্টেডিয়ামে ব্যাপক জনসমাগম ঘটে। নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার মতে উক্ত খেলা প্রদর্শনের জন্য জেলা স্টেডিয়ামে প্রায় ৮ হাজার দর্শকের সমাগম ঘটে। ইতিপূর্বে জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন চ্যারিটি ম্যাচে উপযুক্ত

দর্শক সমাগম না হলেও এই খেলাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক জনসমাগম প্রমাণ করে একদিকে এই খেলা যেমন জনগণের মধ্যে ব্যাপক উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল, তেমনি অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের জনগণ এক্ষেত্রে মূলত নদীয়াবাসী জনগণ যে তাদের প্রতিবেশী পূর্ব পাকিস্তানের বাঙ্গালীদের মুক্তিযুদ্ধের প্রবল সমর্থক তাও দ্ব্যর্থহীন ভাবে প্রমাণিত হয়। ২৫শে জুলাই বিকেল চারটে তিরিশ মিনিটে অনুষ্ঠিত খেলায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের বেশ কিছু পদস্থ ব্যক্তি এবং বাংলাদেশের মুক্তি ফৌজের জনৈক্য উচ্চ পর্যায়ের রণনায়কগণ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন নদীয়ার জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, সহ-পুলিশ সুপার এবং জেলার অন্য অনেক পদস্থ আধিকারিক। কলকাতাতে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনের প্রধান হোসেন আলীর উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তিনি খেলার দিন উপস্থিত থাকতে পারেননি।[২৭] তবে খেলা শুরু হওয়ার পূর্বে জটিলতার সৃষ্টি হয় যখন বাংলাদেশ দল সিদ্ধান্ত নেয় যে খেলা শুরুর পূর্বে তারা জাতীয় পতাকা নিয়ে খেলার মাঠ প্রদক্ষিণ করবে এবং সেই পতাকা বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত গাওয়ার মাধ্যমে উত্তোলিত করা হবে। নির্বাসনে গঠিত বাংলাদেশ সরকারকে যেহেতু তখনও পর্যন্ত ভারত সরকার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়নি, তাই বাংলাদেশ দলের এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা জেলা ক্রীড়া সংস্থার এখতিয়ারের বাইরে ছিল। কিন্তু বাংলাদেশ দলের খেলোয়াড়রা তাদের দাবিতে অনড় থেকে জানায় যে তাদের এই দাবি পূরণ না হলে তারা মাঠে খেলায় অংশগ্রহণ করবে না।[২৮] এই সমস্যা সমাধানের জন্য শেষ পর্যন্ত নদীয়ার জেলাশাসক এগিয়ে আসেন এবং তিনি নিজে দায়িত্বে বাংলাদেশ দলের জাতীয় সংগীত গাওয়া ও পতাকা উত্তোলন করার দাবি মেনে নিয়ে অনুমতি দেন।[২৯] এই ঘটনা ছিল ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ কারণ এই প্রথম বিদেশের মাঠে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত গাওয়া হলো ও পতাকা উত্তোলন করা হলো। খেলা শুরু হওয়ার পূর্বে দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশন করেন বাংলাদেশের দুই বেতার শিল্পী রফিকুল হোসেন (বুলবুল), পেলিনা আখতার ও স্থানীয় বেতার শিল্পী রেনু ভট্টাচার্য। বাংলাদেশ দলের খেলোয়াড় বৃন্দ মাঠে নেমে স্বদেশের পতাকা বহন করে সারা স্টেডিয়াম প্রদক্ষিণ করে এবং উপস্থিত দর্শকবৃন্দ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তাদের অভিনন্দন জানায়। এরপর দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের পতাকা ভারতের জাতীয় পতাকার সাথে মাঠে উত্তোলন করেন নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার অন্যতম সহ-সভাপতি জেলা পুলিশ

সুপার সুবলচন্দ্র গুহ মজুমদার। প্রদর্শনী সাহায্যার্থে খেলা হওয়ার সত্বেও খেলাটিকে কেন্দ্র করে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত ২-২ গোলে খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়।[৩০] উক্ত প্রদর্শনী খেলা অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে শেষ হলেও যেহেতু ভারত সরকার তখনও পর্যন্ত অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারকে আনুষ্ঠানিক অনুমোদন প্রদান করেনি তাই খেলার পূর্বে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের অনুমতি প্রদানের জন্য নদীয়া জেলা শাসক কে বরখাস্ত করা হয় এবং জেলা ক্রীড়া সংস্থার স্বীকৃতিও বাতিল করা হয়। এরপর অবশ্য ভারত সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি প্রদান করা হলে জেলা শাসকের বরখাস্তকরণ বাতিল করে তাকে পুনর্বহাল করা হয় এবং নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার স্বীকৃতিও ফিরিয়ে দেওয়া হয়।[৩১]

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকে নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা ও বাংলাদেশের মধ্যে ক্রীড়া ক্ষেত্রে যে সখ্যতা স্থাপিত হয়েছিল, তা বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পরও বজায় থাকে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর প্রথম ১৯৭২ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি নদীয়া জেলা দল ও বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলা দলের মধ্যে কৃষ্ণনগরস্থ জেলা স্টেডিয়ামে একটি প্রদর্শনী ভলিবল খেলা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে তিনটি গেমে খেলা হয় এবং নদীয়া দল তিনটি গেমেই জয়ী হয়। কুষ্টিয়া দলের ম্যানেজার তথা কোচ এম. আলী তাদের পক্ষ থেকে নদীয়া জেলা দলকে কুষ্টিয়া তে ফিরতি প্রদর্শনী খেলার অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানান।[৩২] ১৯৭১ সালের ২৬মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষিত হয় এবং ১৯৭২ সালের ২৬মার্চ সেই স্বাধীনতা ঘোষণার প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত বাংলাদেশ স্বাধীনতা উৎসবের অনুষ্ঠানের মধ্যে একটি ফুটবল প্রতিযোগিতার স্থান পায়। উক্ত ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশের স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ড (Bangladesh Sports Control Board) বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানায় নদীয়া জেলা দলকে। প্রতিবেশী স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণকে নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার কর্তৃপক্ষ সমগ্র নদীয়ার প্রতি বিশেষ সম্মান হিসেবে গ্রহণ করে এবং উপযুক্ত দল গঠন করে বাংলাদেশে পাঠাবার জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়। নদীয়ায় জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তি যারা এখন ঢাকার অধিবাসী তারা নদীয়া জেলা দলকে অভ্যর্থনা

জানাবার জন্য বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে বলে স্থির করে।[৩৩] বাংলাদেশের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে নদীয়া জেলা দল ৪ঠা এপ্রিল বাসের মাধ্যমে যাত্রা করে ওই দিন রাতেই ঢাকায় পৌঁছায়। ৫ই এপ্রিল খেলা হওয়ার কথা থাকলেও পূর্ব দিনের প্রচন্ড ঝড় বৃষ্টির কারণে সেই খেলা পরিত্যক্ত হয় এবং ৫ই এপ্রিল তারিখে পুনরায় ঝড় বৃষ্টি হওয়ার কারণে ৬ই তারিখেও খেলার আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। শেষ পর্যন্ত ৭ই এপ্রিল নদীয়া জেলা দল ঢাকা ফুটবল লীগ বিজয়ী বাংলাদেশ ইনডাসট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (বি.আই.ডি.সি)- এর বিরুদ্ধে মাঠে নামে। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা মূলক এই খেলা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অমীমাংসিত থাকলে অতিরিক্ত সময়ের খেলা শুরু হয় কিন্তু তাতেও উভয় দল গোল করতে ব্যর্থ হলে শেষ পর্যন্ত খেলাটি গোলশূন্যভাবে অমীমাংসিত থাকে। অমীমাংসিত খেলার মীমাংসার জন্য ৮ই এপ্রিল পুনরায় খেলা হয়, এই দিন উভয়পক্ষ দুটি করে গোল করতে সক্ষম হলেও কোন ফলাফল নির্ধারিত হয়নি। ১০ই এপ্রিল পুনরায় খেলা হলে তৃতীয় দিনের এই খেলায় স্থানীয় দল বি.আই.ডি.সি সফর রত নদীয়া দলকে ৩-১ গোলে পরাজিত করে। বাংলাদেশের ক্রীড়া নিয়ন্ত্রক সংস্থা ৯ই এপ্রিল ঢাকা স্টেডিয়ামে নদীয়া দলকে সরকারিভাবে সংবর্ধনা জানায়, যেখানে নদীয়া দলের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটি মৃন্ময় মূর্তি উপহার হিসেবে প্রদান করা হয়।[৩৪] তৃতীয় দিনের খেলার দিন বিপুল দর্শকের উপস্থিতিতে বাংলাদেশের শিক্ষা ও ক্রীড়া বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ইউসুফ আলী বাংলাদেশের জনগণের শুভেচ্ছার নিদর্শন স্বরূপ রৌপ্য নির্মিত একটি নৌকা নদীয়া জেলা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সুকুমার মৈত্রের হাতে অর্পণ করেন, যা বর্তমানে নদীয়া জেলা স্টেডিয়ামে সংরক্ষিত।[৩৫] কৃষ্ণনগর পৌরসভার প্রাক্তন ভাইস-চেয়ারম্যান এবং পরবর্তীতে ঢাকা নিবাসী ও তৎকালীন ঢাকা উয়াড়ী ক্লাবের সহ-সভাপতি এস.এম. জহুরুদ্দীন সফররত নদীয়া দলকে ১০ই এপ্রিল নৈশভোজে আপ্যায়িত করেন।[৩৬] একটি সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশ, বিদেশী রাষ্ট্রের একটি জেলা দলকে সরকারিভাবে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে আয়োজিত প্রদর্শনী খেলায় অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানাচ্ছে এই রকম নজির ইতিহাসে বিরল। নদীয়া জেলা দল প্রকৃতপক্ষে প্রথম বিদেশী দল যারা বাংলাদেশের মাটিতে খেলে। বাংলাদেশ ফুটবল দল তাদের প্রথম খেলা কৃষ্ণনগর স্টেডিয়ামে নদীয়া জেলা দলের বিরুদ্ধে খেলেছিল এবং এর মাধ্যমে যে বৃত্ত

রচনা শুরু হয়েছিল নদীয়া দলের প্রথম বিদেশী দল হিসেবে বাংলাদেশে খেলার মাধ্যমে তা যেন পরিপূর্ণতা পাই।

১৯৮২ সালে ভারত পরিক্রমারত বাংলাদেশের জাতীয় জুনিয়র ফুটবল চ্যাম্পিয়ন নারায়ণগঞ্জ মহকুমা দল ১৯শে অক্টোবর নদীয়া জেলা সাব-জুনিয়র ফুটবল দলের বিরুদ্ধে প্রদর্শনী খেলায় মিলিত হয়।[৩৭] এই প্রদর্শনী খেলাকে কেন্দ্র করে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি কৃষ্ণনগরস্থ জেলাস্টেডিয়ামে উপস্থিত ছিলেন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন রাজ্য মন্ত্রিসভার মন্ত্রী অমৃতেন্দু মুখোপাধ্যায়, নদীয়া জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক, পুলিশ সুপার, সদর মহকুমা শাসক প্রমুখ। উভয় দলের খেলোয়াড়রা মাঠে প্রাগ্যতা ও দক্ষতার অনন্য নজির রেখে এক তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ফুটবল খেলা উপহার দেয় এবং শেষ পর্যন্ত খেলা ২-২ গোলে অমীমাংসিত থাকে। ভারত পরিক্রমারত বাংলাদেশীয় দলটি যেহেতু জুনিয়ার বিভাগের অন্তর্ভুক্ত তাই ভারতে তারা যে সমস্ত দলের বিরুদ্ধে প্রদর্শনী খেলায় অংশগ্রহণ করে তাদেরও দল জুনিয়র ও সাব-জুনিয়র খেলোয়াড়দের নিয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে গঠিত হওয়া একান্ত আবশ্যক ছিল এবং এক্ষেত্রে সফররত দলটি দু একটি জায়গায় ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের বয়সের বিষয়ে অসন্তুষ্ট ছিল, যদিও নদীয়া দলের বয়সগত গঠনের বিষয়ে সফররত দল যে বিশেষ সন্তুষ্ট তা খেলার শেষে বাংলাদেশীয় দলের কর্মকর্তা নিজ বক্তব্যে তুলে ধরেন। বাংলাদেশীয় দলের কর্মকর্তা কাইসুর খেলার শেষে নদীয়া জেলা দল বিশেষত, সাব-জুনিয়র দল গঠনের ক্ষেত্রে নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার কর্মকর্তার যে সততা ও সামঞ্জস্যতার পরিচয় দিয়েছেন তার প্রশংসা করে জানান, তাদের দল ভারতে মোট পাঁচটি প্রদর্শনী খেলায় অংশগ্রহণ করে যার মধ্যে দু-এক জায়গায় ভারতের ছেলেদের বয়স নিয়ে কিছু অসামঞ্জস্যতা দেখা দিলেও নদীয়ার ছেলেদের বয়স ও মাপে বেশ সামঞ্জসতা ছিল। বাংলাদেশীয় দল যে এখানে খেলে বিশেষ সন্তুষ্ট ও আনন্দিত তাও তিনি জানান তার বক্তব্যে। উল্লেখ্য যে উক্ত প্রদর্শনী খেলায় নদীয়ার কিছু খেলোয়াড়কে বাংলাদেশীয় খেলোয়াড়দের পাশে দীর্ঘকায় দেখালেও, নদীয়া দলের সকল খেলোয়াড়দের বয়স ১৫ বছরের কম ছিল।[৩৮]

বাংলাদেশের রাজশাহী জেলা ফুটবল দল ১৯৮৪ সালের ১০ই মার্চ নদীয়া জেলা ফুটবল দলের বিরুদ্ধে জেলার স্টেডিয়ামে এক প্রদর্শনী খেলায় মিলিত হয়। উক্ত প্রদর্শনী খেলায় নদীয়া ফুটবল দল উন্নত ক্রীড়া মানের স্বাক্ষর রাখলেও, রাজশাহী দলের খেলার মান কখনোই প্রত্যাশা পূরণ করেনি যার ফল স্বরূপ এই প্রদর্শনী খেলায় নদীয়া ফুটবল দল সফররত রাজশাহীর দলকে ২-০ গোলে পরাজিত করে। এই প্রদর্শনী খেলা আয়োজনের ক্ষেত্রে মুখ্য দায়িত্বভার পালন করে নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা। সফররত রাজশাহী দলের সদস্যরা ৮ই ও ৯ই মার্চ গেদে সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করলে দুই দিনই জেলা ক্রীড়া সংস্থার পদস্থ কর্মকর্তারা ও পুলিশের তরফে অফিসারগণ তাদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্য সীমান্তে উপস্থিত থাকেন এবং দুই দেশের সীমান্ত থেকে অতিথিদের স্বাগত জানিয়ে কৃষ্ণনগরে নিয়ে আসেন। আগত দলের সকল সদস্য জেলা ক্রীড়া সংস্থার অতিথি রূপে জেলা স্টেডিয়ামে অধিষ্ঠান করেন।[৩৯] ১০ই মার্চ খেলার শেষে সন্ধ্যায় শুভেচ্ছা সফরে আগত রাজশাহী জেলা দলকে নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার তরফ থেকে এক সভায় সম্বর্ধনা জানানো হয়, যেখানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আই.এফ.এ- এর তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক অশোক ঘোষ। নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার তরফ থেকে রাজশাহী দলের খেলোয়াড়দের হাতে বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ কৃষ্ণনগরের ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্পের কিছু নমুনা প্রদান করা হয় এবং রাজশাহী জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে একটি মৃন্ময় রবীন্দ্র মূর্তি উপহার দেওয়া হয়। সম্বর্ধনা সভায় উপস্থিত আই.এফ.এ- এর সাধারণ সম্পাদক অশোক ঘোষ মহাশয় কে প্রীতি চিহ্ন স্বরূপ একটি বুদ্ধ মূর্তি প্রদান করা হয়। সম্বর্ধনার প্রত্যুত্তরে রাজশাহী দলের ম্যানেজার ইশতিয়াক আহমেদ বলেন নদীয়ায় ভাষার মতো এখানকার মানুষদের মনগুলোও সুন্দর ও মিষ্টি। একই সঙ্গে তিনি জানান নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার আতিথেয়তায় তারা মুগ্ধ এবং তারা নদীয়া জেলা দলকে তাদের দেশে আমন্ত্রণ জানান প্রদর্শনী খেলায় অংশগ্রহণের জন্য।[৪০]

নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা ও বাংলাদেশের মধ্যে যে মিত্রতা খেলাধুলার মাধ্যমে স্থাপিত হয়েছিল তা ফুটবল মাঠের গণ্ডি ছাড়িয়ে পরবর্তীতে ক্রিকেটের বাইশ গজে প্রবেশ করে। বাংলাদেশ ক্রিকেট খেলার উন্নতি ও প্রসারের উদ্যোগ নিলে নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা এক্ষেত্রেও বাংলাদেশীয় বিভিন্ন

ক্রিকেট দলের খেলা আয়োজন করতে উৎসাহিত ও উদ্যোগী হয়। ইতিপূর্বে বাংলাদেশের একাধিক ফুটবল দল নদীয়া জেলা স্টেডিয়ামে খেলে গেলেও ক্রিকেট দলের আগমন ঘটেনি কখনও। এরই ব্যতিক্রমী রূপে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল- এর আনুকূল্যে ১৯৮৩ সালের ১৮ই ডিসেম্বর নদীয়া জেলা স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের ক্রিকেট দলের একটি প্রদর্শনী খেলার আয়োজন করা হয় নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার তরফে।[৪১] এই ৪০ ওভারের প্রদর্শনী খেলায় অংশগ্রহণ করে পশ্চিমবঙ্গের শুভেচ্ছা সফররত বাংলাদেশ থেকে আগত বাংলাদেশ ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড একাদশ ও নদীয়া জেলা একাদশ। সফররত বাংলা দেশীয় দলটি নদীয়া জেলা একাদশ দলটিকে ১৮ রানে পরাজিত করে।[৪২] খেলা শেষে সম্বর্ধনা সভায় নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার অন্যতম সহ-সভাপতি এস.এম. বদরুদ্দীন তার বক্তৃতায় বাংলাদেশী দলের প্রতি অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম লগ্নে এই স্টেডিয়াম বাংলাদেশ ফুটবল দলের খেলার আয়োজন করে এবং বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থ বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ তহবিলে দান করে। উভয় দলের মধ্যে যে ক্রীড়া ও মৈত্রী বন্ধনের সূচনা করে নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা তা ক্রমে দৃঢ়ীভূত হচ্ছে তার অন্যতম প্রমাণ এই ক্রিকেট খেলার অনুষ্ঠান। অপরদিকে সফররত বাংলাদেশ দলের ম্যানেজার এ.এস.এম. ফারুক সংবর্ধনার উত্তরে বলেন, নদীয়া জেলার প্রতি বাংলাদেশ- এর ক্রীড়া মহলের এক বিশেষ শ্রদ্ধা ও অনুরাগের অনুভূতি বিদ্যমান, বাংলাদেশের স্বাধীনতার উষালগ্নে এই জেলা ক্রীড়া সংস্থা এই স্টেডিয়ামে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে যে ফুটবল খেলার আয়োজন করে ও স্বাধীনতা সংগ্রাম তহবিলে অর্থ সাহায্য করে তা বাংলাদেশে ক্রীড়া সমাজ চিরদিন মনে রাখবে। একইসঙ্গে তিনি নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার আপ্যায়ন ব্যবস্থা, আন্তরিকতা ও অন্যান্য আয়োজনের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং বাংলাদেশ ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফ থেকে সেই দেশে সফরের জন্য জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে আমন্ত্রণ জানান। সংবর্ধনা সভার শেষে জেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি তথা নদীয়া জেলার তৎকালীন জেলা শাসক বিমল পান্ডে সফরকারী দলের সদস্যদের হাতে প্রীতি ও শুভেচ্ছার নিদর্শন স্বরূপ কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত মাটির পুতুলের একটি করে স্মারক তুলে দেন এবং বাংলাদেশ ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফ থেকে জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে একটি স্মারক ফলক ও খেলোয়াড়দের প্রত্যেককে স্মারক কোটপিন উপহার দেন দলের ম্যানেজার।[৪৩]

১৯৮৩ সালের পর ২০০৭ সালে অর্থাৎ দীর্ঘ ২৪ বছর পর নদীয়ার জেলা স্টেডিয়ামে পুনরায় কোনো বাংলাদেশী দল খেলতে আসে। ২০০৭ সালের ২রা ও ৩রা জুন একটি দুই দিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলায় বাংলাদেশ ক্রিকেট দল, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল দলের সম্মুখীন হবে বলে স্থির হয় এবং সি.এ.বি এই খেলাটিকে আয়োজন করার দায়িত্ব অর্পণ করে নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে।[৪৪] আন্তর্জাতিক পর্যায়ের এই খেলাটির যাতে যথার্থ মর্যাদা রক্ষিত হয় ও দেশের সম্মান কোনো প্রকারেই যেন ক্ষুন্ন না হয়, সেদিকে নজর রেখে জেলা ক্রীড়া সংস্থা যাবতীয় আয়োজনের ব্যবস্থা করে। খেলার দিন যাতে সকলে খেলাটি উপভোগ করতে পারে ও সর্বোচ্চ সংখ্যক দর্শক মাঠে উপস্থিত করা যায় সেই উদ্দেশ্যে খেলাটির জন্য কোন প্রবেশ মূল্য ধার্য করা হবে না বলে স্থির করে জেলা ক্রীড়া সংস্থা। বাংলাদেশের জাতীয় ক্রিকেট দল তিনজন কর্মকর্তা সহ মোট ২১ জন সদস্য নিয়ে ৩০শে মে সন্ধ্যায় বেনাপোল থেকে সরাসরি কৃষ্ণনগরে পৌঁছাই এবং ওই দিনেই সি.এ.বি একাদশও কৃষ্ণনগরে এসে পৌঁছায়।[৪৫] নির্ধারিত সময়সূচি মেনে ২রা জুন সকাল সাড়ে ন'টায় খেলা শুরু হয়। সফররত বাংলাদেশ দল টসে জিতে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রতি ইনিংসের জন্য নির্ধারিত ৮০ ওভারের মধ্যে প্রথম ইনিংসে বাংলাদেশ দল ৭৩ ওভার এক বলে ২১৬ রান করে।[৪৬] তার প্রত্যুত্তরে সি.এ.বি একাদশ প্রথম দিনের বিকেলে খেলতে নামে ও পরের দিন অসমাপ্ত ইনিংস শুরু করে নির্দিষ্ট ৮০ ওভারে নয় উইকেটে ৩১৪ রান সংগ্রহ করে। এরপর বাংলাদেশ দল তাদের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করে কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খেলার মীমাংসা সম্ভব নয় বলে ম্যান্ডেটরি ওভারের মাঝপথেই খেলা শেষ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং খেলাটি শেষ পর্যন্ত অমীমাংসিত থাকে। খেলার দুই দিনই তীব্র গরম উপেক্ষা করে কয়েকশত দর্শক খেলার মাঠে উপস্থিত হয়ে খেলা দেখেন। জেলা সংস্থার পরিচালনায় খেলার সমস্ত কিছু অত্যন্ত নিখুঁতভাবেই সম্পন্ন হয়। সি.এ.বি- এর কর্তা ব্যক্তিরা ও ক্রীড়া জগতে সুপরিচিত অনেক ব্যক্তিত্বই মাঠে উপস্থিত ছিলেন। সর্বোপরি প্রত্যাশা মতোই খেলার দ্বিতীয় দিনে জেলা স্টেডিয়ামে উপস্থিত থাকেন সি.এ.বি- এর মাননীয় সভাপতি প্রসূন মুখোপাধ্যায়। সি.এ.বি-এর সভাপতি রূপে প্রসূন মুখোপাধ্যায়ের এটাই প্রথম কোনো জেলা পরিদর্শন। তিনি স্টেডিয়াম পরিদর্শন করে এবং খেলার ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনা দেখে সন্তোষ

প্রকাশ করেন। খেলার শেষে উভয় দলের খেলোয়াড়দের সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ দলের ম্যানেজার ও বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের পদস্থ অফিসার মোহাম্মদ তসলিমুদ্দিন তুহিনের হাতে একটি স্মারক ট্রফি তুলে দেওয়া হয়। উভয়দলের খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাদের স্মারক উপহার রূপে দেওয়া হয় কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীদের তৈরি বাংলার সাধারণ লোকজীবনের প্রতিমূর্তি। মোহাম্মদ তসলিমুদ্দিন তুহিন জেলা সংস্থার সাধারণ সম্পাদকের হাতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের তরফ থেকে স্মারক ফলক তুলে দেন এবং তার ভাষণে জেলা সংস্থার আতিথেয়তা ও সমস্ত ব্যবস্থাপনার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এই সভাতেই সি.এ.বি-এর মাননীয় সভাপতির হাতে জেলা সংস্থার পক্ষ থেকে স্মারক উপহার রূপে কৃষ্ণনগরের রাজ পরিবারের পূজিত শ্রী শ্রী দুর্গার রাজরাজেশ্বরী রূপের একটি প্রতিমূর্তি তুলে দেওয়া হয়। সি.এ.বি- এর সভাপতি তার ভাষণে কৃষ্ণনগরে খেলতে আসার জন্য বাংলাদেশ ক্রিকেট কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান ও সমস্ত আয়োজনের জন্য জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে সাধুবাদ জানান।[৪৭]

অনূর্ধ্ব-১৫ বছর বয়সী বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল, সি.এ.বি- এর অনূর্ধ্ব ১৫ বছর বয়সী ক্রিকেট দলের সাথে এক প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলায় অংশগ্রহণ করে কৃষ্ণনগর জেলা স্টেডিয়ামে ২০১৬ সালের মার্চ মাসে। তিন দিনের এই খেলায় বাংলাদেশ দল প্রথমে ব্যাট করে ২৩৯ রান করে যার জবাবে ব্যাট করতে নেমে সি.এ.বি- এর একাদশ প্রথম ইনিংসে চার রানে এগিয়ে যায়। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে স্থানীয় কৃষ্ণনগর পৌরসভার পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণনগর পৌরসভার পৌরপিতা অসীম সাহা, উপ-পৌরপিতা শশী গোপাল সরকার, অন্যান্য কাউন্সিলরগন ও জেলার পুলিশ সুপার ভাস্কর মুখার্জী প্রমুখ। বাংলাদেশ দলের ম্যানেজার সহ উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে ভারতের সুসম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন। জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে উপস্থিত সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ কে ধন্যবাদ জানান সংস্থার ভাইস প্রেসিডেন্ট জয়ন্ত চ্যাটার্জি। তৃতীয় দিনে অর্থাৎ খেলার শেষ দিনে জেলা ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে উভয় দলকে শুভেচ্ছা ও সংবর্ধনা জানানো হয়। উভয় দলের খেলোয়াড়দের হাতে কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত মাটির পুতুল তুলে দেওয়া হয় জেলা ক্রীড়া সংস্থার তরফ থেকে। এই দিন উপস্থিত

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই খেলা সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতার কথা বিনিময় করেন এবং শেষে উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান ক্রীড়া সংস্থার সচিব গৌতম বিশ্বাস।[৪৮]

বাংলাদেশের প্রখ্যাত নাট্যগোষ্ঠী 'থিয়েটার আর্ট ইউনিটি' ২০০৯ সালের নভেম্বর মাসে ভারতে আসে একটি নাট্য উৎসবে অংশগ্রহণ করতে। দুই দেশের ঐক্য সুদৃঢ় করতে এবং পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখতে নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদকের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে ৩০শে নভেম্বর সন্ধ্যাবেলায় উক্ত নাট্যগোষ্ঠীকে সাদরে আমন্ত্রণ করা হয় এবং সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। তবে নির্ধারিত সংবর্ধনার দিনে বাংলাদেশের নাট্যদল পৌঁছাতে বিলম্ব করায় সন্ধ্যার পরিবর্তে অনুষ্ঠান শুরু করা হয় রাত ন'টায়। জেলা স্টেডিয়ামের কৃষ্ণনগর ইনডোর হলে শিল্পীদের সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। সংবর্ধনা সভার সূচনায় স্বাগত ভাষণে জেলা ক্রীড়া সংস্থা সাধারণ সম্পাদক জয়ন্ত চ্যাটার্জী দুই দেশের সু-সম্পর্কের কথা বর্ণনা করেন এবং একই সঙ্গে এই ধরনের সাংস্কৃতিক দলের আদান-প্রদানের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক বন্ধন কে আরও সুদৃঢ় করার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদক সংবর্ধনা সভায় আগত সকলকে স্বাগত জানান ও স্বাগত নাট্যদলের কর্ণধার আব্দুল বারিবের হাতে স্মারক তুলে দেন। এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে আব্দুল বারীব আপ্লুত হয়ে পড়েন। তিনি জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং ভারতে আসার ক্ষেত্রে তার কিছু অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। এই সম্বর্ধনা সভায় উপস্থিত ছিলেন পরম্পরা নাট্যগোষ্ঠীর প্রধান শিবনাথ দত্ত সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি।[৪৯]

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে এটা স্পষ্ট যে নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পূর্বে তথা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকে যে মৈত্রী বন্ধন স্থাপন করেছে তা সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে আরও সুদৃঢ় হয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় ফুটবল দলের প্রথম খেলা থেকে শুরু করে পরবর্তীতে বহু বাংলাদেশীয় ফুটবল ও ক্রিকেট দলের খেলা জেলা স্টেডিয়ামে আয়োজন করে এসেছে নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা। এই সমস্ত খেলাগুলির ক্ষেত্রে জয় পরাজয়ের থেকেও অধিক গুরুত্ব পেয়েছে

পারস্পরিক সৌভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ। যার নমুনা পাওয়া যায় খেলা উপলক্ষ্যে আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় সফররত দলের ম্যানেজার ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার পদস্থ ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত একাধিক ভাষণে। প্রতিবেশী দুটি দেশের মধ্যে সুসম্পর্ককে দৃঢ় করতে রাষ্ট্রীয় স্তরে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের নজির লক্ষ্য করা গেলেও, প্রতিবেশী দুটি রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে একটি প্রতিবেশী দেশের জেলা ক্রীড়া সংস্থা সক্রিয় ও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা সুদীর্ঘ কাল ধরে পালন করেছে এমন নজির ইতিহাসে বিশেষ লক্ষ করা যায় না। তাই নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা প্রতিবেশী বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের যে নজির তার কার্যক্রমের মাধ্যমে রেখেছে তা ইতিহাসের এক অনন্য সাধারণ ঘটনা। এখন প্রশ্ন হলো নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা কেন প্রতিবেশী একটি বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনের এমন নজির গড়ে তুলল। এক্ষেত্রে কোনো একটি সুনির্দিষ্ট কারণ কে চিহ্নিত করা সম্ভব না হলেও, ঐতিহাসিক বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা কতগুলি সম্ভাব্য কারণ কে চিহ্নিত করতে পারি। প্রথমত, পূর্ব অধ্যায়ে উল্লেখিত হয়েছে যে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের সময় নদীয়াও দ্বিখন্ডিত হয়েছিল এবং এর বৃহত্তর অংশ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্ত হয়, কিন্তু এই দুই অঞ্চলের মানুষ একই ধরনের সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যগত পরম্পরার অংশীদার হওয়ায় পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালীদের প্রতি আন্তরিক আকর্ষণ থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক এক বিষয়। দ্বিতীয়ত, স্বাধীনতা লাভের সময় ও তার পরবর্তীতে ভারতভুক্ত নদীয়া থেকে বহু বিশিষ্ট নদীয়াবাসী যারা মূলত মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ তারা পূর্ব পাকিস্তানে চলে যায়, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের বাস্তু ভূমির প্রতি যে গভীর আকর্ষণ বজায় ছিল। যার একাধিক নিদর্শন আমরা লক্ষ করতে পারি, যেমন- কৃষ্ণনগর পৌরসভার প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান এবং পরবর্তীতে ঢাকা নিবাসী ও তৎকালীন ঢাকা উয়াড়ী ক্লাবের সহ-সভাপতি এস.এম. জুহুরুদ্দিন ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে সফররত নদীয়া দলকে নৈশ ভোজে আপ্যায়িত করেন, অর্থাৎ নদীয়ায় জন্ম গ্রহণকারী বহু ব্যক্তির অবিভক্ত নদীয়া থেকে পূর্ব পাকিস্তানে অভিপ্রায়ন দুই অঞ্চলের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের সহায়ক হয়েছিল। তৃতীয়ত, নদীয়া জেলা বাংলাদেশের সীমান্তে অবস্থিত এক জেলা যার একটি বৃহত্তর আন্তর্জাতিক সীমানা রয়েছে বাংলাদেশের সঙ্গে, ফলে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে নিজ ভূমিকা পালনের তাগিদ সম্ভবত জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে প্রভাবিত করেছিল। চতুর্থত, নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা সর্বদায় সামাজিক সচেতনতার

পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন প্রদর্শনী খেলার আয়োজন করে নিজ দায়িত্ব পালন করে এসেছে যা সম্ভবত বাংলাদেশের বিভিন্ন খেলা আয়োজন করতে জেলা সংস্থাকে উৎসাহিত করেছিল। অপরদিকে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় দল হিসেবে বাংলাদেশ ফুটবল দল তাদের প্রথম খেলাটি খেলেছিল নদীয়া একাদশের বিরুদ্ধে কৃষ্ণনগর জেলা স্টেডিয়ামে এবং এই প্রদর্শনী খেলায় টিকিট বিক্রির মাধ্যমে লব্ধ অর্থ বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম তহবিলে প্রদান করা হয়। আর বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার এই অবদান বাংলাদেশ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে সর্বদাই জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রতি তাদের ঋণ কে মনে রেখেছে। যার একাধিক নিদর্শন আমরা লক্ষ করতে পারি বাংলাদেশ থেকে জেলা স্টেডিয়ামে প্রদর্শনী খেলায় অংশগ্রহণ করতে আসা বিভিন্ন সফরকারী দলের ম্যানেজার কর্তৃক সংবর্ধনা সভায় প্রদত্ত ভাষণে, যেখানে প্রায় প্রতিটি সফরকারী দলের ম্যানেজার বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার উজ্জ্বল ভূমিকার কথা তুলে ধরেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে জেলা ক্রীড়া সংস্থার অবদানের প্রতি অনুরাগ এবং স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময় থেকে জেলা ক্রীড়া সংস্থার সঙ্গে যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল তা সুদৃঢ় করার আগ্রহ সম্ভবত বিভিন্ন বাংলাদেশীয় দলকে জেলা স্টেডিয়ামে প্রদর্শনী খেলায় অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করেছিল।

• ৫.৬. গুরুত্বপূর্ণ খেলা ও প্রতিযোগিতার আয়োজন:

জেলা ক্রীড়া সংস্থা একাধিক উদ্দেশ্য নিয়ে বিভিন্ন ঐতিহ্যশালী ও সুনাম সম্পন্ন জাতীয় ও রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতা, কলকাতার বিখ্যাত শক্তিশালী ফুটবল ক্লাব গুলির খেলা এবং পরবর্তীতে জাতীয় স্তরের বিভিন্ন ক্রিকেট দলের খেলা জেলার স্টেডিয়ামে আয়োজন করে এসেছে। এই গুরুত্বপূর্ণ খেলা গুলি আয়োজনের ক্ষেত্রে একাধিক উদ্দেশ্য কাজ করেছিল। প্রথম যে উদ্দেশ্য কাজ করেছিল তা হলো জেলার ক্রীড়া প্রেমী মানুষদের ভালো প্রতিযোগিতামূলক খেলা দেখার সুযোগ করে দেওয়া। দ্বিতীয়ত, আকর্ষক এই সমস্ত খেলা গুলি দেখতে জেলার স্টেডিয়ামে ব্যাপক দর্শক সমাগম ঘটলে, সেই খেলার টিকিট বিক্রির মাধ্যমে সংস্থার আর্থিক পরিস্থিতি মজবুত করা। তৃতীয়ত, এই সমস্ত খেলা ও প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমে বৃহৎ খেলা ও প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক জ্ঞান লাভ করা। চতুর্থত,

উন্নত ক্রীড়া পারদর্শিতা প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে নিজেদের ক্রীড়া মানের উন্নয়ন ঘটানো। আলোচ্য সময় পর্বের মধ্যে ১৯৬৮ সালে প্রথম জেলা স্টেডিয়ামে কলকাতার প্রথম বিভাগের দুই দল এরিয়ান্স ক্লাব ও বাটা স্পোর্টস ক্লাব প্রদর্শনী খেলায় অংশগ্রহণ করে।[৫০] কলকাতার প্রধান তিনটি ফুটবল দলের অন্যতম ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ১৯৬৯ সালের ৪ঠা এপ্রিল এরিয়ান্সের বিরুদ্ধে একটি প্রদর্শনী খেলায় অংশগ্রহণ করে।[৫১] ওই একই বছরের ৬ই এপ্রিল জেলা স্টেডিয়ামে বহু সুবিখ্যাত খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত খালসা ব্লুজ দল, নদীয়া জেলা দলের সঙ্গে এক প্রদর্শনী প্রীতি হকি খেলায় অংশগ্রহণ করে। জেলা দলের কোচ ইন্দ্রজিৎ সিং এবং জেলা সংস্থার যুগ্ম প্রচেষ্টায় ও ব্যবস্থাপনায় অতিথি দলটি কৃষ্ণনগরে আসে এবং স্থানীয় বাসিন্দারা নিজেদের শহরে বসে ভারত বিখ্যাত খেলোয়াড়দের খেলা দেখার সুযোগ পান। অতিথি দলের মধ্যে অন্যতম খেলোয়াড় ছিলেন মেক্সিকো অলিম্পিকে অংশগ্রহণকারী ভারতীয় হকি দলের অধিনায়ক গুরুবক্স সিং। এছাড়াও ছিলেন অন্যান্য খ্যাতনামা খেলোয়াড় বৃন্দ এবং খেলার শেষে খালসা ব্লুজ দল ৪-১ গোলে জয়লাভ করে। খেলার শেষে গুলবক্স সিং এক ঘরোয়া আলোচনা সভায় জেলা স্টেডিয়াম ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার কাজের প্রশংসা করে জানান নদীয়া জেলায় এই ধরনের ব্যবস্থাপনা আছে তা তিনি আগে জানতেন না এবং ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে তিনি পুনরায় এখানে আসবেন।[৫২] কলকাতার মাঠে চালু শীল্ড গলির মধ্যে প্রাচীনতা ও ঐতিহ্যের দাবিতে বিশিষ্ট কোহিনুর শীল্ডের খেলা প্রধানত কলকাতার মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬৯ সালে এই শীল্ডের খেলা সেমিফাইনাল পর্যন্ত কলকাতাতে অনুষ্ঠিত হলেও, ফাইনাল খেলাটি নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় জেলা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় যেখানে বাংলার দুই চির প্রতিদ্বন্দ্বী দল মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল পরস্পরের সম্মুখীন হয়।[৫৩] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এর পূর্বে কলকাতার বিভিন্ন প্রথম শ্রেণীর দল জেলা স্টেডিয়ামে ফুটবল খেলে গেলেও সেগুলি ছিল মূলত প্রদর্শনী বা প্রীতি খেলা কিন্তু এই প্রথম জেলা স্টেডিয়ামে কলকাতার দুই ফুটবল ক্লাব পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে যেখানে জড়িয়ে আছে একটি শীল্ড লাভের বিষয়।

শ্রী অরবিন্দ জন্ম দিবস শতবার্ষিকী কমিটির নদীয়া শাখার উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় ২৫শে জুন ১৯৭২ সালে জেলা স্টেডিয়ামে চ্যারিটি খেলায় ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ও নদীয়া একাদশ পরস্পরের

প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, যেখানে খেলায় নদীয়া দলের প্রাধান্য থাকলেও অর্জিত একাধিক সুযোগের সদ্ব্যবহার না করতে পাড়ায় খেলাটি অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়।[৫৪] এর পূর্বে জেলা স্টেডিয়ামে কলকাতার বহু প্রথম শ্রেণীর ফুটবল দল একাধিক খেলায় অংশগ্রহণ করলেও সেই খেলাগুলিতে তারা সর্বদাই কলকাতার কোনো প্রথম শ্রেণী দলের সম্মুখীন হয়েছে, কিন্তু ১৯৭২ সালের ২৫জুন অনুষ্ঠিত এই খেলায় প্রথম নদীয়া জেলা ফুটবল দল নিজেদের মাঠে কলকাতার একটি প্রথম শ্রেণীর দলের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ লাভ করে এবং এই প্রথম সুযোগেই তারা নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয় গোলশূন্য ড্রয়ের মাধ্যমে। পুনরায় নদীয়া জেলা ফুটবল দল ১৯৭৬ সালের আগস্ট মাসে কলকাতার প্রথম শ্রেণীর ফুটবল ক্লাবের বিরুদ্ধে খেলার সুযোগ পায়। এই বছরের আগস্ট মাসে ইস্টবেঙ্গল ও মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে প্রদর্শনী খেলায় অংশগ্রহণ করে নদীয়া জেলা দল। প্রথমে ১৯৭৬ সালের আগস্ট মাসের ৮ তারিখে জেলা স্টেডিয়ামে কলকাতার প্রখ্যাত মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব এক প্রদর্শনী খেলায় মিলিত হয় নদীয়া একাদশের বিরুদ্ধে। এই খেলা উপলক্ষ্যে ওইদিন স্টেডিয়ামে এক জনসমুদ্রে পরিণত হয় এবং খেলা দর্শনেচ্ছু সকল দর্শককে স্টেডিয়ামে স্থান দিতে না পারায় বহু ব্যক্তিকে হতাশ হয়ে খেলা না দেখেই ফিরে যেতে হয়। মহামেডান স্পোর্টিং দলের প্রায় সকল নিয়মিত খেলোয়াড় এই খেলায় অংশগ্রহণ করে এবং একটি মাত্র গোলের ব্যবধানে তারা জয় লাভ করে।[৫৫] এই বছরেরই ২২শে আগস্ট ইস্টবেঙ্গল ক্লাব কৃষ্ণনগর জেলা স্টেডিয়ামে এক প্রদর্শনী ফুটবল খেলায় মিলিত হয় নদীয়া জেলা একাদশের সঙ্গে। এই খেলা কে কেন্দ্র করে সমগ্র জেলায় ক্রীড়া অনুরাগী দর্শকের মধ্যে এক অভূতপূর্ব উন্মাদনার সৃষ্টি হয়। বিক্রয় যোগ্য টিকিট লাভের আশায় ক্রীড়া পাগল তরুণেরা খেলার আগের দিন রাত ৯ টা থেকে লাইন দিতে শুরু করে জেলা স্টেডিয়ামের অফিসের বাইরে। এই প্রদর্শনী খেলায় ইস্টবেঙ্গল দলের নামী-দামী সকল তারকারই প্রায় অংশগ্রহণ করে এবং কলকাতার বাইরে কোনো মফস্বল শহরের প্রদর্শনী খেলায় এত তারকা খচিত ইস্টবেঙ্গল দলের অংশগ্রহণ এই প্রথম। এই খেলায় নদীয়া একাদশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুললেও শেষ পর্যন্ত ২-০ গোলে পরাজিত হয়।[৫৬] জেলা ক্রীড়া সংস্থা ১৯৭৭ সালের ২৪শে জুলাই জেলা স্টেডিয়ামে মহিলাদের এক প্রদর্শনী ফুটবল খেলার আয়োজন করে যেখানে ভারতের মহিলা ফুটবল দল

প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পশ্চিমবঙ্গের মহিলা ফুটবল দলের সঙ্গে। পূর্বে জেলা ক্রীড়া সংস্থা রাজ্য ও জাতীয় স্তরের বিখ্যাত ক্লাবের খেলা আয়োজন করলেও, সম্পূর্ণ মহিলা দলের ফুটবল খেলার আয়োজন এই প্রথম এবং পরিপূর্ণ দর্শক সমাগমের মাধ্যমে এই খেলা যথেষ্ট সফলতা পায়।[৫৭] ১৯৭৭ সালের ১৯শে আগস্ট কৃষ্ণনগর জেলা স্টেডিয়ামে এক প্রদর্শনী খেলায় অংশগ্রহণ করে মহামেডান স্পোর্টিং দল ও নদীয়া জেলা একাদশ, যেখানে প্রায় পাঁচ হাজার দর্শকের সমাগম ঘটে স্টেডিয়ামে। এই প্রদর্শনী খেলায় প্রথম নদীয়া জেলা একাদশ কলকাতার কোনো ক্লাবের বিরুদ্ধে খেলায় শেষ সময় পর্যন্ত এক শূন্য গোলে এগিয়ে ছিল, যদিও খেলার চূড়ান্ত সময়ে মহামেডান স্পোর্টিং দল গোল শোধ করতে সক্ষম হয়।[৫৮] মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব পুনরায় ১৯৭৮ সালের ২রা আগস্ট জেলা স্টেডিয়ামে নদীয়া জেলা একাদশের বিরুদ্ধে ফুটবল খেলায় মিলিত হয় যেখানে মহামেডান স্পোর্টিং দল ৩-০ গোলে জয়লাভ করে।[৫৯] ১৯৮০ সালের ১৩ই এপ্রিল মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব[৬০] ও ২৭শে জুন ইস্টবেঙ্গল ক্লাব[৬১] জেলা স্টেডিয়ামে নদীয়া একাদশের বিরুদ্ধে প্রদর্শনী খেলায় মিলিত হয় এবং নদীয়া একাদশ দুটি খেলায় যথাক্রমে ২-০ ও ৩-০ গোলের ব্যবধানে পরাজিত হয়। একই বছরের ১১ই অক্টোবর জেলা স্টেডিয়ামে নদীয়া জেলা একাদশের বিরুদ্ধে এক প্রদর্শনী খেলায় অংশগ্রহণ করে মোহনবাগান ক্লাব, যেখানে সফর কারী দলটি ৬-০ গোলে জয়লাভ করে।[৬২] অর্থাৎ ১৯৮০ সালে একই ক্যালেন্ডার বছরে জেলা স্টেডিয়ামে কলকাতার তিন প্রধান ক্লাবকে (মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ও মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব) প্রদর্শনী খেলায় অংশগ্রহণ করাবার কৃতিত্ব অর্জন করে নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা। জেলা স্টেডিয়ামে ১৯৮১ সালের ২৭শে আগস্ট অনুষ্ঠিত এক প্রদর্শনী খেলায় অংশ গ্রহণ করে মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ নেবার জন্য নির্বাচিত ভারতীয় দল এবং ওই বছরে কলকাতা প্রথম ডিভিশন ফুটবল লীগে শীর্ষস্থানাধিকারী মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। এত বড় মাপের খেলা দেখার জন্য জেলার জনমানসে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং খেলার দিন প্রবেশ পত্রের অভাবে বহু ব্যক্তিকে হতাশ হয়ে ফিরে যেতে হয়। খেলা দেখার জন্য এই উন্মাদনা, টিকিটের জন্য হাহাকার ও ব্যাপক দর্শক সমাগম জেলা স্টেডিয়ামের ইতিহাসেও এক অভূতপূর্ব ঘটনা এবং এই খেলা শেষ পযর্ন্ত ১-১ গোলে অমীমাংসিত থাকে।[৬৩] ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ১৯৮২ সালে ১৪ই আগস্ট জেলা স্টেডিয়ামে নদীয়া

জেলা একাদশের বিরুদ্ধে প্রদর্শনী খেলায় মিলিত হয় যেখানে নদীয়া জেলা একাদশ যথেষ্ট ক্রীড়া দক্ষতার পরিচয় দিয়ে প্রথমার্ধে খেলার ফল ১-১ গোলে ধরে রাখতে সক্ষম হলেও, দ্বিতীয়ার্ধে বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলতে না পারায় শেষ পর্যন্ত ৫-১ গোলে পরাজিত হয়।[৬৪] নবদ্বীপের আজাদ হিন্দ ক্লাব, তাদের ক্লাব প্রতিষ্ঠার রজত জয়ন্তী বর্ষ উদযাপনের অন্যতম অঙ্গ হিসেবে ১৯৯১ সালের ৯ই জুন নবদ্বীপের পি.এস.পি মাঠে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের বিরুদ্ধে নদীয়া জেলা একাদশের এক প্রদর্শনী ফুটবল খেলার আয়োজন করে। এই প্রদর্শনী ফুটবল খেলায় নদীয়া জেলা একাদশ ইস্টবেঙ্গল দলকে ১-০ গোলে পরাজিত করে।[৬৫] এর পূর্বে নদীয়া জেলা একাদশ কলকাতার একাধিক বিখ্যাত ফুটবল ক্লাবের বিরুদ্ধে প্রদর্শনী ফুটবল খেললেও কখনও তাদের পরাজিত করতে পারেনি, কিন্তু ১৯৯১ সালের এই খেলায় প্রথম নদীয়া জেলা একাদশ কলকাতার অন্যতম বিখ্যাত শক্তিশালী ক্লাব ইস্টবেঙ্গল দলকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়। এর পরবর্তীতে কলকাতার বিখ্যাত ক্লাবগুলোর মধ্যে জেলা স্টেডিয়ামে প্রদর্শনী ফুটবল খেলায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অনীহা লক্ষ করা যায়। ১৯৯১ এর পর পুনরায় ২০০৭ সালে কলকাতার বিখ্যাত ক্লাব হিসেবে ইস্টবেঙ্গল দল জেলা স্টেডিয়ামে প্রদর্শনী খেলায় নদীয়া জেলা একাদশের বিরুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং ৬-১ গোলে জয়লাভ করে। ইউনিসেফ- এর এইডস বিরোধী কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে রাজ্য যুব কল্যাণ দপ্তরের সহযোগিতায় এই খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। সুদীর্ঘকাল পর জেলা স্টেডিয়ামে কলকাতার কোনো বিখ্যাত ফুটবল ক্লাবের খেলা অনুষ্ঠিত হওয়ায় সারা জেলাতেই প্রবল উন্মাদনার সৃষ্টি হয়। খেলা দেখার আগ্রহ এমনই ছিল যে প্রবল বৃষ্টিপাতও দর্শকদের বিচলিত করতে পারেনি এবং খেলা শুরু হবার অনেক আগেই ক্রীড়া প্রেমীরা জেলা স্টেডিয়ামের গ্যালারি ভরিয়ে দেয়।[৬৬]

জেলা ক্রীড়া সংস্থা সর্বদাই বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খেলা গুলিকে জেলা স্টেডিয়ামে আয়োজন করার বিষয়ে তৎপরতা দেখিয়েছে যার ফলস্বরূপ বাংলাদেশ ছাড়াও দুটি আন্তর্জাতিক মানের ফুটবল দলের খেলা জেলা স্টেডিয়ামে আয়োজন করতে সক্ষম হয়েছে সংস্থা। ১৯৭২ সালে আই.এফ.এ শীল্ডে তিনটি বিদেশি টিম খেলতে আসবে বলে স্থির হয় যথা- ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় দল, মালয়েশিয়ার স্টেট চ্যাম্পিয়ন দল ও ইরানের স্টেট চ্যাম্পিয়ন দল। এই সময় নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা বিদেশ থেকে আগত

একটি দলের খেলার ব্যবস্থা জেলা স্টেডিয়ামে করার জন্য আই.এফ.এ- এর সম্পাদককে অনুরোধ করলে তা অনুমোদিত হয় এবং স্থির হয় ১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি বিদেশ থেকে আগত কোনো একটি দলের খেলা কৃষ্ণনগর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুসারে ১৯৭২ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় দল ও আই.এফ.এ- এর সম্পাদকের একাদশের মধ্যে প্রদর্শনী ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হয় জেলা স্টেডিয়ামে। এই খেলা উপলক্ষ্যে কাঠের গ্যালারি নির্মাণ করে জেলা স্টেডিয়ামের আসন সংখ্যা বাড়ানো হলেও খেলার দুদিন আগেই সব টিকিট বিক্রি হয়ে যায় এবং খেলার দিন প্রায় ৮৪০০ দর্শক মাঠে থেকে খেলা উপভোগ করে। এই প্রদর্শনী খেলার ক্ষেত্রে প্রথম জেলা স্টেডিয়ামে যাতে মহিলারা মাঠে উপস্থিত থেকে এই আন্তর্জাতিক ম্যাচ উপভোগ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয় যা নিঃসন্দেহে খেলার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি তথা বিশেষত মহিলাদের মধ্যে এর প্রসারের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ বলে গণ্য হতে পারে।[৬৭] ভারতে বর্ষ ব্যাপী রুশ উৎসবের অঙ্গ হিসেবে ১৯৮৮ সালে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে অনুষ্ঠিত হয় নানাবিধ অনুষ্ঠান, যাতে অংশ নিতে দফায় দফায় রুশী কলাকুশলী বৃন্দ ভারতে এসে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানে অংশ নেয়। এই অনুষ্ঠানেরই অংশ হিসেবে 'কুজবাসকেমেরোভো' নামক ফুটবল দলটি পশ্চিমবঙ্গে দুটি প্রদর্শনী খেলায় অংশ নেবে বলে স্থির হয়। শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে আই.এফ.এ একাদশের সঙ্গে এবং কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে কলকাতা লীগ বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল দলের সঙ্গে খেলার অনুষ্ঠান সূচি স্থির হয়। কিন্তু জেলা ক্রীড়া সংস্থার তৎপরতায় এই রুশ দলের একটি প্রদর্শনী ফুটবল খেলা জেলা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে বলে স্থির হয়। তবে এই অনুষ্ঠানটি আয়োজনের পেছনে তৎকালীন রাজ্য ক্রীড়া মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর সক্রিয় সুহৃদয়তা ও ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আশুতোষ করের ঐকান্তিক পোষকতা বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছিল। ৬ই নভেম্বর ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস ফেডারেশন এবং জেলা ক্রীড়া সংস্থার যুগ্ম ব্যবস্থাপনায় জেলা স্টেডিয়ামে রুশী ফুটবল দল আই.এফ.এ একাদশের বিরুদ্ধে একটি প্রদর্শনী খেলায় অংশ নেয়, যেখানে সফরকারী রুশ দলটি ২-০ গোলে জয় লাভ করে।[৬৮]

বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খেলা আয়োজন করার পাশাপাশি জেলা ক্রীড়া সংস্থা জাতীয় স্তরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতা গুলিও সফলতার সঙ্গে আয়োজন করে এসেছে। ভারতের প্রাচীনতম ঐতিহ্যমন্ডিত ফুটবল প্রতিযোগিতা আই.এফ.এ শীল্ড কলকাতা কেন্দ্রিকতা দূর করে বিকেন্দ্রীকরণের নীতি গ্রহণ করে ১৯৭৩ সালে শীল্ডের নিয়মাবলী সংশোধন করে যাতে জেলার অধিবাসী রাও প্রতিযোগিতার খেলা গুলি দেখার সুযোগ লাভ করে। নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা ওই বছর থেকেই আই.এফ.এ শীল্ডের খেলা আয়োজন করা শুরু করে।[৬৯] আই.এফ.এ প্রাথমিক পর্যায়ে স্থির করে যে চারটি গ্রুপের খেলা চারটি জেলা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে, কিন্তু এই খেলাগুলি জেলা কেন্দ্রে অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে বিরাট আর্থিক ও সাংগঠনিক ঝুঁকি ছিল ফলে শেষ পর্যন্ত আই.এফ.এ সিদ্ধান্ত নেয় যে প্রথম দুটি গ্রুপের খেলা কলকাতায় এবং অপর দুটি গ্রুপের খেলা যথাক্রমে কৃষ্ণনগর ও বানপুরে অনুষ্ঠিত হবে। এই বছরে কৃষ্ণনগর স্টেডিয়ামে 'খ' গ্রুপের আটটি দলের সাতটি খেলা অনুষ্ঠিত হয়, যা আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাস জুড়ে চলে।[৭০] প্রথম বছরই শীল্ডের খেলা গুলিকে অত্যন্ত সুচারুভাবে আয়োজন করার দরুন জেলা ক্রীড়া সংস্থা ১৯৭৪ সালের পর থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ১০ বছর একটানা আই.এফ.এ- এর অনুমোদন ক্রমে শীল্ডের একটি করে গ্রুপের খেলা জেলা স্টেডিয়ামে আয়োজন করার গুরু দায়িত্ব পালন করেছে। ১৯৮৪ সালের পর থেকে পুনরায় আই.এফ.এ শীল্ডের খেলাগুলি কেন্দ্রীয়ভাবে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হতে থাকে। এরপর পুনরায় ১৯৯৬ সালে আই.এফ.এ জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে শীল্ডের খেলা সংগঠন করার অনুরোধ জানালে জেলা সংস্থা তাতে রাজি হয় এবং সাতটি ক্লাব সম্বলিত শীল্ডের একটি ক্লাস্টারের খেলা জেলা স্টেডিয়ামের সম্পন্ন হয়।[৭১] দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর পুনরায় ২০০৩ সালের মে মাসে জেলা স্টেডিয়ামে আই.এফ.এ শীল্ডের একটি ক্লাস্টারের খেলা সম্পন্ন হয়, কিন্তু এর পরবর্তীতে এই শীল্ডের খেলা আর জেলায় অনুষ্ঠিত হয়নি।[৭২] জাতীয় জুনিয়র ফুটবল প্রতিযোগিতার (বি.সি.রায় ট্রফি) একাদশ তম বর্ষ নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় কৃষ্ণনগর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৪ সালে। জেলা ক্রীড়া সংস্থা হিসেবে নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় সর্বপ্রথম পশ্চিমবঙ্গে এই ধরনের কোন জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ছয়টি রাজ্য দল এই

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে এবং সাফল্যের সঙ্গে এই প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমে নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা তাদের কর্ম কুশলতার পরিচয় তুলে ধরে।[৭৩]

পাতিয়ালার নেতাজি সুভাষ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ স্পোর্টস- এর উদ্যোগে প্রতিবছর গ্রামের ছেলেমেয়েদের জন্য বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়ে থাকে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে, যেখানে ১৫ বছর বয়স্ক গ্রামের অধিবাসী বালক বালিকারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকারী। এই সারা ভারত গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অষ্টম বার্ষিক অনুষ্ঠানের তিন নম্বর গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত খেলা গুলি নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় কৃষ্ণনগর শহরে অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৮ সালের জানুয়ারি মাসে। এই তিন নম্বর গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত খেলা গুলি হল- ফুটবল, ভলিবল ও জিমন্যাস্টিক- এর প্রতিযোগিতা সমূহ। পশ্চিমবঙ্গে এই প্রতিযোগিতার আসর ১৯৭৮ সালেই প্রথম বসে এবং নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থাই প্রথম রাজ্যে এই প্রতিযোগিতা আয়োজনের দায়িত্ব পালন করে।[৭৪] ১৯৭৮ সালের ১০ই জানুয়ারি তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল মাননীয় ত্রিভুবন নারায়ন সিং প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত ভলিবল ও জিমনাস্টিক- এর প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় নদীয়া জেলা স্টেডিয়ামে এবং ফুটবল প্রতিযোগিতা গুলি অনুষ্ঠিত হয় কৃষ্ণনগর শহরের মধ্যস্থিত কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল ও কৃষ্ণনগর ডন বসকো স্কুলের মাঠে। পাঁচ দিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতায় ১৩ টি রাজ্যের ৪৪২ জন বালক ও ১৫০ জন বালিকা সহ সর্বমোট ৫৯২ জন অংশগ্রহণ করে।[৭৫] এই সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা তার সাংগঠনিক দক্ষতা ও ক্রীড়া ক্ষেত্রে তার অফুরন্ত উৎসাহের এক উজ্জ্বল উদাহরণ তুলে ধরে।

১৯৮০- এর দশক থেকে জেলা স্টেডিয়ামে খেলার বিষয়ে কলকাতার প্রধান ফুটবল ক্লাব গুলির অনীহা এবং একই সঙ্গে আই.এফ.এ শীল্ডের খেলা গুলি কেন্দ্রীয়ভাবে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হওয়ার ফলে জেলা ক্রীড়া সংস্থা ক্রমশ ক্রিকেটের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতার খেলা গুলি আয়োজন করতে উদ্যোগী

হয়। পশ্চিম বঙ্গের মফস্বলে রঞ্জি ট্রফির প্রথম খেলাটি অনুষ্ঠিত হয় নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় জেলা স্টেডিয়ামে ১৯৮১ সালের ডিসেম্বর মাসে। প্রকৃতপক্ষে জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত এটিই প্রথম কোনো জাতীয় স্তরের ক্রিকেট প্রতিযোগিতার খেলা এবং ১৮ই ডিসেম্বর থেকে ২০ই ডিসেম্বরের মধ্যে অনুষ্ঠিত এই খেলায় পশ্চিম বাংলা ও আসাম দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়। তবে প্রথম শ্রেণীর এই ক্রিকেট খেলা অনুষ্ঠানের জন্য জেলা স্টেডিয়ামে উপযুক্ত পরিকাঠামো না থাকায় স্টেডিয়ামে একাধিক সংস্কার করা হয়। এই প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলা অনুষ্ঠানের জন্য জেলা স্টেডিয়ামের মাঠে নতুন ও উপযুক্ত পিচ এবং আউটফিল্ড তৈরি করা হয়। এছাড়াও স্টেডিয়ামের মাঠের আয়তন বৃদ্ধি করা হয় এবং মাঠের চারপাশে বেড়া দেওয়ার ব্যবস্থা হয়।[৭৬] বাংলা দল এই খেলায় আসাম কে ইনিংস ও ১৮ রানে পরাজিত করে এবং এই খেলার সম্পূর্ণ ধারা বিবরণী আকাশবাণী প্রচার করে।[৭৭] প্রথম বছরে মফস্বলের মাঠে রঞ্জিট্রফির খেলার আয়োজন করে এবং সফলতার সাথে তার পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা যে কৃতিত্বের প্রদর্শন করেছিল, তারই ফলস্বরূপ ১৯৮২ সালের ডিসেম্বর মাসে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল কর্তৃক পুনরায় জেলা স্টেডিয়ামে রঞ্জিট্রফির একটি খেলা আয়োজনের দায়িত্বভার দেওয়া হয় জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে। ডিসেম্বর মাসের ১১ থেকে ১৩ তারিখের মধ্যে জেলা স্টেডিয়ামে রঞ্জিট্রফি প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চলীয় লীগ খেলার অংশ হিসেবে অনুষ্ঠিত হয় বাংলা বনাম বিহারের খেলা যেটি শেষ পর্যন্ত অমীমাংসিত থাকে।[৭৮] এর পরবর্তীতে দীর্ঘ ১২ বছর পর পুনরায় ১৯৯৬ সালের জানুয়ারি মাসে জেলা স্টেডিয়ামে জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় রঞ্চি ট্রফির গ্রুপ লীগের খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ২১ থেকে ২৫ শে জানুয়ারির মধ্যে অনুষ্ঠিত এই খেলায় পরস্পরের মুখোমুখি হয় আসাম ও বাংলা। বাংলা দল খেলায় আসাম দলকে পরাজিত করে এবং আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে এই খেলার ধারা বিবরণী খেলার মাঠ থেকে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। দীর্ঘ ১২ বছর পরে জেলা স্টেডিয়ামে রঞ্জি ট্রফির খেলা আয়োজন করে এবং সর্বস্তরের কর্মী ও সদস্যদের অক্লান্ত পরিশ্রমে তা সুষ্ঠু ও সফলভাবে সম্পন্ন করে জেলা ক্রীড়া সংস্থা পুনরায় নিজেদের সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় রাখে যা সর্বস্তরে প্রশংসিত হয়।[৭৯] বোর্ড অফ কন্ট্রোল ফর ক্রিকেট ইন ইণ্ডিয়া (বি.সি.সি.আই)- এর প্রাক্তন সহ-সম্পাদক ও বর্তমান

সদস্য গৌতম দাশগুপ্ত, সি.এ.বি- এর প্রাক্তন সম্পাদক বাবলু কোলে, সহ সভাপতি প্রবীর চ্যাটার্জি সি.এ.বি- এর পক্ষ থেকে ২০০৬ সালে জেলা স্টেডিয়াম পরিদর্শন করে স্টেডিয়ামের পরিকাঠামো দেখে সন্তোষ প্রকাশ করলে, সি.এ.বি ওই বছর সি.কে.নাইডু ট্রফির একটি খেলা জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় জেলা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে বলে জানায়।[৮০] সি.কে.নাইডু ট্রফির এই তিন দিবসীয় ক্রিকেট খেলায় বাংলা ও উড়িষ্যা পরস্পরের সম্মুখীন হয় ২০০৬ সালের ১৬ থেকে ১৮ই নভেম্বরের মধ্যে জেলা স্টেডিয়ামে এবং এই খেলায় বাংলা দল উড়িষ্যা কে ৭ উইকেটে পরাজিত করে।[৮১] পুনরায় ২০০৭ সালে জেলা স্টেডিয়ামে সি.কে. নাইডু ট্রফির খেলা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে বাংলা ও ঝাড়খন্ড ২৩ থেকে ২৬শে অক্টোবর- এর মধ্যে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং বাংলা দল এই খেলায় জয় লাভ করে।[৮২] জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল- এর পরিচালনায় আন্তঃরাজ্য পর্যায়ের কোচবিহার ট্রফির খেলা ২০০৮ সালে জেলা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রথম নদীয়া জেলাতে পাঁচটি সর্বভারতীয় ক্রিকেট দলের খেলা অনুষ্ঠিত হয়।[৮৩] জেলা স্টেডিয়ামে ২০০৮ সালের ২২শে নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া এই প্রতিযোগিতার খেলায় অংশগ্রহণ করে গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, গোয়া, ত্রিপুরা রাজ্য দল ও রেলওয়েজ।[৮৪] ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের পরিচালনাধীন সর্বভারতীয় পর্যায়ের মহিলাদের অনূর্ধ্ব-১৯ এক দিবসীয় লীগ কাম নক আউট ক্রিকেট খেলা ২০০৯ সালের নভেম্বর মাসে কৃষ্ণনগরস্থ জেলা স্টেডিয়াম ও চাকদহস্থ নেতাজি সুভাষ স্টেডিয়ামে নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হয়। জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় ১৫ই নভেম্বর থেকে ২৩শে নভেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এই খেলাগুলি সাফল্যের সঙ্গে সংঘটিত হয়, যেখানে হরিয়ানা, হায়দ্রাবাদ, অসম, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ এই পাঁচটি রাজ্য দল খেলতে এসেছিল।[৮৫] জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাংগঠনিক দক্ষতায় সন্তুষ্ট হয়ে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বাংলা ক্রিকেট নিয়ন্ত্রক সংস্থা সি.এ.বি- এর মাধ্যমে জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে ২০০৯ সালে আরও একটি জাতীয় পর্যায়ের খেলা সংগঠিত করার দায়িত্ব অর্পণ করে। অনূর্ধ্ব-১৬ পর্যায়ের স্কুল ক্রিকেট “পলি উমরিগড় ট্রফি ২০০৯-১০”- এর একটি গ্রুপের খেলা ২০০৯ সালের ডিসেম্বর মাসে জেলা স্টেডিয়াম (কৃষ্ণনগর) ও নেতাজি সুভাষ

স্টেডিয়ামে (চাকদাহ) অনুষ্ঠিত হয়। এই জেলায় অনুষ্ঠিত খেল গুলিতে ঝাড়খণ্ডের চ্যাম্পিয়ন স্কুল, বাংলার চ্যাম্পিয়ন স্কুল, উড়িষ্যার রানার্স স্কুল, অসমের রানার্স স্কুল ও ত্রিপুরার রানার্স স্কুল অংশ নেয়।[৮৬] জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় ৩১.১২.২০০৯ থেকে ০২.০১.২০১০ তারিখের মধ্যে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের একটি মর্যাদাপূর্ণ প্রতিযোগিতা বিজয় মার্চেন্ট ট্রফির (অনূর্ধ্ব-১৬) কোয়ার্টার ফাইনালের খেলা অনুষ্ঠিত হয় জেলা স্টেডিয়ামে। তামিলনাডু এবং মুম্বাই- এর মধ্যে অনুষ্ঠিত এই খেলায় তামিলনাডু এক ইনিংস ও বিরাশি রানের ব্যবধানে জয়লাভ করে সেমিফাইনালে উত্তীর্ণ হয়।[৮৭]

জাতীয় স্তরের গুরুত্বপূর্ণ দলের খেলা ও প্রতিযোগিতা ছাড়াও জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় রাজ্য স্তরের বিভিন্ন খেলার একাধিক আন্তঃজেলা প্রতিযোগিতাও বিভিন্ন সময়ে জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা দল বা তাদের খেলোয়াড়রা অংশগ্রহণ করেছে। আর এই সমস্ত খেলা ও প্রতিযোগিতা গুলিকে সুষ্ঠু এবং সফলতার সঙ্গে আয়োজনের মাধ্যমে নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা তার সাংগঠনিক দক্ষতা ও কর্মকুশল তার পরিচয় তুলে ধরেছে।

• ৫.৭. খেলাধুলার প্রসারের ক্ষেত্রে ভূমিকা:

নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা তার প্রধান কাজ অর্থাৎ জেলায় ক্রীড়া প্রসারের ব্যাপারে সর্বদাই সচেষ্ট থেকেছে। জেলা ক্রীড়া সংস্থা তার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য সমগ্র জেলায় কতগুলি আঞ্চলিক ক্রীড়া সংস্থা বা জোনাল স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন গড়ে তুলেছিল। পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে প্রাথমিক পর্যায়ে জেলার খেলাধুলা ছিল প্রধানত গুরুত্বপূর্ণ শহরকেন্দ্রিক ফলে এই আঞ্চলিক ক্রীড়া সংস্থাগুলিও প্রধানত জেলার প্রধান শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। প্রতিষ্ঠার পরবর্তীতে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর, রানাঘাট, চাকদহ ও কল্যাণী- এই ছটি অঞ্চলেই মূলত আঞ্চলিক ক্রীড়া সংস্থা গঠন করা সম্ভব হয়েছিল কিন্তু জেলা ক্রীড়া সংস্থা সর্বদাই এই মূল অঞ্চল গুলির বাইরে জেলার গ্রামাঞ্চলেও আঞ্চলিক ক্রীড়া সংগঠন গড়ে তুলতে সচেষ্ট ছিল। আঞ্চলিক ক্রীড়া সংগঠন গুলি গড়ে তোলার পেছনে দুটি উদ্দেশ্য কাজ করেছিল একদিকে এই আঞ্চলিক ক্রীড়া সংগঠনগুলির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে খেলার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা

ও প্রসার যেমন সম্ভব হয়, তেমনি অন্যদিকে এই আঞ্চলিক সংস্থাগুলির বিভিন্ন পদাধিকারীরা যেহেতু সেই অঞ্চলেরই ক্রীড়ানুরাগী ব্যক্তিরা হয়ে থাকেন তাই তাদের মাধ্যমে আঞ্চলিক চাহিদা ও দাবি গুলি সম্পর্কেও জেলা ক্রীড়া সংস্থা অবহিত হতে পারে। জেলার গ্রামাঞ্চল গুলির মধ্যে প্রথম বেথুয়াডহরীতে নাকাশীপাড়া থানার অন্তর্গত সকল ক্লাব গুলির এক সাধারণ সভায় “নাকাশীপাড়া থানা জোনাল স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন” নামে নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার অধীনস্থ এক নতুন আঞ্চলিক সংস্থা গঠিত হয় ১৯৭৩ সালে এবং এই একই বছরে হরিণঘাটা থানার অন্তর্গত সকল ক্লাবের এক সাধারণ সভায় নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার অধীনে “হরিণঘাটা জোনাল স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন” নামে আরও এক নতুন আঞ্চলিক সংস্থা গঠিত হয়।[৮৮] জেলা ক্রীড়া সংস্থার অধীনে ১৯৭৪ সালে “কালীগঞ্জ জোনাল স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন” গঠিত হয় যার মাধ্যমে জেলা ক্রীড়া সংস্থার অধীনস্থ জোনাল স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় নয়।[৮৯] ১৯৭০- এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধে সরকারি পর্যায়ে দেশে ক্রীড়া মানের উন্নতি ঘটানো ও নতুন প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের খুঁজে বার করার জন্য প্রতিটি প্রদেশের প্রতিটি ব্লকে একটি করে ব্লক স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এতদিন পর্যন্ত জেলা ক্রীড়া সংস্থার নিয়মাবলী অনুসারে নদীয়া জেলায় থানাভিত্তিক আঞ্চলিক স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন গুলি গঠিত ছিল কিন্তু পরবর্তীতে সরকারি নির্দেশের সঙ্গে সমতা বজায় রেখে জেলা ক্রীড়া সংস্থার নিয়মাবলী সংশোধন করে থানা ভিত্তিক ক্রীড়া সংস্থার পরিবর্তে ব্লক ভিত্তিক ক্রীড়া সংস্থা গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়।[৯০] এই উদ্যোগের ফল স্বরূপ ১৯৭৬ সালে করিমপুর ও তেহট্ট অঞ্চলে ব্লক ভিত্তিক আঞ্চলিক ক্রীড়া সংস্থা গঠিত হয়[৯১] এবং ১৯৭৯ সালে কৃষ্ণনগর-২ ব্লকের অন্তর্গত ক্লাবগুলিকে নিয়ে “ধুবুলিয়া আঞ্চলিক ক্রীড়া সংস্থা” ও রানাঘাট-২ ব্লকের অন্তর্গত ক্লাব সমূহকে নিয়ে আড়ংঘাটা আঞ্চলিক ক্রীড়া সংস্থা গড়ে ওঠে।[৯২] জেলা ক্রীড়া সংস্থার অধীনস্থ আঞ্চলিক ক্রীড়া সংস্থাগুলি এক একটি ব্লক কে ভিত্তি করে গঠিত হলেও কোন কোন ব্লকের অন্তর্গত বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ভৌগোলিক কারণে যাতায়াত ও যোগাযোগ রক্ষা দুরূহ ও কষ্টকর হবার দরুণ সেই সকল আঞ্চলিক ক্রীড়া সংস্থার পক্ষে খেলাধুলা সংক্রান্ত কার্য সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছিল না। এই ধরনের একটি আঞ্চলিক ক্রীড়া সংস্থা ছিল “হাঁসখালি আঞ্চলিক সংস্থা” এবং এক্ষেত্রে

জেলা ক্রীড়া সংস্থা তার নিয়মাবলী সংশোধনের মাধ্যমে ১৯৭৯ সালে গভর্নিং বডির সভায় হাঁসখালি ব্লক কে দুই ভাগে বিভক্ত করে দুটি আঞ্চলিক ক্রীড়া সংস্থা গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। নতুন নিয়ম অনুসারে "হাঁসখালি ক্রীড়া সংস্থা" নামটি অবলুপ্ত হয়ে তার স্থলে গঠিত হয় বগুলা ও বাদকুল্লা নামে দুটি আঞ্চলিক ক্রীড়া সংস্থা।[৯৩] জেলায় ব্লক ভিত্তিক আঞ্চলিক ক্রীড়া সংস্থা সংগঠনের যে কাজ তা ১৯৮১ সালে "কৃষ্ণগঞ্জ আঞ্চলিক ক্রীড়া সংস্থা"[৯৪], ১৯৮২ সালে "হরিণঘাটা আঞ্চলিক ক্রীড়া সংস্থা"[৯৫] ও ১৯৮৩ সালে তেহট্ট-২ নং ব্লকে "পলাশীপাড়া আঞ্চলিক ক্রীড়া সংস্থা" সংগঠনের মাধ্যমে পরিপূর্ণতা পায় এবং জেলার ১৮ টি ব্লকে আঞ্চলিক ক্রীড়া সংস্থা গড়ে ওঠে।[৯৬] লক্ষণীয় বিষয় হলো জেলার প্রধান ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসেবে জেলা ক্রীড়া সংস্থা কখনওই আঞ্চলিক ক্রীড়া সংস্থা সংগঠনের ক্ষেত্রে তাদের মতামতকে অঞ্চলগুলির উপর চাপিয়ে দেয়নি, বরং সংশ্লিষ্ট ব্লকের অন্তর্গত জেলা সংস্থা কর্তৃক অনুমোদিত ক্লাব গুলির সভা আয়োজন করে তাদের মতামত কে গুরুত্ব দান করে এবং তাদের সম্মতিক্রমেই অঞ্জলিক ক্রীড়া সংস্থাগুলি গঠন করে।

জেলা ক্রীড়া সংস্থা জেলায় খেলার অঞ্চলগত, পরিমাণগত ও গুণগত প্রসারণের ক্ষেত্রে একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ১৯৭৪ সালে আই.এফ.এ শীল্ড কলকাতা কেন্দ্রিকতা দূর করে বিকেন্দ্রীকরণের নীতি গ্রহণ করলে নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা তখন থেকেই জেলা স্টেডিয়ামে এই শীল্ডের খেলা শুধুমাত্র আয়োজিতই করেনি বরং এই বিকেন্দ্রীকরণের নীতি কে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়ে জেলার পল্লী অঞ্চলে খেলা কে ছড়িয়ে দিতে উদ্যোগ নিয়ে ১৯৮৪ সালে জেলা স্টেডিয়ামের বাইরে পঞ্চায়েত অঞ্চলে এই শীল্ডের কিছু খেলার আয়োজন করে, যার মাধ্যমে গ্রামের অধিবাসীরা নিজেদের ঘরের মাঠে বসে ঐতিহ্যময় এই শীল্ডের খেলা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পায়। ওই বছরে পলাশীপাড়ার সিদ্ধেশ্বরীতলা হাই স্কুল প্রাঙ্গনে পলাশীপাড়া আঞ্চলিক ক্রীড়া সংস্থার তত্ত্বাবধানে দুটি ও তেহট্ট স্পোর্টস এন্ড কালচারাল অরগানাইজেশন ক্লাবের পরিচালনায় তেহট্ট হাইস্কুল প্রাঙ্গণে একটি আই.এফ.এ শীল্ডের খেলা অনুষ্ঠিত হয়।[৯৭] জেলার পল্লী অঞ্চলের মানুষদের এই খেলা দেখার সুযোগ করে দেওয়ার মাধ্যমে তাদের খেলার প্রতি উৎসাহিত করে তোলায় এক্ষেত্রে প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে কাজ করেছে। প্রতিষ্ঠার

সময় থেকেই জেলা ক্রীড়া সংস্থা জেলা ও আঞ্চলিক স্তরে ফুটবল, ক্রিকেট, ও ভলিবলের মতো খেলা গুলির বিভিন্ন প্রতিযোগিতা আয়োজন করে আসছে কিন্তু সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য নতুন খেলা জেলায় প্রচলন ও সেগুলিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন স্তরে প্রতিযোগিতা আয়োজনের বিষয়েও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে জেলা ক্রীড়া সংস্থা। জেলা স্তরে প্রথম ১৯৭৬ সালে ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয় জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে।[৯৮] নদীয়া জেলা টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতার প্রথম বার্ষিক অনুষ্ঠান ১৯৭৫ সালে অনুষ্ঠিত হয় যেখানে ৮৭ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে[৯৯] এবং ১৯৭৮ সালে টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতার আন্তঃআঞ্চলিক প্রতিযোগিতা শুরু হয়।[১০০] সম্পূর্ণ নিজ প্রচেষ্টায় ও আর্থিক সঙ্গতিতে ১৯৭৭ সালে জেলা ক্রীড়া সংস্থা ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল, টেবিল টেনিস ও অ্যাথলেটিক্সের আন্তঃকলেজীয় প্রতিযোগিতার সূচনা করে যা পরবর্তীতে একটি বার্ষিক প্রতিযোগিতার রূপ নেয়।[১০১] উল্লেখ্য যে কলেজগুলির মধ্যে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা চালাবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে একটি করে স্পোর্টস বোর্ড থাকলেও সেই সময় জেলার অধিকাংশ কলেজগুলি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে থাকায় তাদের পক্ষে কলকাতায় গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত প্রতিযোগিতায় নিজেদের তুলে ধরা সম্ভব হতো না, ফলে জেলার কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের ক্রীড়া দক্ষতার বিকাশ ও প্রসারের জন্য জেলা ক্রীড়া সংস্থার তরফ থেকে এই আন্তঃকলেজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে ও পরিচালনায় ১৯৭৮ সালে প্রথম জেলায় আন্তঃঅফিস স্পোর্টস- এর সূচনা হয়।[১০২] সি.এ.বি ১৯৮৩ সালে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় স্কুল ক্রিকেট লীগ চালু করার জন্য সাহায্য করার পরিকল্পনা গ্রহণ করলে জেলা ক্রীড়া সংস্থা ওই বছর থেকেই জেলার বিভিন্ন স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনার মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া পাওয়ার পরে ওই বছর থেকেই স্কুল ক্রিকেট লীগের সূচনা করে জেলায়।[১০৩] জেলা ক্রীড়া সংস্থা ১৯৯৬ সালে জেলায় আন্তঃক্লাব ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নিলে স্থির হয় যে জেলা সংস্থা কর্তৃক অনুমোদিত ক্রীড়া সূচি অনুসারে যেকোনো অঞ্চল কমপক্ষে চারটি ক্লাব নিয়ে এই প্রতিযোগিতার অঞ্চল পর্যায়ের খেলা গুলি অনুষ্ঠিত করতে পারবে

এবং অঞ্চল গুলিতে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ক্লাব সরাসরি জেলা সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্যায়ে অংশগ্রহণের অধিকারী হবে।[১০৪] প্রথম বছরে জেলার নয়টি অঞ্চলে এই প্রতিযোগিতার প্রথম পর্যায়ের খেলা গুলি অনুষ্ঠিত হয় এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা গুলি কল্যাণী টাউন ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় তাদের ইনডোর হলে সম্পন্ন হয়।[১০৫]

ফুটবল, ভলিবল ও ক্রিকেটের মতো খেলা গুলি যেগুলিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ইতিপূর্বেই জেলা ক্রীড়া সংস্থার দ্বারা আয়োজিত হতো সেখানেও বয়স ভিত্তিক স্তর বিভাজনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট বয়সের অন্তর্ভুক্ত খেলোয়ারদের নিয়ে গঠিত দলগুলির মধ্যে জেলা স্তরের বিভিন্ন পর্যায়ে নতুন প্রতিযোগিতা বিভিন্ন সময় প্রচলিত হয়। জেলা ক্রীড়া সংস্থার পরিচালনায় জেলায় সাব-জুনিয়র ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার সূচনা ঘটে ১৯৮১ সালে যেখানে ১৫ বছরের অনূর্ধ্ব বয়সের ছেলেরা অংশগ্রহণ করার অধিকারী।[১০৬] জেলায় ১৯৮৯ সালে জুনিয়র ফুটবল লীগ[১০৭] ও সাব-জুনিয়র ক্রিকেট লীগের[১০৮] সূচনা হয় যেখানে ফুটবল লীগে অংশ নিতে গেলে খেলোয়াড়দের বয়স ১৯ বছরের কম এবং ক্রিকেট লীগে অংশ নিতে গেলে খেলোয়াড়দের বয়স অনূর্ধ্ব-১৫ বছর ও যেকোনো অনুমোদিত বিদ্যায়তনে ছাত্র হওয়া বাধ্যতামূলক। ব্যাডমিন্টনের জুনিয়র লীগ- এর সূচনা করে জেলা ক্রীড়া সংস্থা ২০০৪ সালে।[১০৯] জেলা ক্রীড়া সংস্থার সরাসরি তত্ত্বাবধানে ২০১৫ সালে জেলায় জুনিয়র ভলিবল লীগের সূচনা হয়, যেখানে অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের বয়স ১৮ বছরের কম হবে বলে স্থির করা হয়।[১১০] অ্যাথলেটিক্সকে জেলা ব্যাপী আরও বিস্তৃত করতে এবং আরও বেশি সংখ্যক প্রতিযোগীর যোগদান সুনিশ্চিত করতে জেলা ক্রীড়া সংস্থা জেলার প্রত্যেক অঞ্চলে 'অঞ্চলিক অ্যাথলেটিক মিট' করার সিদ্ধান্ত নেই ২০১০ সালে এবং স্থির হয় অঞ্চলিক স্তরের প্রতিযোগিতা শেষ হওয়ার পরে সেখানকার সফল প্রতিযোগীদের নিয়ে জেলা পর্যায়ের অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।[১১১]

গ্রীষ্ম-বর্ষা নির্বিশেষে সারা বছর ক্রিকেটের অনুশীলন করবার জন্য জেলা স্টেডিয়ামে সি.এ.বি- এর অর্থানুকূল্যে ১৯৮০ সালে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয় করে আচ্ছাদিত ক্রিকেট পিচ নির্মাণ

করা হয়। আচ্ছাদিত ক্রিকেট পিচের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করতে আগত সি.এ.বি- এর তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক বিশ্বনাথ দত্ত কলকাতার পরে এই ধরনের পিচ নির্মাণের স্থান হিসেবে কৃষ্ণনগর কে বেছে নেওয়ার কারণ হিসেবে নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাংগঠনিক শক্তি ও কর্ম দক্ষতাকেই প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন, যা এই ধরনের নির্মাণের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একান্ত আবশ্যিক বলে তিনি মনে করেন।[১১২] প্রাথমিক পর্যায়ে কৃষ্ণনগরে অবস্থিত জেলা স্টেডিয়ামই ছিল নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার অধীনস্থ একমাত্র স্টেডিয়াম কিন্তু পরবর্তীতে জেলা ক্রীড়া সংস্থা জেলার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শহর গুলিতে স্টেডিয়াম স্থাপন করতে উদ্যোগী হয় যাতে এই সমস্ত অঞ্চলেও গুরুত্বপূর্ণ খেলা ও প্রতিযোগিতা গুলি আয়োজিত হতে পারে, যার পরিণতিত জেলা ক্রীড়া সংস্থা রানাঘাট, শান্তিপুর, নবদ্বীপ, ও চাকদহের মতো পৌর শহর গলিতে স্টেডিয়াম নির্মাণ করতে সক্ষম হয়। জেলায় খেলাধুলার মানের উৎকর্ষ সাধনের জন্য জেলা ক্রীড়া সংস্থা বিভিন্ন সময় জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ক্রিকেট, ফুটবল, ভলিবল, অ্যাথলেটিক্স, টেবিলটেনিস সহ বিভিন্ন খেলাধুলার প্রশিক্ষণ শিবিরেরও আয়োজন করে থাকে।

জেলায় দলগত খেলার ক্ষেত্রে মহিলা খেলোয়াড়দের অনুপস্থিতি চোখের পড়ার মতো হওয়ায় নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা সর্বদাই মহিলাদের মধ্যে খেলার সম্প্রসারণ ও আগ্রহ সঞ্চারনের জন্য সচেতন ভাবে উদ্যোগ নিয়ে এসেছে। জেলা ক্রীড়া সংস্থার তত্ত্বাবধানে ১৯৯২ সালে জেলায় প্রথম মহিলাদের জন্য জেলা ভলিবল লীগের সূচনা হয়।[১১৩] সি.এ.বি কর্তৃক ২০১৩ সালে পশ্চিমবঙ্গের সব জেলা ক্রীড়া সংস্থা কে মহিলা ক্রিকেট দল গঠন করতে উদ্যোগ নিতে বলা হলে, নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা তাতে সাড়া দিয়ে মহিলা ক্রিকেট দল গঠন করতে উদ্যোগী হয়। ২০১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত প্রথম 'আন্তঃজেলা মহিলা ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নশিপ' নামক সি.এ.বি কর্তৃক আয়োজিত এই প্রতিযোগিতাই অংশগ্রহণের জন্য জেলা দল গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হলে খেলোয়াড়দের উৎসাহ দিতে হাজির হন ভারতের মহিলা ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক তথা নদীয়ার বাসিন্দা ঝুলন গোস্বামী।[১১৪] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে সি.এ.বি পরিচালিত মহিলাদের আন্তঃজেলা ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতার ফাইনাল যা ২০১৭ সালের ২৪শে মার্চ

কোচবিহার স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় সেখানে গত বারের চ্যাম্পিয়ন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা মহিলা দলকে পরাজিত করে নদীয়া জেলা মহিলা দল প্রথমবারের জন্য চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।[১১৫]

• ৫.৮. সামাজিক সচেতনতার দৃষ্টান্ত:

জেলা ক্রীড়া সংস্থা মূলত একটি খেলাধুলা কেন্দ্রিক সংগঠন হওয়া সত্ত্বেও খেলাধুলার মাধ্যমে কিভাবে সামাজিক সচেতনতার নজির রাখা যায় তার একাধিক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে নিজ কার্যাবলীর মাধ্যমে। ১৯৬৭ সালে জেলা স্টেডিয়ামের নির্মাণ কার্যের সূচনা হওয়ার অল্প কিছু সময়ের মধ্যেই জেলা ক্রীড়া সংস্থা সামাজিক সচেতনতার দৃষ্টান্ত প্রদান করে, যখন ১৯৬৮ সালে ৩রা নভেম্বর কৃষ্ণনগরে অবস্থিত জেলা স্টেডিয়ামে কলকাতার প্রথম বিভাগের দুটি দল- এরিয়ান্স ক্লাব ও বাটা স্পোর্টস ক্লাবের মধ্যে প্রদর্শনী ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রদর্শনী ফুটবল অনুষ্ঠিত হওয়ার পশ্চাতে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল টিকিট বিক্রির মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ উত্তরবঙ্গের বন্যা দুর্গতদের সাহায্যে দান করা। এরিয়ান্স ক্লাব এই খেলায় ৩-০ ব্যবধানে জয়লাভ করে। তবে এই খেলাকে কেন্দ্র করে উপযুক্ত দর্শক সমাগম না হওয়ায় মোট বিক্রীত টিকিটের মাধ্যমে কেবল ৪৭২ টাকায় সংগৃহীত হয়।[১১৬] নর্থ ক্যালকাটা কলেজ- এর সাহায্যার্থে অর্থ সংগ্রহের জন্য ১৯৬৯ সালের ৪ঠা মে ইস্টবেঙ্গল ও এরিয়ান্স ক্লাবের মধ্যে প্রদর্শনী ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে খেলার ফল ১-১ গোলে অমীমাংসিত থাকে।[১১৭] টোকিও অলিম্পিকে (১৯৬৪) জিমন্যাস্টিক বিভাগে ভারতের প্রতিনিধিত্বকারী নদীয়া জেলার বেথুয়াডহরীর অধিবাসী দেবাশীষ মন্ডল ১৯৭১ সালে হুগলিতে ছাত্রদের জিমন্যাস্টিকের প্রশিক্ষণ প্রদানের সময় দুর্ঘটনার ফলে জীবন হারান। দেবাশীষ মন্ডলের এই অকাল মৃত্যুর ফলে তার পরিবারবর্গকে সাহায্য করার জন্য 'কোচেস অ্যাসোসিয়েশন' কৃষ্ণনগরে ১৯৭১ সালের ২৩শে এপ্রিল একটি ফুটবল প্রদর্শনী খেলার আয়োজন করেন, যেখানে খেলায় অংশগ্রহণ করে মোহনবাগান ক্লাব এবং আই.এফ.এ সভাপতি একাদশ। উভয় দলই বিশেষ শক্তিশালী ছিল এবং খ্যাতনামা খেলোয়াড় পুষ্ট ছিল তথাপি খেলায় উচ্চাঙ্গের ক্রীড়া কৌশল দেখা যায়নি এবং খেলাটি শেষ পর্যন্ত গোলশূন্যভাবে শেষ হয়। এই সময় পর্বে কৃষ্ণনগরে রাজনৈতিক

গন্ডগোলের পরিপ্রেক্ষিতে খেলায় বিশেষ জনসমাগম হয়নি ফলে দেবাশীষ মন্ডলের হতভাগ্য পরিবারকে সাহায্যের মূল উদ্দেশ্য বিশেষ সফল হয়নি। খেলার টিকিট বিক্রির মাধ্যমে সংগৃহীত ২৫৩৯ টাকা সবটাই দেবাশীষ মন্ডলের পরিবারবর্গকে দেওয়া হয়।[১১৮] বন্যা দুর্গতদের সাহায্যার্থে ১৯৭৮ সালের ২৬শে নভেম্বর নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে সংস্থার সভাপতি রানু ঘোষ মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর হাতে পাঁচ হাজার এক টাকার চেক মুখ্যমন্ত্রী বন্যা ত্রাণ তহবিলে দান করেন।[১১৯]

উড়িষ্যার কালাহান্ডি জেলায় খরা পীড়িত জনগণকে সাহায্য দানের উদ্দেশ্য নিয়ে পূর্ব যাদবপুর আন্তঃক্লাব সম্মিলনী ও ফ্রেন্ডস অব দি স্টেডিয়াম বিভিন্ন সাব-জুনিয়র ফুটবল দল সমূহকে নিয়ে ‘জুনিয়র ফ্রেন্ডশিপ ট্রফি’ নামে একটি লীগ-কাম নকআউট ভিত্তিক ফুটবল প্রতিযোগিতা আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নেয় ১৯৮৭ সালে এবং ১৯শে জুন থেকে ২৮শে জুন পর্যন্ত বিস্তৃত ক্রীড়া সূচি সমন্বিত এই প্রতিযোগিতার খেলা গুলি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। লীগ ভিত্তিক খেলা শেষে লীগ টেবিলে শীর্ষস্থানাধিকারী দল দুটির মধ্যে ফাইনাল খেলা কলকাতার মোহনবাগান মাঠে ২৮শে জুন তারিখে অনুষ্ঠিত হবে বলে স্থির হয়। এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন সাব-জুনিয়র ফুটবল দলগুলি হচ্ছে বাংলাদেশ চিলড্রেন্স স্পোর্টস ফেডারেশন, টাটা ফুটবল একাডেমি, ত্রিপুরা রাজ্য সাব-জুনিয়র ফুটবল দল, আই.এফ.এ একাদশ ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য স্পোর্টস কাউন্সিল দল।[১২০] এই মহৎ উদ্দেশ্য সম্বলিত প্রতিযোগিতার খেলা ১৯৮৭ সালের ১৯শে জুন অপরাহ্নে নদীয়া জেলা স্টেডিয়ামে সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হয়, যেখানে ত্রিপুরা রাজ্য একাদশ ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্রীড়া সংস্থা একাদশ পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এই খেলার ব্যবস্থাপনা ও যাবতীয় ব্যয় ভার বহন করে নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা নিজেদের অবদান রাখে। যদিও অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে খেলার আয়োজন সম্পন্ন করার কারণে এবং প্রচন্ড গরমের সময় খেলার সূচি নির্ধারিত হওয়ার জন্য এই খেলায় আশানুরূপ দর্শক সমাগম ঘটেনি, তবে সমাগত দর্শকদের মধ্যে একটা বড় অংশ ছিল কিশোর দর্শক এবং মাঠে উপস্থিত ছিলেন নদীয়া জেলা শাসক তথা জেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি পি.কে. প্রধান। এই খেলায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্রীড়া সংস্থা ৩-০ গোলে ত্রিপুরা রাজ্য দলকে পরাজিত করে।[১২১]

সমাজে সমস্ত দিক থেকে অনগ্রসর আদিবাসী সম্প্রদায় যাতে ক্রীড়া ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করে নিজেদের কুশলতা প্রদর্শনের মাধ্যমে, ক্রীড়া ক্ষেত্রে নিজেদের উজ্জ্বল উপস্থিতি তুলে ধরতে পারে, এই মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আই.এফ.এ "আদিবাসী ফুটবল লীগ" সূচনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা তাতে সাড়া দিয়ে খেলা আয়োজন করতে উদ্যোগী হয়। আই.এফ.এ- এর পরিচালনায় প্রথম বর্ষ "আদিবাসী ফুটবল লীগ ২০০৮-০৯"- এর জেলা পর্যায়ের খেলা ২০০৯ সালে জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় চাকদহ নেতাজী সুভাষ স্টেডিয়ামে ২৬শে মার্চ থেকে ৩১শে মার্চ- এর মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। নদীয়া জেলা স্তরে এই ফুটবল প্রতিযোগিতায় চারটি ক্লাব অংশ নেই যথা- কল্যাণীর বীর সিধু কানু অ্যাথলেটিক ক্লাব, হরিণঘাটার মোল্লা বেলিয়া স্টার্স ইলেভেন, কল্যাণী আদিবাসী স্পোর্টিং ক্লাব ও কৃষ্ণনগর অঞ্চলের রাউতারা আদিবাসী যুব সংঘ। এই প্রতিযোগিতার জেলা স্তরের ফাইনালে বীর সিধু কানু ক্লাব ট্রাইবেকারে কল্যাণী আদিবাসী স্পোর্টিং ক্লাবকে পরাজিত করে পরবর্তী পর্যায়ে রাজ্য লীগ খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, আই.এফ.এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী দল গুলিকে উৎসাহিত করতে প্রতি খেলায় নগদ আড়াই হাজার টাকা অনুদান দেয় এবং প্রতি খেলায় প্রত্যেক দলকে জেলা সংস্থার তরফ থেকে মাঠে সেই নির্ধারিত অর্থ প্রদান করা হয়। এছাড়াও প্রতি দলকে জার্সি, প্যান্ট এবং একটি করে ফুটবল দেওয়া হয়।[১২২]

• ৫.৯. সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অবদান:

মূলত একটি ক্রীড়া সংস্থা হওয়া সত্বেও ক্রীড়া ক্ষেত্রের পাশাপাশি জেলার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও নিজেদের অবদান তুলে ধরতে নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা সর্বদাই সচেষ্ট থেকেছে। জেলা ক্রীড়া সংস্থা শুধু মাত্র খেলাধুলার জন্য লাইব্রেরি অর্থাৎ স্পোর্টস লাইব্রেরি গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়ে প্রাথমিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলে ও কিছু বই সংগ্রহ করে, যার চূড়ান্ত পরিণতিতে ২৬শে জানুয়ারি ১৯৭৩ সালে নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস লাইব্রেরির উদ্বোধন করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে এই লাইব্রেরিতে সকল রকম খেলাধুলার নিয়মাবলী, শিক্ষা বিষয়ক ও বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া আলোচনা বিষয়ক পুস্তক রাখা হয়।[১২৩] এই ধরনের

স্পোর্টস লাইব্রেরি গড়ে তোলার উদ্যোগ সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এক অনন্য পদক্ষেপ কারণ এই ধরনের স্পোর্টস লাইব্রেরি তখনকার সময়ে পশ্চিমবাংলায় একটিও ছিল না অর্থাৎ নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার তত্ত্বাবধানে ১৯৭৩ সালে গড়ে ওঠা এই লাইব্রেরিটিকে আমরা পশ্চিমবাংলায় গড়ে ওঠা প্রথম স্পোর্টস লাইব্রেরি হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। লাইব্রেরির মাধ্যমে জেলার খেলাধুলার ইতিহাস কে ধরে রাখা প্রধান উদ্দেশ্য হলেও পরবর্তীতে রাজ্য, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের খেলাধুলার ইতিহাস সংক্রান্ত পুস্তক ও উপাদান এই লাইব্রেরিতে সংরক্ষণ করা হয়। বর্তমানে জেলা ক্রীড়া সংস্থার অধীনস্থ লাইব্রেরিতে বিভিন্ন খেলাধুলার নিয়মাবলী, কোচিং সংক্রান্ত পুস্তক, খেলাধুলার আলোচনা ও সমালোচনা পুস্তক, জেলা সংস্থার অতীত ও বর্তমান গঠনতন্ত্র ও নিয়মাবলী, জেলা ক্রীড়া সংস্থার বিগত সকল বছরে বার্ষিক বিবরণী ও হিসেবের বিবরণী, জেলার অতীতের খেলাধুলার ফিক্সচার ও প্রোগ্রাম, জেলা সংস্থার অধীনস্থ সকল আঞ্চলিক ক্রীড়া সংস্থাগুলোর বার্ষিক বিবরণী ও ফিক্সচার প্রভৃতি সংরক্ষিত রয়েছে। নদীয়া জেলার খেলাধুলার ইতিহাস কে সংরক্ষিত করার উদ্যোগ নিয়ে জেলা ক্রীড়া সংস্থা ১৯৭৩ সালে জেলার সকল ক্রীড়া অনুরাগী ও ইতিহাস অনুরাগী মানুষের কাছে উপযুক্ত প্রবন্ধ জেলা ক্রীড়া সংস্থার কাছে পাঠানোর জন্য আহ্বান জানায় এবং স্থির হয় যে উপযুক্ত প্রবন্ধ জমা পড়লে সেগুলিকে একটি পুস্তক আকারে প্রকাশিত করা হবে।[১২৪] তবে এক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রবন্ধ জমা না পড়ায় জেলার খেলাধুলা বিষয়ক পুস্তক প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি বরং এর পরবর্তীতে জেলা ক্রীড়া সংস্থা ইতিমধ্যে তাদের দপ্তরে জেলার খেলাধুলা বিষয়ক যে সমস্ত প্রবন্ধ জমা পড়েছিল সেগুলিকে ১৯৭৪ সালের আগস্ট মাস থেকে 'নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ' নামক পাক্ষিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করতে থাকে।[১২৫] আর এই প্রবন্ধ প্রকাশ ১৯৭৪ সালের আগস্ট মাস থেকে ১৯৭৫ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে স্থায়ী হয়েছিল।[১২৬] এছাড়াও জেলা ক্রীড়া সংস্থা ১৯৬৮ সালের আগস্ট থেকে বর্তমান পর্যন্ত 'নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ' নামক পাক্ষিক পত্রিকা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করে চলেছে যেখানে জেলার খেলাধুলার সংক্রান্ত যাবতীয় সংবাদ প্রকাশিত হয়ে থাকে।[১২৭]

- **৫.১০. পর্যবেক্ষণ:**

নদীয়া জেলার প্রধান ক্রীড়া নিয়ন্ত্রনকারী সংস্থা হিসেবে নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত উপরোক্ত আলোচনা সামগ্রিকভাবে জেলার খেলাধুলার ইতিহাস কে বহুলাংশে আমাদের কাছে আলোকিত করে তুলেছে বলা যায়। নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার ইতিহাস একটি জেলা ক্রীড়া সংস্থা তো বটেই এমনকি জাতীয় স্তরের কোনো ক্রীড়া সংস্থার ইতিহাসের থেকেও অধিক বৈচিত্র্যময় ও অনন্য ঘটনা দ্বারা সমৃদ্ধ। একটি আঞ্চলিক ক্রীড়া সংস্থা হওয়া সত্ত্বেও জেলা ক্রীড়া সংস্থার নিয়ম সংহিতা রচনাকে কেন্দ্র করে যে জটিল দ্বন্দ্ব ও সংঘাত তা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষা ও নিজেদের ন্যায় সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠা করার আন্দোলনের সঙ্গে তুলনীয়। প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের সঙ্গে খেলাধুলার মাধ্যমে সখ্যতা স্থাপনের যে নজির জেলা ক্রীড়া সংস্থা স্থাপন করেছে তা প্রকৃত অর্থেই কোনো জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষে অত্যন্ত গৌরবের ও নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত। খেলার মাঠ কে সামাজিক সচেতনতা ও সহায়তা মূলক কাজে ব্যবহার করার একাধিক নজির স্থাপন করেছে জেলা ক্রীড়া সংস্থা নিজস্ব কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে। বিভিন্ন বিচিত্র কর্মকাণ্ড সত্বেও জেলা ক্রীড়া সংস্থা সর্বদাই তার মূল কাজ অর্থাৎ জেলায় খেলাধুলার প্রসারের বিষয় নিজ ভূমিকা অত্যন্ত সুচারুভাবে পালন করে এসেছে। জেলা ক্রীড়া সংস্থার তত্ত্বাবধানে জেলায় রাজ্য ও জাতীয় স্তরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতা যেমন আয়োজিত হয়েছে, তেমনি আন্তর্জাতিক স্তরের বিভিন্ন খেলাধুলাও জেলায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। খেলাধুলা কে শহরকেন্দ্রিকতা থেকে মুক্ত করে জেলার গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে দেওয়ার বিষয়েও জেলা ক্রীড়া সংস্থা সর্বদাই সচেষ্ট থেকেছে। জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক ক্রীড়া সংস্থা গঠনের মাধ্যমে জেলা ক্রীড়া সংস্থা নিজেদের সাংগঠনিক শক্তিকে তৃণমূল স্তরে পৌঁছে দিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের খেলাধুলাকে সংগঠিত ও প্রসারিত করতে চেয়েছে। খেলাধুলার মানের উৎকর্ষ সাধনের জন্য জেলা ক্রীড়া সংস্থা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করে এসেছে এবং সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন নিত্য নতুন খেলাও জেলায় প্রচলনের চেষ্টা করেছে। জেলার মহিলাদের মধ্যে খেলার বিষয়ে উৎসাহ বৃদ্ধি ও তাদের খেলার সঙ্গে অধিক পরিমাণে যুক্ত করার জন্যও জেলা ক্রীড়া সংস্থা বিভিন্ন সময়ে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এছাড়া মূলত একটি ক্রীড়া সংস্থা হলেও জেলার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে

বিশেষত খেলার ইতিহাস সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও জেলা ক্রীড়া সংস্থা নিজ ভূমিকা পালন করেছে। পরিশেষে বলা যায় নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার অভিভাবক সুলভ তত্ত্বাবধানে জেলায় খেলাধুলার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ঘটেছে এবং জেলা ক্রীড়া সংস্থা নিজস্ব কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে তাদের সাংগঠনিক দক্ষতা ও কর্ম কুশলতার যথার্থ পরিচয় তুলে ধরেছে।

• টীকা ও সূত্র নির্দেশ:

১. Jayanta Chatterjee, ed., *Nadia District Sports Association, Amended Constitution Book* (Krishnagar: Nadia District Sports Association, 2017), I.

২. Jayanta Chatterjee, ed., *Nadia District Sports Association, Amended Constitution Book* (Krishnagar: Nadia District Sports Association, 2017), II.

৩. A.K. Chanda, *Ninth Quinquennial Review on the Progress of Education in Bengal for the year 1932 to 1937* (Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot., 1939), 160.

"Some money out of the Rural Development Grant which was placed at the disposal of the Provincial Government by the Government of India was spent in providing playing fields to some rural schools. The Military Intelligence Officers who were posted in certain Bengal districts, mainly to fight the terrorist movement, wisely realised that the extreme dullness in the life of the Bengal school boy often drove him to the rank of the terrorists and tried to fight terrorism by offering greater facilities for the playing of games, etc., by school boys."

8. Education Department, Government of West Bengal, Physical Education and Youth Welfare Scheme, Calcutta: West Bengal Government Press, 1952.

৫. *দেশ পত্রিকা*, ১৬ই জানুয়ারি, ১৯৩৭।

৬. *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ৮ই জানুয়ারি, ১৯৩৭।

৭. Jayanta Chatterjee, ed., *Nadia District Sports Association, Amended Constitution Book* (Krishnagar: Nadia District Sports Association, 2017), IV.

৮. Jayanta Chatterjee, ed., *Nadia District Sports Association, Amended Constitution Book* (Krishnagar: Nadia District Sports Association, 2017), II.

৯. Jayanta Chatterjee, ed., *Nadia District Sports Association, Amended Constitution Book* (Krishnagar: Nadia District Sports Association, 2017), III.

১০. Jayanta Chatterjee, ed., *Nadia District Sports Association, Amended Constitution Book* (Krishnagar: Nadia District Sports Association, 2017), IV-V.

১১. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১৫ই জুন ২০১৫, ১।

১২. পূর্ণচন্দ্র বাকচী, "একটি বিস্মিত অধ্যায়," *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১৫ই এপ্রিল ১৯৭৫, ২।

১৩. পূর্ণচন্দ্র বাকচী, "একটি বিস্মিত অধ্যায়," *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা মে, ১৯৭৫, ৩-৪।

১৪. পূর্ণচন্দ্র বাকচী, "একটি বিস্মিত অধ্যায়," *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা মে, ১৯৭৫, ৪।

১৫. পূর্ণচন্দ্র বাকচী, "একটি বিস্মিত অধ্যায়," *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা জুলাই, ১৯৭৫, ৪।

১৬. Jayanta Chatterjee, ed., *Nadia District Sports Association, Amended Constitution Book* (Krishnagar: Nadia District Sports Association, 2017), 6.

১৭. এম. আব্দুর রহিম, আব্দুল মোমিন চৌধুরী, এ.বি. মহিউদ্দিন মামুদ, সিরাজুল ইসলাম, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (ঢাকা: ইডেন প্রেস, ১৯৭১), ৪৪৮-৪৪৯।

১৮. তদেব, ৪৮৯।

১৯. প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী, *প্রান্তীক মানব* (কলকাতা: প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস, ১৯৯৭), ১১-১৪।

২০. কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *খেলা যখন ইতিহাস* (কলকাতা: সেতু প্রকাশনী, ২০১৯), ৮৭-৮৯।

২১. জাকারিয়া পিন্টু, *মুক্তিযুদ্ধে ফুটবল* (ঢাকা: মেলা প্রকাশনী, ২০০৬), ২৬-২৭।

২২. তদেব, ৩২।

২৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, *খেলা যখন ইতিহাস*, ১০০।

২৪. তদেব, ১০২।

২৫. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা আগস্ট, ১৯৭১।

২৬. সালেক সুফী, "মুক্তিযুদ্ধের ফুটবল ফ্রন্ট," *খেলার কথা কথার খেলা*, সম্পা. ইকরামউজ্জামান ও অন্যান্য (ঢাকা: ১৯৯৩), ৩৭।

২৭. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা আগস্ট, ১৯৭১, ১।

২৮. পিন্টু, *মুক্তিযুদ্ধে ফুটবল*, ৩৭।

২৯. তদেব, ৩৮-৩৯।

৩০. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা আগস্ট ১৯৭১, ২।

৩১. পিন্টু, *মুক্তিযুদ্ধে ফুটবল*, ৪২।

৩২. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা মার্চ ১৯৭২, ১।

৩৩. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১৫ই মার্চ ১৯৭২, ১।

৩৪. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা মে, ১৯৭২, ১।

৩৫. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা মে, ১৯৭২, ২।

৩৬. এস.এম বদরুদ্দীন, "নদিয়ার খেলাধূলা- অতীত ও বর্তমান," *পশ্চিমবঙ্গ- নদিয়া জেলা সংখ্যা* (কলকাতা: তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯৭), ১৮১।

৩৭. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা নভেম্বর, ১৯৮২, ১।

৩৮. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা নভেম্বর, ১৯৮২, ২।

৩৯. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১৫ই মার্চ, ১৯৮৪, ১।

৪০. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১৫ই মার্চ, ১৯৮৪, ২।

৪১. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা ডিসেম্বর, ১৯৮৩, ১।

৪২. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা জানুয়ারি, ১৯৮৪, ১।

৪৩. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা জানুয়ারি, ১৯৮৪, ২।

৪৪. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা মে, ২০০৭, ১।

৪৫. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা জুন, ২০০৭, ১।

৪৬. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১৫ই জুন, ২০০৭, ১।

৪৭. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১৫ই জুন, ২০০৭, ২।

৪৮. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১৫ই মার্চ, ২০১৬, ১।

৪৯. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা ডিসেম্বর, ২০০৯, ২।

৫০. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১৫ই নভেম্বর, ১৯৬৮, ১।

৫১. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ৬ই মে, ১৯৬৯, ১।

৫২. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ৬ই মে, ১৯৬৯, ২।

৫৩. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১৬ই অক্টোবর, ১৯৬৯, ১।

৫৪. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা জুলাই, ১৯৭২, ১।

৫৫. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬, ২।

৫৬. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬, ২।

৫৭. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭, ১।

৫৮. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭, ৪, ৬।

৫৯. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১৫ই আগস্ট, ১৯৭৮, ১।

৬০. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১৫ই এপ্রিল, ১৯৮০, ১।

৬১. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা জুলাই, ১৯৭৮, ১, ৪।

৬২. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১৫ই অক্টোবর, ১৯৮০, ১-২।

৬৩. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৮১, ১, ৪।

৬৪. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১৫ই আগস্ট, ১৯৮২, ১-৩।

৬৫. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১৫ই জুন, ১৯৯১, ১।

৬৬. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১৫ই আগস্ট, ২০০৭, ১-২।

৬৭. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭২, ১।

৬৮. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা ডিসেম্বর, ১৯৮৮, ১-২।

৬৯. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা আগস্ট, ১৯৭৩, ১।

৭০. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১৫ই অক্টোবর, ১৯৭৩, ১।

৭১. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬, ১।

৭২. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা জুন, ২০০৩, ১, ৪।

৭৩. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪, ১।

৭৪. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা জানুয়ারি, ১৯৭৮, ১।

৭৫. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা মার্চ, ১৯৭৮, ১-৪।

৭৬. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১৫ ই নভেম্বর, ১৯৮১, ১।

৭৭. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১ লা জানুয়ারি, ১৯৮২, ১-২।

৭৮. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৮২, ১-২।

৭৯. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬, ১, ৫।

৮০. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা সেপ্টেম্বর, ২০০৬, ১।

৮১. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা ডিসেম্বর, ২০০৬, ১।

৮২. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১৫ই নভেম্বর, ২০০৭, ১।

৮৩. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা ডিসেম্বর, ২০০৮, ১।

৮৪. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১৫ই ডিসেম্বর, ২০০৮, ১।

৮৫. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা ডিসেম্বর, ২০০৯, ১।

৮৬. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা জানুয়ারি, ২০১০, ১।

৮৭. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা ফেব্রুয়ারি, ২০১০, ৩।

৮৮. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা মে, ১৯৭৩, ১-২।

৮৯. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা জুলাই, ১৯৭৪, ২।

৯০. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৭৬, ২।

৯১. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১৫ই এপ্রিল, ১৯৭৭, ২।

৯২. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা এপ্রিল, ১৯৭৯, ২।

৯৩. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১৫ই জুলাই, ১৯৭৯, ১, ৩।

৯৪. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮১, ৩, ৪।

৯৫. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা জুলাই, ১৯৮২, ১, ৪।

৯৬. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১৫ই অক্টোবর, ১৯৮৩, ১।

৯৭. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪, ১, ২।

৯৮. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা এপ্রিল, ১৯৭৬, ১, ৪।

৯৯. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৭৬, ১।

১০০. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা জানুয়ারি, ১৯৭৮, ২।

১০১. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১৫ই এপ্রিল, ১৯৭৭, ১, ২।

১০২. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা এপ্রিল, ১৯৭৮, ৩।

১০৩. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৮৩, ১।

১০৪. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৯৬, ৬।

১০৫. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা মার্চ, ১৯৯৬, ৪।

১০৬. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা এপ্রিল, ১৯৮১, ১।

১০৭. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১৫ই জুন, ১৯৮৯, ১।

১০৮. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১৫ই নভেম্বর, ১৯৮৯, ১।

১০৯. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা সেপ্টেম্বর, ২০০৪, ১।

১১০. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা নভেম্বর, ২০১৫, ১।

১১১. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা অক্টোবর, ২০১০, ১।

১১২. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১৫ই নভেম্বর, ১৯৮০, ১, ৩।

১১৩. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা এপ্রিল, ১৯৯২, ২।

১১৪. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০১৩, ১।

১১৫. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা এপ্রিল, ২০১৭, ১।

১১৬. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১৫ই নভেম্বর, ১৯৬৮, ১-২।

১১৭. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ৬মে, ১৯৬৯, ১-২।

১১৮. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা মে, ১৯৭২, ৩।

১১৯. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা ডিসেম্বর, ১৯৭৮, ১।

১২০. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১৫ই জুন, ১৯৮৭, ১।

১২১. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা জুলাই, ১৯৮৭, ১।

১২২. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা এপ্রিল, ২০০৯, ১।

১২৩. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা জানুয়ারি, ১৯৭৩, ১।

১২৪. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৭৩, ৪।

১২৫. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা আগস্ট, ১৯৭৪, ৩।

১২৬. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা জুলাই ১৯৭৫, ৪।

১২৭. Jayanta Chatterjee, ed., *Nadia District Sports Association, Amended Constitution Book* (Krishnagar: Nadia District Sports Association, 2017), VI.

ষষ্ঠ অধ্যায়:

জেলার বিশিষ্ট খেলোয়াড়, ক্রীড়া সংগঠক ও ক্রীড়া ক্লাব

খেলাধুলা সংক্রান্ত যেকোনো সংগঠন হলো মূলত এক বস্তু গত উপাদান যার অবস্তু গত বা জৈবিক উপাদান হলো খেলোয়াড় ও ক্রীড়া সংগঠকেরা, যাদের কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে জেলার খেলাধুলার জগৎ। নদীয়া জেলার বাসিন্দা একাধিক খেলোয়াড় রাজ্য, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে নিজেদের ক্রীড়া প্রতিভার স্বাক্ষর দিয়েছেন, নদীয়া জেলার ক্রীড়া ইতিহাস সংক্রান্ত যেকোনো আলোচনা এই সমস্ত খেলোয়াড়দের বর্ণনা ব্যতীত সম্পূর্ণ হতে পারে না। জেলায় প্রচলিত বিভিন্ন খেলাধুলা কে কেন্দ্র করে আয়োজিত প্রতিযোগিতা গুলির সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা ও খেলাধুলার ক্রম উন্নতি সাধনের ক্ষেত্রে ক্রীড়া সংগঠকদেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। নদীয়ার অধিবাসী বিশিষ্ট খেলোয়াড়দের পাশাপাশি জেলার একাধিক ক্রীড়া সংগঠকও রাজ্য, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে তাদের সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। জেলার খেলাধুলার পরিমণ্ডলের সৃজন ও প্রসারণের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠকদের অবদান যথেষ্ট মনসংযোগের দাবি করে। জেলার খেলাধুলা সংক্রান্ত কার্য তৃণমূল স্তরে পরিচালিত হয় একাধিক ক্রীড়া সংক্রান্ত ক্লাবের দ্বারা। জেলার প্রায় প্রতিটি অঞ্চলেই খেলাধুলা কে কেন্দ্র করে একাধিক ক্লাব গড়ে উঠেছে, যে ক্লাবগুলি নিজেদের ক্ষুদ্র পরিসরে ক্রীড়া সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে ক্রীড়া ক্ষেত্রে প্রতিভাবানদের খেলোয়াড় হিসেবে গড়ে তোলার প্রাথমিক রসদ সরবরাহ করে থাকে। গবেষণা কার্যের এই অধ্যায়ে জেলার বিশিষ্ট খেলোয়াড়, ক্রীড়া সংগঠক ও ক্রীড়া ক্লাবগুলির তথ্যনিষ্ঠ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

• ৬.২. জেলার বিশিষ্ট খেলোয়াড়গণ:

গবেষণা কার্যের জন্য নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে নদীয়া জেলার অধিবাসী একাধিক খেলোয়াড় রাজ্য, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে জেলার একাধিক খেলোয়াড় জেলা স্তরে তাদের প্রতিভার দৃষ্টান্ত তুলে ধরলেও যারা ধারাবাহিকভাবে রাজ্য, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছে একমাত্র তাদের বর্ণনাই এই গবেষণা সন্দর্ভের স্বল্প পরিসরে তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে। পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে হকি খেলার বিশেষ প্রচলন ছিল এবং ১৯৬০ ও ৭০- এর দশকে এই খেলায় একাধিক প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের

উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। ১৯৬৯ সালে বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত আন্তঃরাজ্য জুনিয়র হকি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য বাংলা হকি দল গঠনের লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে একটি ট্রায়াল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয় যেখানে নদীয়া জেলা থেকে পাঁচ জন খেলোয়াড় কে পাঠানো হয়। এই ট্রায়াল ক্যাম্পে আগত ১০০ জন খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রাথমিকভাবে যে ৩০ জনকে নির্বাচিত করা হয় তাদের মধ্যে নদীয়া জেলার এই পাঁচজন খেলোয়াড়ই স্থান লাভ করে, যদিও চূড়ান্ত দল গঠনের সময় অর্ধেন্দু চক্রবর্তী ঠাকুর চূড়ান্ত দলে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং রনজিত দাশ অতিরিক্ত খেলোয়াড় রূপে স্থান পায়। নদীয়ার খেলোয়াড় অর্ধেন্দু বাংলা দলের খেলোয়াড় হিসেবে বোম্বাই যায় এবং সেখানে অনুষ্ঠিত আন্তঃরাজ্য জুনিয়র হকি প্রতিযোগিতায় বাংলা দলের সবকটি খেলায় চূড়ান্ত খেলোয়ার হিসাবে অংশগ্রহণ করার পাশাপাশি একটি খেলায় গোলও করে বহু নামকরা খেলোয়ারদের মধ্যে।[১] নিজ যোগ্যতায় রাজ্য হকি দলে স্থান করে নিয়ে এবং জাতীয় স্তরের আন্তঃরাজ্য প্রতিযোগিতায় ভালো ক্রীড়া দক্ষতা প্রদর্শনের মাধ্যমে জেলার এই খেলোয়াড় যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। ওই একই বছর নয়া দিল্লিতে অনুষ্ঠিত নেহেরু হকি প্রতিযোগিতায় দেশের বিভিন্ন হকি দল যোগদান করে যেখানে ভারতীয় হকি ফেডারেশন একটি জুনিয়র দল প্রেরণ করে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের প্রতিশ্রুতি মান ও উদীয়মান খেলোয়াড়দের নিয়ে গঠিত এই দলে বাংলা থেকে তিনজন খেলার সুযোগ পায়। বাংলা থেকে সুযোগ পাওয়া এই তিনজন খেলোয়াড়দের মধ্যে অন্যতম হলেন অর্ধেন্দু চক্রবর্তী ঠাকুর। বাংলার মফস্বল অঞ্চল থেকে একমাত্র অর্ধেন্দু এই দলের সুযোগ লাভ করে।[২]

কেরলের কোচিনে ১৯৮০ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় জুনিয়র ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবাংলা দল গঠনের জন্য আয়োজিত ট্রায়াল ক্যাম্পে নদীয়া জেলার তিনজন ফুটবল খেলোয়াড় ডাক পেয়েছিল, যারা হলেন ভবতোষ কুন্ডু, উত্তম ঘোষ ও প্রসাদ তরফদার। যদিও শেষ পর্যন্ত এই তিনজন খেলোয়াড়ের মধ্যে একমাত্র প্রসাদ তরফদার চূড়ান্ত দলে স্থান পায় এবং পশ্চিমবঙ্গ দলের সদস্য হিসেবে কেরলের কোচিনে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।[৩] জাতীয় জুনিয়র ফুটবল প্রতিযোগিতা (ড: বি.সি.রায় ট্রফি) ১৯৮১ সালে আগরতলায় অনুষ্ঠিত হয় যেখানে পশ্চিমবাংলা দল ও রেল দল যুগ্মভাবে

বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে এবং বিজয়ী বাংলা দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন নদীয়ার অধিবাসী ও কৃষ্ণনগর টাউন ক্লাবের নির্ভরযোগ্য স্ট্রাইকার নির্মলেন্দু দেবনাথ। ইতিপূর্বে নির্মলেন্দু দেবনাথ নদীয়া জেলা জুনিয়র ফুটবল দলের হয়ে একাধিকবার আন্তঃজেলা ফুটবলে অংশগ্রহণ করে নিজস্ব কৃতিত্বের পরিচয় তুলে ধরেছেন।[৪] জাতীয় সাব-জুনিয়র ফুটবল প্রতিযোগিতার ১৯৮৫ সালের আসরে অংশগ্রহণ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ দল গঠনের উদ্দেশ্যে আই.এফ.এ কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন জেলা দল থেকে সম্ভাবনা পূর্ণ খেলোয়াড়দের বেছে নিয়ে কলকাতায় এক কোচিং ক্যাম্প শুরু করে এবং স্থির হয় এই ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ পাবার পর খেলোয়াড়দের সংশোধিত ক্রীড়ার উপর ভিত্তি করে চূড়ান্ত দল গঠন করা হবে। এই প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে নদীয়ার হরিণঘাটা অঞ্চলের ফতেপুর বিবেকানন্দ সংঘ ক্লাবের খেলোয়াড় জগন্নাথ দাস, শান্তিপুর সবুজ সংঘ ক্লাবের খেলোয়াড় অজয় শিকদার ও কৃষ্ণনগর তরুণ সংঘ ক্লাবের খেলোয়াড় অসিমানন্দ ঘোষ সুযোগ লাভ করে।[৫] জাতীয় গ্রামীন খেলাধুলার অংশ হিসেবে ১৯৮৫ সালে ফুটবল প্রতিযোগিতার আসর বসেছিল রাজস্থানের চিতোর শহরে এবং এই প্রতিযোগিতায় প্রেরণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ফুটবল দল গঠনকল্পে যে ট্রায়াল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয় তাতে নদীয়া জেলা থেকে শান্তিপুর সবুজ সংঘ ক্লাবের অজয় শিকদার ও সুবীর বসাক, কৃষ্ণনগর তরুণ সংঘ ক্লাবের অসীমানন্দ ঘোষ, ফতেপুর বিবেকানন্দ সংঘ ক্লাবের জগন্নাথ দাস যোগ দেয়। এই ট্রায়াল ক্যাম্প থেকে প্রাথমিক পর্যায়ে যে ১৮ জনকে নির্বাচিত করা হয় তাতে সুবীর বসাক ও অসীমানন্দ ঘোষ স্থান লাভ করলেও চূড়ান্ত ১৪ জনের দলে একমাত্র সুবীর বসাক নদীয়া জেলা থেকে নির্বাচিত হয়। চিতোরে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ ফুটবল দল তৃতীয় স্থান দখল করে ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে এবং সুবীর বসাক প্রতিযোগিতার সেরা ফুটবল খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়ে পুরস্কৃত হন।[৬] জাতীয় গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ১৯৮৭ সালে অসমের গৌহাটিতে অনুষ্ঠিত হয়। এই গ্রামীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অন্যতম অঙ্গ ছিল ফুটবল প্রতিযোগিতা যেখানে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ফুটবল দল অংশ নেয় এবং নদীয়ার শ্যামল ভৌমিক সেই দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে খেলায় অংশগ্রহণ করে। শ্যামল ভৌমিক নদীয়ার নবদ্বীপ অঞ্চলের অন্তর্গত চরব্রম্ভনগরের সেবক সমিতি ক্লাবের খেলোয়াড় এবং সে জেলা স্টেডিয়ামে আয়োজিত আই.এফ.এ ফুটবল কোচিং ক্যাম্পে দীর্ঘদিন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে।[৭]

স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়া (Sports Authority of India) প্রতিবছর খেলাধুলার বিভিন্ন শাখায় মেধা অনুসন্ধান প্রকল্পের সূচি অনুসারে সারাদেশে জাতীয় মেধা অনুসন্ধান কর্মসূচি (National Talent Contest) পরিচালনা করে থাকেন। কলকাতার সল্টলেক স্টেডিয়ামে ১৯৮৮ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর থেকে শুরু করে ১৪ই অক্টোবর পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে চলতি বছরের ফুটবলে জাতীয় মেধা অনুসন্ধানের জন্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য যে ফুটবল দল গঠন করে তাতে কৃষ্ণনগর বিবেকানন্দ সংঘ ক্লাবের শুভাশীষ রায় ও ঘূর্ণি তরুণ সংঘ ক্লাবের সঞ্জয় দাশ সুযোগ লাভ করে। পরবর্তীতে নদীয়ার এই দুইজন খেলোয়াড়ের মধ্যে সঞ্জয় দাশ চূড়ান্ত নির্বাচিত ৪০ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে স্থান লাভ করার দরুন দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত সাই স্পোর্টস স্কুলে প্রশিক্ষণ লাভ করার ও মাসিক বৃত্তি পাওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করে।[৮] ১৯৯৪ সালে বাহরিনে অনুষ্ঠিত এশীয় যুব ফুটবল প্রতিযোগিতায় (অনূর্ধ্ব ২১ বছর) যে ভারতীয় ফুটবল দলটি অংশগ্রহণ করে তার অন্যতম সদস্য ছিলেন নদীয়ার কৃষ্ণনগর তরুণ সংঘ ক্লাবের খেলোয়াড় সমরজিৎ সরকার। জেলা ক্রীড়া সংস্থার পরিচালনায় জেলা স্টেডিয়ামে যে ফুটবল কোচিং ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয় সেখান থেকেই সমরজিৎ তার প্রথম ফুটবল খেলার প্রশিক্ষণ জীবন শুরু করেন।[৯]

১৯৮১ সালের নভেম্বর মাসে কানপুরে অনুষ্ঠিত জাতীয় জুনিয়র ভলিবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ থেকে যে ভলিবল দল প্রেরিত হয় তাতে নদীয়ার দুজন খেলোয়াড় স্থান পায়। রাজ্য ভলিবল দলে স্থান লাভ করার কৃতিত্ব প্রদর্শনকারী এই দুজন খেলোয়াড় হলেন চাকদাহ তরুণ সমিতি ক্লাবের মদনমোহন সাহা ও কৃষ্ণনগর ভারতী সংঘ ক্লাবের জাহিদুল হাসান। এদের মধ্যে মদনমোহন সাহা ইতিপূর্বে সল্টলেকে আয়োজিত সর্বভারতীয় স্কুল স্পোর্টসেও পশ্চিমবঙ্গ দলের প্রতিনিধিত্ব করেন।[১০] শান্তিপুরের শান্তি স্মৃতি সংঘ ক্লাবের শান্তনু দেবনাথ ভলিবলে অনূর্ধ্ব-১৪ বৎসর বিভাগে ২০১১ সালের মরশুমে বাংলার বর্ষসেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন। ওই বছরে হায়দ্রাবাদে জাতীয় জুনিয়র ভলিবল প্রতিযোগিতায় বাংলা থেকে অনূর্ধ্ব-১৪ বৎসর বিভাগে যে ভলিবল দল অংশগ্রহণ করে তার অন্যতম সদস্য হিসেবে শান্তনু দেবনাথ খেলায় বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করায় তিনি সংশ্লিষ্ট বিভাগে বাংলার বর্ষসেরা

খেলোয়াড় নির্বাচিত হন এবং ক্রীড়ামন্ত্রী মদন মিত্র- এর হাত থেকে পুরস্কার স্বরূপ নগদ অর্থ ও সার্টিফিকেট লাভ করেন ভলিবল সংস্থার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে।[১১] জম্মুতে অনুষ্ঠিত ২০১৩-১৪ সালের জাতীয় মিনি ভলিবল প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ দলের প্রতিনিধিত্ব করেন শান্তিপুরের বাসিন্দা সেন্ট্রাল ব্লকার তুষার কুণ্ডু। পরবর্তীতে ২০১৫ সালের ১৪ থেকে ১৮ই অক্টোবরে ব্যাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব-১৪ জাতীয় ভলিবল প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ দলের অধিনায়কত্ব করেন তুষার। শান্তিপুর মিউনিসিপাল স্কুলের ছাত্র তুষার তার খেলোয়াড় জীবনের সূচনা করেন স্থানীয় শান্তিপুরের শতদল ক্লাবে এবং পরবর্তীতে শান্তিপুরের শান্তি স্মৃতি সংঘ ক্লাবে যোগদান করেন।[১২]

নদীয়া জেলার একাধিক খেলোয়াড় ক্রিকেট খেলাতেও নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর তুলে ধরেছে। কৃষ্ণনগরের অমর ভারতী সংঘ ক্লাবের খেলোয়াড় সৌতম মিত্র নদীয়া জেলার প্রথম খেলোয়াড় হিসাবে রঞ্জি ট্রফি প্রতিযোগিতার জন্য গঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দলে অন্তর্ভুক্ত হয় ১৯৮৫-৮৬ সালের মরশুমে। খেলার মাঠে কালী নামে পরিচিত সৌতম নদীয়া জেলায় তার খেলোয়াড় জীবন শুরু করে রঞ্জি ট্রফি প্রতিযোগিতায় বেঙ্গল ক্যাপ পাওয়ার অনন্য কৃতিত্ব অর্জন করে। ইতিপূর্বে নদীয়া জেলা ক্রিকেট দলে রঞ্জি ট্রফিতে অংশ নেওয়া একাধিক খেলোয়াড় অংশ নিলেও তারা কেউ সৌতমের মতো নদীয়ার খেলোয়ার হিসেবে খেলোয়ার জীবন শুরু করেননি।[১৩] অনূর্ধ্ব-১৫ বছর বয়সের সাব-জুনিয়ার ক্রিকেটের জাতীয় প্রতিযোগিতা বিজয় মার্চেন্ট ট্রফির ১৯৮৮ সালের মরশুমে পূর্বাঞ্চলীয় ক্রীড়া সূচির অন্তর্গত একটি খেলা অনুষ্ঠিত হয় উড়িষ্যার কটকে, যেখানে উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গ পরস্পরের সম্মুখীন হয়। এই খেলায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দলে নির্বাচিত খেলোয়াড়দের মধ্যে নদীয়ার দুজন খেলোয়াড় নির্বাচিত হওয়ার কৃতিত্ব প্রদর্শন করে। নদীয়ার এই দুই খেলোয়াড় হলেন কৃষ্ণনগরের ক্লাব ইয়ংস্টারের সদস্য রবীন্দ্রনাথ দাস ও নির্মাল্য ঘোষ। এই দুই খেলোয়াড় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দলের সঙ্গে কটকে গিয়ে খেলায় অংশগ্রহণ করে এবং তারা উভয়েই তাদের নির্দিষ্ট বয়স গত বিভাগে নদীয়া জেলা দলের নিয়মিত খেলোয়াড়।[১৪] ইতিপূর্বে ১৯৮৮ সালের ২৬শে জুলাই কলকাতার ইডেন উদ্যানের ইনডোর কোচিং সেন্টারে অনুষ্ঠিত সি.এ.বি- এর বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ দাস পশ্চিমবঙ্গের সব জেলার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সাব-জুনিয়র ক্রিকেটার নির্বাচিত

হয়ে পুরস্কার বাবদ একটি ট্রফি ও নগদ ১০০০ টাকা লাভ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ১৯৮৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের আন্তঃজেলা সাব-জুনিয়র ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করা নদীয়া জেলা ক্রিকেট দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন রবীন্দ্রনাথ দাস।[১৫] নির্মাল্য ঘোষ পুনরায় ১৭ বছরের নিম্ন বয়স্ক ক্রিকেট খেলোয়াড়দের জন্য নির্দিষ্ট আন্তঃরাজ্য ক্রিকেট প্রতিযোগিতা, বিজয় হাজারে ট্রফির খেলায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দলে অন্তর্ভুক্ত হন ১৯৮৯ সালে।[১৬] নদীয়া জেলার চাকদহ নবীন সংঘ ক্লাবের খেলোয়াড় ও নদীয়া জেলা ক্রিকেট দলের নিয়মিত খেলোয়াড় সায়ন ঘোষ ২০১৪ সালে মুম্বাইতে অনুষ্ঠিত মুস্তাক আলী ক্রিকেট টুর্নামেন্টে সি.এ.বি- এর সিনিয়র ক্রিকেট দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন। এই প্রতিযোগিতায় সায়ন শুধুমাত্র সি.এ.বি- এর সিনিয়র ক্রিকেট দলের অন্তর্ভুক্ত হয়নি সে এমনকি নিয়মিত প্রথম একাদশে খেলে যথেষ্ট ভালো পারফরমেন্স করে।[১৭] ২০১৩-১৪ সালের মরশুমের জন্য সি.এ.বি- এর বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে নদীয়া জেলার তিনজন খেলোয়াড় নিজেদের খেলোয়াড়ি দক্ষতার জন্য পুরস্কৃত হয়। ২৬শে জুলাই ২০১৪ সালে কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে অনুষ্ঠিত এই পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে জেলার ক্রিকেটার হিসেবে সর্বোচ্চ উইকেট সংগ্রহকারী চাকদাহ নবীন সংঘ ক্লাবের সায়ন ঘোষ, সর্বোচ্চ রান সংগ্রহকারী রানাঘাট ফ্রেন্ডস ক্লাবের অয়ন গুপ্ত এবং মহিলা ক্রিকেটার হিসেবে সর্বোচ্চ উইকেট সংগ্রহকারী কৃষ্ণনগরের পম্পা সরকার সি.এ.বি কর্তৃক পুরস্কৃত হন ও মেডেল পান। এই অনুষ্ঠানে খেলোয়াড়দের হাতে পুরস্কার তুলে দেন প্রসিদ্ধ প্রাক্তন ক্রিকেটার গুন্ডাপ্পা বিশ্বনাথ।[১৮] মুস্তাক আলী ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় সায়ন ঘোষ সিনিয়র বাংলা দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার যে সুযোগ লাভ করে তাকে কাজে লাগিয়ে নিয়মিত প্রথম একাদশে খেলে যথেষ্ট ভালো পারফরম্যান্স করে যার ফলস্বরূপ সে ২০১৫ সালে বাংলার রঞ্জি দলে নির্বাচিত হয়। বিদর্ভ বনাম বাংলার খেলার মধ্যে দিয়ে সায়নের রঞ্জি অভিষেক ঘটে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে সায়ন সাব-জুনিয়র পর্যায় থেকেই নদীয়া জেলা ক্রিকেট দলের প্রতিনিধিত্ব করে এবং পরবর্তীতে জুনিয়র ও সিনিয়র দলেরও অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। নদীয়া জেলার একাধিক মহিলা ক্রিকেটাররাও নিজেদের দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বাংলা মহিলা ক্রিকেট টিমে তেহট্টের

প্রিয়াঙ্কা বালা ও কৃষ্ণনগরের পম্পা সরকার এবং অনূর্ধ্ব ১৯ বাংলা মহিলা দলে বাদকুল্লার রুপা দত্ত ও চাকদাহের অম্বিকা গুহ নিয়মিত খেলেছেন।[১৯]

নদীয়া জেলার ইতিহাসে ক্রিকেট খেলায় যিনি সর্বোচ্চ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তিনি হলেন চাকদহের বাসিন্দা ঝুলন গোস্বামী। ১৯৯২ সালে টেলিভিশনের পর্দায় পুরুষদের ক্রিকেট বিশ্বকাপের সম্প্রচার দেখে ১০ বছর বয়সে প্রথম তিনি খেলাটির প্রতি আকৃষ্ট হন এবং এর পূর্বে তিনি কখনও চামড়ার ক্রিকেট বলে হাত দেননি। ঝুলন নদীয়ার বাসিন্দা হলেও তার ক্রিকেট খেলার যাবতীয় প্রশিক্ষণ ঘটেছে জেলার বাইরে কলকাতায়। উত্তর কলকাতার বিবেকানন্দ পার্কে স্বপন সাঁধু- এর প্রশিক্ষণ শিবিরে ঝুলন তার ক্রিকেট প্রশিক্ষণ শুরু করেন, যেখানে প্রশিক্ষণ লাভ করার জন্য তিনি সকাল ৫.০৫- এর কৃষ্ণনগর লোকাল ধরে কলকাতায় যেতেন, সকাল ৭.৩০- এর ক্রিকেট প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগদান করতে। ১৯৯৯ সালে তিনি সি.এ.বি- এর বেঙ্গল মহিলা দলে নির্বাচিত হন। ২০০২ সালের জানুয়ারি মাসে ভারত বনাম ইংল্যান্ড মহিলা ক্রিকেট দলের একদিনের সিরিজে মাত্র উনিশ বছর বয়সে তিনি ভারতীয় মহিলা দলে অন্তর্ভুক্ত হন।[২০] তিনি ২০২২ সাল পর্যন্ত ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলে নিয়মিত খেলোয়াড় হিসেবে যুক্ত ছিলেন। তিনি টেস্ট ক্রিকেট, একদিনের ক্রিকেট ও টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট- তিন ধরনের ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। শুধু ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের সদস্য হিসেবেই নয় ২০০৮ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত তিনি ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের অধিনায়কত্বের গুরুদায়িত্বও পালন করেছেন। ক্রিকেটের আন্তর্জাতিক নিয়ামক সংস্থা আই.সি.সি কর্তৃক তিনি ২০০৭ সালে সেই বৎসরের শ্রেষ্ঠ মহিলা খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি ও পুরস্কার লাভ করেন। ঝুলন তার অনন্য ক্রীড়া কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরুপ ভারত সরকার কর্তৃক ২০১০ সালে 'অর্জুন পুরস্কার' লাভ করেন এবং পুনরায় ২০১২ সালে ভারত সরকারের তরফ থেকে 'পদ্মশ্রী' পুরস্কার লাভ করেন। ডিয়ানা এডুলজি- এর পরে তিনি দ্বিতীয় ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটার যিনি ভারত সরকারের তরফ থেকে 'পদ্মশ্রী' পুরস্কার লাভ করেন। ২০১৭ সালে আন্তর্জাতিক মহিলা একদিনের ক্রিকেটে ১৮১ টি উইকেট অর্জন করার মাধ্যমে তিনি আন্তর্জাতিক মহিলা ক্রিকেটের ইতিহাসে সর্বোচ্চ একদিনের উইকেটের অধিকারী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন।[২১] ২০২২

সালে প্রথম মহিলা ক্রিকেটার হিসেবে তিনি আন্তর্জাতিক একদিনের মহিলা ক্রিকেটে ২৫০ টি উইকেট অর্জনের কৃতিত্ব অর্জন করেন।[২২] শেষ পর্যন্ত ২০২২ সালে যখন তিনি আন্তর্জাতিক মহিলা ক্রিকেট থেকে অবসর গ্রহণ করেন ততদিনে তিনি ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের সদস্য হিসেবে ২০৪ টি আন্তর্জাতিক একদিনের ক্রিকেট ম্যাচে অংশ নিয়েছেন এবং ২৫৫ টি উইকেট নিয়ে আন্তর্জাতিক একদিনের মহিলা ক্রিকেটে সর্বোচ্চ উইকেটের অধিকারী হিসেবে নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন।

নদীয়া জেলার খেলোয়াড়রা সম্ভবত যে ক্ষেত্রে সব থেকে বেশি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা হল অ্যাথলেটিক্স। ১৯৭১ সালে আহমেদাবাদে অনুষ্ঠিত জাতীয় ক্রীড়া অনুষ্ঠানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার উদ্দেশ্যে যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দল গঠিত হয় সেখানে বিগত বছরের রাজ্য স্পোর্টসে যে সকল প্রতিযোগী অ্যামেচার অ্যাথলেটিক ফেডারেশন কর্তৃক নির্দিষ্ট নূন্যতম মান অতিক্রম করেছিল তাদের মধ্যে থেকে বিভিন্ন বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ মানরক্ষাকারীরা স্থান লাভ করেন। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত রাজ্য অ্যাথলেটিক্সে দীর্ঘ লম্ফনে প্রথম স্থান অধিকার করায় এই দলে কৃষ্ণনগর অ্যাথলেটিক্স ক্লাবের গোপাল বিশ্বাস অনূর্ধ্ব-১৮ বৎসর বালক বিভাগে স্থান লাভ করেন।[২৩] ২৩ ও ২৪ শে জানুয়ারি ১৯৭১ সালে অনুষ্ঠিত আন্তঃরাজ্য স্পোর্টস- এর নবম বার্ষিক অনুষ্ঠানে গোপাল বিশ্বাস দীর্ঘ লম্ফনে ৬.৬৩ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে দ্বিতীয় স্থান অর্জন দখল করেন ও পদক লাভ করেন। এছাড়াও সে জাতীয় স্পোর্টসে ট্রিপল জাম্পেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, কিন্তু সেক্ষেত্রে চতুর্থ স্থান অধিকার করায় অল্পের জন্য পদক লাভ থেকে বঞ্চিত হন।[২৪] কৃষ্ণনগরের শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগার ক্লাবের খেলোয়াড় শেফালী প্রামানিক পশ্চিমবঙ্গ অ্যামেচার অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় নদীয়া জেলা দলের প্রতিনিধিত্ব করে ১৯৭৭ ও ১৯৭৮ সালে মহিলা বিভাগে হাই জাম্পে তৃতীয় এবং ১৯৮০ সালে হাই জাম্পে প্রথম, লং জাম্পে দ্বিতীয় ও জ্যাভলিন থ্রোতে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।[২৫] নদীয়ার অধিবাসী সুজয় বিশ্বাস রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় ১৯৭৮ সালে ৪০০ মিটার হার্ডেল দৌড়ে তৃতীয় এবং ১৯৭৯ সালে একই বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।[২৬] বাদকুল্লা অঞ্চলের অনামী ক্লাবের খেলোয়ার

দেবিকা বিশ্বাস ১৯৭৬ সালে রাজ্য অ্যাথলেটিক্সে প্রতিযোগিতায় শট পুটে দ্বিতীয় ও ডিসকাস থ্রোতে নতুন রেকর্ডসহ প্রথম স্থান, ১৯৭৮ সালের রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় শট পুট ও ডিসকাস থ্রোতে তৃতীয় স্থান, ১৯৭৯ সালে রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় ডিসকাস থ্রতে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ১৯৮০ সালে রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় শট পুট ও ডিসকাস থ্রোতে প্রথম স্থান অধিকার করার পাশাপাশি মহিলা বিভাগে প্রতিযোগিতার সেরা খেলোয়াড় হিসাবে শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার অর্জন করেন।[২৭] অ্যামেচার অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত সপ্তম আন্তঃজেলা বার্ষিক অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা যেটি নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় কৃষ্ণনগর জেলা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮০ সালের ২৫ ও ২৬শে ডিসেম্বর, সেখানে কৃষ্ণনগর স্টারলেটস ক্লাবের খেলোয়াড় ইরা মন্ডল মহিলা বিভাগে ৮০০ মিটার দৌড়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। এছাড়াও ইরা মন্ডল ১৯৮১ সালে আন্তঃজেলা অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় ৮০০ মিটার দৌড়ে প্রথম এবং ১৯৮১ সালে রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় ৮০০ মিটার দৌড় ও হাই জাম্পে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।[২৮] বাদকুল্লা অঞ্চলের অনামী ক্লাবের খেলোয়ার দেবিকা মন্ডল ১৯৮১ সালে আন্তঃজেলা অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় মহিলা বিভাগে শট পুটে ও ডিসকাস থ্রোতে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ১৯৮৩ সালে ২১তম জাতীয় অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দল গঠিত হয় তাতে স্থান লাভ করেন। এর পাশাপাশি দেবিকা মন্ডল আন্তঃজেলা অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় ১৯৮৬ সালে ডিসকাস থ্রোতে প্রথম, ১৯৮৭ সালে ডিসকাস থ্রো ও শট পুটে দ্বিতীয় এবং রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় ১৯৮৬ সালে ডিসকাস থ্রোতে দ্বিতীয়, ১৯৮৭ সালে ডিসকাস থ্রোতে দ্বিতীয় ও শট পুটে তৃতীয়, ১৯৮৯ সালে ডিসকাস থ্রোতে প্রথম স্থান অধিকার করেন।[২৯] বাদকুল্লা অঞ্চলের অজয় সংঘ ক্লাবের খেলোয়াড় রুবুকা ঘোষ আন্তঃজেলা অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় ১৬ বছরের অনূর্ধ্ব বালিকা বিভাগে ১৯৮২ সালে শট পুটে তৃতীয়, ১৯৮৬ সালে শট পুট ও ডিসকাস থ্রোতে প্রথম এবং রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় বালিকা বিভাগে ১৯৮২ সালে শট পুটে প্রথম, ১৯৮৪ সালে শট পুটে তৃতীয়, ১৯৮৬ সালে শট পুট ও ডিসকাস থ্রোতে প্রথম স্থান অধিকার করেন।[৩০] রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় ১৯৮২ সালে কৃষ্ণনগর অ্যাথলেটিক্স ক্লাব- এর খেলোয়াড় অতীন্দ্র মজুমদার ১৭ বছর বালক

বিভাগে হাই জাম্প ও পোল ভল্টে প্রথম স্থান অধিকার করে, ২৭শে জানুয়ারি ১৯৮২ সালে কালিকটে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় আন্তঃরাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য গঠিত বাংলা দলে নিজের স্থান করে নেন এবং এর পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালে রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় তিনি হাই জাম্পে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।[৩১] কৃষ্ণনগর অ্যাথলেটিক্স ক্লাবের খেলোয়াড় অতীন্দ্র মজুমদার রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় ১৯৮২ সালে ১৭ বৎসর বালক বিভাগে হাই জাম্প ও পোলভল্টে প্রথম স্থান অধিকার করে ওই বছরই কালিকটে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় আন্তঃরাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতার জন্য গঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দলে স্থান লাভ করেন এবং ১৯৮৪ সালে রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় একই বিভাগে হাই জাম্পে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।[৩২] চাকদহ অঞ্চলের চাকদহ তরুণ সমিতি ক্লাবের খেলোয়াড় হীরা দেবনাথ ১৯৮২ সালের রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় ১৬ বছর বালিকা বিভাগে হাই জাম্পে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে, ওই বছরে আন্তঃরাজ্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য গঠিত পশ্চিমবঙ্গ দলে সুযোগ লাভ করেন। হীরা দেবনাথ রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় ১৯৮৪ সালে মহিলা বিভাগে হাই জাম্পে তৃতীয় ও ১৯৮৫ সালে একই বিভাগে হাই জাম্পে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে পুনরায় ১৯৮৫ সালে আন্তঃরাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য গঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দলে সুযোগ লাভ করার পাশাপাশি উক্ত প্রতিযোগিতায় হাই জাম্পে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।[৩৩] চামেলী পাল যিনি কৃষ্ণনগর অ্যাথলেটিক্স ক্লাবের রেজিস্ট্রেট খেলোয়াড় তিনি ১৯৮৩ সালে জাতীয় অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য গঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দলে সুযোগ লাভ করেন এবং ১৯৮৬ সালে আন্তঃজেলা অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় ও রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব ১৮ বৎসর বালিকা বিভাগে হাই জাম্পে প্রথম স্থান অধিকার করেন।[৩৪] চামেলী ১৯৮৬ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম জাতীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য গঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দলে সুযোগ লাভ করার পাশাপাশি উক্ত প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব ১৮ বছর বালিকা বিভাগে হাই জাম্পে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।[৩৫]

১৯৮০- এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে নদীয়ার খেলোয়াড়েরা আরও অধিক পরিমাণে তাদের দক্ষতা অ্যাথলেটিক্সে তুলে ধরতে থাকে এবং এই সময় থেকে সফল অ্যাথলেটিক্স খেলোয়াড়দের সংখ্যারও উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটে। বাদকুল্লা অঞ্চলের খেলোয়াড় জনতা বিশ্বাস রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় ১৯৮৫ সালে ডিসকাস থ্রোতে তৃতীয়, ১৯৮৭ সালে ১৫ বছর বালিকা বিভাগে শট পুটে ও ডিসকাস থ্রোতে নতুন রেকর্ড সহ প্রথম স্থান এবং ১৯৮৯ সালে বালিকা ১৮ বছর বিভাগে ডিসকাস থ্রোতে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।[৩৬] দীপক সাহা যিনি চাকদাহ তরুণ সমিতি ক্লাবের খেলোয়াড় তিনি ১৯৮৫ সালে আন্তঃরাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য গঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দলে বালক বিভাগে হাই জাম্পে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য অন্তর্ভুক্ত হন এবং ওই একই বছরে আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে ভারতের জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স দল গঠনের জন্য যে প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয় তাতে সুযোগ লাভ করেন।[৩৭] দেবগ্রাম অঞ্চলের দেবগ্রাম ফুটবল ক্লাবের খেলোয়াড় রীণা দাস ১৯৮৬ সালে রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় ও ১৯৮৭ সালে আন্তঃজেলা অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব ১৬ বছর বালিকা বিভাগে ৮০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করে নিজ প্রতিভার স্বাক্ষর দিয়ে ১৯৮৭ সালে জাতীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য গঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দলে সুযোগ লাভ করেন। এর পরবর্তীতে রীণা দাস পুনরায় ১৯৮৮ সালে রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব ১৮ বছর বালিকা বিভাগে ১৫০০ মিটার দৌড়ে নতুন রেকর্ড সহ প্রথম স্থান অধিকার করেন।[৩৮] করিমপুর অঞ্চলের বাসিন্দা বুদ্ধদেব মন্ডল ১৯৮৭ সালে সিওলে অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমসে জ্যাভলিন থ্রোতে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। নতিভাঙ্গা তরুণ সংঘ ক্লাবের রেজিস্ট্রেট খেলোয়াড় বুদ্ধদেব মন্ডল ১৯৮১ সালে জেলা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় জ্যাভলিন থ্রোতে অংশগ্রহণ করে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন, পরবর্তীতে তিনি সেনাবাহিনীতে যোগদান করলেও নিজের খেলাধুলা চালিয়ে যান। সেনাবাহিনীর সদস্য হিসেবে তিনি উন্নত প্রশিক্ষণ নিয়ে এশিয়ান গেমসে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।[৩৯] কৃষ্ণনগরের ব্রজ সংঘ ক্লাবের খেলোয়াড় শৈলেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ১৯৮৭ সালে একইসঙ্গে আন্তঃজেলা অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় ১৬ বৎসর বালক বিভাগে ৮০০ মিটার দৌড়ে তৃতীয়

স্থান ও রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় ১০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করার দরুন ওই বছরে ব্যাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় জাতীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতার জন্য গঠিত পশ্চিমবঙ্গ দলে সুযোগ লাভ করেন। শৈলেন্দ্রনাথ বিশ্বাস পুনরায় রাজ্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ১৯৮৯ সালে অনূর্ধ্ব ১৯ বছর বালক বিভাগে ১০০ মিটার ও ২০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ১৯৯০ সালে রাজ্য জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায়, যা নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত হয় সেখানে অনূর্ধ্ব ১৯ বছর বালক বিভাগে ১০০ মিটার ও ২০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন।[৪০] বাদকুল্লা অঞ্চলের অজয় সংঘ ক্লাবের খেলোয়াড় হরিদাস বল রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব ১৯ বছর বালক বিভাগে ১৯৮৮ সালে ডিসকাস থ্রোতে দ্বিতীয় ও জ্যাভলিন থ্রোতে তৃতীয় স্থান, ১৯৮৯ সালে অনূর্ধ্ব ১৬ বৎসর বয়স্ক জুনিয়র বালক বিভাগে ডিসকাস থ্রোতে প্রথম ও শট পুটে তৃতীয় স্থান, ১৯৯২ সালে অনূর্ধ্ব কুড়ি বছর বালক বিভাগে শট পুটে ও ডিসকাস থ্রোতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় এই সাফল্য ছাড়াও হরিদাস বল রাজ্য জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় ১৯৯০ সালে অনূর্ধ্ব ১৯ বৎসর বালক বিভাগে জ্যাভলিন থ্রোতে প্রথম স্থান, ডিসকাস থ্রোতে ও শট পুটে দ্বিতীয় স্থান এবং ১৯৯১ সালে ডিসকাস থ্রোতে ও শটপুটে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।[৪১] কৃষ্ণনগরের কলিকা ইয়ং অ্যাথলেটিক্স ক্লাব- এর খেলোয়াড় বিশ্বজিৎ দেব রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় ১৯৮৮ সালে অনূর্ধ্ব ১৯ বৎসর বালক বিভাগে ৮০০ মিটার দৌড়ে নতুন রেকর্ড সহ প্রথম স্থান, ১৯৮৯ সালে একই বিভাগে ৪০০ ও ৮০০ মিটার দৌড়ে তৃতীয় স্থান এবং রাজ্য জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় ১৯৯০ সালে একই বিভাগে ৮০০ মিটার দৌড়ে দ্বিতীয় স্থান ও ৪০০ মিটার দৌড়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।[৪২] কৃষ্ণনগরের কলিকা ইয়ং অ্যাথলেটিক্স ক্লাবের খেলোয়াড় বিশ্বজিৎ দেব রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব ১৯ বছর বালক বিভাগে ১৯৮৮ সালে ৮০০ মিটার দৌড়ে নতুন রেকর্ড সহ প্রথম স্থান, ১৯৮৯ সালে ৪০০ ও ৮০০ মিটার দৌড়ে তৃতীয় স্থান এবং ১৯৯০ সালে রাজ্য জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় ৮০০ মিটার দৌড়ে দ্বিতীয় স্থান ও ৪০০ মিটার দৌড় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।[৪৩] দীপক মল্লিক যিনি কৃষ্ণনগর স্টারলেটস ক্লাবের রেজিস্ট্রেট খেলোয়াড় তিনি রাজ্য অ্যাথলেটিক্স

প্রতিযোগিতায় ১৯ বছরের নিম্ন বয়স্ক বালক বিভাগে ১৯৮৮ সালে জ্যাভলিন থ্রোতে নতুন রেকর্ড সহ প্রথম স্থান এবং ১৯৮৯ সালে ১৬ বছরের নিম্ন বয়স্ক বালক বিভাগ বর্শা ছোঁড়ায় নতুন রাজ্য রেকর্ড সহ প্রথম স্থান, লোহার গোলা নিক্ষেপে প্রথম স্থান ও দীর্ঘ লম্ফনে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। কৃষ্ণনগর অঞ্চলের ব্রজসংঘ ক্লাবের খেলোয়াড় ইলা নন্দী রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় ১৯৮৮ সালে অনূর্ধ্ব ১৮ বছর বালিকা বিভাগে হাই জাম্পে প্রথম ও ১৯৮৯ সালে একই বিভাগে হাই জাম্পে প্রথম স্থান অধিকার করেন।[88]

নদীয়ার খেলোয়াড়দের অ্যাথলেটিক্সে এই সাফল্যের ধারা ১৯৯০- এর দশকেও বজায় ছিল। ১৯৯১ সালের রাজ্য জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় কৃষ্ণনগর স্টারলেটস ক্লাবের খেলোয়াড় তিলক পাল অনূর্ধ্ব ১৬ বৎসর বালক বিভাগে ৮০০ মিটার, ১৫০০ মিটার ও তিন হাজার মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করে নিজ বিভাগে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পাশাপাশি তিন হাজার মিটার দৌড়ে নতুন রাজ্য রেকর্ড স্থাপন করেন। তিলক ছাড়াও ১৯৯১ সালের রাজ্য জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় কৃষ্ণনগর হিরোজ ক্লাবের খেলোয়াড় সোমা বিশ্বাস অনূর্ধ্ব ১৬ বৎসর বালিকা বিভাগে হাই জাম্পে প্রথম স্থান, কৃষ্ণনগর লিডার্স ক্লাবের খেলোয়াড় সুশোভন সরকার অনূর্ধ্ব ১৬ বৎসর বালক বিভাগে পোলভল্টে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ওই একই বছরের প্রতিযোগিতায় নাকাশিপাড়া অঞ্চলের উদয়ন সংঘ ক্লাবের খেলোয়াড় দীপক মল্লিক বর্শা ছোঁড়াতে নতুন রাজ্য রেকর্ড স্থাপন করে প্রথম স্থান ও শট পুটে প্রথম স্থান অধিকার করে নিজ বিভাগে প্রতিযোগিতার শ্রেষ্ঠ অ্যাথলিটের মর্যাদা অর্জন করেন।[৪৫] এই তিন খেলোয়াড় ১৯৯২ সালের রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায়ও তাদের সাফল্যের ধারা বজায় রাখে। উক্ত প্রতিযোগিতায় তিলক পাল অনূর্ধ কুড়ি বছর বালক বিভাগে ১৫০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান, সোমা বিশ্বাস অনূর্ধ্ব ১৭ বছর বালিকা বিভাগে হাই জাম্পে দ্বিতীয় স্থান ও সুশোভন সরকার অনূর্ধ্ব কুড়ি বছর বালক বিভাগে পোলভল্টে প্রথম স্থান অধিকার করেন।[৪৬] পলাশীপাড়া অঞ্চলের ক্লাব সাহেবনগর অ্যাথলেটিক্স- এর রেজিস্ট্রেট খেলোয়াড় শংকর বিশ্বাস রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় ১৯৯২ সালে অনূর্ধ্ব ১৭ বছর বালক বিভাগে শট পুটে দ্বিতীয় স্থান, ১৯৯৩ সালের প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব ১৭ বছর বালক বিভাগে একই

সঙ্গে জ্যাভলিন থ্রোতে, ডিসকাস থ্রোতে ও শট পুটে প্রথম স্থান অধিকার করে নিজ বিভাগে প্রতিযোগিতার সেরা অ্যাথলিটের মর্যাদা লাভ করেন। রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় একাধিক বার নিজের দক্ষতার পরিচয় দেওয়ায় শংকর ১৯৯৩ সালে তামিলনাড়ুতে অনুষ্ঠিত জাতীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য গঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দলে অন্তর্ভুক্ত হন এবং ১৯৯৪ সালে নয়া দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় আন্তঃআঞ্চলিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য যে পূর্বাঞ্চলীয় দলটি গঠিত হয় তাতেও সুযোগ লাভ করেন। পরবর্তীতে শংকর ১৯৯৫ সালেও রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব কুড়ি বছর বালক বিভাগে অংশগ্রহণ করে জ্যাভলিন থ্রোতে প্রথম ও ডিসকাস থ্রোতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।[৪৭] ১৯৯০- এর দশকের প্রথমার্ধে কৃষ্ণনগর সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের একাধিক খেলোয়াড় ক্রীড়া ক্ষেত্রে নিজেদের দক্ষতা প্রদর্শন করেন। এই খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রথমে উল্লেখ করতে হয় ফিরোজা খাতুনের কথা যিনি রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় ১৯৯২ সালে অনূর্ধ্ব কুড়ি বৎসর বালিকা বিভাগে ১০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান ও ২০০ মিটার দৌড়ে দ্বিতীয় স্থান এবং ১৯৯৩ সালে ওই একই বিভাগে ১০০ মিটার দৌড়ে দ্বিতীয় স্থান ও ২০০ মিটার দৌড়ে তৃতীয় স্থান অর্জন করে, ওই বছরে জাতীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য গঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দলে অন্তর্ভুক্ত হন।[৪৮] একইভাবে এই বিদ্যালয়ের ওপর দুই ছাত্রী সরস্বতী দে ও লক্ষী কোলে রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় ১৯৯২ সালে যথাক্রমে অনূর্ধ্ব ১৪ বছর বালিকা বিভাগে ১০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান ও দীর্ঘ লম্ফণে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এই দুই খেলোয়াড় পুনরায় ১৯৯৩ সালে রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন যেখানে সরস্বতী দে অনূর্ধ্ব কুড়ি বছর বালিকা বিভাগে ১০০ মিটার ও ২০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান এবং লক্ষী কোল অনূর্ধ্ব ১৪ বছর বালিকা বিভাগে ব্রড জাম্পে প্রথম স্থান অধিকার করে, উভয়ে ওই বছরে জাতীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য গঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দলে অন্তর্ভুক্ত হন।[৪৯] এই বিদ্যালয়ের অপর এক ছাত্রী মনীষা দে রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় ১৯৯৩ সালে অনূর্ধ্ব কুড়ি বছর বালিকা বিভাগে ব্রড জাম্পে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে সেই বছরে জাতীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য গঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দলে সুযোগ লাভ করেন এবং তিনি পুনরায়

১৯৯৪ সালে রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব কুড়ি বছর বালিকা বিভাগে ব্রড জাম্পে প্রথম স্থান অধিকার করেন।[৫০]

১৯৯০- এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধে এই সফলতার হারের আরো উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটে। কৃষ্ণনগর অঞ্চলের হীরোজ ক্লাবের খেলোয়াড় জুলফিকার হক মন্ডল ১৯৯৪ সালের রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব ১৭ বছর বালক বিভাগে হাই জাম্পে নতুন রেকর্ড সহ প্রথম স্থান অধিকার করে পূর্বাঞ্চলীয় অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য গঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দলে অন্তর্ভুক্ত হন এবং ১৯৯৩-৯৪ মরশুমে নয়া দিল্লিতে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় আন্তঃআঞ্চলিক অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য গঠিত পূর্বাঞ্চলীয় দলে সুযোগ লাভ করার পাশাপাশি ওই প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব কুড়ি বছর বালক বিভাগে হাই জাম্পে তৃতীয় স্থান দখল করেন। জুলফিকার মন্ডল পুনরায় ১৯৯৮ সালে আন্তঃরাজ্য জুনিয়ার অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য গঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দলে সুযোগ লাভ করে ওই প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব সতেরো বছর বালক বিভাগে হাইজাম্পে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।[৫১] কৃষ্ণনগর সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী সারথী বর্মন ১৯৯৪ সালে পূর্বাঞ্চলীয় অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য গঠিত পশ্চিমবঙ্গ দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে ওই প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব ১৪ বছর বালিকা বিভাগে ১০০ মিটার দৌড়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ লাভ করে। ১৯৯৫ সালে রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় সারথী বর্মন অনূর্ধ্ব ১৪ বছর বালিকা বিভাগে ১০০ মিটার দৌড় ও ব্রডজাম্পে নতুন রেকর্ড সহ প্রথম স্থান অধিকার করে প্রতিযোগিতার বিচারকদের মূল্যায়নে ওই বছরের সেরা অ্যাথলিটের শিরোপা অর্জন করেন এবং সারথী হলো জেলার প্রথম খেলোয়াড় যে এই ধরনের গৌরব অর্জন করেন। ভূপালে ১৯৯৫ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় আন্তঃরাজ্য জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দলের সদস্য হিসেবে সারথি বর্মন অংশগ্রহণ করে অনূর্ধ্ব ১৪ বছর বিভাগে ১০০ মিটার দৌড়ে ও লং জাম্পে প্রথম স্থান অধিকার করার পাশাপাশি অ্যামেচার অ্যাথলেটিক ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া (Amateur Athletic Federation of India) কর্তৃক প্রতিযোগিতার সেরা জুনিয়র অ্যাথলিট হিসেবে নির্বাচিত হন এবং এই ক্ষেত্রেও জেলার প্রথম খেলোয়ার হিসেবে সারথী এই কৃতিত্ব অর্জন করেন।[৫২] কৃষ্ণনগর অঞ্চলের হীরোজ

ক্লাবের খেলোয়াড় সুশোভন সরকার রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব কুড়ি বছর বালক বিভাগে ১৯৯৪, ১৯৯৫, ১৯৯৬ ও ১৯৯৭ সালে পোলভল্টে প্রথম স্থান অধিকার করে এক অনন্য কীর্তি প্রদর্শন করেন, যার মধ্যে ১৯৯৪, ১৯৯৬, ও ১৯৯৭ সালে তিনি নতুন রেকর্ড স্থাপন করেন নিজ বিভাগে। এছাড়াও সুশোভন রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় ১৯৯৮ ও ১৯৯৯ সালে পুরুষ বিভাগে অংশগ্রহণ করে যথাক্রমে তৃতীয় ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।[৫৩] হীরোজ ক্লাবেরই অপর এক খেলোয়াড় ইমচাঁদ শেখ রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় ১৯৯৪ সালে অনূর্ধ্ব ১৭ বছর বালক বিভাগে ২০০ মিটার দৌড়ে নতুন রেকর্ডসহ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে, ওই বছরে পূর্বাঞ্চলীয় অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহনের জন্য গঠিত পশ্চিমবঙ্গ দলে অন্তর্ভুক্ত হন এবং ১৯৯৫ সালে রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় একই বিভাগে ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন।[৫৪] বাদকুল্লা অঞ্চলের অনামী ক্লাবের খেলোয়ার সুশীল বিশ্বাস পুরুষ বিভাগে রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় ১৯৯৫ সালে ডিসকাস থ্রোতে প্রথম, ১৯৯৭ সালে ডিসকাস থ্রোতে তৃতীয় ও শটপুটে দ্বিতীয়, ডিসকাস থ্রোতে ১৯৯৮ সালে তৃতীয় এবং ১৯৯৯ সালে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।[৫৫] এই সময় পর্বে কৃষ্ণনগর অঞ্চলের স্টারলেটস ক্লাবের চারজন খেলোয়াড় অনুপ বিশ্বাস, শেখ মমতাজ, ননীগোপাল সরকার ও সবিতা মন্ডল অ্যাথলেটিক্সে রাজ্য ও জাতীয় স্তরে নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর তুলে ধরেন। অনুপ বিশ্বাস রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব কুড়ি বছর বালক বিভাগে ১৯৯৫ সালে জ্যাভলিন থ্রোতে পঞ্চম ও ১৯৯৭ সালে জ্যাভলিন থ্রোতে নতুন রেকর্ডসহ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। শেখ মমতাজ ১৯৯৭ সালে রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব ১৬ বছর বালক বিভাগে জ্যাভলিন থ্রোতে প্রথম স্থান ও শটপুটে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে ১৯৯৮ সালে জাতীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য গঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দলে অন্তর্ভুক্ত হন। ননীগোপাল সরকার রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব ১৮ বছর বালক বিভাগে ১৯৯৭ সালে ডিসকাস থ্রোতে প্রথম ও ১৯৯৯ সালে ডিসকাস থ্রোতে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। সবিতা মণ্ডল রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব ১৫ বছর বালিকা বিভাগে ১৯৯৮ সালে জ্যাভলিন থ্রোতে নতুন রেকর্ড সহ প্রথম স্থান অধিকার করে ওই বছরে জাতীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য

গঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দলে সুযোগ লাভ করে প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব ১৬ বছর বালিকা বিভাগে জ্যাভলিন থ্রোতে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন এবং পুনরায় ১৯৯৯ সালে জাতীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য গঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দলে সুযোগ লাভ করে উড়িষ্যার কটকে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব ১৬ বছর বালিকা বিভাগে জ্যাভলিন থ্রোতে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।[৫৬] কৃষ্ণনগর অঞ্চলের ইউনাইটেড স্পোর্টিং ক্লাবের খেলোয়ার তাপসী নন্দী রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব কুড়ি বছর বালিকা বিভাগে ১৯৯৭ সালে হাই জাম্পে নতুন রেকর্ডসহ প্রথম স্থান অধিকার করে ওই বছর জাতীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য গঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দলে অন্তর্ভুক্ত হন এবং এর পরবর্তীতে ১৯৯৯ সালে পুনরায় রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় হাই জাম্পে প্রথম স্থান অধিকার করেন।[৫৭] আদিত্য বিশ্বাস যিনি অনামী ক্লাবের রেজিস্ট্রেট খেলোয়াড় তিনি রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব ১৬ বছর বালক বিভাগে ১৯৯৯ সালে ৪০০ মিটার দৌড়ে তৃতীয়, ২০০০ সালে অনূর্ধ্ব ১৮ বছর বালক বিভাগে ১০০ মিটার দৌড়ে তৃতীয়, ২০০ মিটার দৌড়ে নতুন রেকর্ড সহ প্রথম ও ৪০০ মিটার দৌড়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করার পাশাপাশি ২০০২ সালে পূর্বাঞ্চলীয় অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য গঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দলে অন্তর্ভুক্ত হন। অনামী ক্লাবেরই ওপর এক খেলোয়ার কিশোরী মন্ডল রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় ১৯৯৯ সালে অনূর্ধ্ব ১৬ বছর বালিকা বিভাগে জ্যাভলিন থ্রোতে দ্বিতীয় ও ডিসকাস থ্রোতে তৃতীয় স্থান, ২০০০ সালে অনূর্ধ্ব ১৮ বছর বালিকা বিভাগে জ্যাভলিন থ্রো ও ডিসকাস থ্রোতে তৃতীয় স্থান এবং ২০০১ সালে অনূর্ধ্ব কুড়ি বছর বালিকা বিভাগে জ্যাভলিন থ্রো ও ডিসকাস থ্রোতে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।[৫৮] বিংশ শতাব্দীতে নদীয়ার অ্যাথলিটদের মধ্যে সম্ভবত সব থেকে সফল হলেন, নদীয়ার দেবগ্রামের মেয়ে জ্যোতির্ময়ী শিকদার। খুব অল্প বয়েসে দেবগ্রাম কালচারাল সোসাইটি ক্লাবের সদস্য হিসেবে তার ক্রীড়া জীবনের সূচনা করে জ্যোতির্ময়ী ১৯৮১ থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা দ্বারা পরিচালিত বার্ষিক অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করেছেন এবং পরবর্তীতে তিনি উন্নততর প্রশিক্ষণ লাভের জন্য কলকাতায় পাড়ি দেন। ধীরে ধীরে নিজের ক্রীড়া দক্ষতার উন্নতি ঘটিয়ে জ্যোতির্ময়ী ১৯৯২ সালে জাতীয় অ্যাটলেটিক্স মিটে

৪০০ মিটার দৌড়ে দ্বিতীয় স্থান ও ১৯৯৪ সালের জাতীয় অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় পনেরশো মিটার দৌড়ে নতুন রেকর্ড সহ প্রথম স্থান অধিকার করেন। এর পরবর্তীতে জ্যোতির্ময়ী ক্রমশ দেশের সীমানা ছাড়িয়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিজ দক্ষতার পরিচয় তুলে ধরেন। ১৯৯৫ সালে তিনি ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তাই অনুষ্ঠিত এশিয়ান ট্রাক এন্ড ফিল্ড মিটে স্বর্ণপদক লাভ করেন এবং ১৯৯৮ সালে এশিয়ান গেমসে ৮০০ মিটার ও ১৫০০ মিটার দৌড়ে স্বর্ণপদক লাভ করার পাশাপাশি ৪×৪০০ মিটার রিলে দৌড়ে রুপোর পদক লাভ করেন।[৫৯] খেলাধুলায় তার এই অনন্য দক্ষতার স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি ১৯৯৮-১৯৯৯ সালের জন্য ‘রাজীব গান্ধী খেলরত্ন পুরস্কার’ লাভ করেন ভারত সরকারের তরফ থেকে।[৬০]

নদীয়ার অ্যাথলিটদের এই সাফল্যের ধারা একবিংশ শতাব্দীতেও প্রবাহমান থাকে। একবিংশ শতাব্দীর সূচনায় নদীয়ার অ্যাথলিট সোমা বিশ্বাস আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর তুলে ধরেন। ২০০২ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার বুসানে অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমসে তিনি হেপটাথ্যালনে রুপোর পদক লাভ করেন এবং পুনরায় ২০০৬ সালে দোহায় অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমসে হেপটাথ্যালনে রুপোর পদক লাভ করেন। তার অনন্য ক্রীড়া দক্ষতা স্বীকৃতি স্বরূপ ২০০৩ সালে তিনি ভারত সরকারের কাছ থেকে ‘অর্জুন পুরস্কার’ লাভ করেন।[৬১] বাদকুল্লা অঞ্চলের অনামী ক্লাবের খেলোয়াড় বাচ্চু দুর্লভ রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় ২০০০ সালে অনূর্ধ্ব ১৬ বছর বালক বিভাগে ৪০০ ও ৮০০ মিটার দৌড়ে দ্বিতীয়, ২০০১ সালে অনূর্ধ্ব ১৮ বছর বালক বিভাগে ৪০০ মিটার দৌড়ে দ্বিতীয়, ২০০২ সালে অনূর্ধ্ব ১৮ বছর বালক বিভাগে ৪০০ মিটার দৌড়ে প্রথম ও ৮০০ মিটার দৌড়ে নতুন রেকর্ডসহ প্রথম, ২০০৩ সালে অনূর্ধ্ব কুড়ি বছর বালক বিভাগে ৪০০ ও ৮০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ২০০২ সালে পূর্বাঞ্চলীয় অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য গঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দলে সুযোগ লাভ করেন ও ২০০৪ সালে আন্তঃরাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য গঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দলেও সুযোগ লাভ করেন।[৬২] অনামী ক্লাবেরই অপর এক খেলোয়াড় টুম্পা চুনারী রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় ২০০২ সালে অনূর্ধ্ব ১৪ বছর বালিকা বিভাগে ট্রায়াথলনে (১০০ মিটার), ব্রড জাম্প ও শট পুটে প্রথম স্থান অধিকার করে ওই বছরে অনুষ্ঠিত পূর্বাঞ্চলীয় অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের

জন্য গঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দলে অন্তর্ভুক্ত হন। টুম্পা উত্তরাঞ্চলের হরিদ্বারে ২০০৩ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম জাতীয় আন্তঃজেলা অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় লং জাম্পে তৃতীয় ও ১০০ মিটার দৌড়ে চতুর্থ স্থান অধিকার করেন এবং রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় ২০০৪ সালে অনূর্ধ্ব ১৪ বছর বালিকা বিভাগে পেনট্রাথলনে তৃতীয় ও ২০০৬ সালে ১০০ মিটার দৌড়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।[৬৩] হাঁসখালি অঞ্চলের দত্তফুলিয়া ইয়ংম্যানস অ্যাসোসিয়েশন ক্লাবের খেলোয়াড় শিল্পী ঢালি রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব কুড়ি বছর বালিকা বিভাগে ২০০২ সালে ১০০ মিটার দৌড়ে প্রথম ও ২০০ মিটার দৌড়ে তৃতীয়, ২০০৩ সালে ১০০ মিটার, ২০০ মিটার ও ৪০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এছাড়াও শিল্পী ২০০৩ সালে জামশেদপুরে অনুষ্ঠিত সিনিয়র অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় ৪×৪০০ মিটার রিলে দৌড়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে স্বর্ণপদক লাভ করেন এবং ওই একই বছর চেন্নাইতে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল জুনিয়র ফেডারেশন কাপ অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ অ্যাথলিট-এর সম্মান ও পুরস্কার লাভ করেন।[৬৪] কৃষ্ণনগর অ্যাথলেটিক্স ক্লাবের খেলোয়াড় মফিজুল হক মন্ডল রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগে ২০০৪ সালে ৮০০ মিটার ও ১৫০০ মিটার দৌড়ে প্রথম, ২০০৭ সালে ১৫০০ মিটার দৌড়ের দ্বিতীয় এবং ২০০৮ সালে ৫০০ মিটার ও ১৫০০ মিটার দৌড়ে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।[৬৫]

বাদকুল্লা অঞ্চলের অনামী ক্লাবের একাধিক খেলোয়াড় একবিংশ শতকে রাজ্য ও জাতীয় স্তরে নিজেদের ক্রীড়া দক্ষতার পরিচয় তুলে ধরেন অ্যাটলেটিক্সে। এই খেলোয়ারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সুমিত্রা রায়, সাবিনা খাতুন, শুভাশিষ ঘোষ, দীপু দাস, মনোজ সিং, বিশ্বনাথ পাল, সুমিত্রা বিশ্বাস ও ঝুমা বসু। সুমিত্রা রায় রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় ২০০৬ সালে ট্রিপল জাম্পে দ্বিতীয়, ২০০৭ সালে অনূর্ধ্ব কুড়ি বছর বালিকা বিভাগে ট্রিপল জাম্পে দ্বিতীয় ও লং জাম্পে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। পূর্বাঞ্চলীয় অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য গঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে ২০০৬ সালে অনূর্ধ্ব ১৮ বছর বালিকা বিভাগে সুমিত্রা ট্রিপল জাম্পে তৃতীয় স্থান এবং ২০০৭ সালে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য গঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দলে পুনরায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে ব্রড জাম্পে দ্বিতীয় ও

ট্রিপল জাম্পে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।[৬৬] সাবিনা খাতুন রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় ২০০৮ সালে অনূর্ধ্ব ১৬ বছর বালিকা বিভাগে ৮০০ মিটার দৌড়ে তৃতীয় স্থান ও ২০১০ সালে অনূর্ধ্ব ১৮ বছর বালিকা বিভাগে ৩০০০ মিটারে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ২০১০ সালে একই সঙ্গে ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে অনুষ্ঠিত পূর্বাঞ্চলীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় ও অন্ধ্রপ্রদেশের গুন্টুরে অনুষ্ঠিত জাতীয় আন্তঃআঞ্চলিক অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য গঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দলে সুযোগ লাভ করেন।[৬৭] শুভাশিস ঘোষ রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় ২০০৮ সালে অনূর্ধ্ব ১৬ বছর বালক বিভাগে ডিসকাস থ্রোতে প্রথম ও জ্যাভলিন থ্রোতে দ্বিতীয় স্থান, ২০০৯ সালে অনূর্ধ্ব ১৮ বছর বালক বিভাগে ডিসকাস থ্রোতে প্রথম, ২০১০ সালে অনূর্ধ্ব ১৮ বছর বালক বিভাগে ডিসকাস থ্রোতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।[৬৮] দীপু দাস রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় ২০১০ সালে অনূর্ধ্ব কুড়ি বছর বালক বিভাগে ১০০ মিটার ও ২০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করে, ওই বছরে একই সাথে পূর্বাঞ্চলীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় ও জাতীয় আন্তঃআঞ্চলিক অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য গঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দলে সুযোগ লাভ করেন।[৬৯] মনোজ সিং রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় ২০১০ সালে অনূর্ধ্ব ১৪ বছর বালক বিভাগে দীর্ঘ লম্ফনে প্রথম স্থান অধিকার করে ওই বছরে পূর্বাঞ্চলীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য গঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দলে সুযোগ লাভ করেন এবং ২০১২ সালে রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব ১৬ বছর বালক বিভাগে ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করে ওই বছরে পূর্বাঞ্চলীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য গঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দলে সুযোগ লাভ করেন।[৭০] বিশ্বনাথ পাল রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় ২০১০ সালে অনূর্ধ্ব ১৮ বছর বালক বিভাগে ৫০০০ মিটার দৌড়ে দ্বিতীয় ও ২০১২ সালে অনূর্ধ্ব কুড়ি বছর বালক বিভাগে ৫০০০ মিটার দৌড়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন এবং ২০১২ সালে একই সাথে পূর্বাঞ্চলীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় ও জাতীয় আন্তঃআঞ্চলিক অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য গঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দলে সুযোগ লাভ করেন।[৭১] সুমিত্রা বিশ্বাস রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় ২০১২ সালে অনূর্ধ্ব ১৮ বছর বালিকা বিভাগে হেপটাথেলনে প্রথম স্থান অধিকার করে ওই বছরে

পূর্বাঞ্চলীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য গঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দলে অন্তর্ভুক্ত হন এবং পুনরায় ২০১৩ সালে রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব কুড়ি বছর বালিকা বিভাগে হেপটাথেলনে প্রথম স্থান অধিকার করে ওই বছরে পূর্বাঞ্চলীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য গঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দলে অন্তর্ভুক্ত হন।[৭২] ঝুমা বসু রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় ২০১২ সালে অনূর্ধ্ব ১৮ বছর বালিকা বিভাগে শট পুটে প্রথম স্থান অধিকার করে ওই বছরে পূর্বাঞ্চলীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য গঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দলে অন্তর্ভুক্ত হন এবং পুনরায় ২০১৩ সালে রাজ্য অথেলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব ১৮ বছর বালিকা বিভাগে শট পুটে প্রথম স্থান অধিকার করে ওই বছরে পূর্বাঞ্চলীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য গঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দলে অন্তর্ভুক্ত হন। এছাড়া ২০১৪ সালেও পূর্বাঞ্চলীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য গঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দলে সুযোগ লাভ করার পাশাপাশি, ঝুমা ডিসকাস থ্রোতে প্রথম ও শটপুটে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।[৭৩]

একবিংশ শতকে নদীয়ার অ্যাথলিটদের মধ্যে সবথেকে উজ্জ্বল হলেন দেবশ্রী মজুমদার। কৃষ্ণনগরের স্টারলেটস ক্লাবের খেলোয়াড় হিসাবে নিজের ক্রীড়া জীবন শুরু করে দেবশ্রী আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিজের ক্রীড়া দক্ষতার পরিচয় তুলে ধরেন। ক্রীড়া ক্ষেত্রে দেবশ্রী প্রথম উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেন ২০০৬ সালের রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায়, যেখানে বালিকা বিভাগে ১০০ মিটার ও ৪০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করার পাশাপাশি, কর্তৃপক্ষের বিচারে প্রতিযোগিতার সেরা অ্যাথলিটের মর্যাদা লাভ করেন এবং ওই একই বছরে অনুষ্ঠিত পূর্বাঞ্চলীয় অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য গঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দলে সুযোগ লাভ করে দেবশ্রী অনূর্ধ্ব ১৬ বছর বালিকা বিভাগে ১০০ মিটার, ৪০০ মিটার ও রিলে দৌড়ে সোনার পদক লাভ করে প্রতিযোগিতার 'বেস্ট পারফর্মড অ্যাথলিট' হবার সম্মান লাভ করেন। এলাহাবাদে ১১ থেকে ১৩ই অক্টোবর ২০০৬ সালে অনুষ্ঠিত আন্তঃআঞ্চলিক জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় পূর্বাঞ্চলীয় দলে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ লাভ করে দেবশ্রী ৪০০ মিটার দৌড়ে দ্বিতীয় স্থান ও রিলে দৌড় দলের সদস্য হিসেবে প্রথম স্থান লাভ করেন এবং ওই বছরের নভেম্বরে

কর্নাটকে অনুষ্ঠিত জাতীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য গঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দলে নির্বাচিত হন।[৭৪] জাতীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় উল্লেখযোগ্য সফলতা প্রদর্শন করায় দেবশ্রী ২০০৭ সালের ১১ থেকে ১৪ জুলাই চেক রিপাবলিক- এর অক্টোভাতে অনূর্ধ্ব ১৮ বছর বয়সী অ্যাথলিটদের বিশ্ব প্রতিযোগিতা ওয়ার্ল্ড ইয়ূথ অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ-২০০৭ (World Youth Athletic Championship-2007)-তে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নির্বাচিত হন এবং এই উদ্দেশ্যে নয়া দিল্লীতে সর্বভারতীয় প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রশিক্ষণও লাভ করেন। ২০০৭ সালে রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় তিনি অনূর্ধ্ব ১৮ বছর বালিকা বিভাগে ২০০ মিটার ও ৪০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ওই বছরে বিহারের পাটনায় অনুষ্ঠিত পূর্বাঞ্চলীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য গঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দলে সুযোগ লাভ করে উক্ত প্রতিযোগিতায় ২০০ ও ৪০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ২০০৯ সালে আন্তঃজেলা অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় দেবশ্রী ৪০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করার পাশাপাশি ওই একই বছরে রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব কুড়ি বছর বালিকা বিভাগে ২০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন ও ৪০০ মিটার দৌড়ে নতুন রেকর্ডসহ প্রথম স্থান অধিকার করেন।[৭৫] জাতীয় সীমা অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেবশ্রী তার প্রতিভার স্বাক্ষর তুলে ধরেন ২০১৪ সালের এশিয়ান গেমসে, যেখানে তিনি ৪×৪০০ মিটার রিলে দৌড়ে সোনার পদক লাভ করেন। একটিমাত্র আন্তর্জাতিক কৃতিত্ব অর্জনের মধ্যেই দেবশ্রীর প্রতিভা থেমে থাকেনি ২০১৫ সালে এশিয়ান ট্রাক এন্ড ফিল্ড প্রতিযোগিতায় তিনি রুপোর পদক লাভ করেন এবং ওই একই বছরের চীনের বেজিংয়ে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য যে ১৭ জন অ্যাথলিট নিয়ে ভারতীয় দল গঠিত হয় তার অন্যতম সদস্য ছিলেন তিনি। ২০১৬ সালের রিও অলিম্পিকে তিনি নাটকীয় ভাবে ভারতীয় দলে সুযোগ লাভ করলেও শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত রিলে দলের সদস্য হিসাবে মাঠে নামার সুযোগ লাভ করেননি।[৭৬] এর পরবর্তীতে তিনি পুনরায় ২০১৭ সালে ভুবনেশ্বরে অনুষ্ঠিত এশীয় অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় ৪×৪০০ মিটার রিলে দৌড়ে সোনার পদক লাভ করেন।[৭৭]

এই সময় পর্বের নদীয়ার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য অ্যাথলিটরা হলেন তেজাব বিশ্বাস, সাবের আলী মন্ডল, তাপসী বৈদ্য, অনিতা দাস, সুমিতা ভৌমিক প্রমুখ। তেজাব বিশ্বাস যিনি কৃষ্ণনগর স্টারলেটস ক্লাবের রেজিস্ট্রেট খেলোয়াড় তিনি ২০১০ সালে রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব ১৬ বছর বালক বিভাগে ৮০০ মিটার ও ১৫০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করে ওই বছরই পূর্বাঞ্চলীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ ও জাতীয় আন্তঃআঞ্চলিক অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণের জন্য গঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দলে সুযোগ লাভ করেন। তেজাব ২০১২ সালের রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব ১৬ বছর বালক বিভাগে ১৫০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করে পূর্বাঞ্চলীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য গঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দলে সুযোগ লাভ করেন এবং ঠিক একইভাবে ২০১৩ সালের রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব কুড়ি বছর বালক বিভাগে ১৫০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করে পূর্বাঞ্চলীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য গঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দলে সুযোগ লাভ করেন।[৭৮] স্টারলেটস ক্লাবেরই অপর এক খেলোয়াড় সাবের আলি মন্ডল রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় ২০১০ সালে অনূর্ধ্ব ১৮ বছর বালক বিভাগে ৫০০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান, ২০১১ সালে অনূর্ধ্ব কুড়ি বছর বালক বিভাগে ৫০০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান, ২০১২ সালে অনূর্ধ্ব কুড়ি বছর বালক বিভাগে ৫০০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ২০১২ সালে পূর্বাঞ্চলীয় জাতীয় জুনিয়ার অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য গঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দলে অন্তর্ভুক্ত হন। চাকদহ অঞ্চলের উত্তরলালপুর ইয়ুথ ক্লাবের খেলোয়াড় তাপসী বৈদ্য রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় ২০১০ সালে অনূর্ধ্ব ১৪ বছর বালিকা বিভাগে ১০০ মিটার দৌড়ে ও লং জাম্পে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ওই বছরে একই সাথে পূর্বাঞ্চলীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় ও জাতীয় আন্তঃআঞ্চলিক অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য গঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দলে সুযোগ লাভ করেন।[৭৯] রানাঘাট অঞ্চলের হালাল পুর বিবেকানন্দ সংস্কৃত পরিষদ ক্লাবের খেলোয়ার অনিতা দাস রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় ২০১১ সালে দীর্ঘ লম্ফনে নতুন রেকর্ড সহ প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ওই বছরে ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় আন্তঃজেলা জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায়

অনূর্ধ্ব ১৪ বছর বালিকা বিভাগে দীর্ঘ লম্ফনে ৫.২১ মিটার লাফিয়ে জাতীয় পর্যায়ে নতুন রেকর্ড স্থাপন করে প্রথম স্থান অধিকার করেন। অনিতা ২০১২ সালে রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব ১৬ বছর বালিকা বিভাগে ১০০ মিটার দৌড়ে ও দীর্ঘ লম্ফনে প্রথম স্থান অধিকার করে ওই বছরে একই সাথে পূর্বাঞ্চলীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় ও জাতীয় আন্তঃআঞ্চলিক অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য গঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দলে সুযোগ লাভ করেন। পুনরায় অনিতা ২০১৩ সালে রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব ১৬ বছর বালিকা বিভাগে ১০০ মিটার দৌড়ে ও দীর্ঘ লম্ফনে প্রথম স্থান অধিকার করে ওই বছরে একই সাথে পূর্বাঞ্চলীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় ও জাতীয় আন্তঃআঞ্চলিক অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য গঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দলে সুযোগ লাভ করেন এবং এক্ষেত্রে তিনি জাতীয় আন্তঃআঞ্চলিক অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব ১৬ বছর বালিকা বিভাগে দীর্ঘ লম্ফনে দ্বিতীয় ও ১০০ মিটার দৌড়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।[৮০] চাকদহ অঞ্চলের মন্ডল পুকুরিয়া নবজ্যোতি সংঘ ক্লাবের খেলোয়ার সুমিত্রা ভৌমিক ২০১৪ সালের রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব ১৬ বছর বালিকা বিভাগে ৪০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করে, ওই বছরে পূর্বাঞ্চলীয় জাতীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য গঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দলে অন্তর্ভুক্ত হন এবং ২০১৫ সালে অন্ধপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় আন্তঃজেলা অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব ১৬ বছর বালিকা বিভাগে অংশগ্রহণ করে ৪০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এর পরবর্তীতে তিনি রাজ্য অথেলেটিক্স প্রতিযোগিতায় ২০১৬ ও ২০১৭ উভয় বছরে অনূর্ধ্ব ১৮ বছর বালিকা বিভাগে ৪০০ মিটার ও ২০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন।[৮১]

• ৬.৩. জেলার বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠকগণ:

যেকোনো ধরনের খেলাধুলা সংক্রান্ত কার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজন হয় সাংগঠনিক দক্ষতার। বিভিন্ন খেলাধুলার প্রশিক্ষণ, বয়স ভিত্তিক প্রতিযোগিতার আয়োজন এবং সেগুলি যথার্থ নিয়মকানুন অনুসরণ করে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য দক্ষতা সম্পন্ন সংগঠক মন্ডলী দ্বারা পরিচালিত সংগঠনের ছত্রছায়া একান্ত

আবশ্যিক। খেলাধুলার প্রসার ও ক্রীড়া সংক্রান্ত কার্যাবলী পরিচালনার ক্ষেত্রে ক্রীড়া সংগঠকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। নদীয়ার খেলাধুলার ইতিহাস বর্ণনার ক্ষেত্রে ক্রীড়া সংগঠকদের ভূমিকাও যথেষ্ট উল্লেখের দাবি রাখে। নদীয়া জেলার একাধিক ক্রীড়া সংগঠক জেলার পাশাপাশি রাজ্য, জাতীয়, এমনকি আন্তর্জাতিক স্তরেও তাদের সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। জেলাস্তরে একাধিক ক্রীড়া সংগঠক তাদের সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় দিলেও এই আলোচনায় মূলত যে সমস্ত ক্রীড়া সংগঠকরা জেলার বাইরে ধারাবাহিকভাবে তাদের দক্ষতা তুলে ধরেছেন তাদেরই কর্মকাণ্ডের বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে।

আলোচ্য সময় পর্বের মধ্যে নদীয়ার যে ক্রীড়া সংগঠকের কথা প্রথম উল্লেখের দাবি রাখে তিনি হলেন এস.এম. বদরুদ্দীন। ১৯৫৫ সালে নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার যখন পুনরুজ্জীবন ঘটে তখন যারা এই সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন তাদের অন্যতম হলেন এস.এম. বদরুদ্দীন। অন্য দক্ষ সংগঠকদের সঙ্গে নিয়ে নবগঠিত জেলা ক্রীড়া সংস্থার সংগঠনের ভিত্তিমূলকে দৃঢ় বুনিয়াদের উপর স্থাপন করে তিনি জেলার সকল প্রান্তে সংগঠনকে সক্রিয় ও সজীব করে তোলেন। জেলার খেলোয়াড়দের রেজিস্ট্রেশন কার্ডের প্রচলন ও তার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ, জেলা সংস্থার নিজস্ব নিয়মাবলী প্রণয়ন, জেলা সংস্থার নিজস্ব মুখপত্র পত্রিকার প্রকাশ সবই তার সুচিন্তার ফসল। জেলার ক্রীড়া কর্ম সংক্রান্ত অভিযোগ মীমাংসার জন্য জেলা ট্রাইবুনাল গঠন তার অনন্য চিন্তাভাবনার এক অন্যতম দৃষ্টান্ত। নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার ক্ষেত্রে তার মস্তিষ্ক প্রসূত এই পদক্ষেপগুলি যখন গ্রহণ ও কাজে রূপায়িত করা হচ্ছে তখন অন্যান্য জেলা সংস্থায় এমনকি অধিকাংশ রাজ্য ক্রীড়া সংস্থাতেও এইসব কর্মকান্ড কার্যকর করার কোনো প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় না। নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহকারী সম্পাদক রূপে ১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে সংস্থার সাথে প্রথম যুক্ত হবার পর থেকে দীর্ঘ ৫৮ বছর তিনি জেলা ক্রীড়া সংস্থার বিভিন্ন পদের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন এবং অলংকৃত করেছেন সাধারণ সম্পাদক, সহ-সভাপতি সহ বিভিন্ন পদ, এমনকি ২০১০ সালের ২৩শে অক্টোবর ৮৯ বছর বয়সে তার মৃত্যুর তিন মাস আগে পর্যন্ত জেলা ক্রীড়া সংস্থার ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান হিসাবে নিজ ভূমিকা পালন করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্রীড়া পরিষদ পুনর্গঠন করলে ১৯৬৮ ও ৬৯ উভয় বছরেই এই পরিষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন এস.এম. বদরুদ্দীন এবং তিনি ছিলেন এই পরিষদে মফস্বল থেকে যুক্ত একমাত্র সদস্য। ক্রীড়া সংগঠক হিসেবে তার দক্ষতার

স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৮৬ সালে তিনি রাজ্য সরকারের তরফ থেকে পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৮৬ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি ক্রীড়া দিবস উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার রাজ্যের ১২ জন ক্রীড়া সংগঠক ব্যক্তিকে তাদের সাংগঠনিক শক্তি ও কর্ম কুশলতার স্বীকৃতি স্বরূপ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে অনুষ্ঠিত বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে সংবর্ধিত করে এবং এই ১২ জনের একজন ছিলেন নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার তৎকালীন সহ-সভাপতি তথা কার্যকারী কমিটির প্রধান এস.এম. বদরুদ্দীন। রাজ্য সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত হওয়ার পর ১৯৮৬ সালে ৪ই মার্চ নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা এস.এম. বদরুদ্দীন কে সংবর্ধিত করার উদ্দেশ্যে এক সভার আয়োজন করলে, উক্ত সভায় তিনি রাজ্য সরকারের তরফ থেকে পুরস্কার হিসেবে প্রাপ্ত পাঁচ হাজার টাকা ও নিজ তরফ থেকে পাঁচ হাজার টাকা অর্থাৎ মোট দশ হাজার টাকা জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে দান করেন। তিনি জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে অনুরোধ করেন যেন তার প্রদান করা অর্থ থেকে প্রতি বছর প্রাপ্ত সুদের অর্থে জেলা ক্রীড়া সংস্থা জেলার কৃতী ক্রীড়া সংগঠকদের কর্ম স্বীকৃতি স্বরূপ পুরস্কার প্রদানের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তার অনুরোধ অনুসারে নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা ১৯৯০ সাল থেকে জেলার দক্ষ ক্রীড়া সংগঠকদের দক্ষতার স্বীকৃতি স্বরূপ 'বদরুদ্দিন পুরস্কার' নামক এক নতুন বিশেষ পুরস্কার দানের ব্যবস্থা করে যা বর্তমানেও নিয়মিত প্রদান করা হয়। নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার বিভিন্ন পদ অলংকৃত করা ছাড়াও জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রতিনিধি হিসেবে এস.এম. বদরুদ্দীন বিভিন্ন সময়ে আই.এফ.এ, সি.এ.বি, ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস ফেডারেশনের মত বিভিন্ন ক্রীড়াসংস্থার সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন এবং নিজ ভূমিকা সফলতার সঙ্গে পালন করেছেন।[৮২]

নদীয়ার অধিবাসী শিবদাস রায় ক্রীড়া সংগঠক ও বিচারক তথা পরিচালক হিসেবে নিজ দক্ষতা জেলার বাইরে প্রসার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৯৮২ সালে জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহ-সাধারণ সম্পাদক থাকা অবস্থায় তিনি দিল্লিতে অনুষ্ঠিত নবম এশিয়ান গেমসে পশ্চিমবঙ্গ থেকে নির্বাচিত বিচারকদের অন্যতম হিসাবে অ্যাথলেটিক্সে নিজ বিভাগে কৃতিত্বের সঙ্গে বিচার কার্য পরিচালনা করেন। দিল্লির জহরলাল নেহেরু স্টেডিয়ামে ১৯৮৯ সালের ১৪ থেকে ১৯শে নভেম্বরে অনুষ্ঠিত অষ্টম এশিয়ান ট্রাক ও ফিল্ড মিটে শিবদাস রায় যুক্ত বিষয় সমূহের (combined events) প্রতিযোগিতা বিভাগের

বিচারকার্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বিচারক হিসাবে। পরবর্তীতে তিনি ভারতের অ্যামেচার অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন কর্তৃক ১৯৯৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ব্যাঙ্গালোরে আয়োজিত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অ্যাথলেটিক্সের বিচারক নির্ধারণ করার পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়ে অ্যাথলেটিক্সে আন্তর্জাতিক বিচারক হিসেবে ফেডারেশনের স্বীকৃতি লাভ করার দরুন, আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক্স মিটে অফিসিয়াল হিসেবে ও জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় রেফারি হিসেবে অংশ নেওয়ার অধিকারী হন। পশ্চিমবঙ্গ জেলা ক্রীড়া সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভা ও নতুন কর্মকর্তা নির্বাচন, ২৪শে মে ১৯৯৮ সালে বর্ধমান জেলার বানপুর শহরে অনুষ্ঠিত হয় যেখানে শিবদাস রায় উক্ত সংস্থার অন্যতম সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন।[৮৩] নদীয়া জেলার সফল ক্রীড়া সংগঠকদের মধ্যে অন্যতম হলেন গোবিন্দ প্রসাদ দত্ত। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য স্পোর্টস কাউন্সিল ও রাজ্য যুব দপ্তরের উদ্যোগে ১৯৮৬ সাল থেকে ২২শে ফেব্রুয়ারি দিনটিকে ক্রীড়া দিবস হিসেবে চিহ্নিত করে ওই দিনটিতে রাজ্যের প্রবীণ ক্রীড়াবিদ, প্রশিক্ষক ও ক্রীড়া সংগঠকদের সম্মানিত ও পুরস্কৃত করার যে রীতির সূচনা করে, তাতে ১৯৮৭ সালে যে ২০ জন ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তারা ১৯৮৮ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি পুরস্কার লাভ করেন এবং এই পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন গোবিন্দ প্রসাদ দত্ত। ইতিপূর্বে তিনি জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক, সহ-সভাপতি, কার্যনির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান, সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদে দক্ষতার সঙ্গে নিজ ভূমিকা পালন করেছেন। এর পাশাপাশি গোবিন্দ প্রসাদ দত্ত রাজ্য স্তরের একাধিক ক্রীড়া সংগঠনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ কলঙ্কিত করেছেন। তিনি ১৯৯১-৯২ মরশুমের জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন, ১৯৯২ সালের ২২শে জুন অনুষ্ঠিত ওয়েস্ট বেঙ্গল ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশন- এর বার্ষিক সাধারণ সভা ও আগত মরশুমের জন্য নতুন কমিটি গঠন সম্পন্ন হলে সেখানে সহ-সভাপতি রূপে পুনঃনির্বাচিত হন এবং ১৯৯৩-৯৪ ও ১৯৯৪-৯৫ মরশুমেও উক্ত সংস্থার সহ-সভাপতি রূপে পুনঃনির্বাচিত হন। এছাড়াও গোবিন্দ প্রসাদ দত্ত ১৯৮৯-৯০ ক্রীড়াবর্ষে আই.এফ.এ- এর সহ-সভাপতি পদে নির্বাচিত হন, ১৯৯২ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত বেঙ্গল টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভায় আগত বছরের জন্য নতুন কমিটি গঠন সম্পন্ন হলে সেখানে অন্যতম সহ-সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন, শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে ১৯৯৩ সালের ২১শে মার্চ ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস

ফেডারেশনের বার্ষিক সভা ও ১৯৯৩-৯৪ সালের জন্য নতুন কর্মকর্তাগণ নির্বাচিত হলে সেখানে জেলার প্রতিনিধি হিসেবে তিনি নতুন কমিটিতে কোষাধাক্ষ্য রূপে নির্বাচিত হন, প্রসঙ্গত উল্লেখ্য পূর্বে ১৯৮৯-৯০ ও ১৯৯০-৯১ মরশুমেও তিনি ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস ফেডারেশনের কোষাধাক্ষ্য পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। রাজ্য ব্যাডমিন্টন সংস্থা, রাজ্য টেবিল টেনিস সংস্থা, ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস ফেডারেশন প্রভৃতি একাধিক ক্রীড়া সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকলেও গোবিন্দ প্রসাদ দত্তের সবথেকে উল্লেখযোগ্য প্রাপ্তি সম্ভবত ১৯৯৫ সালের ২৮ শে জুলাই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল- এর আগত বছরের জন্য নতুন কমিটি গঠনের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে অন্যতম সহ-সভাপতি রূপে নির্বাচিত হওয়া। সি.এ.বি- এর মতন নামি সংস্থার এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ পদে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি নদীয়া জেলা থেকে নির্বাচিত হন।[৮৪]

নদীয়া জেলার অপর উল্লেখযোগ্য ক্রীড়া সংগঠক ও বিচারকেরা হলেন- হরপ্রসাদ মুখার্জী, শংকরী চরণ চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র বাগচী, জয়ন্ত চ্যাটার্জী ও দেবতোষ মুখার্জি প্রমুখ। হরপ্রসাদ মুখার্জী ১৯৮৭ সালে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ৩৯ তম বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতার অন্যতম আম্পায়ার রূপে নির্বাচিত হন ও দক্ষতার সঙ্গে কর্ম পরিচালনা করে কৃতিত্বের পরিচয় দেন। শঙ্করিচরণ চট্টোপাধ্যায় যিনি বিভিন্ন সময়ে নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার বিভিন্ন পদ অলংকৃত করেছেন তিনি ১৯৮৯ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি রাজ্য সরকারের তরফ থেকে ক্রীড়া দিবসে ক্রীড়া সংগঠক হিসেবে তার উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ পুরস্কার লাভ করেন। পূর্ণচন্দ্র বাগচী যিনি নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহ-সভাপতি সহ একাধিক পদ বিভিন্ন সময়ে অলংকৃত করেছেন তিনি ১৯৯১ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি ক্রীড়া দিবসে ক্রীড়া সংগঠক রূপে তার দক্ষতার স্বীকৃতি স্বরূপ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের তরফ থেকে পুরস্কার লাভ করেন। জয়ন্ত চ্যাটার্জি যিনি বিভিন্ন সময়ে নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ অলংকৃত করেছেন তিনি ৪ঠা জুন ২০১১ সালে বালুরঘাটে অনুষ্ঠিত ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস ফেডারেশনের বার্ষিক সাধারণ সভায় সর্বসম্মতি ক্রমে উক্ত সংস্থার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। তবে জয়ন্ত চ্যাটার্জির ক্রীড়া সংগঠক হিসেবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য হলো ২০১২ সালে আই.এফ.এ- এর সহ-সচিব পদে তার

নির্বাচন। দেশের অন্যতম প্রাচীনতম ক্রীড়া সংগঠন ও বাংলার ফুটবল নিয়ামক সংস্থা আই.এফ.এ- এর গভর্নিং বডির সভায় জয়ন্ত চ্যাটার্জী সহ-সচিব পদে নির্বাচিত হন এবং তিনিই নদীয়া জেলা থেকে প্রথম এত গুরুত্বপূর্ণ পদে নির্বাচিত হন। দেবতোষ মুখার্জী ২০১০-১১ মরশুমে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল- এর ক্যাটেগরি-২ বিভাগে বর্ষসেরা আম্পায়ার নির্বাচিত হয়ে, ২৩শে জুলাই ২০১১ সালে ইডেন গার্ডেন্সে অনুষ্ঠিত সি.এ.বি- এর বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী উৎসবে কলকাতার মেয়রের হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন।[৮৫]

ক্রিকেট আম্পায়ার হিসেবে নদীয়ার যে অধিবাসী সম্ভবত সব থেকে বেশি কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন তিনি হলেন ফ্রান্সিস গোমেজ। ফ্রান্সিস নদীয়ার কৃষ্ণনগর শহরের আদিবাসিন্দা এবং তিনি সুনামের সঙ্গে দীর্ঘদিন নদীয়া জেলা ক্রিকেট দলে খেলেছেন। খেলোয়াড় জীবনের শেষে তিনি ক্রিকেট আম্পেয়ারিং- এর সঙ্গে যুক্ত হন এবং একই সঙ্গে তিনি নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার বিভিন্ন সাংগঠনিক পদও অলংকৃত করেছেন। তিনি ১৯৯১ সালে রঞ্জি ট্রফি প্রতিযোগিতার আম্পায়ার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হন। রঞ্জি ট্রফির বিভিন্ন খেলা পরিচালনা করবার জন্য যেসব আম্পায়ার নিযুক্ত হন প্রথমে তাদের রঞ্জি প্যানেল আম্পায়ারের তালিকাভুক্ত হতে হয়। এক্ষেত্রে রঞ্জি প্যানেল আম্পায়ারের তালিকাভুক্ত হতে তাদের কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয় যেখানে প্রথমে লিখিত পরীক্ষা, তার পরবর্তীতে মৌখিক ও ব্যবহারিক পরীক্ষা এবং সর্বশেষ ডাক্তারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। ১৯৯১ সালে পশ্চিমবঙ্গ থেকে মোট ৯ জন লিখিত পরীক্ষায় বসেন যার মধ্যে চারজন সফল হয়ে পরবর্তী পর্যায়ে মৌখিক ও ব্যবহারিক পরীক্ষা দেন এবং শেষ পর্যন্ত তিন জন ডাক্তারি পরীক্ষা সফলভাবে সম্পূর্ণ করেন যার অন্যতম হলেন ফ্রান্সিস গোমেজ। পরবর্তীতে তিনি ১৯৯৯ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আম্পায়ারের স্বীকৃতি লাভ করেন। ২০০০ সালের ১৯শে মার্চ নাগপুরে অনুষ্ঠিত ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে একদিনের ক্রিকেট সিরিজের পঞ্চম তথা শেষ একদিনের খেলায় অন্যতম আম্পায়ার হিসেবে মাঠে নামেন ফ্রান্সিস গোমেজ। নদীয়ার অধিবাসী হিসেবে তিনিই প্রথম আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলায় আম্পেয়ারিং করার কৃতিত্ব অর্জন করেন।[৮৬]

• ৬.৪. জেলার বিশিষ্ট ক্রীড়া ক্লাব:

জেলার খেলাধুলা সংক্রান্ত কার্য তৃণমূল স্তরে পরিচালিত হয় একাধিক ক্রীড়া সংক্রান্ত ক্লাবের দ্বারা। এই সমস্ত ক্লাবগুলি নিজেদের ক্ষুদ্র পরিসরে ক্রীড়া সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে ক্রীড়া ক্ষেত্রে প্রতিভাবানদের খেলোয়াড় হিসেবে গড়ে তোলার প্রাথমিক রসদ সরবরাহ করে থাকে। জেলার প্রায় প্রতিটি অঞ্চলেই এই সমস্ত ক্লাবগুলি গড়ে উঠেছে এবং নদীয়ার যে সমস্ত খেলোয়াড় রাজ্য, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছে তাদের প্রায় প্রত্যেকেই জেলার কোনো না কোনো ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত থেকেছে, তাদের খেলোয়াড় জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে। এই ক্লাব গুলি ক্রীড়া সংক্রান্ত কার্যের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক কার্যের সঙ্গেও যুক্ত থাকে। বিভিন্ন ক্লাবগুলি নিজেদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দুস্থদের সাহায্য করা, বন্যার মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় ত্রাণ ও সাহায্যের ব্যবস্থা করা, রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা প্রভৃতি কাজের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত রাখে। এছাড়া সাংস্কৃতিক কার্যেও ক্লাবগুলি নিজেদের অবদানের স্বাক্ষর তুলে ধরে স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস ও বিভিন্ন মনীষীদের জন্ম বা মৃত্যুদিনে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে। অধিকাংশ ক্লাবগুলি নিজেদের অঞ্চলে দুর্গাপূজা, কালী পূজার মতো বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করে থাকে। জেলার ক্রীড়া ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এই ক্লাবগুলোর অবদান তুলে ধরা আবশ্যক। সমগ্র জেলাজুড়ে একাধিক ক্লাব গড়ে উঠলেও নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার দ্বারা অনুমোদিত এবং ক্রীড়া ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা ক্লাবগুলোর বর্ণনা তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে উক্ত গবেষণাকার্যে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর সূচনার দিক থেকে আমরা জেলায় বিভিন্ন ক্রীড়া ক্লাব গড়ে ওঠার সংবাদ পায়। জেলায় পাশ্চাত্য খেলাধুলা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সেই খেলাধুলা গুলিকে সংগটিতভাবে আয়োজনের জন্য বিভিন্ন ক্রীড়া ক্লাব গড়ে উঠতে থাকে। প্রাথমিক পর্যায়ে জেলার মুখ্য শহর কৃষ্ণনগর, চাকদহ, শান্তিপুর, রানাঘাট ও নবদ্বীপের মত পৌরসভা অঞ্চলগুলিতেই এই ক্রীড়া ক্লাবগুলি গড়ে উঠেছিল। কৃষ্ণনগরের প্রথম ক্রীড়া ক্লাব হিসেবে কৃষ্ণনগর টাউন ক্লাব গড়ে ওঠে ১৮৯০ সালে। স্বাধীনতার পূর্বে কৃষ্ণনগর শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকায় একাধিক ক্রীড়া ক্লাব গড়ে উঠলেও তাদের মধ্যে

বেশিরভাগই দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। জেলায় ক্রীড়া ক্লাবের সংখ্যা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায় স্বাধীনতার পরবর্তীকালে। কৃষ্ণনগর অঞ্চলের ক্রীড়া ক্লাবগুলির মধ্যে হিরোজ ক্লাব, কৃষ্ণনগর সাউথ ক্লাব, অগ্রণী সংঘ, শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগার ইত্যাদি, শান্তিপুর অঞ্চলের ক্রীড়া ক্লাবগুলির মধ্যে শান্তিপুর স্পোটিং ইউনিয়ন, শান্তিপুর মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, ন্যাশনাল ক্লাব, সূত্রাগড় স্পোর্টিং ক্লাব ইত্যাদি, নবদ্বীপ অঞ্চলের ক্রীড়া ক্লাবগুলির মধ্যে নবদ্বীপ অ্যাথলেটিক ক্লাব, নদিয়া ক্লাব ইত্যাদি, রানাঘাট অঞ্চলের ক্রীড়া ক্লাবগুলির মধ্যে রানাঘাট টাউন ক্লাব, রানাঘাট স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন, রানাঘাট ভারতী সংঘ ইত্যাদি, চাকদহ অঞ্চলের ক্রীড়া ক্লাবগুলির মধ্যে নবীন সংঘ, লাইভ ফর ডু ইত্যাদি হলো প্রাচীনতম ও উল্লেখযোগ্য ক্রীড়া ক্লাব। ১৯৭০- এর দশকের পর থেকে জেলায় ক্রীড়া ক্লাবের সংখ্যায় ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটে। এই সময়ে জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ক্লাবের সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটে, যার দ্বারা জেলায় ক্রীড়া ক্লাবের সংখ্যায় ব্যাপক বৃদ্ধির বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। স্বাধীনতা উত্তর কালের মত, ১৯৭০- এর দশকের পরবর্তীকালে জেলায় ক্রীড়া ক্লাবের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটলেও উভয় সময়ের জেলায় ক্রীড়া ক্লাবের সংখ্যার বৃদ্ধির মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। স্বাধীনতা উত্তর কালে জেলায় ক্রীড়া ক্লাবের সংখ্যায় বৃদ্ধি ঘটলেও তা প্রধানত জেলার প্রধান পৌরাঞ্চল ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অপরদিকে ১৯৭০- এর দশকের পরবর্তীতে জেলায় যে নতুন ক্লাবগুলি গড়ে উঠতে থাকে তার অধিকাংশই গড়ে উঠেছিল জেলার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে। নাকাশিপাড়া, পলাশীপাড়া, করিমপুর, কালীগঞ্জ, আড়ংঘাটার মতো গ্রাম প্রধান অঞ্চল গুলিতে এই সময়ে অসংখ্য ক্রীড়া ক্লাব গড়ে ওঠে। শুধুমাত্র পরিমাণগত নয় গুণগত ক্ষেত্রেও গ্রামাঞ্চলে খেলাধুলার মানের ব্যাপক উন্নতি ঘটে গ্রামাঞ্চলে ক্রীড়া সংক্রান্ত ক্লাবের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াই। নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন খেলাধুলার প্রতিযোগিতায় গ্রামাঞ্চলের ক্লাব ও তাদের খেলোয়াড়দের সফল ভূমিকার একাধিক নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। এর পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলের ক্রীড়া ক্লাব গুলির বহু খেলোয়াড় জেলার বাইরেও নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর তুলে ধরেছে খেলাধুলার জগতে।

নদীয়া জেলায় প্রতিষ্ঠিত প্রথম ক্লাব হিসেবে ১৮৯০ সালে কৃষ্ণনগরে প্রতিষ্ঠিত হয় কৃষ্ণনগর টাউন ক্লাব। সেই সময়ের বিখ্যাত কৃষ্ণ নাগরিক সরোজ রঞ্জন বসু ও শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরীর প্রচেষ্টায়

প্রতিষ্ঠিত হয় এই ক্লাব। তবে প্রতিষ্ঠার সময় এই ক্লাব ছিল প্রধানত একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান তবে পরবর্তীতে এই প্রতিষ্ঠান খেলাধুলার সাথে যুক্ত হয়। ১৯৩০ সাল থেকে কৃষ্ণনগরে নিয়মিত ফুটবল খেলা শুরু হলে কৃষ্ণনগর টাউন ক্লাব সেই সময় থেকেই ফুটবল দল গঠন করে নিয়মিতভাবে জেলা স্তরের বিভিন্ন খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করে আসছে।[৮৭] পরবর্তীতে ক্রিকেট, ফুটবল, অ্যাথলেটিক্স সহ বিভিন্ন খেলাধুলার সাথে যুক্ত হয় ক্লাব। কৃষ্ণনগরের অপর এক প্রাচীন ক্লাব হল শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগার যা বর্তমানেও টিকে রয়েছে। ১৩৫১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসের অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে এই ক্লাবটি প্রতিষ্ঠিত হয় কৃষ্ণনগরের নগেন্দ্রনগর পল্লীতে সমাজ-সংস্কৃতি মনস্ক কয়েকজন ব্যক্তির সহায়তায়, বিশেষত চারণ কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের মুখ্য উদ্যোগে। প্রতিষ্ঠার সময় এই ক্লাবের সম্পাদক ছিলেন বিশিষ্ট কৃষ্ণ নাগরিক দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী। প্রতিষ্ঠার সময় এই ক্লাবটি ছিল মূলত একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠার পরবর্তীতে নগেন্দ্রনগর সন্নিহিত অনুন্নত, অশিক্ষিত ও অসহায়, চর্মকার বৃত্তির মানুষদের হরিজন পল্লীতে সেবামূলক কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে এই ক্লাব তাদের সামাজিক সচেতনতার পরিচয় দেয় এবং ১৯৪৪ সালের শেষের দিকে এই ক্লাবের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় নৈশ বিদ্যালয়। শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগার ক্লাব প্রথম ১৯৪৮-৪৯ সাল থেকে খেলাধুলার সাথে যুক্ত হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে এই ক্লাব ক্রিকেট খেলা শুরু করলেও পরবর্তীতে ফুটবল, টেবিল টেনিস, ভলিবল ও অ্যাথলেটিক্সের মতো খেলাধুলার সাথে যুক্ত হয়। বর্তমানে এই ক্লাবটি নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক অনুমোদিত 'এ' পর্যায়ের ক্লাব। এই ক্লাব বিগত ৩৭ বছর ধরে জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক অনুমোদিত একটি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা আয়োজন করে আসছে। জেলার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও এই ক্লাব তার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে এবং বর্তমানে শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগারের গ্রন্থাগার জেলার অন্যতম ঐতিহ্যশালী গ্রন্থাগার যেখানে সংরক্ষিত রয়েছে অসংখ্য পুস্তক ও দুষ্প্রাপ্য পত্র-পত্রিকা।[৮৮] কৃষ্ণনগরের অন্যান্য ক্লাব যারা ক্রীড়া ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন তারা হলো- কৃষ্ণনগর তরুণ সংঘ,[৮৯] কৃষ্ণনগর অ্যাথলেটিক্স ক্লাব,[৯০] কৃষ্ণনগর হীরোজ ক্লাব,[৯১] কৃষ্ণনগর স্টারলেটস ক্লাব[৯২] ইত্যাদি।

রানাঘাট শহরে প্রতিষ্ঠিত ক্লাব গুলির মধ্যে সবথেকে প্রাচীনতম ও বর্তমান পর্যন্ত টিকে থাকা ক্লাব হলো রানাঘাট টাউন ক্লাব যা ১৯০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ক্লাব প্রথম থেকেই খেলাধুলাকে কেন্দ্র করে গঠিত হয়েছিল। সেই সময়ের রানাঘাটে বসবাসকারী মুষ্টিমেয় কয়েকটি পরিবার যারা শহরের সংস্কৃতি ও খেলাধুলার ধারক বাহক ছিল সেই সব পরিবারের যুবকেরা কলকাতা থেকে ফুটবল আনিয়ে বর্তমানে রানাঘাটে গীতাঞ্জলি সিনেমা হল যেখানে অবস্থিত সেই মাঠে খেলা শুরু করেন দল গঠন করে এবং পরবর্তীতে তারাই নিজেদের দলের নামকরণ করেন রানাঘাট টাউন ক্লাব। সেই সময় রানাঘাটে শুধুমাত্র খেলাধুলাকে কেন্দ্র করে গঠিত অপর কোনো ক্লাব ছিল না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৯০৫ সালে রানাঘাটে হ্যাপি ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হলেও তারা প্রধানত সংস্কৃতিক জগতে নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখেছিল এবং পরবর্তীতে এই ক্লাব 'রানাঘাট তরুণ ব্যায়াম সমিতি' নামে নিজেদের একটি শাখা সংগঠন গড়ে তুলে খেলাধুলার সাথে যুক্ত হয়। পরবর্তীতে রানাঘাট টাউন ক্লাবের দলের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে আরও বড় খেলার মাঠের প্রয়োজন হয় এবং সেই সময় আনুলীয়া গ্রামের রায় বাবুদের বদান্যতায় রানাঘাট কোর্টের ধারে রাজ বাগান পাড়ার মাঠটিতে ফুটবল খেলার সম্মতি পেয়ে ক্লাবের ছেলেরা নিজেরাই মাঠটি পরিষ্কার করে ফুটবল খেলা শুরু করেন। ১৯১১ সালে টাউন ক্লাবের উদ্যোগে 'রানাঘাট টাউন শীল্ড' নামক ফুটবল প্রতিযোগিতার সূচনা হয়। রানাঘাটে ছোট বাজারের একজন স্বর্ণ শিল্পীর কাছ থেকে টাউন শীল্ড তৈরি করানো হয় এবং রানাঘাটের পালচৌধুরী বংশ তাদের পরিবারের একজনের স্মৃতি রক্ষার্থে একটি কাপ তৈরি করে দিলে, তা রানার্স আপ কাপ হিসেবে ধার্য করা হয়। রানাঘাটের বাইরের বহু দল এই প্রতিযোগিতা অংশ নিতে আসতো। ১৯১২ সালে রানাঘাট টাউন ক্লাবের ফুটবল দল অধুনা বাংলাদেশের খুলনায় ১৯১১ সালের আই.এফ.এ শীল্ড বিজয়ী মোহনবাগান দলের সাথে তিনটি ফুটবল খেলায় অংশ নেয়, যেখানে রানাঘাট টাউন ক্লাব প্রথম দুটি খেলায় ড্র করলেও তৃতীয় খেলায় পরাজিত হয়। এর পরবর্তীতে ক্লাব ক্রিকেট অ্যাথলেটিক্স সহ অন্যান্য খেলাধুলার সাথে যুক্ত হয় এবং সেখানেও যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেয়।[৯৩] রানাঘাটের ওপর এক প্রাচীন ক্লাব যা বর্তমানেও টিকে রয়েছে তা হলো রানাঘাট স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন। রানাঘাটের বেনেবাগানে কয়েকজন স্থানীয় যুবক ১৯২৫ সালে 'দেশবন্ধু ব্যায়ামগার' নামে একটি শরীর চর্চার কেন্দ্র গড়ে তোলে। ক্রমশই এই শরীরচর্চা কেন্দ্রে অংশগ্রহণকারী

ছেলেদের সংখ্যা বাড়তে থাকলে তৎকালীন ইংরেজ সরকার তা ভালোভাবে নেয়নি। এই শরীরচর্চার কেন্দ্র বিপ্লবী সন্ত্রাসমূলক কাজের কেন্দ্রে পরিণত হতে পারে বলে তৎকালীন ইংরেজ সরকারের ধারণা তৈরি হয়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ব্যায়ামগার সদস্যরা উপলব্ধি করতে পারে যে তাদের সংগঠনের উপর ইংরেজ সরকারের নজর পড়েছে তাই তারা বাধ্য হয়ে ব্যায়ামগার শহরের বিশ্বাসপাড়ায় সরিয়ে নিয়ে আসেন, যেখানে বর্তমানেও এই ক্লাবটি অবস্থিত। স্থানান্তর করনের পরে এই সংগঠনের নতুন নামকরণ করা হয় 'রানাঘাট স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন', যেই নামটি বর্তমানেও একই রয়েছে। ১৯৩১ সালে এই ক্লাবের তৎকালীন সম্পাদক অমিয়কুমার ঘোষের প্রচেষ্টায় একটি নতুন ব্যায়ামগার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই ব্যায়ামগারের দ্বারোদ যাটন করতে বিশেষ অতিথি হিসাবে আসেন তৎকালীন কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ও ভারতের অন্যতম জাতীয়তাবাদী নেতা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। পরবর্তীতে এই ক্লাব ফুটবল, ক্রিকেট, অ্যাথলেটিক্স সহ একাধিক খেলাধুলাকে নিজের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করেছে।[৯৪] রানাঘাট শহরের অপর এক প্রাচীন ক্লাব হলো রানাঘাট তরুণ সংঘ ক্লাব যা ১৯৩৭ সালে রানাঘাটের দত্তপাড়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়। মূলত একটি সামাজিক সংগঠন হিসেবে এই ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ক্লাব ১৯৪৮ সালে সমাজ কল্যাণের বিভিন্ন ধারায় নিজেদের নিয়োজিত করার জন্য চারটি বিভাগ চালু করে যেগুলি হলো- সেবা বিভাগ, সংস্কৃতি বিভাগ, নাট্য বিভাগ ও ক্রীড়া বিভাগ। আর এই ক্রীড়া বিভাগ সংক্রান্ত কার্য পরিচালনার জন্য ১৯৫৪ সালে ক্লাব আনুলিয়ায় নিজস্ব জমি কেনে এবং বর্তমানে এই ক্লাব ক্রিকেট, ফুটবল ও অ্যাথলেটিক্স সহ একাধিক খেলাধুলার সাথে যুক্ত।[৯৫] রানাঘাট শহরের অপর উল্লেখযোগ্য ক্রীড়া ক্লাবগুলি হলো- রানাঘাট ভারতী সংঘ ক্লাব (১৯৫৭), রানাঘাট ফ্রেন্ডস ক্লাব (১৯৬৮), রানাঘাট তেরঙ্গী ক্লাব ইত্যাদি।

চাকদহ শহরে ১৯৪১ সালে প্রতিষ্ঠিত নবীন সংঘ ক্লাব জেলার অন্যতম প্রাচীন ও বর্তমান পর্যন্ত টিকে থাকা একটি ক্লাব। চাকদহ শহরের বিশিষ্ট বাসিন্দা মনোরঞ্জন শিকদার ও সত্যেন কুমার বসু প্রমুখদের প্রচেষ্টায় এই ক্লাবটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রধানত ক্রীড়া কর্মকাণ্ডকে সংগঠিত করতে এই ক্লাবটি গড়ে তোলা হয়েছিল। প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই এই ক্লাবটি ক্রিকেট, ফুটবল, অ্যাথলেটিক্স ও ভলিবল সহ বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রেখেছে। নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন

প্রতিযোগিতায় এই ক্লাব একাধিকবার নিজেদের দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে।[৯৬] ২০১৬ ও ২০১৭ সালে পরপর দুই বার এই ক্লাব নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত সাব-জুনিয়র, জুনিয়র ও সিনিয়র ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় চূড়ান্ত জয়লাভ করার মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা অর্জন করে।[৯৭] শান্তিপুর শহরে গড়ে ওঠা প্রাচীনতম ও বর্তমান পর্যন্ত টিকে থাকা অন্যতম ক্লাবগুলি হলো শান্তিপুর স্পোর্টিং ইউনিয়ন (১৯৩৮), সবুজ সংঘ ক্লাব (১৯৪০), ইত্যাদি। প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই শান্তিপুরের এই ক্লাবগুলি প্রধানত ক্রীড়া কর্মকাণ্ডের মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখেছে এবং এই ক্লাবগুলি ক্রিকেট, ফুটবল, ভলিবল ও অ্যাথলেটিক্স সহ বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত।[৯৮] কল্যাণী অঞ্চলে গড়ে ওঠা অন্যতম প্রাচীন ও বর্তমান পর্যন্ত টিকে থাকা ক্লাব হলো কল্যাণী টাউন ক্লাব, যা ১৯৬০ সালে কল্যাণীর বাসিন্দা অলোক ব্যানার্জির ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ক্লাব প্রধানত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাজকর্মের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখলেও প্রতিষ্ঠার সময় থেকে খেলাধুলার সঙ্গেও যুক্ত থেকেছে এই ক্লাব। বিশেষত টেবিল টেনিস খেলাটিকে সংগঠিত করতে বিশেষ অবদান রেখেছে এই ক্লাব।[৯৯]

স্বাধীনতার পরবর্তীতে নদীয়া জেলার গ্রামাঞ্চলে অসংখ্য ক্লাব গড়ে ওঠে, যে ক্লাবগুলি অচিরেই জেলার খেলাধুলার ক্ষেত্রে নিজেদের উজ্জ্বল উপস্থিতি তুলে ধরতে থাকে। গ্রামাঞ্চলের এই সমস্ত ক্লাবগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- নাকাশিপাড়া অঞ্চলের উদয় সংঘ ক্লাব[১০০], বাদকুল্লা অঞ্চলের অজয় সংঘ ক্লাব ও অনামী ক্লাব এবং রানাঘাট শহরের সন্নিকটে অবস্থিত হালালপুর গ্রামাঞ্চলের হালালপুর বিবেকানন্দ সংস্কৃতি সংঘ ক্লাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শহরাঞ্চলের বাইরে গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত ক্লাব হিসেবে প্রথম বাদকুল্লা অঞ্চলের অজয় সংঘ ক্লাব ১৯৮০ সালে নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে চ্যাম্পিয়ন হয়ে এক অনন্য নজির স্থাপন করে।[১০১] তবে গ্রামাঞ্চলের ক্লাব গুলির মধ্যে যে ক্লাবটি জেলার খেলাধুলার ক্ষেত্রে সবথেকে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে সেটি হলো সম্ভবত অনামী ক্লাব। অনামী ক্লাব ২০১২ সালে নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত বার্ষিক অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মাধ্যমে একটানা সাতবার এই প্রতিযোগিতায়

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার অনন্য কৃতিত্ব অর্জন করে, গ্রামাঞ্চলের ক্লাব ও খেলোয়ারদের উন্নত ক্রীড়া পারদর্শিতার এক নজির স্থাপন করে।[১০২] হালালপুর বিবেকানন্দ সংস্কৃত সংঘ ক্লাবটিও নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত বার্ষিক অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় একাধিকবার দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে নিজ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে।[১০৩]

• ৬.৫. পর্যবেক্ষণ:

আলোচ্য সময় পর্বে নদীয়া জেলার একাধিক খেলোয়াড় ক্রিকেট, ফুটবল, ভলিবল ও অ্যাটলেটিক্সে জেলার বাইরে এমনকি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রও নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর তুলে ধরেছেন। ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের এক প্রান্তিক জেলার অধিবাসী হিসেবে তাদের এই ক্রীড়া সাফল্য যথেষ্ট শ্লাঘার বিষয়। জেলায় ক্রীড়া পরিকাঠামোর নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তাদের এই সাফল্যই প্রমাণ করে যে উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা পেলে প্রান্তিক অঞ্চলের খেলোয়াড়রাও নিজেদের ক্রীড়া দক্ষতার পরিচয় তুলে ধরতে পারে বৃহৎ মঞ্চে। জেলায় ক্রীড়া সংক্রান্ত কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও জেলার খেলাধুলার মান উন্নয়ন অনেকাংশেই ক্রীড়া সংগঠকদের ওপরেও নির্ভর করে। নদীয়া জেলার সৌভাগ্য যে এক্ষেত্রে কিছু পরিশ্রমী ও নিষ্ঠাবান ক্রীড়া সংগঠক বিভিন্ন সময়ে জেলার ক্রীড়া সংগঠনের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দান করেছে। এমনকি এই ক্রীড়া সংগঠকেরা জেলার বাইরেও নিজেদের সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় তুলে ধরেছে একাধিকবার। ক্রীড়া পরিচালক হিসাবেও জেলার একাধিক অধিবাসী আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিজেদের অবদান তুলে ধরেছে। জেলায় তৃণমূল স্তরে খেলাধুলা সংক্রান্ত কার্য পরিচালিত হয় যে ক্লাবগুলোর মাধ্যমে সেগুলিও জেলায় খেলাধুলার প্রসার ও উন্নয়নে যথেষ্ট সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। জেলার ক্রীড়া ক্লাব গুলির মধ্যে অনেকগুলি প্রাথমিক পর্যায়ে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেও পরবর্তীতে তারা ক্রীড়া কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং খেলাধুলায় বিশেষ নজির স্থাপন করে। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জেলার শহরাঞ্চলের পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলের ক্লাবগুলিও খেলাধুলায় নিজেদের অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর তুলে ধরতে থাকে। খেলাধুলার পাশাপাশি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ক্লাবগুলি সক্রিয় ভূমিকা পালন করে এসেছে। জেলার খেলাধুলার ইতিহাসে জেলার বিশিষ্ট খেলোয়াড়, ক্রীড়া সংগঠক ও ক্লাব গুলির অবদান যথেষ্টই চিত্তাকর্ষক।

- **টীকা ও সূত্র নির্দেশ:**

১. *নদীয়া ডিস্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা জুন, ১৯৬৯, ২।

২. *নদীয়া ডিস্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা নভেম্বর, ১৯৬৯, ২।

৩. *নদীয়া ডিস্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা জানুয়ারি, ১৯৮১, ৮।

৪. *নদীয়া ডিস্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১৫ই নভেম্বর, ১৯৮১, ১।

৫. *নদীয়া ডিস্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫, ৩।

৬. *নদীয়া ডিস্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা জানুয়ারি, ১৯৮৬, ২।

৭. *নদীয়া ডিস্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১৫ই মার্চ, ১৯৮৭, ২।

৮. *নদীয়া ডিস্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১৫ই নভেম্বর, ১৯৮৮, ১-২।

৯. *নদীয়া ডিস্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা জুন, ১৯৯৪, ৪।

১০. *নদীয়া ডিস্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা জানুয়ারি, ১৯৮২, ২।

১১. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা নভেম্বর, ২০১১, ১।

১২. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা ডিসেম্বর, ২০১৫, 8; Volleyball Federation of India, 24th Mini National Volleyball Championship for Boys and Girls, Kanteerava Stadium, Bangalore (Karnataka)- 14th to 18th October, 2015, Players List- [Boys]- Group "A", West Bengal (WB).

১৩. *নদীয়া ডিস্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা জানুয়ারি ১৯৮৬, ৪।

১৪. *নদীয়া ডিস্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১৫ই নভেম্বর, ১৯৮৮, ১।

১৫. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা, আগস্ট, ১৯৮৮, ১।

১৬. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা জানুয়ারি, ১৯৮৯, ৩।

১৭. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১৫ই এপ্রিল, ২০১৪, ২।

১৮. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা সেপ্টেম্বর, ২০১৪, ৪।

১৯. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১৫ই ডিসেম্বর, ২০১৫, ১।

২০. Suprita Das, *Free Hit: The Story of Women's Cricket in India* (Noida: Harper Sport, 2019), 55-70.

২১. "Jhulan Goswami becomes the leading wicket- taker in Women's ODIs," The *Times of India* (May 9, 2017), https://timesofindia.indiantims.com/sports/cricket/news/jhulan-goswami-becomes-the-leading-wicket-taker-in-womens-odis./articleshow/58594182.cms.

২২. Sahil Bakshi, "Jhulan Goswami bags 250th ODI wicket, becomes first woman cricketer on planet to achieve feat," *Sports Now* (March 16, 2022), https://www.timesnownews.com/sports/cricket/jhulan-goswami-bag-250th-odi-wicket-becomes-first-womens-cricketer-on-planet-to-achieve-feat-article-90252288.

২৩. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৭১, ৩।

২৪. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১, ৫।

২৫. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৭, ২; ১লা এপ্রিল, ১৯৭৮, ১-২; ১লা জানুয়ারি, ১৯৮০, ৭।

২৬. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা এপ্রিল, ১৯৭৮, ১-২; ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯, ৩।

২৭. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৭৬, ৩; ১লা এপ্রিল, ১৯৭৮, ১-২; ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯, ৩; ১লা জানুয়ারি, ১৯৮০, ৭।

২৮. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা জানুয়ারি, ১৯৮০, ৭; ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৮১, ২; ১লা ফেব্রুয়ারি ১৯৮১, ৪।

২৯. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৮১, ২; ১লা ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩, ৩; ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৮৬, ১; ১লা জানুয়ারি, ১৯৮৭, ১; ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৮৭, ১; ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯, ৩।

৩০. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা জানুয়ারি, ১৯৮২, ১-২; ১লা জানুয়ারি, ১৯৮৬, ১-৩; ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৮২, ১-২; ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৮৪, ১; ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৮৬, ১।

৩১. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৮২, ১-২; ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৮৪, ১।

৩২. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৮২, ১-২; ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৮৪, ১।

৩৩. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৮২, ১-২; ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৮৪, ১; ১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৫, ২; ১৫ই, মার্চ, ১৯৮৫, ৩-৪; ১লা জুন, ১৯৮৫, ১-২।

৩৪. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৩, ৩; ১লা জানুয়ারি, ১৯৮৬, ১-৩; ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৮৬, ১।

৩৫. Athletic Federation of India, First Junior National Athletic Championship, Hissar, 10 to 12 January 1986, Results, Girls-18, Event- High Jump.

৩৬. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৫, ২; ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৮৭, ১; ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৯, ৩।

৩৭. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১৫ই মার্চ, ১৯৮৫, ৩-৪; ১লা জুন, ১৯৮৫, ১-২।

৩৮. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৮৬, ১; ১লা জানুয়ারি, ১৯৮৭, ১; ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৮৭, ৩; ১লা মার্চ, ১৯৮৮, ১, ৩।

৩৯. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৮৭, ৩।

৪০. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা জানুয়ারি, ১৯৮৭, ১; ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৮৭, ১, ৩; ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৯, ৩; ১লা মার্চ, ১৯৯০, ৩।

৪১. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা মার্চ, ১৯৮৮, ১, ৩; ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৯, ৩; ১লা মার্চ, ১৯৯০, ৩; ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৯১, ১; ১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২, ১-২।

৪২. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা মার্চ, ১৯৮৮, ১, ৩; ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৯, ৩; ১লা মার্চ, ১৯৯০, ৩।

৪৩. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা মার্চ, ১৯৮৮, ১, ৩; ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৯, ৩; ১লা মার্চ, ১৯৯০, ৩।

৪৪. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা মার্চ, ১৯৮৮, ১, ৩; ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৯, ৩।

৪৫. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৯১, ১, ৩।

৪৬. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২, ১-২।

৪৭. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২, ২; ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৯৩, ১-২; ১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৩, ১; Athletic Federation of India, 8 Junior Inter State Athletics Championships, Tamil Nadu, 10-13 February, 1993, Boys-17, Event: Javelin Throw; ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৯৪, ১-২; ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৪, ৪; ১লা জানুয়ারি, ১৯৯৫, ৪; ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৯৫, ১, ৩।

৪৮. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২, ২; ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৯৩, ১-২; ১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৩, ১; Athletic Federation of India, 8 Junior Inter State Athletics Championships, Tamil Nadu, 10-13 February, 1993, Girls-20, Event: 100M.

৪৯. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২, ২; ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৯৩, ১-২; ১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৩, ১; Athletic Federation of India, 8 Junior Inter State Athletics Championships, Tamil Nadu, 10-13 February, 1993, Girls-17, Event: 100 M; Athletic Federation of India, 8 Junior Inter State Athletics Championships, Tamil Nadu, 10-13 February, 1993, Girls-14, Event: Long Jump.

৫০. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৯৩, ১-২; ১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৩, ১; ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৯৪, ১-২।

৫১. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৯৪, ১-২; ১লা আগস্ট, ১৯৯৪, ৪; ১লা জানুয়ারি, ১৯৯৫, ৪; ১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৫, ৩; ১লা মার্চ, ১৯৯৫, ৪; Athletic Federation of India, VI ITC Inter Zonal Athletics Championships, 21 to 22 August, 1994, High Jump, JR. Boys Final; Athletic Federation of India, 10 National Inter Zonal Junior Athletic Championship, 10-13 November, 1998, L.B Stadium, Hyderbad, High Jump, Boys Final.

৫২. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা জানুয়ারি, ১৯৯৫, ৪; ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৯৫, ১; ১লা মার্চ, ১৯৯৫, ৪; Athletic Federation of India, 10 Junior Inter State Athletics Championships, Madhya Pradesh (Bhopal), 3-6 February, 1995, 100 M Run U-14, Girls Final, Long Jump U-14, Girls Final.

৫৩. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৯৪, ১-২; ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৯৫, ১; ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৯৬, ১, ৬; ১লা এপ্রিল, ১৯৯৭, ১, ৩; ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৯৯, ১, ৩।

৫৪. *নদীয়া ডিস্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৯৪, ১-২; ১লা আগস্ট, ১৯৯৪, ৪; ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৯৫, ১।

৫৫. *নদীয়া ডিস্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৯৫, ১; ১লা এপ্রিল, ১৯৯৭, ১, ৩; ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৯৯, ১, ৩।

৫৬. *নদীয়া ডিস্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৯৫, ১; ১লা এপ্রিল, ১৯৯৭, ১, ৩; ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৯৯, ১, ৩; Athletic Federation of India, 13 Junior National Athletic Championship, Kerala, 1998, Boys-18, Event- Javelin Throw; Athletic Federation of India, 13 Junior National Athletic Championship, Kerala, 1998, Girls-16, Event- Javelin Throw; Athletic Federation of India, 14 Junior Inter State Athletic Championship, Cuttack, 9-11 January, 1999, Girls-16, Event- Javelin Throw.

৫৭. *নদীয়া ডিস্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা এপ্রিল, ১৯৯৭, ১, ৩; ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৯৯, ১, ৩।

৫৮. *নদীয়া ডিস্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৯৯, ১, ৩; ১লা জানুয়ারি, ২০০০, ১, ২; ১লা জুন, ২০০১, ২; ১লা আগস্ট, ২০০২, ২।

৫৯. "West Bengal CM Jyoti Basu crowns Jytirmoyee Sikdar for dazzling run at Bangkok Asiad," *Indian Today*, 11th January, 1999; Rohit Brijnath, "Asian Games: Some individuals sparkle while other Indians fail." *India Today* (December 28, 1998), https://www.indiatoday.in/magazine/sport/story/19981228-asian-games-some-individuals-sparkle-while-other-indians-fail-827730-1998-12-27; *নদীয়া ডিস্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৯৯, ১।

৬০. "Khel Ratna For Jyotirmoyee," *The Telegraph*, 8th August, 1999; "Jyotirmoyee Sikdar presented with prestigious Rajiv Gandhi Khel Ratan Award," *India Today* (February 1, 2013), https://www.indiatoday.in/magazine/signposts/story/19990913-jyotimoyee-sikdar-presented-with-prestigious-rajiv-gandhi-khel-ratna-award-824221-1990-09-12.(Updated-February 1,2013).

৬১. Sudesh Banerjee, "Nadia Village to Olympic track," *The Telegraph*, 19.08.2016.

৬২. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা জানুয়ারি, ২০০০, ১, ২; ১৫ই জুন, ২০০২, ৪; ১লা আগস্ট, ২০০২, ২; *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা জুলাই, ২০০৩, ১, ৩; ১লা ডিসেম্বর, ২০০৩, ১; ১লা জুন, ২০০৪, ১; ১৫ই জুলাই, ২০০৪, ৪; Athletic Federation of India, 44th National Inter State Athletics Championship 2004, Jawaharlal Nehru Stadium, Chennai, 18-20 July 2004, Organised by: Tamilnadu Athletics Association, Men Final Results, 400 M Final, 19-07-2004.

৬৩. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১৫ই জুন, ২০০২, ৪; ১লা আগস্ট, ২০০২, ২; *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা জুলাই, ২০০৩, ১, ৩; ১লা ডিসেম্বর, ২০০৩, ১; ১লা জুন, ২০০৪, ১; ১৫ই জুলাই, ২০০৪, ১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০০৬, ১, ২; Athletic Federation of India, 1st National Inter District Athletic Championship 2003, Haridwar, November 15-18, 2003, Final Results, Girls Under 14 Years.

৬৪. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১৫ই জুন, ২০০২, ৪; *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা জুলাই, ২০০৩, ১, ৩; ১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০০৩, ১; ১৫ই অক্টোবর, ২০০৩, ১; Athletic Federation of India, 3rd National Junior Federation Cup Athletic Championships, October 4-5, 2003, Jawaharlal Nehru Stadium, Chennai, Results, Junior Women, 100m, 200m.

৬৫. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা জুন, ২০০৪, ১; ১লা অক্টোবর, ২০০৭, ৫; ১৫ই আগস্ট, ২০০৮, ১।

৬৬. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০০৬, ১-২; ১লা নভেম্বর, ২০০৬, ১, ১লা অক্টোবর, ২০০৭, ১-৫।

৬৭. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১৫ই আগষ্ট, ২০০৮, ১; ১৫ই আগষ্ট, ২০০৯, ১, 8; ১লা আগষ্ট ২০১০, ১, ২; ১লা সেপ্টেম্বর, ২০১০, ২; Athletic Federation of India, 18th National Interzone Athletics Championships 2006, October 11-13, 2006, Final Results, Event#37, Girls 20- 200 Run.

৬৮. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১৫ই আগষ্ট, ২০০৮, ১; ১৫ই আগষ্ট, ২০০৯, ১, 8; ১লা আগষ্ট ২০১০, ১, ২; ১লা সেপ্টেম্বর, ২০১০, ২।

৬৯. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা আগষ্ট ২০১০, ১, ২; ১লা সেপ্টেম্বর, ২০১০, ২।

৭০. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা আগষ্ট ২০১০, ১, ২; ১লা জুলাই, ২০১২, ১, ২; ১লা আগষ্ট, ২০১২, ১; ১৫ই অক্টোবর, ২০১২, ১।

৭১. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা আগষ্ট ২০১০, ১, ২; ১লা জুলাই, ২০১২, ১, ২; ১লা আগষ্ট, ২০১২, ১; ১৫ই অক্টোবর, ২০১২, ১; Athletic Federation of India, 24th National Inter Zonal Athletics Championship-2012, Organised by: Maharashtra Athletics Association, Venue:- Balewadi Sports Complex, Pune, 22nd and 24th September, 2012, Final Results, Event# 7, Boys 20 & UN 10000m.

৭২. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা জুলাই, ২০১২, ১, ২; ১লা আগষ্ট, ২০১২, ১; ১৫ই অক্টোবর, ২০১২, ১; ১লা আগষ্ট ২০১৩, ১, ২; ১লা সেপ্টেম্বর, ২০১৩, ১।

৭৩. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা জুলাই, ২০১২, ১, ২; ১লা আগষ্ট, ২০১২, ১; ১৫ই অক্টোবর, ২০১২, ১; ১লা আগষ্ট ২০১৩, ১, ২; ১লা সেপ্টেম্বর, ২০১৩, ১; ১৫ই অক্টোবর, ২০১৪, ১;।

৭৪. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০০৬, ১; ১লা নভেম্বর, ২০০৬, ১; Athletic Federation of India, 18th National Interzone Athletics Championships 2006, October 11-13, 2006, Final Results, Events# 4, Girls 16- 100 Run, Events# 5, Girls 16- 400 Run; Athletic Federation of India, 22nd National Junior Athletics Championship 2006, November 25-29, Kanteerava Stadium- Bangalore, Final Results, Event# 4, Girls 16- 100 Run, Events# 5, Girls 16- 400 Run.

৭৫. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১৫ই জুন, ২০০৭, ২; ১লা অক্টোবর, ২০০৭, ১-৫; ১৫ই জানুয়ারি, ২০০৯, ৩; ১৫ই আগষ্ট, ২০০৯, ১।

৭৬. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা সেপ্টেম্বর, ২০১৫, ১; "Nadia to lunch beside Nadal," *The Telegraph*, 6th August, 2016; "নাটকীয় ভাবে অলিম্পিক্সে সুযোগ পেয়ে নতুন জুতোর খোঁজে দেবশ্রী," *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ১৭ই জুলাই, ২০১৬, https://www.anandabazar.com/sports/debashree-majumdar-qualified-for-rio-olympics-1.436619.

৭৭. সুস্মিত হালদার, "ভুবনেশ্বরে সোনা দেবশ্রীর: প্রমাণ করব, জেদ মেয়ের।", *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ১২ই জুলাই, ২০১৭, https://www.anandabazar.com/sports/women-athlete-debashree-majumdar-brings-gold-medal-at-home-1.641161.

৭৮. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা আগষ্ট ২০১০, ১, ২; ১লা সেপ্টেম্বর, ২০১০, ২; ১লা আগষ্ট, ২০১১, ১, ৬; ১লা নভেম্বর, ২০১১, ১; ১লা জুলাই, ২০১২, ১, ২; ১লা আগষ্ট, ২০১২, ১; ১৫ই অক্টোবর, ২০১২, ১; ১লা আগষ্ট ২০১৩, ১, ২; ১লা সেপ্টেম্বর, ২০১৩, ১; ১লা নভেম্বর, ২০১৩, ১; Athletic Federation of India, 24th National Inter Zonal Athletics Championship-2012, Organised by: Maharashtra Athletics Association, Venue:- Balewadi Sports Complex, Pune, 22nd and 24th September, 2012, Final Results, Event# 27, Boys 18, UN 1500m.

৭৯. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা আগষ্ট ২০১০, ১, ২; ১লা সেপ্টেম্বর, ২০১০, ২; ১লা আগষ্ট, ২০১১, ১, ৬; ১লা নভেম্বর, ২০১১, ১; ১লা জুলাই, ২০১২, ১, ২; ১লা আগষ্ট, ২০১২, ১; ১৫ই অক্টোবর, ২০১২, ১।

৮০. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা আগষ্ট ২০১০, ১, ২; ১লা সেপ্টেম্বর, ২০১০, ২; ১লা আগষ্ট, ২০১১, ১, ৬; ১লা নভেম্বর, ২০১১, ১; ১লা জুলাই, ২০১২, ১, ২; ১লা আগষ্ট, ২০১২, ১; ১৫ই অক্টোবর, ২০১২, ১; ১লা আগষ্ট ২০১৩, ১, ২; ১লা সেপ্টেম্বর, ২০১৩, ১; ১লা নভেম্বর, ২০১৩, ১; Athletic Federation of India, 9th National Inter District Athletics Championship-2011, 16th to 18th October 2011, Birsa Munda Sports Complex, Ranchi, Final Results, Event# 17, Girls 14 & UN 60m, Event# 21, Girls 14 & UN Long Jump; Athletic Federation of India, 24th National Inter Zonal Athletics Championship-2012, Organised by: Maharashtra Athletics Association, Venue:- Balewadi Sports Complex, Pune, 22nd and 24th September, 2012, Final Results, Event# 144, Girls 16 & UN Long Jump; Athletic Federation of India, 25th National Interzone Junior Athletic Championship-2013, Kochi, Kerala, 22nd to 24th September 2013, Final Results, Event# 106, Girls 16 & UN 100m, Event# 113 Girls 16 & UN Long Jump.

৮১. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০১৪, ১, ২; ১৫ই অক্টোবর, ২০১৪, ১; ১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০১৫, ১; ১৫ই জুলাই, ২০১৬, ১, ২; ১৫ই জুলাই, ২০১৭, ১, ২; Athletic Federation of India, 13th National Inter District Athletics Championships-2015, Visakhapatnam, Andhra Pradesh, 05th to 7th September 2015, Final Results, Event# 23, Girls 16 & UN 400m.

৮২. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ২৫শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৬, ১; ১লা মার্চ, ১৯৮৬, ১, ৪; ১৫ই মার্চ, ১৯৮৬, ১; নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ, ১লা নভেম্বর, ২০১০, ১, ২।

৮৩. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৮২, ১; ১লা ডিসেম্বর, ১৯৮৯, ১; ১লা এপ্রিল, ১৯৯৫, ৩; ১৫ই জুন, ১৯৯৮, ৪।

৮৪. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা মার্চ, ১৯৮৭, ১; ১লা মার্চ, ১৯৮৮, ১; ১৫ই এপ্রিল, ১৯৮৯, ৭; ১৫ই এপ্রিল, ১৯৯০, ৪; ১৫ই জুলাই, ১৯৯১, ১; ১৫ই মার্চ, ১৯৯২, ২; ১৫ই মে, ১৯৯২, ২; ১লা জুলাই, ১৯৯২, ৪; ১লা মে, ১৯৯৩, ১; ১লা আগষ্ট, ১৯৯৩, ১; ১লা আগষ্ট, ১৯৯৪, ১; ১৫ই আগষ্ট, ১৯৯৫, ২।

৮৫. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা মে, ১৯৮৭, ১, ৩; ১লা মার্চ, ১৯৮৯, ৪; ১লা মার্চ, ১৯৯১, ১, ৩; *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১৫ই জুন ও ১লা জুলাই, ২০১১, ১; ১লা নভেম্বর, ২০১১, ১; ১লা আগষ্ট, ২০১২, ১।

৮৬. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৯১, ৪; ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯, ২; ১৫ই এপ্রিল, ২০০০, ৪।

৮৭. নীহার রঞ্জন বসু, “কৃষ্ণনগরে খেলাধুলা,” *নদীয়া ডিস্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা আগস্ট, ১৯৭৪, ৩।

৮৮. শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগার ক্লাবের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত প্রচার পত্রিকা; শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগার ক্লাবের ৮০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত প্রচার পত্রিকা।

৮৯. কৃষ্ণনগর তরুণ সংঘ ক্লাব নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত বার্ষিক অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় ১৯৮৪, ১৯৮৫, ১৯৮৬ ও ১৯৮৮ সালে প্রথম স্থান অধিকার করে শ্রেষ্ঠ ক্লাবের শিরোপা অর্জন করে- কৃষ্ণনগর তরুণ সংঘ ক্লাব কর্তৃপক্ষের সাক্ষাৎকার, ১৪ই অক্টোবর, ২০২৩।

৯০. কৃষ্ণনগর অ্যাথলেটিক্স ক্লাব নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত বার্ষিক অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় ১৯৭৮, ১৯৮০, ১৯৮১, ১৯৮২, ১৯৮৩ সালে প্রথম স্থান অধিকার করে শ্রেষ্ঠ ক্লাবের শিরোপা অর্জন করে- কৃষ্ণনগর অ্যাথলেটিক্স ক্লাব কর্তৃপক্ষের সাক্ষাৎকার, ২০শে অক্টোবর, ২০২৩।

৯১. কৃষ্ণনগর হীরোজ ক্লাব নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত বার্ষিক অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় ১৯৯৫ ও ১৯৯৬ সালে প্রথম স্থান অধিকার করে শ্রেষ্ঠ ক্লাবের শিরোপা অর্জন করে- কৃষ্ণনগর হীরোজ ক্লাব কর্তৃপক্ষের সাক্ষাৎকার, ১৬ই অক্টোবর, ২০২৩।

৯২. কৃষ্ণনগর স্টারলেটস ক্লাব নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত বার্ষিক অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় ২০০5 সালে প্রথম স্থান অধিকার করে শ্রেষ্ঠ ক্লাবের শিরোপা অর্জন করে।

৯৩. রানাঘাট টাউন ক্লাবের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণিকা।

৯৪. রানাঘাট স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন ক্লাবের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণিকা।

৯৫. রানাঘাটের তরুণ সংঘ ক্লাব কর্তৃপক্ষের সাক্ষাৎকার, ২৯শে জানুয়ারি, ২০২৪।

৯৬. চাকদহ নবীন সংঘ ক্লাবের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণিকা।

৯৭. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১৫ই জুন, ২০১৭, ১।

৯৮. শান্তিপুর স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাব কর্তৃপক্ষের সাক্ষাৎকার, ২৪শে জানুয়ারি, ২০২৪; সবুজ সংঘ ক্লাব কর্তৃপক্ষের সাক্ষাৎকার, ২৪শে জানুয়ারি, ২০২৪।

৯৯. কল্যাণী টাউন ক্লাব কর্তৃপক্ষের সাক্ষাৎকার, ১১ই জুলাই, ২০২৩।

১০০. নাকাশীপাড়া অঞ্চলের উদয় সংঘ ক্লাব, এই অঞ্চলের প্রথম ক্লাব হিসেবে ১৯৯১ সালে নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত বার্ষিক অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে শ্রেষ্ঠ ক্লাবের শিরোপা অর্জন করে- নদীয়া ডিস্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ, ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৯১, ১।

১০১. *নদীয়া ডিস্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা জানুয়ারী, ১৯৮০, ৭।

১০২. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১৫ই ফেব্রুয়ারি ২০১২, ১।

১০৩. হালালপুর বিবেকানন্দ সংস্কৃত সংঘ ক্লাব কর্তৃপক্ষের সাক্ষাৎকার, ৮ই অক্টোবর, ২০২৩।

সপ্তম অধ্যায়:

জেলায় খেলার আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট ও আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে খেলা

ইতিহাসের প্রধান বিষয়বস্তু হলো সঙ্ঘবদ্ধ মানুষের অতীত কর্মকান্ড। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ মানুষের সামাজিক জীবনেও দেখা দেয় নানা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন। আর খেলাধুলাও যেহেতু সঙ্ঘবদ্ধ মানুষের সামাজিক জীবনেরই এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ তাই সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে খেলাধুলার ক্ষেত্রেও দেখা দেয় নানা ধরনের পরিবর্তন। এই গবেষণা সন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে খেলাধুলা ও সমাজের মধ্যে যে গভীর যোগসূত্র বর্তমান সে বিষয়ে সূক্ষ আলোচনা করা হয়েছে যেখানে আর্থসামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে খেলাধুলার যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক তা বর্ণনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে নদীয়া জেলাও কোনো ব্যতিক্রমী নয়, জেলার সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক পরিবেশ খেলাধুলা গুলিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে যার ফলে খেলাধুলার মধ্যে লক্ষ করা যায় জেলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রতিফলন। জেলার আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে নানা পরিবর্তন যার ফলে খেলাধুলাতে দেখা গেছে নানা ধরনের পরিবর্তন। আলোচ্য সময় পর্বে জেলার আর্থসামাজিক পরিবেশের যে প্রতিফলন খেলাধুলার ইতিহাসের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় তারই বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে বর্তমান অধ্যায়ে। আর্থসামাজিক পরিবর্তনের সাথে সঙ্গতি রেখে বিভিন্ন সময় পর্বে বিভিন্ন খেলার জনপ্রিয়তার তারতম্য ঘটেছে। এর ফলে একটি খেলা যেমন একদিকে গুণগত ও পরিমাণগত দিক থেকে হ্রাস পেয়েছে তেমনি অন্য দিকে অন্য এক খেলা গুনগত ও পরিমাণগত দিক থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জেলায় খেলাধুলার অঞ্চলগত প্রসারণ লক্ষ করা যায়। শহরকেন্দ্রিকতা ছাড়িয়ে খেলাধুলা গুলি জেলার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও ক্রমশ প্রসারিত হতে থাকে। জেলায় অ্যাথলেটিক্স ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে এবং জেলার সফল খেলোয়ারদের অধিকাংশ অ্যাথলেটিক্সেই নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর তুলে ধরেছেন বৃহত্তর পরিসরে। অ্যাথলেটিক্স- এর মধ্যেও নারী অ্যাথলিটদের সাফল্য অত্যন্ত উজ্জ্বল ও নজরকারা। জেলার খেলাধুলা বিশেষত ক্রীড়া সংগঠনের ক্ষেত্রে লিঙ্গগত ও সম্প্রদায়গত প্রতিনিধিত্বের অসামঞ্জস্যতা স্পষ্টতই বিদ্যমান। আর্থসামাজিক সচলতার মাধ্যম হিসেবেও খেলাধুলার ভূমিকা লক্ষ করা যায়। আর এই অধ্যায়ে জেলার খেলাধুলার বিবর্তন, অঞ্চলগত সম্প্রসারণ, অ্যাথলেটিক্স খেলার প্রাধান্য, বিশেষত নারী অ্যাথলিটদের সাফল্য, খেলাধুলা ও ক্রীড়া সংগঠনের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব গত অসামঞ্জস্য এবং আর্থসামাজিক সচলতার মাধ্যম হিসেবে খেলাধুলার ভূমিকার মতো

বিষয়গুলিকে তুলে ধরা হয়েছে। আর এই সামগ্রিক আলোচনার মাধ্যমেই প্রকাশ পাবে জেলায় খেলার আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট ও আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে খেলা।

• ৭.২. খেলাধুলার বিবর্তন:

সমাজ পরিবর্তনশীল আর এই পরিবর্তনশীল সমাজের সাথে সঙ্গতি রেখে সমাজে প্রচলিত খেলাধুলার মধ্যেও দেখা যায় নানা ধরনের পরিবর্তন। কোন সময় পর্বে কোন একটি খেলা বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং অধিক সংখ্যক খেলোয়াড় সেই খেলাধুলার সাথে যুক্ত হতে থাকে। কিন্তু সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই জনপ্রিয় খেলা ক্রমশ তার জনপ্রিয়তা হারায় এবং অন্য কোনো খেলা তার স্থান দখল করে। বৃহত্তর ভারতীয় সমাজের ক্ষেত্রেও আমরা খেলাধুলার জনপ্রিয়তার এই পরিবর্তনের ধারা লক্ষ করতে পারি। ঔপনিবেশিক শাসনকালে ভারতে প্রচলিত পাশ্চাত্য খেলাধুলা গুলির মধ্যে ক্রিকেটের তুলনায় হকি ও ফুটবলের জনপ্রিয়তা ছিল বেশি এবং এই জনপ্রিয়তা ১৯৮০ সাল পর্যন্ত বজায় ছিল। ১৯৮০ সালের আগে পর্যন্ত ক্রিকেটের তুলনায় হকি ও ফুটবলে ভারতের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সফলতাও ছিল অনেক বেশি। কিন্তু ১৯৭০ সালের পর থেকে যখন হকি ও ফুটবলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সফলতা ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। ১৯৮০- এর দশক থেকে ভারতে টেলিভিশনের প্রসার ঘটে এবং টেলিভিশনের প্রসার ও ক্রিকেটের উত্থান একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ট ভাবে সম্পর্কিত।[১] ভারতের তৈরি টিভি সেটের সংখ্যা ১৯৮৬ সালে ছিল ৩০ লক্ষ এবং ১৯৯২ সালে তা ৩৪০ লক্ষ তে পৌঁছে যায়।[২] ঠিক এই সময়ে যখন টেলিভিশনে বিভিন্ন খেলাধুলার সম্প্রচার শুরু হয় তখন হকিতে ভারতীয় দলের একের পর এক ব্যর্থতা এবং এর বিপরীতে ভারতীয় ক্রিকেট দলের ১৯৮৩ সালের বিশ্বকাপ জয় সহ একাধিক সফলতা, ক্রিকেট খেলার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করার পাশাপাশি হকি খেলার জনপ্রিয়তার হ্রাস ঘটায়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে হকিতে ১৯৭৫ সালে অ্যাস্ট্রোটাফের প্রচলন ফিল্ড হকিতে অভ্যস্ত ভারতীয় দলের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল হকি প্রশাসনের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব।[৩] নদীয়া জেলাতে ঔপনিবেশিক আমল থেকেই হকি খেলার প্রচলন ছিল তবে এই খেলা কখনওই কৃষ্ণনগর শহরের বাইরে সমগ্র জেলায় প্রসার লাভ করতে

না পারলেও ১৯৮০- এর দশক পর্যন্ত এই খেলা যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল এবং নদীয়ার খেলোয়াড়রা জাতীয় স্তরেও হকিতে নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছিল। এর পরবর্তীতে জেলায় হকি খেলার জনপ্রিয়তার হ্রাস পায় এবং এর পরবর্তীতে নদীয়া জেলার কোনো খেলোয়াড় হকিতে বিশেষ কোনো প্রতিভার স্বাক্ষর তুলে ধরতে পারেনি জেলার বাইরে।[৪] ১৯৮০ সালের আগে পর্যন্ত নদীয়া জেলা দলও হকি খেলায় যথেষ্ট প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিল। ১৯৬৯ সালে নদীয়া জেলা দল বেটন কাপে প্রথম অংশগ্রহণ করে যেখানে তাদের খেলাও যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করে এবং ওই একই বছরে রাজ্যের আন্তঃজেলা হকি প্রতিযোগিতায় নদীয়া জেলা দল সেমিফাইনালে পরাজিত হয়।[৫] এই সময় থেকে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে হকি খেলার জনপ্রিয়তা হ্রাস পেতে থাকে যার উদাহরণ হিসেবে আমরা ১৯৭০ সালের রাজ্যের আন্তঃজেলা হকি প্রতিযোগিতার কথা উল্লেখ করতে পারি যেখানে অংশগ্রহণকারী জেলার সংখ্যা কম হওয়ায় মাএ ছয়টি অংশগ্রহণকারী জেলা দল নিয়ে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।[৬] রাজ্যের আন্তঃজেলা হকি প্রতিযোগিতায় নদীয়া জেলা দল ১৯৭২, ১৯৭৩ ও ১৯৭৪ সালে সেমিফাইনালে উঠে পরাজিত হয় এবং ১৯৭৬ সালে চুঁচুড়াতে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় সেমিফাইনালের গণ্ডি অতিক্রম করে হাওড়া জেলার সঙ্গে যুগ্ম বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে।[৭] নদীয়া জেলা হকি দল পুনরায় ১৯৮২ সালে রাজ্যের আন্তঃজেলা হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে উঠে পরাজিত হয় কিন্তু এর পরবর্তীতে জেলা হকি দলের খেলায় যথেষ্ট অবনমন ঘটে এবং এর পরবর্তীতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নদীয়া জেলা হকি দল রাজ্যের আন্তঃজেলা হকি প্রতিযোগিতার প্রথম রাউন্ড থেকেই বিদায় নিয়েছে।[৮] নদীয়া জেলায় এই হকি খেলার জনপ্রিয়তা ও সফলতা হ্রাসের অন্যতম কারণ হলো এস্টোট্রাফের প্রচলন। ১৯৭০- এর দশক থেকে আন্তর্জাতিক হকিতে এস্টোট্রাফের প্রচলন ঘটলে, আন্তর্জাতিক স্তরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ভারতের অভ্যন্তরীণ জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা গুলিতেও এস্টোট্রাফের প্রচলন আবশ্যিক হয়ে ওঠে। যার ফলস্বরূপ ভারতের অভ্যন্তরেও বিভিন্ন অঞ্চলে এস্টোট্রাফ গড়ে উঠতে থাকে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে কৃষ্ণনগরে হকি খেলা প্রচলিত থাকলেও এবং এই খেলায় খেলোয়াড়রা জাতীয় স্তরে নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখলেও জেলায় কোনো এস্টোট্রাফ গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি ফলে জেলার খেলোয়াড়রা ফিল্ড হকিতেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়। জেলার

হকি খেলোয়াড়েরা প্রধানত ফিল্ড হকিতে অভ্যস্ত হওয়ায় তারা যখন পরবর্তীতে জেলা স্তর অতিক্রম করে এস্টোট্রাফে হকি খেলে তখন স্বাভাবিকভাবেই তারা পিছিয়ে পড়ে দক্ষতায়। এছাড়াও হকি খেলা নদীয়া জেলায় প্রচলিত থাকলেও তা মূলত কৃষ্ণনগরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, এমনকি এই খেলাকে কেন্দ্র করে জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় একটি হকি লীগ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলেও সেখানে কৃষ্ণনগরের বিভিন্ন ক্লাবগুলোই অংশগ্রহণ করে জেলার অন্য অঞ্চলের ক্লাবগুলি কখনওই এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে কোনো উৎসাহ দেখায়নি। এইসবেরই চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে হকি খেলা ক্রমশ জেলা থেকে অবলুপ্ত হতে থাকে।

হকির মতো ফুটবলও ১৯৮০- এর দশকের আগে পর্যন্ত জেলায় ব্যাপকভাবে প্রচলিত থাকলেও পরবর্তীতে তা ক্রমশ গুরুত্ব হারায় তবে তা হকির মতো কোনো একটি শহরে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়নি তবে তার গুরুত্ব স্পষ্টতই হ্রাস পায়। অবশ্য বৃহত্তর ভারতে ঔপনিবেশিক সময়কালে ও স্বাধীনতা পরবর্তী সময়কালে ১৯৭০- এর দশক পর্যন্ত ফুটবল ক্রিকেটের তুলনায় অধিক জনপ্রিয় ছিল, কারণ ফুটবল খেলা ছিল অপেক্ষাকৃত সস্তা যার ফলে তা মফস্বলেও ছড়িয়ে পড়েছিল।[৯] কিন্তু ১৯৭০- এর পর থেকে দেশ ও ক্লাবের স্বার্থের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব এবং পেশাদারিত্ব ও বাণিজ্যিকতার গুরুত্ব বুঝতে এ.আই.এফ.এফ- এর ব্যর্থতা ফুটবলের পতনের জন্য দায়ী।[১০] নদীয়া জেলায় প্রথম থেকেই ফুটবল খেলা অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল এবং এই খেলাকে কেন্দ্র করেই প্রথম জেলায় বিভিন্ন ক্লাবের মধ্যে লীগ স্তরের প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। ফুটবল খেলা জেলায় এতটাই জনপ্রিয় ছিল যে বিভিন্ন অঞ্চলে ডিভিশন ভিত্তিক লীগ প্রতিযোগিতার সূচনা হয়, যেখানে একাধিক অঞ্চলে তিনটি ডিভিশন ভিত্তিক ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতা প্রচলিত থাকতেও দেখা যায়। বিভিন্ন বয়স ভিত্তিক নদীয়া জেলা ফুটবল দলের সাফল্য আন্তঃজেলা ফুটবল প্রতিযোগিতায় যথেষ্ট উজ্জ্বল। নদীয়া জেলা ফুটবল দল জুনিয়র ও সিনিয়র উভয় বিভাগে ১৯৮০ সালে রাজ্যের আন্তঃজেলা ফুটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করে।[১১] ১৯৮২ সালে রাজ্যের আন্তঃজেলা ফুটবল প্রতিযোগিতায় নদীয়া জেলা দল সাব-জুনিয়র বিভাগে রানার্স ও জুনিয়ার বিভাগে সেমিফাইনালে পরাজিত হয়।[১২] নদীয়া জেলা ফুটবল দল ১৯৮৬ সালে রাজ্যের আন্তঃজেলা ফুটবল

প্রতিযোগিতায় জুনিয়র বিভাগে চ্যাম্পিয়ন এবং সিনিয়র বিভাগে রানার্সআপ হয়।[১৩] এর পরবর্তীতে রাজ্যের আন্তঃজেলা ফুটবল প্রতিযোগিতায় নদীয়া জেলা ফুটবল দলের সফলতার হারে উল্লেখযোগ্য হ্রাস ঘটে। রাজ্যের অন্তঃজেলা সাব-জুনিয়র ফুটবল প্রতিযোগিতায় নদীয়া জেলা ফুটবল দল দীর্ঘ ১৯ বছর পরে ২০০৬ সালে এবং সিনিয়র বিভাগে দীর্ঘ ৩৪ বছর পরে ২০১৭ সালে পুনরায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করে।[১৪] এই সময় পর্বে নদীয়া জেলায় ফুটবলের জনপ্রিয়তারও হ্রাস ঘটে। ফুটবলের এই জনপ্রিয়তার হ্রাসের ক্ষেত্রে আমরা প্রধানত চারটি কারণ কে চিহ্নিত করতে পারি। প্রথমত আই.এফ.এ শিল্ড প্রতিযোগিতার বিভিন্ন খেলা ১৯৮৪ সালের আগে পর্যন্ত জেলায় অনুষ্ঠিত হতে থাকে যার ফলে জেলায় ফুটবলের প্রতি একটি আগ্রহ বৃদ্ধি পায় কিন্তু ১৯৮৪ সালের পরে কেন্দ্রীয়ভাবে আই.এফ.এ শিল্ডের খেলা গুলি কলকাতায় অনুষ্ঠিত হতে থাকে যার ফলে জেলায় ফুটবলের জনপ্রিয়তার হ্রাস পায়। দ্বিতীয়ত ১৯৯১ সালের আগে পর্যন্ত কলকাতার প্রথম সারির ফুটবল ক্লাবগুলি নিয়মিত জেলায় বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহণ করত যেগুলিকে কেন্দ্র করে জেলার ব্যাপক উন্মাদনার সৃষ্টি হত কিন্তু ১৯৯১ সালের পর থেকে জেলায় খেলার ক্ষেত্রে এই ক্লাবগুলোর অনীহা বৃদ্ধি পায় যার ফলে জেলায় ক্রমশ এই খেলার জনপ্রিয়তার হ্রাস ঘটে। তৃতীয় কারণ হিসাবে আমরা রাজ্যের আন্তঃজেলা ফুটবল প্রতিযোগিতায় নদীয়া জেলা দলের একের পর এক ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করতে পারি যার ফলে এই খেলার জনপ্রিয়তার হ্রাস ঘটে। চতুর্থ কারণটি হলো জেলায় ক্রমবর্ধমান ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা। জেলায় ফুটবল খেলার জনপ্রিয়তা ১৯৮০- এর দশকের পর থেকে হ্রাস পেলও তা হকির মতো কোনো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়নি বা অবলুপ্ত হয়ে যায়নি। জেলায় ফুটবলের জনপ্রিয়তা হ্রাস পেলেও তা যে সুগভীর ছিল না তার প্রমাণ পাই আমরা জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন বয়স ভিত্তিক ফুটবল লীগে অংশগ্রহণকারী ক্লাবের পরিসংখ্যানে। জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন বয়স ভিত্তিক ফুটবল লীগে অংশগ্রহণকারী ক্লাবের সংখ্যা সমগ্র গবেষণা কার্যের সময় পর্বে চার শতাধিক থেকে পাঁচ শতাধিক এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছে।[১৫] এই অংশগ্রহণকারী ক্লাবের সংখ্যায় যেমন উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটেনি তেমনি উল্লেখযোগ্য হ্রাসও ঘটেনি। জনপ্রিয়তা হ্রাস সত্ত্বেও জেলায় ফুটবল খেলার এই বিপুলভাবে টিকে থাকার পশ্চাদে দুটি কারণ কে আমরা

লক্ষ করতে পারি। প্রথম কারণ হিসেবে আমরা বলতে পারি যে ফুটবল খেলায় ব্যবহৃত সরঞ্জাম ক্রিকেট খেলায় ব্যবহৃত সরঞ্জামের তুলনায় সস্তা হওয়ায় নিম্নবিত্ত পরিবারের মানুষেরা খুব সহজেই এই খেলাটি গ্রহণ করতে পেরেছে। দ্বিতীয়ত এবং সম্ভবত অন্যতম কারণটি হলো জেলা ক্রীড়া সংস্থা ও আই.এফ.এ জেলায় ফুটবল খেলাকে ছড়িয়ে দিতে বিশেষত গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে দিতে সর্বদাই তৎপর থেকেছে, যার ফলে এই খেলা ক্রমশ গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে।[১৬]

সমগ্র ভারতের মতো নদীয়া জেলাতেও ক্রমশ দলগত খেলার মধ্যে ক্রিকেট খেলা সবথেকে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং সমগ্র জেলায় এই খেলা ক্রমশই প্রসারিত হতে থাকে। ১৯৮০ সালের পর থেকে যখন সমগ্র ভারতীয় সমাজে ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন খুব স্বাভাবিকভাবে নদীয়া জেলাতেও ক্রিকেট খেলার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। জেলার বাইরে যেই সময় নদীয়া জেলা ফুটবল ও হকি দলের সফলতার পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে, ঠিক সেই সময় জেলা ক্রিকেট দলের একের পর এক সফলতা লাভ এই খেলাটাকে জনপ্রিয় হতে সাহায্য করেছিল। নদীয়া জেলা ক্রিকেট দল সিনিয়র বিভাগে ১৯৭৩ সালে রাজ্যের আন্তঃজেলা ক্রিকেটে সেমিফাইনালে পরাজিত হয় এবং ১৯৭৪ সালে চ্যাম্পিয়ন হয়।[১৭] রাজ্যের অন্তঃজেলা জুনিয়র ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় নদীয়া জেলা দল ১৯৮০ সালে, সাব-জুনিয়র ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় নদীয়া জেলা দল ১৯৮৩ ও ১৯৮৮ সালে এবং সিনিয়র ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় ১৯৮৭ ও ২০১৪ সালে চ্যাম্পিয়ন হয়।[১৮] এছাড়াও বিভিন্ন বয়স ভিত্তিক বিভাগে রাজ্যের আন্তঃজেলা ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় নদীয়া জেলা দল চ্যাম্পিয়ন না হলেও একাধিক বার সেমিফাইনাল ও ফাইনালে উঠে নিজেদের কৃতিত্বের প্রদর্শন করে। বিভিন্ন বয়সভিত্তিক বিভাগে নদীয়া জেলা দলের এই একের পর এক সাফল্য স্বাভাবিকভাবেই জেলার খেলোয়াড়দের ক্রিকেটের প্রতি উৎসাহিত করেছিল এবং জনগণকে এই খেলাটির প্রতি সজাগ করে তোলে। ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল-এর তরফ থেকেও এই সময় জেলায় ক্রিকেট খেলা কে জনপ্রিয় করে তুলতে একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় যার ফলে জেলায় ক্রিকেট খেলার জনপ্রিয়তা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। সি.এ.বি ১৯৮৩ সালে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় স্কুল ক্রিকেট লীগ চালু করার জন্য সাহায্য করার পরিকল্পনা গ্রহণ করলে ওই বছর থেকেই নদীয়া জেলা ক্রীড়া

সংস্থার পরিচালনায় জেলায় স্কুল ক্রিকেট লীগের সূচনা হয়। তৃণমূল স্তরে স্কুল গুলিতে ক্রিকেট খেলার জনপ্রিয়তা কে প্রসারিত করাই ছিল সি.এ.বি- এর এই উদ্যোগের পেছনে প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য যে নদীয়া জেলায় বিশেষভাবে সফল হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় নদীয়া জেলা স্কুল ক্রিকেট লীগের পরিসংখ্যানে। ১৯৮৩ সালে যখন নদীয়া জেলায় প্রথম স্কুল ক্রিকেট লীগের সূচনা হয় তখন কেবলমাত্র কৃষ্ণনগর, রানাঘাট ও নবদ্বীপ অঞ্চলেই লীগ খেলার সূচনা ঘটে এবং এক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী স্কুলের সংখ্যা ছিল ১৮। পরবর্তীতে অংশগ্রহণকারী স্কুলের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে ১৯৮৫ সালে অংশগ্রহণকারী স্কুলের সংখ্যা ছিল ৩১। ১৯৯৮ সালে এই সংখ্যা ৫০ ছাড়িয়ে যায় এবং ওই বছরে অংশগ্রহণকারী স্কুলের সংখ্যা ছিল ৫৪। একবিংশ শতাব্দীতে এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায়। ২০০১ সালে অংশগ্রহণকারী স্কুলের সংখ্যা ছিল ৬৩, যা ২০০৩ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৮৫ তে পৌঁছায় এবং ২০০১ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত প্রতিটি বছরই অংশগ্রহণকারী স্কুলের সংখ্যা সর্বদাই ৮০ এর ঊর্ধ্বে থেকেছে।[১৯] ১৯৮৩ সাল থেকে শুরু হয়ে স্কুল ক্রিকেট লীগে অংশগ্রহণকারী স্কুলের সংখ্যার এই ক্রমাগত বৃদ্ধিই প্রমাণ করে যে জেলায় সি.এ.বি- এর উদ্যোগে ক্রিকেট খেলা কে প্রসারিত করার যে উদ্যোগ তা ফলপ্রসু হয়েছিল। ১৯৮০ সালের পরবর্তীতে নদীয়ার যে সকল ক্রিকেট খেলোয়াড় সি.এ.বি কর্তৃক গঠিত বেঙ্গল দলের সদস্য হিসেবে জাতীয় স্তরে ক্রিকেট খেলেছেন তাদের অধিকাংশই তাদের খেলোয়াড় জীবনের সূচনায় জেলা স্কুল ক্রিকেট লীগে অংশগ্রহণ করেছেন। ১৯৮০ সালের পরবর্তীতে নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন বয়স ভিত্তিক ক্রিকেট লীগেও অংশগ্রহণকারী ক্লাবের সংখ্যা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পায়। জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন বয়স ভিত্তিক ক্রিকেট লীগে অংশগ্রহণকারী ক্লাবের সংখ্যা ১৯৮৫ সালে যেখানে ছিল ৮৩, মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৮৮ সালে হয় ১২৪, ১৯৯২ থেকে ২০০৩ পর্যন্ত প্রতিবছরই এই অংশগ্রহণকারী ক্লাবের সংখ্যা ১৩০- এর উপর থেকেছে।[২০] জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত ক্রিকেট লীগে অংশগ্রহণকারী ক্লাবের এই সংখ্যা বৃদ্ধি স্বাভাবিকভাবেই জেলায় ক্রিকেটের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা ও উৎসাহের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে। সি.এ.বি- এর উদ্যোগে ১৯৮০ সাল থেকেই জেলায় ক্রিকেট খেলোয়াড়দের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন জেলার খেলোয়াড়দের

ক্রিকেটের প্রতি উৎসাহিত করে। এছাড়াও জেলায় ক্রিকেট অনুশীলনে তরুণ খেলোয়াড়দের সারা বছরব্যাপী সুযোগ ও পরিবেশ সৃষ্টি করণের উদ্দেশ্যে সি.এ.বি ১৯৮১ সালে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয় করে কৃষ্ণনগরস্থ জেলা স্টেডিয়ামে একটি আচ্ছাদিত ক্রিকেট পিচ নির্মাণ করে যার ফলে জেলায় নিঃসন্দেহে এই খেলার প্রতি উৎসাহ বৃদ্ধি পায়।[২১] ১৯৮৪ সালের পরবর্তীতে আই.এফ.এ শীল্ডের খেলা গুলি যখন জেলার পরিবর্তে কেন্দ্রীয়ভাবে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হতে থাকে, ঠিক সেই সময় সি.এ.বি- এর উদ্যোগে নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা কে জেলায় রঞ্জি ট্রফি প্রতিযোগিতার খেলার মতো একের পর এক জাতীয় স্তরের খেলাধুলা আয়োজনের দায়িত্বভার অর্পণ ক্রিকেট খেলাকে আরও জনপ্রিয় করে তুলতে সাহায্য করে জেলায়। আর এই সামগ্রিক পরিস্থিতির ফলেই জেলায় ক্রমশ ক্রিকেট খেলার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়।

দলগত খেলার মধ্যে ভলিবল জেলায় প্রচলিত থাকলেও এক্ষেত্রে সফলতা ও জনপ্রিয়তা উভয়ে ওঠা পড়া লক্ষ করা যায়, এমনকি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার ভলিবল দলকে নিয়ে যে আন্তঃজেলা ভলিবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে সেখানে বিবিধ কারণে বিভিন্ন সময় পর্বে নদীয়া জেলা দল অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। রাজ্যের আন্তঃজেলা ভলিবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ১৯৬৯ ও ১৯৭০ সালে বিরত থাকার পর পুনরায় ১৯৭১ সালে নদীয়া জেলা দল অংশগ্রহণ করে এবং প্রথম রাউন্ডে পরাজিত হয়ে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নেয়।[২২] প্রকৃতপক্ষে ১৯৮০- এর দশকে গিয়েই নদীয়া জেলা ভলিবল দল রাজ্যের আন্তঃজেলা ভলিবল প্রতিযোগিতায় নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে শুরু করে। ১৯৮৪ সালে নদীয়া জেলা ভলিবল দল প্রথম রাজ্যের আন্তঃজেলা ভলিবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়নের শিরোপা অর্জন করে এবং এর পরবর্তীতে পুনরায় ১৯৮৫ সালে রাজ্যের আন্তঃজেলা ভলিবল প্রতিযোগিতায় সেমিফাইনালে উঠে পরাজিত হয়।[২৩] এর পরবর্তীতে অবশ্য নদীয়া জেলা দল বিশেষ প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে পারেনি রাজ্যের আন্তঃজেলা ভলিবল প্রতিযোগিতায়। নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক ভলিবলে বিভিন্ন বয়স ভিত্তিক যে সকল প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয় সেখানেও অংশগ্রহণকারী ক্লাবের সংখ্যায় বিশেষ বৃদ্ধি লক্ষ করা যায় না। ১৯৮০- এর দশক থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত সামগ্রিক

সময় পর্বে নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন বয়স ভিত্তিক ভলিবল লীগে অংশগ্রহণকারী ক্লাবের সংখ্যা সর্বদায় ১০০ থেকে ১৫০- এর মধ্যে থেকেছে এবং এই সংখ্যায় বিশেষ কোনো বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায় না। নদীয়া জেলার ক্রীড়া ক্লাবগুলির ভলিবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে যে ক্রমবর্ধমান অনীহা তা প্রকাশ পায় ২০১০ সালের ১লা অক্টোবর নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক জেলার ক্রীড়া ক্লাব গুলির উদ্দেশ্যে প্রচারিত একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে, যেখানে জেলা ক্রীড়া সংস্থার তরফ থেকে জেলার সমস্ত ক্রীড়া ক্লাব গুলিকে ভলিবল লীগে অংশগ্রহণ করার জন্য বিশেষ অনুরোধ করা হয়।[২৪] ভলিবলে জেলার বাইরে নদীয়া জেলা ভলিবল দল ও খেলোয়াড় গণের সীমিত সাফল্য জেলায় ভলিবলের জনপ্রিয়তা হ্রাসের অন্যতম কারণ। এর পাশাপাশি সমগ্র ভারতে গণমাধ্যম গুলিতে ভলিবল খেলা কে যথেষ্ট গুরুত্ব না দেওয়ার ফলে স্বাভাবিকভাবে জেলাতেও তার গুরুত্ব ও জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়। এছাড়াও নদীয়া জেলায় ব্যাডমিন্টন খেলা প্রচলিত থাকলেও এবং এই খেলাকে কেন্দ্র করে জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক বিভিন্ন প্রতিযোগিতা আয়োজিত হলেও তা বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেনি। যার ফলস্বরূপ এই খেলায় জেলার খেলোয়াড়দের সফলতাও থেকেছে সীমিত।

• ৭.৩. অ্যাথলেটিক্সের প্রাধান্য:

যে খেলাটিতে নদীয়া জেলার খেলোয়াড়রা সম্ভবত সব থেকে বেশি কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছে তা হলো অ্যাথলেটিক্স। জেলার খেলোয়াড়দের মধ্যে অ্যাথলেটিক্সের প্রতি আগ্রহ ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আরও বেশি সংখ্যক খেলোয়াড়রা অ্যাথলেটিক্সের সঙ্গে যুক্ত হতে থাকে। জেলার ক্রীড়া ক্লাব গুলির মধ্যেও অ্যাথলেটিক্স- এর প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং তারা এই খেলাটিকে সংগঠিত করতে বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়। নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত বার্ষিক অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা যা প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয় সেখানে অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড় ও ক্লাবের সংখ্যা উভয়েই আমরা সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমবৃদ্ধি লক্ষ করতে পারি। জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত বার্ষিক অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় যেখানে ১৯৬৯ সালে অংশগ্রহণকারী ক্লাবের সংখ্যা ছিল ৪৪ ও খেলোয়াড়দের সংখ্যা ছিল ১৪৪, যা সমগ্র ১৯৭০- এর দশক জুড়ে বৃদ্ধি পায় এবং ১৯৭৯ সালে জেলা অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী

ক্লাবের সংখ্যা ছিল ৬৭ ও খেলোয়াড়দের সংখ্যা ছিল ৩৫১ জন।[২৫] ১৯৮০- এর দশকে জেলা অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ক্লাবের ও খেলোয়াড়দের সংখ্যায় ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটে। ১৯৮৯ সালে জেলা অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ক্লাবের সংখ্যা ১০০ ছাড়িয়ে যায় এবং অংশগ্রহণকারী অ্যাথলিটদের সংখ্যা ৫০০ ছাড়িয়ে যায়।[২৬] ব্যতিক্রমী হিসেবে ১৯৯৮ সাল টিকে বাদ দিয়ে,[২৭] ১৯৯০-এর দশক থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত সময় পর্বে প্রায় প্রতি বছরই জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত বার্ষিক জেলা অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের সংখ্যা ৫০০-র উপর থেকেছে। এক্ষেত্রে একটি আকর্ষণীয় বিষয় হলো যে ১৯৮৯ সালের পর থেকে জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত বার্ষিক জেলা অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ক্লাবের সংখ্যা ক্রমানুসারে কমেছে। ১৯৮৯ সালে যেখানে অংশগ্রহণকারী ক্লাবের সংখ্যা ছিল ১০৪, তা সব থেকে কমে ২০০২ সালে হয় মাত্র উনিশ। অথচ পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে ১৯৮৯ সালের পর থেকে বার্ষিক জেলা অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের সংখ্যা ব্যাপক বৃদ্ধি পায়। এমনকি ২০০২ সালে যখন বার্ষিক জেলা অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ক্লাবের সংখ্যা ছিল সর্বনিম্ন ১৯, তখন ওই বছরে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের সংখ্যা ছিল ৫৮৬, যা কিনা তখনও পর্যন্ত জেলা অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতার ইতিহাসে অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীর সর্বোচ্চ সংখ্যা।[২৮] আসলে ১৯৮৯ সালের পর থেকে অংশগ্রহণকারী ক্লাব ও খেলোয়াড়দের সংখ্যার মধ্যে এই চূড়ান্ত বৈপরীত্যের পশ্চাতে প্রধান কারণ ছিল জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কিছু নিয়মাবলী ও প্রয়োজনীয় মানদণ্ডের পরিবর্তন।[২৯] ২০০৬ সাল থেকে জেলা ক্রীড়া সংস্থা সমগ্র জেলাকে দুটি অঞ্চলে ভাগ করে ওই দুটি অঞ্চলে জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক অনুমোদিত ক্লাবগুলির মধ্যে যারা অংশগ্রহণে ইচ্ছুক তাদের নিয়ে আঞ্চলিক পর্যায়ে বার্ষিক অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতার প্রাথমিক পর্ব সম্পাদন করার পর চূড়ান্ত পর্যায় কৃষ্ণনগরে অবস্থিত জেলা স্টেডিয়ামে আয়োজিত করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং স্থির হয় যে চাকদহ ও তেহট্ট অঞ্চলে এই অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতার প্রাথমিক পর্বটি অনুষ্ঠিত হবে। এই উদ্যোগের ফলে স্বাভাবিকভাবেই অংশগ্রহণকারী খেলোয়ারদের সংখ্যায় ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটে। ২০০৬ সালে যখন এই ব্যবস্থাটি প্রথম কার্যকর করা হয় তখন

শুধুমাত্র চাকদহ অঞ্চলে অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের সংখ্যা ছিল ৩৬৬ ও তেহট্ট অঞ্চলে অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের সংখ্যা ছিল ৩৯৮, এবং এই দুই অঞ্চলের প্রতিযোগিতার সফল খেলোয়াড়দের নিয়ে কৃষ্ণনগরে যে চূড়ান্ত পর্যায় অনুষ্ঠিত হয় সেখানে অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের সংখ্যা ছিল ৩০৪।[৩০] জেলা ক্রীড়া সংস্থা যাতে আরও বেশি করে ক্লাব ও খেলোয়াড়েরা বার্ষিক অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারে তার জন্য বার্ষিক অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতার প্রারম্ভিক পর্যায় জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষত গ্রামাঞ্চলে করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সিদ্ধান্তের ফল স্বরূপ ২০০৮ সালে জেল বার্ষিক অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতার প্রারম্ভিক পর্যায় নদীয়া জেলার আড়ংঘাটায় অনুষ্ঠিত হয় এবং এই সিদ্ধান্তের ফলে স্বাভাবিকভাবে অংশগ্রহণকারী ক্লাব ও খেলোয়াড়দের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।[৩১] এই সামগ্রিক উদ্যোগ ও পরিস্থিতিতে জেলার ক্লাব ও খেলোয়াড়দের মধ্যে অ্যাথলেটিক্স- এর প্রতি যে প্রবল আগ্রহ ও উৎসাহ বজায় ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ২০১৬ সালে অনুষ্ঠিত জেলা অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায়। ২০১৬ সালে অনুষ্ঠিত বার্ষিক জেলা অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ক্লাবের সংখ্যা পূর্বের বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে ৮৪ হয় এবং অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের সংখ্যা ছিল ৯৫৩ যা ছিল এই যাবতকালের মধ্যে সর্বাধিক।[৩২]

জেলার অ্যাথলিটরা, জেলার বাইরেও নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর তুলে ধরেছে রাজ্য ও জাতীয় স্তরে। হকি, ফুটবল, ভলিবল ও ক্রিকেট- এর মতো খেলায় যে সংখ্যক খেলোয়াড়রা জেলার বাইরে নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর তুলে ধরেছে তার চেয়ে বহু সংখ্যায় বেশি খেলোয়াড় অ্যাথলেটিক্সে নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর তুলে ধরেছেন জেলার বাইরে। এমনকি অ্যাথলেটিক্সে জেলার বহু খেলোয়াড় দেশের প্রতিনিধিত্ব করে আন্তর্জাতিক স্তরেও নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর তুলে ধরেছেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার খেলোয়াড়দের নিয়ে যে বার্ষিক রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয় সেখানে নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার তরফ থেকে যে অ্যাথলেটিক্সের দল পাঠানো হয় তাতে জেলার প্রতিনিধিত্বকারী খেলোয়াড়দের সংখ্যা ও সফলতার হারে বৃদ্ধি লক্ষ করা যায় তবে তা সর্বদা সমান থাকেনি, এক্ষেত্রে কিছু হ্রাস বৃদ্ধি লক্ষ করা যায়। ১৯৭৪ সালের রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার

তরফ থেকে যে দল অংশগ্রহণ করে তাতে অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের সংখ্যা ছিল ৭।[৩৩] এর পরবর্তী থেকে নদীয়া জেলা দলের তরফ থেকে রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও ১৯৮০- এর দশক পর্যন্ত তা সর্বদাই ২৫ এর নিচে থেকেছে। ১৯৯০- এর দশকে রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় নদীয়া জেলা দলের তরফ থেকে অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের সংখ্যা ব্যাপক বৃদ্ধি পায় এবং এই দশকে প্রায় সর্বদাই নদীয়া জেলা দলের তরফ থেকে অংশগ্রহণকারী অ্যাথলিটদের সংখ্যা ৪০- এর ওপর থেকেছে। একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে পুনরায় নদীয়া জেলা দলের তরফ থেকে অংশগ্রহণকারী অ্যাথলিটদের সংখ্যায় হ্রাস ঘটে এবং এই সামগ্রিক সময় পর্বে নদীয়া জেলা দলের তরফ থেকে অংশগ্রহণকারী খেলোয়ারদের সংখ্যা কখনোই ৫০ এর উপরে ওঠেনি।[৩৪] তবে একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের সূচনা থেকে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, যার দরুন আমরা লক্ষ করতে পারি ২০১১ সালেই রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় নদীয়া দলের তরফ থেকে অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের সংখ্যা ৬০ ছাড়িয়ে যায়।[৩৫] জেলা দলের তরফ থেকে অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের এই সংখ্যা বৃদ্ধির ধারা ২০১৭ সাল পর্যন্ত বজায় ছিল। ২০১৭ সালে নদীয়া জেলা দলের তরফ থেকে ১০৬ জন অ্যাথলিট রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে, যা জেলার ইতিহাসে এই প্রতিযোগিতায় জেলা দলের তরফ থেকে অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যা।[৩৬] সফলতার নিরিখেও জেলা অ্যাথলেটিক্স দলের খেলোয়াড়রা এই প্রতিযোগিতায় ক্রম উন্নতির দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছে। ১৯৭৪ সালে অনুষ্ঠিত রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় নদীয়া জেলা অ্যাথলেটিক্স দল যেখানে কেবলমাত্র দুটি স্বর্ণপদক লাভ করেছিল তা পরবর্তীতে ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ২০১৭ সালে অনুষ্ঠিত রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা নদীয়া জেলা অ্যাথলেটিক্স দল ১৬ টি স্বর্ণপদক লাভ করে যা এই খেলার ধারাবাহিক উন্নতির দৃষ্টান্তই তুলে ধরে।[৩৭]

জাতীয় অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দল গঠন করা হয়ে থাকে। ১৯৭১ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয়

অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দলে নদীয়া জেলার একমাত্র একজন অ্যাথলিট সুযোগ লাভ করেছিলেন।[৩৮] পরবর্তীতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দলে নদীয়ার অ্যাথলিটদের উপস্থিতি বৃদ্ধি পেতে থাকে যা নদীয়ার খেলোয়াড়দের সফলতার দৃষ্টান্তই তুলে ধরে। ১৯৮৩ সালের জাতীয় অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দলে নদীয়ার নয় জন খেলোয়ার স্থান লাভ করে।[৩৯] পূর্বাঞ্চলীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দল গঠিত হয় তাতে নদীয়া জেলার অ্যাথলিটরা সর্বদাই বহু সংখ্যায় নিজেদের স্থান সুনিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে। ১৯৯৪ সালে যেখানে পূর্বাঞ্চলীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য গঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দলে নদীয়া থেকে ১৩ জন অ্যাথলিট অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, সেখানে ২০১৫ সালেও পূর্বাঞ্চলীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য গঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দলে অন্তর্ভুক্ত নদীয়া জেলার অ্যাথলিটদের সংখ্যা ছিল ১৪।[৪০] এই পরিসংখ্যান জেলায় অ্যাথলেটিক্স- এর ধারাবাহিক জনপ্রিয়তা ও সফলতার একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরে। এর মধ্যবর্তী বছর গুলিতে এই অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য গঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দলে নদীয়া জেলার খেলোয়াড়দের সংখ্যায় হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটলেও, তা অধিকাংশ সময় ১০- এর উপরেই থেকেছে। শুধুমাত্র জাতীয় স্তরেই নয় নদীয়া জেলার অ্যাথলিটরা আন্তর্জাতিক স্তরেও ভারতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করার পাশাপাশি পদক লাভ করার কৃতিত্বও প্রদর্শন করেছেন একাধিকবার।[৪১] নদীয়া জেলার বিভিন্ন ক্লাব ও খেলোয়াড়দের মধ্যে অ্যাথলেটিক্স- এর এই ব্যাপক জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ হলো এই খেলাধুলা অত্যন্ত কম ব্যয়বহুল। ক্রিকেট ও ফুটবলের মতো খেলায় যে ধরনের ব্যয়বহুল সরঞ্জাম ও পরিকাঠামের প্রয়োজন হয় অ্যাথলেটিক্সের ক্ষেত্রে বিশেষত দৌড় ও দীর্ঘ লম্ফনের মতো খেলায় প্রাথমিক পর্যায়ে সেই ধরনের কোনো ব্যয়বহুল সরঞ্জাম ও পরিকাঠামের প্রয়োজন পড়ে না।[৪২] যার দরুন একদিকে জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের ক্লাবগুলি পক্ষেও স্বল্প ব্যয়ে অ্যাথলেটিক্স- এর পরিকাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে কম ব্যয়বহুলতার কারণে প্রত্যন্ত অঞ্চলের খেলোয়াড়রাও এই খেলাটিতে প্রশিক্ষণ লাভ করতে পেরেছে।

• ৭.৪. নারী অ্যাথলিটদের সাফল্য:

জেলার ক্রীড়া ইতিহাসের একটি অন্যতম চিত্তাকর্ষক দিক হলো নদীয়া জেলার ক্রীড়া ক্ষেত্রে অধিকাংশ সাফল্য যেমন অ্যাথলেটিক্সে এসেছে, তেমনি এই অ্যাথলেটিক্সের সাফল্যের মধ্যে অধিকাংশই এসছে নারী অ্যাথলিটদের হাত ধরে। নারী অ্যাথলিটদের এই অভাবনীয় সাফল্য নদীয়া জেলার ক্রীড়া ইতিহাসকে এক অনন্যতা দান করেছে। নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা পরিচালিত বার্ষিক অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় ১৯৮০ সালে মোট ৩৯৯ জন অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের মধ্যে মহিলা খেলোয়াড়ের সংখ্যা ছিল ৮০ এবং ১৯৮৫ সালে যেখানে মোট অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের সংখ্যা ছিল ৩৭৩ সেখানে নারী খেলোয়াড়দের সংখ্যা ছিল ৬৬।[৪৩] ১৯৯০ সালের আগে পর্যন্ত আমরা জেলা অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতার বার্ষিক অনুষ্ঠানে নারী অ্যাথলিটদের অংশগ্রহণের সংখ্যার ক্ষেত্রে এই হ্রাস-বৃদ্ধি আমরা বিশেষভাবে লক্ষ করতে পারি। ১৯৯০ সালের পর থেকে আমরা বার্ষিক জেলা অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় নারী অ্যাথলিটদের অংশগ্রহণের সংখ্যায় ক্রমিক বৃদ্ধি লক্ষ করতে পারি, তবে এই সংখ্যা সর্বদাই পুরুষ অ্যাথলিটদের তুলনায় কম থেকেছে। নারী অ্যাথলিটদের এই সংখ্যা বৃদ্ধি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় জুনিয়র ও সাব-জুনিয়ার- এর মতো কম বয়সী বিভাগে। জেলার বার্ষিক অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় পুরুষ প্রতিযোগিদের সংখ্যা নারীদের তুলনায় সর্বদাই বেশি হলেও জেলার বাইরে অনুষ্ঠিত আন্তঃজেলা ও রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী নদীয়া জেলা দলে উভয়ের মধ্যে সংখ্যার পার্থক্য নগণ্যই থেকেছে। এমনকি অনেক সময় নারী অ্যাথলিটদের সংখ্যা পুরুষদের তুলনায় অধিক থেকেছে, ১৯৭৯ সালে নদীয়া জেলা অ্যাথলেটিক্স দলের তরফ থেকে রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় যে ১৩ জন অ্যাথলিট অংশগ্রহণ করে তার মধ্যে সাতজন ছিল নারী অ্যাথলিট।[৪৪] এর পরবর্তীতে রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী নদীয়া জেলা অ্যাথলেটিক্স দলের খেলোয়াড়দের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটলে প্রতিযোগিতায় জেলার প্রতিনিধিত্বকারী নারী অ্যাথলিটদের সংখ্যারও বৃদ্ধি ঘটে, তবে তা কখনওই আর পুরুষ অ্যাথলিটদের সংখ্যাকে অতিক্রম করে যায়নি। সফলতার ক্ষেত্রে অবশ্য নারী অ্যাথলিটরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় পুরুষ অ্যাথলিটদের তুলনায় নিজেদের এগিয়ে রেখেছেন। রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় নদীয়া জেলা

অ্যাথলেটিক্স দল ১৯৮০ সালে যে পাঁচটি স্বর্ণপদক লাভ করে তার মধ্যে তিনটি, ১৯৮৬ সালে যে পাঁচটি স্বর্ণপদক লাভ করে তার প্রত্যেকটি, ১৯৮৭ সালে যে পাঁচটি স্বর্ণপদক লাভ করে তার মধ্যে তিনটি, ২০০১ সালে যে দুটি স্বর্ণপদক লাভ করে তার মধ্যে একটি, ২০১৩ সালে যে ১৩ টি সত্য স্বর্ণপদক লাভ করে তার মধ্যে আটটি, ২০১৪ সালে যে ১৩ টি স্বর্ণপদক লাভ করে তার মধ্যে দশটি ও ২০১৭ সালে যে ১৬ টি স্বর্ণপদক লাভ করে তার মধ্যে নয়টি লাভ করে নারী অ্যাথলিটদের সফলতার মাধ্যমে।[৪৫] উল্লেখিত বছরগুলির বাইরে অন্যান্য বছরগুলিতে অবশ্য অধিকাংশ স্বর্ণপদক পুরুষ অ্যাথলিটরাই লাভ করেছিল।

রাজ্যের বাইরে জাতীয় স্তরে নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখার ক্ষেত্রে অবশ্য নারী অ্যাথলিটরা সর্বদাই জেলার পুরুষ অ্যাথলিটদের টেক্কা দিয়েছে। জাতীয় স্তরের বিভিন্ন অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য অ্যাথলেটিক্স দল গঠিত হয় তাতে নদীয়ার নারী অ্যাথলিটদের সংখ্যা সর্বদাই পুরুষ অ্যাথলিটদের তুলনায় অধিক থেকেছে। জাতীয় অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য গঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য অ্যাথলেটিক্স দলে নদীয়া থেকে সুযোগ লাভ করা অ্যাথলিটদের মধ্যে ১৯৭২ সালে দুজনের মধ্যে দুজন, ১৯৮০ সালে চার জনের মধ্যে তিনজন, ১৯৮১ সালে চার জনের মধ্যে দুজন, ১৯৮৩ সালের নয় জনের মধ্যে পাঁচ জন ছিলেন জেলার নারী অ্যাথলিট।[৪৬] জাতীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা ও বিভিন্ন অঞ্চল ভিত্তিক জাতীয় অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য গঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য অ্যাথলেটিক্স দলেও সুযোগ লাভ করার ক্ষেত্রে নদীয়ার নারী অ্যাথলিটরা তাদের প্রধান একাধিকত্ব বজায় রেখেছিল। জাতীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য গঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য অ্যাথলেটিক্স দলে নদীয়া থেকে সুযোগ লাভ করা অ্যাথলিটদের মধ্যে ১৯৯৫ সালে ৬ জনের মধ্যে ৩ জন, ১৯৯৮ সালে পাঁচ জনের মধ্যে তিন জন, ২০১৩ সালে সুযোগ লাভ করা দুজনের মধ্যে দুজনায় ছিলেন জেলার নারী অ্যাথলিট।[৪৭] জাতীয় পূর্বাঞ্চলীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য গঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য অ্যাথলেটিক্স দলে নদীয়া থেকে সুযোগ লাভ করা অ্যাথলিটদের মধ্যে ১৯৯৪ সালে ১৩ জনের মধ্যে ৭ জন, ১৯৯৫ সালে ৬ জনের মধ্যে ২ জন, ২০০৬ সালে তিন জনের মধ্যে দুজন, ২০১০ সালে ৫ জনের মধ্যে ২ জন, ২০১২ সালে ১০ জনের মধ্যে পাঁচ

জন, ২০১৩ সালে ১১ জনের মধ্যে পাঁচ জন, ২০১৪ সালের ১৪ জনের মধ্যে ৯ জন, ২০১৫ সালে ১৪ জনের মধ্যে ৮ জন, ২০১৬ সালে বারো জনের মধ্যে ৭ জন ছিলেন জেলার নারী অ্যাথলিট।[৪৮] উল্লিখিত পরিসংখ্যানের মাধ্যমে আমরা জেলার নারী অ্যাথলিটদের অভাবনীয় ও ধারাবাহিক সাফল্যের দিকটি স্পষ্টভাবেই উপলব্ধি করতে পারি। নদীয়া জেলার কোনো পুরুষ অ্যাথলিট জাতীয় স্তরে প্রতিযোগিতায় নিজ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারেনি, কিন্তু একাধিক নারী অ্যাথলিট এই কৃতিত্বের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছে। নদীয়া জেলার নারী অ্যাথলিট সারথি বর্মন ১৯৯৫ সালে ভূপালে অনুষ্ঠিত জাতীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দলের সদস্য হিসেবে অংশগ্রহণ করে অনূর্ধ্ব ১৪ বছর বালিকা বিভাগে ১০০ মিটার দৌড়ে ও লং জাম্পে প্রথম স্থান অধিকার করে অ্যামেচার অ্যাথলেটিক ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া (Amateur Athletic Federation of India) কর্তৃক প্রতিযোগিতার সেরা জুনিয়র অ্যাথলিট হিসেবে নির্বাচিত হন।[৪৯] জেলার ওপর এক নারী অ্যাথলিট দেবশ্রী মজুমদার ২০০৬ সালে পূর্বাঞ্চলীয় অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য গঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দলে সুযোগ লাভ করে অনূর্ধ্ব ১৬ বছর বালিকা বিভাগে ১০০ মিটার, ৪০০ মিটার ও রিলে দৌড়ে সোনার পদক লাভ করে প্রতিযোগিতার 'বেস্ট পারফর্মড অ্যাথলিট' হবার সম্মান লাভ করেন।[৫০] জাতীয় স্তর অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক স্তরেও জেলার নারী অ্যাথলিটরা ভারতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করার পাশাপাশি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় পদক লাভ করে জেলার সম্মান বৃদ্ধি করেছেন। অপর দিকে জেলার কোনো পুরুষ অ্যাথলিটই জাতীয় স্তর অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ লাভ করতে পারেননি। জ্যোতির্ময়ী সিকদার ও দেবশ্রী মজুমদার- এর মতো নারী অ্যাথলিটরা জাতীয় স্তর অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করার পাশাপাশি নিজেদের বিভাগে এশিয়ান গেমসে স্বর্ণপদক লাভ করে জেলাকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এনে দিয়েছে। অ্যাথলেটিক্সে জেলার নারী অ্যাথলিটদের এই ধারাবাহিক সফলতা প্রকৃত অর্থেই এক অনন্য নজির স্থাপন করেছে সামগ্রিক খেলার ইতিহাসে।

• ৭.৫. অঞ্চলগত সম্প্রসারণ ও বৈশিষ্ট্য:

আলোচ্য সময় পর্বের মধ্যে আমরা লক্ষ করতে পারি যে ক্রিকেট, ফুটবল, ভলিবল ও অ্যাথলেটিক্সের মতো খেলা গুলি ক্রমশ সমগ্র নদীয়ায় প্রসার লাভ করেছে। সমগ্র জেলায় এই খেলাধুলা প্রসারের ক্ষেত্রে আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশকে চিহ্নিত করতে পারি এবং একই সঙ্গে অঞ্চল ভেদে খেলাধুলাগুলির জনপ্রিয়তা ও প্রসারের ক্ষেত্রে কিছু অঞ্চলগত বৈশিষ্ট্য কে চিহ্নিত করতে পারি। ১৯৭১ সালের আদমশুমারির পরিসংখ্যান অনুসারে আমরা লক্ষ করতে পারি যে নদীয়া জেলার মোট ৩৯২৬ বর্গ কিলোমিটার অঞ্চলের মধ্যে ৩৮০৮.৪ বর্গ কিলোমিটার অঞ্চল গ্রামাঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত এবং ১১৭.৬ বর্গ কিলোমিটার অঞ্চল শহরাঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।[৫১] একবিংশ শতাব্দীতেও যে জেলায় শহর ও গ্রামাঞ্চলের পরিমাণে বিশেষ কোনো তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়নি তার সাক্ষ্য আমরা লাভ করতে পারি ২০১১ সালের আদমশুমারির পরিসংখ্যানে। ২০১১ সালের আদমশুমারির পরিসংখ্যানে নদীয়া জেলার মোট ৩৯২৭ বর্গ কিমি অঞ্চলের মধ্যে গ্রামাঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত ৩৬১২.১৪ বর্গ কিমি এবং শহরাঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত ৩১৪.৮৬ বর্গ কিমি অঞ্চল। অর্থাৎ ১৯৭১ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে জেলায় শহরাঞ্চল প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেলেও ২০১১ সালেও জেলার মোট অঞ্চলের মধ্যে ৯১% অঞ্চল গ্রামাঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত। ২০১১ সালে জেলায় বসবাসকারী মোট ৫১ লক্ষ ৬৭ হাজার ৬০০ জন মানুষের মধ্যে ৩৭ লক্ষ ২৮ হাজার ৭২৭ জন মানুষ গ্রামাঞ্চলে বসবাস করেন।[৫২] পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে প্রাথমিক পর্যায়ে ক্রিকেট, ফুটবল ও অ্যাথলেটিক্স- এর মতো পাশ্চাত্য খেলাধুলা গুলি জেলার প্রধান শহরাঞ্চল গুলি যথা কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর, রানাঘাট, চাকদহ ও নবদ্বীপের মতো শহর গুলিতে বিকশিত হয়েছিল এবং পরবর্তীতে তা ক্রমশ গ্রামাঞ্চলে প্রসারিত হয়। নদীয়া জেলায় শহরাঞ্চলের পরিমাণ সর্বদাই গ্রামাঞ্চলের থেকে কম থেকেছে তা সত্ত্বেও পাশ্চাত্য খেলাধুলা গুলি প্রাথমিক প্রসার যেহেতু এই শহরাঞ্চল গুলিতেই হয়েছিল তাই স্বাভাবিকভাবেই জেলায় খেলাধুলা প্রসারের অভিমুখ থেকেছে শহর থেকে গ্রামাঞ্চলের দিকে।

জেলার প্রধান সদর শহর হওয়ার দরুণ স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই আমরা খেলাধুলায় কৃষ্ণনগরের বিশেষ অগ্রগতি লক্ষ করতে পারি, যা স্বাধীনতার পরবর্তীতেও পূর্ণমাত্রায় বজায় ছিল। নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায়, জেলা ক্রীড়া সংস্থার অধীনস্থ বিভিন্ন আঞ্চলিক ক্রীড়া সংস্থাগুলির মধ্যে ক্রিকেট, ফুটবল ও ভলিবলের মতো খেলা গুলিকে কেন্দ্র করে আন্তঃআঞ্চলিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ১৯৬৮ সালে জেলা ক্রীড়া সংস্থা পরিচালিত এই আন্তঃআঞ্চলিক ফুটবল, ক্রিকেট ও ভলিবল প্রতিযোগিতায় কৃষ্ণনগর অঞ্চল তিনটি তেই জয় লাভ করে।[৫৩] কৃষ্ণনগর আঞ্চলিক সংস্থার এই সফলতায় প্রমাণ করে যে এই অঞ্চলটি খেলাধুলায় কতটা অগ্রসরমান ছিল জেলার অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায়। কিন্তু ১৯৬০- এর দশকের শেষ দিক থেকে খেলাধুলায় কৃষ্ণনগর অঞ্চলের একাধিকত্ব হ্রাস পেতে থাকে। প্রথমদিকে রানাঘাট, শান্তিপুর, কল্যাণী, চাকদহ ও নবদ্বীপের মতো শহরকেন্দ্রিক অঞ্চল গুলি খেলাধুলায় নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে। কল্যাণী অঞ্চল প্রথম ১৯৬৯ সালে আন্তঃআঞ্চলিক ফুটবল প্রতিযোগিতা জয়লাভ করে নিজের অগ্রসরতার প্রমাণ দেয়।[৫৪] রানাঘাট অঞ্চল ১৯৭১ সালে একইসঙ্গে আন্তঃআঞ্চলিক ক্রিকেট ও ফুটবল প্রতিযোগিতা, ১৯৭২ সালে আন্তঃআঞ্চলিক ভলিবল প্রতিযোগিতা, ১৯৭৫ সালে আন্তঃআঞ্চলিক ক্রিকেট ও ভলিবল প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করে জেলার খেলাধুলার জগতে নিজের স্থান করে নেয়।[৫৫] ১৯৭০- এর দশক জুড়ে জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় বিশেষত গ্রামাঞ্চলে নতুন নতুন আঞ্চলিক ক্রীড়া সংস্থা গড়ে উঠতে থাকে। গ্রামাঞ্চলে গড়ে ওঠা আঞ্চলিক ক্রীড়া সংস্থা ও তাদের অধীনস্থ ক্রীড়া ক্লাব গুলি ১৯৮০- এর দশক থেকে জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় জয় লাভের মাধ্যমে নিজেদের সফলতার স্বাক্ষর তুলে ধরে গ্রামাঞ্চলে খেলাধুলার প্রসারের প্রমাণ রাখতে শুরু করে। জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন অঞ্চলে সাব-জুনিয়ার বিভাগে যে ফুটবল লীগ খেলা অনুষ্ঠিত হয়, সেই ফুটবল লীগে শীর্ষস্থানাধিকারী দুটি ক্রীড়া ক্লাবকে নিয়ে সাব-জুনিয়র জেলা ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮৩ সালে এই সাব-জুনিয়র ফুটবল জেলা চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে জেলার ইতিহাসে প্রথম শহরাঞ্চলের বাইরে দুটি গ্রামাঞ্চলের দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়, যেখানে ধুবুলিয়া ইউথ সোসাইটি ক্লাব ও কালীগঞ্জ অঞ্চলের চাঁদপুর অনুশীলন

ক্লাব পরস্পরের সম্মুখীন হয়।[৫৬] একইভাবে ওই বছরে জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় যে সিনিয়র ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় তার ফাইনালেও শহরাঞ্চলের বাইরের গ্রামাঞ্চলের দুটি ক্রীড়া ক্লাব পরস্পরের সম্মুখীন হয়, যেখানে আড়ংঘাটা অঞ্চলের দত্তফুলিয়া ইয়ংমেনস অ্যাসোসিয়েশন ক্লাব ও নাকাশিপাড়া অঞ্চলের জুনিয়র ইস্টবেঙ্গল ক্লাব পরস্পরের সম্মুখীন হয়।[৫৭] এর পরবর্তী থেকে আমরা ধারাবাহিকভাবেই জেলার গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতার ফাইনালে গ্রামাঞ্চলের ক্লাবগুলির উপস্থিতি লক্ষ করতে পারি। জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় নাকাশিপাড়া আঞ্চলিক ক্রীড়া সংস্থা ১৯৭৩ সালে গঠিত হওয়ার পর থেকেই এই অঞ্চলের ক্লাবগুলি খেলাধুলায় বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিতে থাকে। জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় যে বার্ষিক অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা হয় ১৯৯১ সালে তার ৭৩ তম বর্ষে নাকাশিপাড়া অঞ্চলের উদয়ন সংঘ ক্লাব দলগত চ্যাম্পিয়ন হয়।[৫৮] নাকাশিপাড়া অঞ্চল ১৯৯২ সালে জেলা ক্রীড়া সংস্থার পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সাব-জুনিয়র ফুটবলের আন্তঃআঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়।[৫৯] জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনা অনুষ্ঠিত জুনিয়র ফুটবলের জেলা চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় ১৯৯৪ সালে চ্যাম্পিয়ন হয় তেহট্ট অঞ্চলের বালিউড়া তরুণ সংঘ ক্লাব।[৬০] ধুবুলিয়া অঞ্চলের ক্রীড়া ক্লাব সোনাডাঙ্গা জুবিলী ক্লাব জেলা জুনিয়র ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় ১৯৯৭ সালে, চাপড়া অঞ্চলের ক্রীড়া ক্লাব গোবরডাঙ্গা আদর্শ সংঘ জেলা সাব-জুনিয়র ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় ২০০১ সালে, কালিগঞ্জ অঞ্চলের ক্রীড়া ক্লাব স্টুডেন্ট কর্নার জেলা সিনিয়র ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় ২০০৪ সালে চ্যাম্পিয়ন হয়।[৬১] জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় যে বার্ষিক অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা হয় তাতেও প্রাথমিক পর্যায়ে আমরা লক্ষ করতে পারি কৃষ্ণনগর ও চাকদহের মতো শহরাঞ্চলের ক্লাবগুলোর প্রাধান্য। জেলার গ্রামাঞ্চলের ক্লাবগুলি ১৯৮০- এর দশক থেকে শহরাঞ্চলের ক্লাবগুলোর অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় যে আধিপত্য তাতে ভাগ বসাতে থাকে এবং এক্ষেত্রে বিশেষত বাদকুল্লা অঞ্চলের অনামী ক্লাব ও অজয় সংঘের মতো ক্লাবগুলি জেলা অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় সেরা ক্লাবের শিরোপা অর্জন করে নিজেদের অঞ্চলে অ্যাথলেটিক্সের প্রসার ও দক্ষতার দিকটি তুলে ধরেছে। লক্ষণীয় বিষয় হলো ফুটবল ও অ্যাথলেটিক্সের মতো খেলা গুলি জেলার গ্রামাঞ্চলে প্রসার লাভ করে এবং এই খেলাগুলিকে কেন্দ্র করে

জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের ক্লাব ও খেলোয়াড়রা নিজেদের দক্ষতার পরিচয় তুলে ধরতে সক্ষম হলেও, ক্রিকেটের ক্ষেত্রে আমরা প্রধানত জেলার শহরাঞ্চলের ক্লাবগুলোর প্রাধান্যই লক্ষ করতে পারি। জেলার গ্রামাঞ্চলগুলিতে ক্রিকেট খেলা প্রসার লাভ করলেও এক্ষেত্রে সম্ভবত ক্রিকেট খেলা অর্থনৈতিক দিক থেকে ব্যয়বহুল হওয়ার দরুন জেলার গ্রামাঞ্চলের ক্লাব ও খেলোয়াড়রা তাদের আর্থিক দিক থেকে অনগ্রসরতার কারণে সম্ভবত এই খেলাটিতে তাদের দক্ষতার পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ ঘটাতে পারেনি।[৬২]

জেলার শহরাঞ্চল থেকে গ্রামাঞ্চলে এই খেলাধুলার প্রসার ছাড়াও আমরা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে খেলাধুলার প্রসারে ও জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রে কিছু আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করতে পারি। বিস্তৃত এই জেলায় অঞ্চল ভেদে আমরা বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলার জনপ্রিয়তা ও দক্ষতার ক্ষেত্রে তারতম্য দেখতে পারি। কোনো একটি অঞ্চলে অন্যান্য খেলার তুলনায় একটি নির্দিষ্ট খেলা অধিক পরিমাণে জনপ্রিয় ও সফলতার দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছে। কৃষ্ণনগর অঞ্চলে ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল ও অ্যাথলেটিক্স- এর মতো সব খেলা প্রচলিত থাকলেও, হকি খেলা প্রচলিত থাকা এই অঞ্চলের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। জেলার অন্যান্য অঞ্চলের কোনো ক্লাবই হকি খেলাকে সংগঠিত করতে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। মূলত কৃষ্ণনগরের শহর ও শহর সংলগ্ন অঞ্চলের কয়েকটি ক্লাবে এই খেলাটি প্রচলিত থাকতে দেখা যায়।[৬৩] যেহেতু কৃষ্ণনগর শহর সংলগ্ন এই ক্লাবগুলি ছাড়া জেলার অন্য কোনো ক্লাব হকি খেলার সাথে যুক্ত নয়, তাই মূলত কৃষ্ণনগর অঞ্চলের এই ক্লাবগুলিকে নিয়ে জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় জেলা হকি লীগ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কৃষ্ণনগর টাউন ক্লাব ও কৃষ্ণনগর তরুণ সংঘ ক্লাব একাধিকবার এই লীগ প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করে নিজেদের দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। জেলার গ্রামাঞ্চলে ফুটবল ও অ্যাথলেটিক্স অধিক প্রচলিত থাকতে দেখা যায়। নাকাশিপাড়া, কালীগঞ্জ, করিমপুর ও চাপড়ার মতো গ্রামাঞ্চলের ক্লাবগুলি একাধিকবার জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন বয়স ভিত্তিক ফুটবল প্রতিযোগিতায় নিজেদের ক্রীড়া দক্ষতার পরিচয় দিয়ে জয় লাভ করার মাধ্যমে এই সমস্ত গ্রামাঞ্চলে ফুটবল খেলার ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও প্রসারের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত তুলে ধরেছে। বাদকুল্লা অঞ্চলে অ্যাথলেটিক্স খেলাটি যে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই অঞ্চলের একাধিক ক্লাবের জেলা

ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত বার্ষিক অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় সফলতার নিরিখে। বিশেষত এই অঞ্চলের অজয় সংঘ ক্লাব ও অনামী ক্লাব দুইটি একাধিকবার জেলা বার্ষিক অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় নিজেদের সফলতার দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছে।[৬৪] একই সঙ্গে এই অঞ্চলের একাধিক অ্যাথলিট রাজ্যস্তরে প্রতিযোগিতায় পদক লাভ করেছে এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে জাতীয় স্তরে প্রতিযোগিতায় প্রতিনিধিত্ব করেছে। মূলত জেলার শহরাঞ্চল গুলিতে আমরা ক্রিকেট খেলার ব্যাপক প্রচলন লক্ষ করতে পারি। রানাঘাট ও চাকদহ অঞ্চলে আমরা অন্যান্য খেলার তুলনায় ক্রিকেট খেলার প্রচলন অধিক লক্ষ করতে পারি। জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত আন্তঃআঞ্চলিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় যেমন রানাঘাট ও চাকদহ অঞ্চল একাধিকবার জয়লাভ করেছে, তেমনি এই অঞ্চলের একাধিক ক্লাব জেলা ক্রীড়া সংস্থা ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত বিভিন্ন বয়স ভিত্তিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় নিজেদের সফলতার দৃষ্টান্ত রেখেছে।[৬৫] রানাঘাট অঞ্চলের তরুণ ব্যায়াম সমিতি ক্লাব, রানাঘাট টাউন ক্লাব, রানাঘাট স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন ক্লাব এবং চাকদহ অঞ্চলের নবীন সংঘ ক্লাব ইত্যাদি ক্লাবগুলি ক্রিকেট খেলায় বিশেষ সফলতার পরিচয় দিয়েছে। এই দুই অঞ্চলের একাধিক ক্রিকেট খেলোয়াড় সি.এ.বি কর্তৃক বিভিন্ন জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য গঠিত রাজ্য দলেও সুযোগ লাভ করেছে। শান্তিপুর অঞ্চলে অন্যান্য খেলার তুলনায় ভলিবল খেলার স্পষ্টতই প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। ১৯৮০- এর দশকের পর থেকে জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় যে আন্তঃআঞ্চলিক ভলিবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় সেখানে অধিকাংশ সময় শান্তিপুর অঞ্চল অন্যান্য অংশগ্রহণকারী সমস্ত অঞ্চলগুলিকে পরাজিত করে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে। জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন অঞ্চলে অনুষ্ঠিত ভলিবল লীগের শীর্ষ স্থানাধিকারী দুটি দলকে নিয়ে যে জেলা ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় সেখানেও আমরা অধিকাংশ সময় শান্তিপুরের কোনো ক্লাবকে বিজয়ী হতে দেখি।[৬৬] এর পাশাপাশি শান্তিপুর অঞ্চলের বহু ভলিবল খেলোয়াড় রাজ্য ও জাতীয় স্তরে নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। কল্যাণী অঞ্চলে আমরা প্রধানত ক্রিকেট ও ফুটবল খেলারই প্রাধান্য লক্ষ করতে পারি। তবে এক্ষেত্রে কল্যাণী টাউন ক্লাবের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় কারণ এই ক্লাবটি ব্যাডমিন্টন খেলায় বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে এবং জেলা ক্রীড়া সংস্থার

ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত বিভিন্ন ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় এই ক্লাব ও তাদের খেলোয়াড়রা বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে।[৬৭]

• ৭.৬. খেলাধুলা ও সংগঠনে প্রতিনিধিত্বগত অসামঞ্জস্যতা:

নদীয়া জেলায় আমরা খেলাধুলায় অংশগ্রহণ ও ক্রীড়া সংগঠনে প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে স্পষ্টতই লিঙ্গগত ও সম্প্রদায়গত অসামঞ্জস্যতা লক্ষ করতে পারি। ১৯৭১ সালের আদমশুমারি অনুসারে জেলার মোট জনসংখ্যার মধ্যে মহিলার সংখ্যা ছিল ১০ লক্ষ ৮৫ হাজার ২৯৩ জন, যা ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে বেড়ে হয় ২৫ লক্ষ ১৩ হাজার ৮৩২ জন।[৬৮] অর্থাৎ ১৯৭১ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে জেলায় নারীদের সংখ্যা প্রায় আড়াই গুণ বৃদ্ধি পেলেও খেলাধুলার ক্ষেত্রে আমরা এই বর্ধিত সংখ্যার প্রভাব লক্ষ করতে পারি না।[৬৯] অ্যাথলেটিক্সে যেখানে নারী অ্যাথলিটরা নদীয়াকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এনে দিয়েছে সেখানেও আমরা লক্ষ করতে পারি নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যাপক পার্থক্য। নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা পরিচালিত বার্ষিক অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী পুরুষ অ্যাথলিটদের সংখ্যা সর্বদাই নারী অ্যাথলিটদের থেকে বেশি থেকেছে এবং এর পরবর্তীতে নারী অ্যাথলিটদের অংশগ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও, সেই বৃদ্ধির গতি ছিল অত্যন্ত শ্লথ। নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা পরিচালিত বার্ষিক অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় ১৯৭৮ সালে মোট ২৩৮ জন অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের মধ্যে নারী অ্যাথলিট ছিলেন মাত্র ৩৮ জন।[৭০] ১৯৮০- এর দশক থেকে জেলার বার্ষিক অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী নারী অ্যাথলিটদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটতে থাকে। তবে বিভিন্ন বছরে এই সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি লক্ষ করা যায় যেমন, ১৯৮০ সালে জেলার বার্ষিক অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় মোট ৩৯৯ জন অংশগ্রহণকারী খেলোয়ারদের মধ্যে মহিলা খেলোয়াড়ের সংখ্যা ছিল ৮০ এবং ১৯৮৫ সালে যেখানে মোট অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের সংখ্যা ছিল ৩৭৩ সেখানে নারী খেলোয়াড়দের সংখ্যা ছিল ৬৬।[৭১] ১৯৯০-এর দশকের পর থেকে বার্ষিক অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী নারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটলেও তা পুরুষদের তুলনায় সর্বদাই অনেক কম থেকেছে। নারী খেলোয়াড়দের অনুপস্থিতির বিষয়টি বিশেষ

ভাবে পরিলক্ষিত হয় দলগত খেলার ক্ষেত্রে। জেলা ক্রীড়া সংস্থা দ্বারা অনুমোদিত বিভিন্ন অঞ্চলে যে ফুটবল লীগ অনুষ্ঠিত হয় তাতে কৃষ্ণনগর ও রানাঘাটের মতো খেলার ক্ষেত্রে অগ্রসরমান অঞ্চলে সিনিয়র বিভাগে অংশগ্রহণকারী ফুটবল দলের সংখ্যা এতটাই বেশি থাকে যে তিনটি ডিভিশনে ভাগ করে লীগ প্রতিযোগিতা গুলি আয়োজিত হয়ে থাকে। ঠিক এর বিপরীতে নারী ফুটবল দল নিয়ে এখনও পর্যন্ত জেলায় কোনো ধরনের প্রতিযোগিতাযর আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। জেলায় প্রথম থেকে ভলিবল প্রচলিত থাকলেও নারী খেলোয়াড়দের নিয়ে কোনো ভলিবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে দীর্ঘ সময় লেগেছিল। জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় প্রথম ১৯৯২ সালে জেলায় প্রথম বার্ষিক মহিলা ভলিবল লীগ চালু হয়, যদিও প্রথম বছরে অংশগ্রহণকারী দলের সংখ্যা ছিল মাত্র চার এবং ১৯৯৫ সালে অংশগ্রহণকারী দলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৭।[৭২] এর পরবর্তীতে এই লীগ প্রতিযোগিতা ১৯৯৮ সালের পরে বন্ধ হয়ে যায় এবং ২০০২ ও ২০০৩ সালে পুনরায় সূচনা হওয়ার পরে বন্ধ হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত ২০১১ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে পুনরায় শুরু হয়।[৭৩] জেলার এই একমাত্র মহিলা ভলিবল প্রতিযোগিতা বারবার বন্ধ হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি যে নারী খেলোয়াড়দের মধ্যে এই খেলাটি যথেষ্টভাবে প্রসার লাভ করতে পারিনি। অথচ উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করলে যে জেলার নারী ভলিবল খেলোয়াড়রাও যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিতে পারে তার প্রমাণ আমরা প্রায় ২০১৩ সালে, যখন রাজ্য ভলিবল প্রতিযোগিতায় জেলা মহিলা দল সেমিফাইনালে উঠে পরাজিত হয়।[৭৪] জেলায় প্রথম ১৯৭৬ সালে জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার সূচনা হয় এবং এক্ষেত্রেও একবিংশ শতকের আগে পর্যন্ত শুধুমাত্র নারী খেলোয়াড়দের নিয়ে কোনো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। জেলা স্তরে প্রথম ২০১৫ সালে শুধুমাত্র নারী খেলোয়াড়দের নিয়ে বার্ষিক ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার সূচনা করা হয়, জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে।[৭৫] একইভাবে স্বাধীনতা পূর্ব সময় থেকে জেলায় ক্রিকেট খেলার প্রচলন থাকলেও এক্ষেত্রে শুধুমাত্র নারী খেলোয়াড়দের নিয়ে কোনো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। ২০১৩ সালে সি.এ.বি পশ্চিমবঙ্গের সব জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে মহিলা ক্রিকেট দল গঠন করতে উদ্যোগ নিতে বললে নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থাও একটি মহিলা ক্রিকেট দল গঠন করে এবং ২০১৩ সাল

থেকে সি.এ.বি তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত 'আন্তঃজেলা মহিলা ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নশিপ' নামক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে থাকে। ২০১৭ সালে এই প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করার মাধ্যমে জেলার নারী ক্রিকেটাররা বুঝিয়ে দেন যে উপযুক্ত সুযোগ পেলে তারাও নিজেদের দক্ষতা তুলে ধরতে পারেন।[৭৬] উপরের আলোচনা থেকে দলগত খেলার ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণের যে সীমাবদ্ধতা তা স্পষ্টতই উঠে আসে। ক্রীড়া সংগঠনের ক্ষেত্রেও নারীদের প্রতিনিধিত্বের হার নগণ্য। জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাংগঠনিক পদে কখনওই কোনো নারী সদস্য নিযুক্ত হননি। জেলা ক্রীড়া সংস্থা এবং এমনকি ক্রীড়া ক্লাব গুলিরও কোনো গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক পদে আমরা কোনো নারীদের প্রতিনিধিত্ব লক্ষ করতে পারিনা এই সামগ্রিক সময় পর্বে।

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে জেলার মোট জনসংখ্যার ৭২.২ শতাংশ মানুষ হিন্দু এবং ২৬.৮ শতাংশ মানুষ মুসলিম সম্প্রদায় ভুক্ত।[৭৭] জেলায় জনসংখ্যায় মুসলিমদের এই বৃহৎ উপস্থিতি সত্ত্বেও খেলাধুলা ও ক্রীড়া সংগঠনের ক্ষেত্রে তাদের প্রতিনিধিত্বের হার নিতান্তই কম। এস.এম. বদরুদ্দিন দীর্ঘদিন জেলা ক্রীড়া সংস্থার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক পদের দায়িত্ব সফলতার সাথে সম্পাদন করলেও, একমাত্র তাকে ছাড়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার অপর কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদে কোনো মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের নিযুক্তির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। খেলাধুলার ক্ষেত্রেও মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষদের অংশগ্রহণের পরিমাণ থেকেছে কম। বিশেষত জেলার দলগত খেলার ক্ষেত্রে রাজ্য, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে নিজেদের দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে এমন কোনো মুসলিম সম্প্রদায়ের খেলোয়াড়দের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। তবে অ্যাথলেটিক্সে রাজ্য ও জাতীয় স্তরে নিজেদের ক্রীড়া দক্ষতার পরিচয় তুলে ধরেছে এমন অনেক মুসলিম সম্প্রদায়ের খেলোয়াড়দের আমরা চিহ্নিত করতে পারি। মুসলিম সম্প্রদায়ের অ্যাথলিটদের এই সফলতা ১৯৯০- এর দশক থেকে পরিলক্ষিত হয়। বিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে সফলতা প্রদর্শনকারী জেলার অধিবাসী মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত অ্যাথলিটদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- রাবেয়া খাতুন, ফিরোজা খাতুন, মনিরুজ্জামান বিশ্বাস, জুলফিকার হক মন্ডল, ইমচাঁদ শেখ, একরামুল হক মন্ডল, শেখ মমতাজ, জাহাঙ্গীর মণ্ডল প্রমুখ। একবিংশ শতাব্দীতে সফলতা প্রদর্শনকারী জেলার অধিবাসী মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত

অ্যাথলিটদের মধ্যে মোঃ কাসিম আলী, মফিজুল হক মন্ডল, কালামচাঁদ শেখ, রেজিনা খাতুন, সাবিনা খাতুন, সাবের আলী মন্ডল, হালিমা খাতুন প্রমুখরা হলেন উল্লেখযোগ্য।

• ৭.৭. সামাজিক ও অর্থনৈতিক সচলতা:

খেলাধুলার মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নেরও একটি প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয় জেলার খেলোয়াড়দের মধ্যে। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের সময় নদীয়া জেলাও দ্বিখন্ডিত হয়েছিল এবং এই জেলা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী হওয়ার কারণে সেখান থেকে বিপুল পরিমাণ হিন্দু উদ্বাস্তু মানুষের আগমন ঘটে জেলায়। ১৯৫১ সালের আদমশুমারির ক্ষেত্রসমীক্ষার সময় জেলায় বসবাসকারী ৪ লক্ষ ২৬ হাজার ৯৬০ জন মানুষ নিজেদের ১৯৪৬ সালের পরে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তু মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করে। উল্লেখ্য যে স্বাধীনতা লাভের সময় নদীয়া জেলায় বসবাসকারী প্রায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার মুসলিম মানুষও পূর্ব পাকিস্তানের চলে গেছিল, যদিও তাদের মধ্যে অনেকেই ১৯৫১ সালের পরবর্তীতে পুনরায় ভারতবর্ষে ফিরে আসে।[৭৮] এই বাস্তুহারা মানুষদের অধিকাংশই এই জেলার গ্রামাঞ্চলগুলিতে ও শহরের উপকণ্ঠে নতুন বসতি স্থাপন করে বসবাস করতে শুরু করে। ১৯৮০-এর দশক থেকে জেলার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে যে নতুন ক্রীড়া ক্লাবগুলি গড়ে উঠতে থাকে তার অনেক গুলোই তৈরি এই বাস্তুহারা মানুষদের দ্বারা। ১৯৮০- এর দশকের পর থেকে জেলার গ্রামাঞ্চলের ক্লাবগুলি জেলা ক্রীড়া সংস্থা পরিচালিত বিভিন্ন খেলাধুলায় যে ধারাবাহিক সফলতার নিদর্শন তুলে ধরতে থাকে তার পেছনেও এই উদ্বাস্তু পরিবারে খেলোয়াড়দের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিশেষত বাদকুল্লা অঞ্চলের অনামী ক্লাব ও অজয় সংঘ ক্লাব, আড়ংঘাটা অঞ্চলের দত্তফুলিয়া ইয়ংমেনস অ্যাসোসিয়েশন ক্লাব, নাকাশিপাড়া অঞ্চলের জুনিয়র ইস্টবেঙ্গল ক্লাব, ধুবুলিয়া ইউথ সোসাইটি ক্লাব, হালালপুর বিবেকানন্দ সংস্কৃতি সংঘ ক্লাব প্রমুখ ক্রীড়া ক্লাব গুলি জেলা ক্রীড়া সংস্থা আয়োজিত প্রতিযোগিতায় যে ধারাবাহিক সফলতা প্রদর্শন করেছে তার পেছনে এই উদ্বাস্তু পরিবারের খেলোয়াড়দের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান থেকেছে।[৭৯] আসলে এই উদ্বাস্তু পরিবারের মানুষেরা নিজেদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সচলতার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম

হিসেবে খেলাধুলাকে বেছে নিয়েছিলেন। রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ২৩.৫১ শতাংশ মানুষ যেখানে তপশিলি সম্প্রদায় ভুক্ত সেখানে জেলার মোট জনসংখ্যার ২৯.৯৩ শতাংশ মানুষ তপশিলি সম্প্রদায় ভুক্ত।[৮০] জেলায় তপশিলি সম্প্রদায়ভুক্ত অধিকাংশ মানুষেরই বসবাস গ্রামাঞ্চলে। তপশিলি সম্প্রদায় ভক্ত বিপুল সংখ্যক খেলোয়াড় জেলার গ্রামাঞ্চলের ক্লাবগুলিতে অংশগ্রহণ করে। এই তপশিলি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষেরাও নিজেদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির একটি মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতে চেয়েছিল খেলাধুলাকে।[৮১] একইভাবে জেলার নারী খেলোয়ারও নিজেদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যম হিসেবে খেলাধুলাকে গ্রহণ করতে চেয়েছিল। এক্ষেত্রে খেলার মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদাহরণ হিসেবে জেলাকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এনে দেওয়া দুই নারী অ্যাথলিট জ্যোতির্ময়ী সিকদার ও দেবশ্রী মজুমদার- এর কথা উল্লেখ করতে পারি। খেলাধুলার সফলতার মাধ্যমে এই দুই অ্যাথলিট সারা দেশে জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং পরবর্তীতে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার স্বচ্ছলতা দরুন তারা কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন।[৮২]

• ৭.৮. পর্যবেক্ষণ:

চলমান সমাজের এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে খেলাধুলা, নদীয়া জেলার পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রের নানা বৈশিষ্ট্যকে সার্থক ভাবে তুলে ধরে। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পারিপার্শ্বিক আর্থ-সামাজিক পরিবেশের সাথে সঙ্গতি রেখেই জেলায় ক্রিকেট খেলার ক্রমশ প্রসার ঘটেছে। যেখানে ক্রিকেট খেলা প্রসারের উদ্যোগ এবং অংশগ্রহণকারী ক্লাব ও খেলোয়ারদের সংখ্যাই ক্রমশ বৃদ্ধি লক্ষ করা যায়, সেখানে হকি, ভলিবল ও ফুটবলের মতো খেলায় একটি স্থবিরতা লক্ষ করা যায়। এদের মধ্যে হকি খেলাটি জেলার একমাত্র কৃষ্ণনগর শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যায় এবং এর গুরুত্ব ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। অপরদিকে ফুটবল ও ভলিবলে অংশগ্রহণকারী ক্লাব ও খেলোয়াড়দের সংখ্যা সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক বৃদ্ধি না পেলেও, তা সর্বদাই ক্রিকেটে অংশগ্রহণকারী ক্লাব ও খেলোয়াড়দের সংখ্যার থেকে বেশি থেকেছে। জেলায় ফুটবল ও ভলিবলের এই জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ জেলার আর্থ-

সামাজিক পরিবেশের মধ্যে নিহিত। জেলার আর্থ-সামাজিক পরিবেশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বলেই অ্যাথলেটিক্সে জেলার খেলোয়াড়রা ব্যাপক সাফল্য তুলে ধরেছে। অ্যাথলেটিক্সে নারীদের ব্যাপক পরিমাণে অংশগ্রহণ এবং তাদের ব্যাপক সফলতা জেলার খেলাধুলার ইতিহাসে এক অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল বিষয়। এমনকি জেলার নারী অ্যাথলিটরা পুরুষের তুলনায় অধিক পরিমাণে সফলতার নিদর্শন তুলে ধরেছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশের প্রতিনিধিত্ব করে পদক জয় লাভ করার কৃতিত্ব জেলার যে অ্যাথলিটরা দেখিয়েছেন তারা সকলেই নারী। জেলায় শহরাঞ্চল থেকে গ্রামাঞ্চলের দিকে খেলাধুলার প্রসার ঘটেছে এবং প্রতিটি অঞ্চল নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুসারে এক একটি খেলাধুলায় পারদর্শী হয়ে উঠেছে। জেলায় খেলাধুলার ব্যাপক প্রসার ঘটলেও খেলাধুলা ও ক্রীড়া সংগঠনের ক্ষেত্রে লিঙ্গ ও সম্প্রদায় গত প্রতিনিধিত্বের অসামঞ্জস্যতা বিদ্যমান। খেলাধুলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানোর তাগিদ জেলার অধিবাসীদের বিপুল পরিমাণে খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

• টীকা ও সূত্র নির্দেশ:

১. বোরিয়া মজুমদার ও নলিন মেহতা, *একশো কোটি মানুষের স্বপ্ন ভারতবর্ষ আর অলিম্পিক* (কলকাতা: দীপ প্রকাশন, ২০২০), ২৫৯।

২. David Page and William Crawley, *Satellites Over South Asia: Broadcasting, Culture and the Public Interest* (New Delhi: Penguin, 1995), 30.

৩. মজুমদার ও মেহতা, *একশো কোটি মানুষের স্বপ্ন ভারতবর্ষ আর অলিম্পিক*, ২২৭-২৪০।

৪. জেলার অধিবাসী অর্ধেন্দু চক্রবর্তী ঠাকুর জাতীয় স্তরে একাধিক বার হকি খেলায় নিজ দক্ষতার পরিচয় তুলে ধরেছেন।

৫. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ৬ই মে, ১৯৬৯, ১; ১লা জুন, ১৯৬৯, ১।

৬. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা মে, ১৯৭০, ১।

৭. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা জুন, ১৯৭২, ৩; ১লা জুন, ১৯৭৩, ২; ১লা জুলাই, ১৯৭৪, ২; ১লা জুন, ১৯৭৬, ১।

৮. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা মে, ১৯৮২, ১, ২।

9. Mihir Bose, *A History of Indian Cricket* (London: Andre Deutsch Ltd., 1990), 16-17.

10. Boria Majumdar and Kausik Bandpadhyay, "Introduction to 'A Social History of Indian Football: Striving to Score," *Soccer & Society* 6, Special Issue, no.2/3 (June-September 2005): 288.

১১. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১৫ই অক্টোবর, ১৯৮০, ১।

১২. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৮২, ১।

১৩. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১৫ই নভেম্বর, ১৯৮৬, ১, ২।

১৪. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা নভেম্বর, ২০০২, ১, ৪; ১লা ডিসেম্বর ২০১৭, ১।

১৫. নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন বয়স ভিত্তিক ফুটবল লীগে ১৯৮৪ সালে পাঁচ শতাধিক ক্লাব অংশগ্রহণ করেছিল এবং ২০০৫ সালেও এই বিভিন্ন বয়স ভিত্তিক ফুটবল লীগে অংশগ্রহণকারী ক্লাবের সংখ্যা ছিল ৫৬২- *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১৫ই আগস্ট, ১৯৮৪, ১; *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১৫ই অক্টোবর, ২০০৫, ৩।

১৬. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪, ১।

১৭. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১৫ই মার্চ ১৯৭৩, ১; ১৫ই মার্চ, ১৯৭৪, ১।

১৮. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৮০, ১; ১লা মার্চ, ১৯৮৩, ১; ১লা মার্চ, ১৯৮৪, ১, ২; ১৫ই এপ্রিল, ১৯৮৮, ১; *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১৫ই এপ্রিল ২০১০, ২; ১৫ই মে, ২০১৪, ১।

১৯. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৮৩, ২; ১লা এপ্রিল, ১৯৮৩, ১; ১লা মে, ১৯৮৫, ২; ১লা মার্চ, ১৯৯৮, ৩; ১লা মে, ২০০১, ৪; *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা এপ্রিল, ২০০৩, ১; ১লা মার্চ, ২০০৬, ৩।

২০. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা এপ্রিল, ১৯৮৫, ১; ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৮৮, ১; ১লা এপ্রিল, ১৯৯২, ৫; ১৫ই এপ্রিল, ২০০৩, ২।

২১. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮২, ১, ৪।

২২. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা জুন, ১৯৭১, ২।

২৩. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা মার্চ, ১৯৮৪, ১; ১৫ই মার্চ, ১৯৮৫, ১।

২৪. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা অক্টোবর, ২০১০, ১।

২৫. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা জানুয়ারি, ১৯৬৯, ১; ১লা জানুয়ারি, ১৯৭৯, ১।

২৬. ১৯৮৯ সালের অনুষ্ঠিত জেলা অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ক্লাবের সংখ্যা ছিল ১০৪ ও অংশগ্রহণকারী অ্যাথলিটদের এর সংখ্যা ছিল ৫৭৫- *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা জানুয়ারি, ১৯৮৯, ১, ২।

২৭. ১৯৯৮ সালের অনুষ্ঠিত জেলা অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী অ্যাথলিটদের সংখ্যা ছিল ৪০৩- *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা জানুয়ারি, ১৯৯৮, ১।

২৮. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা জানুয়ারি, ২০০২, ১।

২৯. নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক, জয়ন্ত বিশ্বাসের সাক্ষাৎকার, ১১ই নভেম্বর, ২০২৩।

৩০. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ২০০৬, ১।

৩১. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১৫ই মার্চ, ২০০৮, ১।

৩২. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা ফেব্রুয়ারি, ২০১৬, ১।

৩৩. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা জানুয়ারি, ১৯৭৪, ৩।

৩৪. ২০০৫ ও ২০০৭ সালে নদীয়া জেলা দলের তরফ থেকে রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১১ ও ৭, যা ছিল ১৯৭৫ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে সর্বনিম্ন সংখ্যক খেলোয়াড়- *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা জুন, ২০০৫, ২; ১লা অক্টোবর, ২০০৭, ২।

৩৫. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা আগস্ট, ২০১১, ১।

৩৬. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১৫ই জুলাই ২০১৭, ১।

৩৭. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৭৪, ৩; ১৫ই জুলাই, ২০১৭, ১।

৩৮. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৭১, ৩।

৩৯. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩, ৩।

৪০. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা আগস্ট, ১৯৯৪, ৪; *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১৫ই অক্টোবর, ২০১৫, ১।

৪১. নদীয়ার অধিবাসী জ্যোতির্ময়ী সিকদার ও দেবশ্রী মজুমদার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এশিয়ান গেমসে ভারতের জাতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করার পাশাপাশি স্বর্ণপদক লাভ করেছেন।

৪২. বাদকুল্লা অঞ্চলের অনামী ক্লাব কর্তৃপক্ষের সাক্ষাৎকার, ২৫শে মার্চ, ২০২৩।

৪৩. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা জানুয়ারি, ১৯৮০, ১, ৭; ১লা জানুয়ারি, ১৯৮৫, ১।

৪৪. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯, ৩।

৪৫. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৮০, ১, ২; ১৫ ই জানুয়ারি, ১৯৮৬, ১; ১৫ ই জানুয়ারি, ১৯৮৭, ১; ১লা জুন, ২০০১, ২; *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০১৪, ১; ১৫ জুলাই, ২০১৭, ১।

৪৬. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৮০, ২; ১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৮১, ৪; ১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৩, ৩।

৪৭. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা মার্চ, ১৯৯৫, ৪; ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৮, ২; *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা ডিসেম্বর, ২০১৩, ৪।

৪৮. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা আগস্ট, ১৯৯৪, ৪; ১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৫, ৪; *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা নভেম্বর, ২০০৬, ১; ১লা আগস্ট, ২০১০, ১; ১লা আগস্ট, ২০১২, ১; ১লা সেপ্টেম্বর, ২০১৩, ১; ১৫ই অক্টোবর, ২০১৪, ১; ১৫ই অক্টোবর, ২০১৫, ১; ১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০১৬, ১।

৪৯. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা মার্চ, ১৯৯৫, ৪।

৫০. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা নভেম্বর, ২০০৬, ১।

৫১. *District Census Handbook Nadia 1971*, Part X-C, Director of Census Operations, West Bengal (Kolkata: Government Printing West Bengal, 1971), III.

৫২. *District Census Handbook Nadia 2011*, Series 20, Part XII-B (West Bengal: Directorate of Census Operations, 2011), 26.

৫৩. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১৫ই আগস্ট, ১৯৬৮, ৩।

৫৪. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯, ২।

৫৫. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১, ১, ২; ১৫ই আগস্ট, ১৯৭১, ১; ১৫ই মার্চ, ১৯৭২, ২; ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৫, ১, ২।

৫৬. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩, ৩।

৫৭. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৮৩, ১, ২।

৫৮. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৯১, ১।

৫৯. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১৫ই জুলাই, ১৯৯২, ১।

৬০. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১৫ই অক্টোবর, ১৯৯৪, ১, ২।

৬১. *নদীয়া ডিস্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৯৭, ১, ২; ১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০০১, ১, ২; *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ২০০৪, ১, ২।

৬২. বাদকুল্লা অঞ্চলের অনামী ক্লাব ও অজয় সংঘ ক্লাবের কর্তৃপক্ষের সাক্ষাৎকার, ২৫শে মার্চ, ২০২৩।

৬৩. কৃষ্ণনগরের হকি খেলার সাথে যুক্ত কয়েকটি ক্লাব হলো- কৃষ্ণনগর টাউন ক্লাব, কৃষ্ণনগর তরুণ সংঘ, কৃষ্ণনগর অমর ভারতী সংঘ, হিরোজ ক্লাব, স্বীকৃতি ক্লাব।

৬৪. বাদকুল্লা অঞ্চলের অনামী ক্লাব ও অজয় সংঘ ক্লাবের কর্তৃপক্ষের সাক্ষাৎকার, ২৫শে মার্চ, ২০২৩।

৬৫. রানাঘাট আঞ্চলিক ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদকের সাক্ষাৎকার, ১২ই মে, ২০২৩।

৬৬. ভলিবলে জেলা স্তরে সফলতা প্রদর্শনকারী শান্তিপুরের কয়েকটি ক্লাব- শান্তিপুর অ্যামেচার ক্লাব, সরল স্মৃতি সংঘ ক্লাব, শান্তিপুর স্পোর্টিং ইউনিয়ন, সূত্রাগড় সিটি ক্লাব।

৬৭. কল্যাণী টাউন ক্লাবের সাধারণ সম্পাদকের সাক্ষাৎকার, ১১ই জুলাই, ২০২৩।

৬৮. *District Census Handbook Nadia 1971*, Part X-C, Director of Census Operations, West Bengal (Kolkata: Government Printing West Bengal, 1971), III.

৬৯. *District Census Handbook Nadia 2011*, Series 20, Part XII-B (West Bengal: Directorate of Census Operations, 2011), 26.

৭০. *নদীয়া ডিস্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা জানুয়ারি, ১৯৭৮, ১, ৪।

৭১. *নদীয়া ডিস্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা জানুয়ারি, ১৯৮০, ১; ১লা জানুয়ারি, ১৯৮৫, ১।

৭২. *নদীয়া ডিস্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা এপ্রিল, ১৯৯২, ৬; ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৯৫, ১, ৩।

৭৩. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১৫ই ফেব্রুয়ারি ২০১১, ১।

৭৪. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১৫ই মার্চ, ২০১৩, ১।

৭৫. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১লা মার্চ ২০১৫, ২।

৭৬. *নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ*, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৩, ১; ১ এপ্রিল, ২০১৭, ১।

৭৭. *District Census Handbook Nadia 2011*, Series 20, Part XII-A (West Bengal: Directorate of Census Operations, 2011), 45.

৭৮. *District Census Handbook Nadia 1951* (Calcutta: Sree Saraswaty Press Ltd., 1953), XX.

৭৯. বাদকুল্লা অঞ্চলের অনামী ক্লাব ও অজয় সংঘ ক্লাবের কর্তৃপক্ষের সাক্ষাৎকার, ২৫শে মার্চ, ২০২৩; জুনিয়র ইস্টবেঙ্গল ক্লাব কর্তৃপক্ষের সাক্ষাৎকার, ৩০শে আগস্ট, ২০২৩; হালালপুর বিবেকানন্দ সংস্কৃতি সংঘ ক্লাব কর্তৃপক্ষের সাক্ষাৎকার, ৮ই অক্টোবর, ২০২৩; দত্তফুলিয়া ইয়ংমেনস অ্যাসোসিয়েশন ক্লাব কর্তৃপক্ষের সাক্ষাৎকার, ২৮শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩; ধুবুলিয়া ইউথ সোসাইটি ক্লাব কর্তৃপক্ষের সাক্ষাৎকার, ৭ই সেপ্টেম্বর, ২০২৩।

৮০. *District Census Handbook Nadia 2011*, Series 20, Part XII-B (West Bengal: Directorate of Census Operations, 2011), 17.

৮১. সোমা বিশ্বাস, সাক্ষাৎকার, ২০শে জানুয়ারি, ২০২৩; সারথি বর্মন, সাক্ষাৎকার, ২৩শে জানুয়ারি, ২০২৩; সুশোভন সরকার, সাক্ষাৎকার, ২০শে জানুয়ারি, ২০২৩; তেজাব বিশ্বাস, সাক্ষাৎকার, ১৪ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৩; কিশোরী মন্ডল, সাক্ষাৎকার, ২৪শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩; টুম্পা চুনারী, সাক্ষাৎকার, ৭ই মার্চ, ২০২৩; অনিতা দাস, সাক্ষাৎকার, ১১ই মে, ২০২৩; তুষার কুন্ডু, সাক্ষাৎকার, ১৮ই এপ্রিল, ২০২৩; শংকর বিশ্বাস, সাক্ষাৎকার, ২০শে আগস্ট, ২০২৩।

৮২. দেবশ্রী মজুমদার, সাক্ষাৎকার, ৫ই জানুয়ারি, ২০২৪।

অষ্টম অধ্যায়:

উপসংহার

খেলাধুলা মানব সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। প্রাচীনকাল থেকেই বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে ওঠা প্রাচীন মানব সভ্যতা গুলিতে আমরা বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা প্রচলিত থাকতে দেখি বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে। সভ্যতার ক্রম অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে খেলাধুলার ক্ষেত্রেও দেখা দেয় ব্যাপক পরিবর্তন। মানব সভ্যতার বিবর্তনের পথে বহু খেলাধুলা বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং অনেক নতুন খেলাধুলার প্রচলন ঘটে। মানব সমাজের যে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট তার ওপর ভিত্তি করেই খেলাধুলা গুলি বিকশিত হয়। সভ্যতার অগ্রগতির পথে যেহেতু সমাজের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন ঘটে তাই তার সাথে সঙ্গতি রেখে খেলাধুলার ক্ষেত্রেও দেখা দেয় নানা পরিবর্তন। অর্থাৎ মানব সমাজের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে খেলাধুলার এক গভীর সংযোগ বর্তমান। তাই মানব সমাজের এক গুরুত্বপূর্ণ বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে খেলাধুলা গুলি প্রচলিত থাকলেও একে শুধুমাত্র বিনোদনের মাধ্যম হিসেবেই বিবেচনা করা ঠিক নয়। মানব সমাজের পরিবর্তনশীল আর্থ-সামাজিক, এমন কি রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যের দ্বারাও খেলাধুলা গুলি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকে। ফলে কোনো সমাজের পরিবর্তনশীল আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা যথার্থ ভাবে অনুধাবন করতে হলে ওই সমাজে প্রচলিত খেলাধুলার ইতিহাস গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। মানব সমাজের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি অনুধাবনের ক্ষেত্রে খেলাধুলার এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও প্রথাগত তাত্ত্বিক জ্ঞানচর্চার কাঠামোই দীর্ঘদিন খেলাধুলাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। প্রাথমিক পর্যায়ে নৃতাত্ত্বিকরা সমাজে খেলাধুলার যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তা বিশ্লেষণ করতে সচেষ্ট হন। মানব সমাজের ইতিহাস রচনার ধারা অত্যন্ত প্রাচীন হলেও খেলার ইতিহাস রচনার ধারা অপেক্ষাকৃত নতুন এক বিষয়। ইতিহাসের বিষয়বস্তু হিসেবে খেলাধুলা দীর্ঘকাল ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এসে প্রথম খেলাধুলার ইতিহাস রচিত হতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকেরা বিশেষত ব্রিটেন ও ইউরোপের ঐতিহাসিকেরা মানব সমাজে খেলাধুলার গুরুত্বকে যথার্থভাবে তুলে ধরতে সচেষ্ট হন। খেলাধুলার ইতিহাসচর্চায় বিভিন্ন আঙ্গিক থেকে সমাজে খেলাধুলার গুরুত্বকে বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা করা হয়। শ্রেণী চেতনা, সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয়তাবাদের মতো বিষয়গুলি কিভাবে খেলাধুলা কে প্রভাবিত করে তার যেমন ইতিহাস রচিত হতে থাকে তেমনি অন্যদিকে অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েও খেলাধুলার ইতিহাসকে বিশ্লেষণের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। খেলাধুলার ইতিহাস রচনার এই নতুন ধারা ভারতবর্ষে

প্রসার লাভ করতে বিশেষ দেরি হয়নি। বিংশ শতাব্দীর আশির দশক থেকে আমরা ভারতের খেলাধুলার ইতিহাস রচিত হতে দেখি। তবে ভারতে খেলাধুলার ইতিহাস রচনা প্রধানত বৃহৎ ইতিহাস কেন্দ্রিক থেকেছে। এক্ষেত্রে 'বৃহৎ ইতিহাস' বলতে প্রসারিত ভৌগোলিক অঞ্চল অথবা জনপ্রিয়তার নিরিখে প্রধান খেলা গুলিকে বোঝানো হয়েছে। যেমন ভারতে খেলাধুলার ইতিহাস রচিত হয়েছে প্রধানত ক্রিকেট ও ফুটবলের মতো জনপ্রিয় খেলা গুলিকে কেন্দ্র করে এবং এক্ষেত্রেও বোম্বে বা কলকাতার মত প্রাচীন ও বৃহত্তর নগর অথবা পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্য অথবা বৃহত্তর ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে খেলার ইতিহাস রচিত হয়েছে। ক্ষুদ্র ভৌগোলিক পরিসরে বিশেষত জেলা ভিত্তিক খেলার ইতিহাস রচিত হতে বিশেষ দেখা যায় না। এই গবেষণা সন্দর্ভে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অন্তর্গত এক জেলা হিসাবে নদীয়া জেলার খেলাধুলার ইতিহাস রচনা করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে একটি নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে। এক্ষেত্রে খেলাধুলা বলতে প্রধানত ক্রিকেট, ফুটবল, ভলিবল ও অ্যাথলেটিক্সের মতো পাশ্চাত্য খেলাধুলা কে বোঝানো হয়েছে এবং নির্দিষ্ট সময়কাল বলতে ১৯৬৭ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত সময়কালকে চিহ্নিত করা হয়েছে। উল্লেখিত পাশ্চাত্য খেলাধুলাগুলিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বিতা মূলক প্রতিযোগিতা যেহেতু বর্তমানে রাজ্য ও জাতীয় স্তরের বিভিন্ন ক্রীড়া নিয়ন্ত্রক সংস্থা দ্বারা অনুমোদিত নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার দ্বারা আয়োজিত হয়ে থাকে তাই উক্ত খেলাধুলা গুলিকে বেছে নেওয়া হয়েছে।

যেকোনো বস্তু অথবা বিষয় সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা বা বোধ সেটি প্রকাশিত হয় ভাষার মাধ্যমে। ভাষা হলো এক সামাজিক নির্মাণ এবং অনেক ক্ষেত্রেই তা ক্ষমতার কাঠামোর দ্বারা প্রভাবিত। সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে শব্দের অর্থের সংকোচন ও প্রসারণ এবং উন্নয়ন ও অবনমন উভয়ই সাধিত হতে দেখা যায়। খেলাধুলা সংক্রান্ত যেকোনো ইতিহাস আলোচনার আগে আমাদের প্রথমে 'খেলা' শব্দটির অর্থ যথার্থভাবে নির্ধারণ করতে হয়। 'খেলা' শব্দটির অর্থ নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে আমরা আন্তঃবিষয়ক পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারি। বাংলা ভাষায় 'খেলা' ও 'ক্রীড়া' এবং ইংরেজি ভাষায় 'play', 'game', ও 'sport' শব্দগুলির অর্থের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে যথার্থ অর্থ বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ছাড়াও বিভিন্ন তাত্ত্বিক দার্শনিকরা খেলার যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা উল্লেখের

দাবি রাখে। শিক্ষাবিজ্ঞানীরাই সর্ব প্রথম খেলার সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে সচেষ্ট হন এবং খেলার নানা বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করেন। তবে শিক্ষাবিজ্ঞানীরা মূলত খেলার সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলা গুলিকেই বিশ্লেষণ করেছেন। পরবর্তীতে নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকেরা যখন খেলার সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে সচেষ্ট হন তখন তারা অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা মূলক ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা মূলক খেলার মধ্যে স্পষ্টতই বিভাজন করেন। 'খেলা' শব্দটির অর্থ নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে এই ভাষাগত ও তাত্ত্বিক আলোচনার মাধ্যমে এর যথার্থ অর্থ অনুধাবন করা যায়। গোটা বিংশ শতাব্দী জুড়ে ইতিহাস রচনার বিষয়বস্তু সম্প্রসারণের যে প্রচেষ্টা যার ফলে বিজ্ঞানের ইতিহাস, জনস্বাস্থ্যের ইতিহাস, অভিবাসনের ইতিহাস ইত্যাদির মতো নতুন বিষয়গুলি ইতিহাস রচনার অন্তর্ভুক্ত হয়, সেই প্রচেষ্টারই একটি অঙ্গ হিসেবে খেলাধুলার ইতিহাস চর্চারও সূচনা হয়। খেলাধুলা ও সমাজের মধ্যে গভীর যোগ সূত্র বর্তমান যার ফলে কোনো গুরুত্বপূর্ণ খেলায় জয় লাভ করা হয়ে ওঠে জাতীয় গৌরবের প্রতীক, আবার একইভাবে কোনো গুরুত্বপূর্ণ খেলায় পরাজয় হয়ে ওঠে জাতীয় অবমাননার প্রতীক। এমনকি প্রতিবেশী দেশের সাথে পারস্পরিক দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে সুসম্পর্ক স্থাপনের পরিবেশ রচনার ক্ষেত্রে কূটনৈতিক মাধ্যম হিসেবেও খেলাধুলার ব্যবহার লক্ষ করা যায় এবং এই প্রসঙ্গে আমরা ২০০৫ সালে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘটিত শুভেচ্ছা সফরের কথা উল্লেখ করতে পারি।[১]

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় সমাজে বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা প্রচলিত থাকতে দেখা যায়। কিন্তু পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেকেই প্রাচীনকালে ভারতে যথার্থ খেলাধুলার প্রচলন ছিল না বলে মত দিয়েছেন। আমাদের মনে রাখতে হবে যে ভারতের প্রথম যথার্থ ইতিহাস গ্রন্থের মর্যাদা দেওয়া হয় কলহনের রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থকে যা খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দীতে রচিত, অথচ ভারতীয় উপমহাদেশে হরপ্পা সভ্যতা নামে এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত যে প্রাচীনতম নাগরিক সভ্যতার সন্ধান পাওয়া গেছে তার সূচনাকাল আনুমানিক চার হাজার বছর আগে। তাই লিখিত ইতিহাস গ্রন্থের অভাবে আমাদের মূলত বিভিন্ন সাহিত্যিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের সাহায্যে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস নির্মাণ করতে হয়। প্রাচীন ভারতে রচিত একাধিক সাহিত্যিক উপাদানে এবং প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান হিসেবে স্বীকৃত বহু স্থাপত্য

ও ভাস্কর্যে আমরা খেলাধুলার নানা নিদর্শন লক্ষ করতে পারি। এই সমস্ত উপাদানের সাক্ষ্য থেকে আমরা প্রাচীন ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা যথা- মল্ল ক্রীড়া, তীরন্দাজি, ঘোড় দৌড়, রথ চালনা ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে পারি। মধ্যযুগে তুর্কি ও মুঘলদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন ভারতে পোলোর মতো নতুন খেলার প্রচলন ঘটে, তেমনই অন্যদিকে প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত মল্ল ক্রীড়ার মতো খেলা গুলিও সমান জনপ্রিয় ছিল। পরবর্তীতে আধুনিক যুগে ইউরোপীয় তথা ইংরেজদের আগমনের ফলে খেলাধুলায় এক নতুন ক্ষেত্রের সূচনা ঘটে। ইউরোপীয়দের আগমনের ফলে এদেশে নতুন পাশ্চাত্য খেলাধুলার প্রচলন ঘটে। প্রাথমিক পর্যায়ে ভারতে পাশ্চাত্য খেলাধুলা প্রচলনের ক্ষেত্রে ইংরেজদের কোনো সুচিন্তিত উদ্যোগ না থাকলেও ক্রমশ ভারতীয় সমাজে পাশ্চাত্য খেলাধুলা গুলি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এমনকি পাশ্চাত্য খেলাধুলা প্রচলনের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যও পরিলক্ষিত হয়, যার দরুণ আমরা লক্ষ করতে পারি ভারতীয় উপমহাদেশের এক একটি অঞ্চলে এক একটি পাশ্চাত্য খেলাধুল বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। যেমন ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত কলকাতা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে ফুটবল খেলা জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত বোম্বে ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে ক্রিকেট খেলা জনপ্রিয়তা লাভ করে। অনেক সময় ভারতে প্রচলিত পাশ্চাত্য খেলাধুলা গুলিকে এদেশে সাংস্কৃতিক আধিপত্য স্থাপনের সাম্রাজ্যবাদী হাতিয়ার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে ফুটবল ও ক্রিকেটের মতো খেলা গুলি অনেক ক্ষেত্রে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রকাশের মাধ্যম হয়ে ওঠে। পরবর্তীতে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটলেও এই পাশ্চাত্য খেলাধুলা গুলি ভারতে প্রচলিত থেকে যায় এবং তা ভারতীয় সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে ওঠে। অবশ্য ভারতে প্রচলিত পাশ্চাত্য খেলাধুলা গুলির মধ্যে ক্রিকেট ক্রমশ সর্বাধিক জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এমনকি হকি ও ফুটবলের তুলনায় প্রাথমিক পর্যায়ে ক্রিকেট খেলায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সফলতা অনেক সীমিত হলেও ক্রিকেট ক্রমশ ভারতীয় সমাজে ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। টেলিভিশনের প্রচলনের পর ক্রিকেট খেলার সরাসরি সম্প্রচার ও বিভিন্ন ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষায় তার ধারাভাষ্য প্রদান ক্রিকেট খেলাকে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে সাহায্য করেছিল। ভারতীয় সমাজে ক্রিকেট খেলার এই অত্যাধিক জনপ্রিয়তা দরুন হকি, ফুটবল ও

অ্যাথলেটিক্সের মতো খেলা গুলি ক্রমশ তাদের জনপ্রিয়তা হারায় এবং এর ফলে এই খেলাধুলা গুলিতে ভারত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত সফলতা কখনওই লাভ করতে পারেনি।

পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত অন্যতম এক জেলা হলো নদীয়া জেলা। নদীয়া জেলার প্রাচীন যুগের ইতিহাস সুস্পষ্ট ভাবে জানা না গেলেও মধ্যযুগ থেকে আমরা মোটামুটি ভাবে জেলার ধারাবাহিক ইতিহাস জানতে পারি। নদীয়া জেলার নামকরণ হয়েছে জেলার অন্যতম প্রাচীন শহর নবদ্বীপের নামানুসারে। মুঘল যুগে নদীয়ার জমিদারী বংশ যারা ‘নদীয়া রাজ’ নামেও পরিচিত তাদের রাজত্বেই নদীয়া একটি বৃহত্তর অঞ্চল হিসেবে পরিগণিত হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান হিসেবে নবদ্বীপ বৈষ্ণব ধর্মালম্বীদের কাছে বিশেষত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মানুষদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত। তবে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই নবদ্বীপ মূলত একটি সংস্কৃত শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। পরবর্তীতে নদীয়ার জমিদারী বংশের অন্যতম উজ্জ্বল পুরুষ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের আমলে নদীয়া শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র হিসেবে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনে আধুনিক জেলা হিসেবে নদীয়া গড়ে ওঠে ১৭৮৭ সালে এবং সমগ্র ঔপনিবেশিক শাসন পর্বে বিভিন্ন সময়ে নদীয়া জেলার আয়তনে পরিবর্তন সাধিত হলেও মোটের উপর নদীয়া জেলা কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, কৃষ্ণনগর ও রানাঘাট- এই পাঁচটি মহকুমা নিয়ে গঠিত থাকে। নদীয়া জেলার আয়তনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয় ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময়। দেশভাগের সময় নদীয়া জেলাও দ্বিখন্ডিত হয়েছিল। জেলার চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া ও মেহেরপুর মহকুমা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং এই তিনটি মহকুমা নিয়ে গঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তানের কুষ্টিয়া জেলা। অপরদিকে রানাঘাট ও কৃষ্ণনগর মহকুমা যা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল সেই অঞ্চলের নামকরণ হয় নদীয়া জেলা নামে।[২]

নদীয়ায় পাশ্চাত্য খেলাধুলার প্রচলন ঘটে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর সূচনায়। প্রাথমিক পর্যায়ে জেলায় খেলাধুলা কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর, রানাঘাট, চাকদহ ও নবদ্বীপের মতো জেলার প্রধান শহরগুলিতে কেন্দ্রীভূত ছিল। এই সময় জেলায় বিশেষত কৃষ্ণনগর অঞ্চলে খেলাধুলা প্রসারের ক্ষেত্রে স্কুল ও কলেজগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। কৃষ্ণনগর শহর জেলার প্রধান সদর

শহর হওয়ার কারণে প্রাথমিক পর্যায়ে এই শহরটি খেলাধুলায় অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বিশেষ অগ্রসর ছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে জেলায় অন্যান্য পাশ্চাত্য খেলার তুলনায় ফুটবল খেলা অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। প্রধানত ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করেই এই সময় জেলায় বিভিন্ন ক্রীড়া ক্লাব গড়ে উঠতে থাকে। ফুটবলের পরবর্তীতে জেলায় হকি, ক্রিকেট, অ্যাথলেটিক্স ও ভলিবলের মতো খেলা গুলিও প্রচলিত হতে থাকে। প্রাথমিক পর্যায়ে জেলায় খেলাধুলা গুলিকে সংগঠিতভাবে আয়োজন ও নিয়ন্ত্রণ করার মতো কোনো কেন্দ্রীয় সংস্থা না থাকায় এই সময় বিভিন্ন আঞ্চলিক ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতা জেলায় আয়োজিত হতে থাকে। এই সময় জেলার একাধিক খেলোয়াড় কলকাতায় ইস্টবেঙ্গল, এরিয়ান্স, ও মোহনবাগানের মতো প্রথম শ্রেণীর ফুটবল দলগুলিতে সফলতার সঙ্গে ফুটবল খেলে এই খেলায় নিজেদের দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। রানাঘাটের বাসিন্দা অজিত নন্দী, অনিল নন্দী, নিখিল নন্দী ও সুনীল নন্দী জেলায় খেলাধুলার জগতের যারা 'নন্দী ব্রাদার্স' নামে পরিচিত, তাদের মধ্যে অজিত, অনীল ও নিখিল নন্দী তিনজনই ভারতীয় ফুটবল দলের হয়ে ফুটবল খেলেছেন। জেলায় সংগঠিত ভলিবল খেলার সূচনা হয়েছিল ১৯৫০ সালে কৃষ্ণনগর ভলিবল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে। তবে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জেলায় একাধিক ক্রীড়া ক্লাব গঠিত হলেও শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এই ক্লাব গুলির মধ্যে অধিকাংশ পরবর্তীতে অবলুপ্ত হয়ে যায়, যদিও একই সঙ্গে অনেক নতুন ক্রীড়া ক্লাব গড়ে উঠতেও থাকে।[৩]

নদীয়া জেলার প্রধান ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসেবে ১৯৩৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা। প্রতিষ্ঠার সময় এই সংস্থার নাম ছিল নদীয়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন (Nadia Sporting Association), এবং ১৯৫২ সালে এই নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন (Nadia District Sports Association) যা বর্তমানেও একই রয়ে গেছে।[৪] ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসক দ্বারা এই সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রধানত জেলার যুব সমাজকে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে দূরে রেখে ক্রীড়া ক্ষেত্রে ব্যস্ত রাখার উদ্দেশ্যে। ফলে এই সংস্থাটি মূলত জেলায় রয়ে যাওয়া ঔপনিবেশিক শাসক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি সংস্থার অবশেষে কিন্তু সংস্থাটির ক্রমশই ভারতীয় করণ ঘটে। ব্রিটিশ শাসকগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই ক্রীড়া সংস্থায় স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত জনপ্রতিনিধিত্বের

কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। কিন্তু স্বাধীনতার পরবর্তীতে জেলার সমস্ত অঞ্চলের ক্লাবগুলি চেয়েছিল জেলা ক্রীড়া সংস্থায় তাদের প্রতিনিধিত্ব। স্বাধীনতার পরবর্তীতে নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার যে নতুন নিয়ম সংহিতা রচিত হয়েছিল তাতে ক্লাব গুলির যথার্থ প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা না থাকায় তারা ক্ষুব্ধ হয়েছিল এবং প্রতিনিধিত্বের দাবিকে কেন্দ্র করে জেলা ক্রীড়া সংস্থার কর্তাদের সঙ্গে তাদের মতবিরোধ শুরু হয়েছিল। এই বিরোধ এতটাই তীব্র হয়েছিল যে ১৯৫২ থেকে ১৯৫৪ সালের মধ্যে বিক্ষুব্ধ ক্লাবগুলি একটি নিজস্ব ক্রীড়া সংস্থা গড়ে তুলেছিল। এমনকি নদীয়া জেলার তৎকালীন জেলা শাসক যিনি পদাধিকার বলে জেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি ছিলেন, তিনি বিক্ষুব্ধ ক্লাব গুলির সংস্থার সভাপতির পদ গ্রহণ করে তাদের সংগঠনকেই স্বীকৃতি দেন। এর ফলে এই সময় পর্বে জেলার ক্রীড়া জগতে একটি বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত ১৯৫৪ সালে জেলা ক্রীড়া সংস্থার নতুন নিয়ম সংহিতা রচিত হয় যেখানে সমস্ত ক্লাবগুলোর উপযুক্ত প্রতিনিধিত্বের ও দু’বছর অন্তর জেলা ক্রীড়া সংস্থার সমস্ত পদে নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধি নিযুক্ত করার ব্যবস্থা গৃহীত হলে যাবতীয় বিরোধের অবসান হয় এবং নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা জেলার একমাত্র ক্রীড়া সংস্থা হিসেবে নিজ স্বীকৃতি ফিরে পায়। ১৯৬৭ সালে কৃষ্ণনগরে নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার অধীনস্থ স্টেডিয়াম স্থাপনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়, বর্তমানে এটি একই সঙ্গে জেলা ক্রীড়া সংস্থার মুখ্য কার্যালয়ও। একটি ক্রীড়া সংস্থা হওয়া সত্ত্বেও নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা সর্বদাই সামাজিক সচেতনতার নজির স্থাপন করেছে নিজের কাজের মাধ্যমে। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই জেলা ক্রীড়া সংস্থা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সামাজিক কাজে দান করার জন্য অর্থ সংগ্রহ করার মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বহু জনপ্রিয় ক্রীড়া দলের প্রদর্শনী খেলার আয়োজন করেছে জেলাই।

মূলত একটি জেলা ক্রীড়া সংস্থা হওয়া সত্ত্বেও নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে খেলাধুলার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পূর্বে মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকেই বাংলাদেশের সাথে নদীয়া জেলার ক্রীড়া ক্ষেত্রে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল কারণ মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতবর্ষে বাংলাদেশী ফুটবল খেলোয়াড়দের নিয়ে যে বাংলা দল গঠিত হয়েছিল তারা তাদের প্রথম প্রদর্শনী খেলা খেলেছিল ১৯৭১ সালের ২৫শে

জুলাই কৃষ্ণনগর স্টেডিয়ামে নদীয়া একাদশের বিরুদ্ধে। আবার বিদেশী দল হিসাবে নদীয়া জেলা ফুটবল দলই প্রথম বাংলাদেশের মাটিতে ফুটবল খেলেছিল ১৯৭২ সালে। ১৯৭২ সালের ২৬শে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত উৎসবের অংশ হিসেবে বাংলাদেশের তরফ থেকে নদীয়া জেলা ফুটবল দলকে একটি প্রদর্শনী ফুটবল খেলায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ করা হয়, যা নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা গ্রহণ করে এবং বাংলাদেশে গিয়ে বাংলাদেশ ইনডাসট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন নামে একটি ফুটবল দলের বিরুদ্ধে প্রদর্শনী খেলায় অংশগ্রহণ করে।[৫] এর পরবর্তীতেও বাংলাদেশের জাতীয় ফুটবল ও ক্রিকেট দলও একাধিক বার জেলা স্টেডিয়ামে বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহণ করেছে। জেলা ক্রীড়া সংস্থা যাতে জেলার খেলোয়াড়রা খেলার প্রতি উৎসাহিত হয় এবং জেলার ক্রীড়া প্রেমীরা উন্নতমানের খেলাধুলা জেলায় দেখতে পারে সেই উদ্দেশ্যে রাজ্য ও জাতীয় স্তরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতার খেলা গুলিকে জেলায় আয়োজন করতে সর্বদাই সচেষ্ট থেকেছে। যার ফলে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের মতো কলকাতার প্রথম শ্রেণীর ক্লাব, ইন্দোনেশিয়ার ফুটবল দলের মতো জাতীয় ফুটবল দল নদীয়া জেলায় খেলায় অংশগ্রহণ করেছে এবং এর পাশাপাশি জাতীয় স্তরের ক্রিকেট প্রতিযোগিতার একাধিক খেলাও জেলায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা ক্রীড়া সংস্থা তার প্রধান কাজ অর্থাৎ জেলায় খেলাধুলার প্রসারের বিষয়ে নিজ ভূমিকা সর্বদাই যথার্থভাবে পালন করেছে। জেলায় খেলাধুলা প্রসারের জন্য নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক ক্রীড়া সংস্থা গঠন করে থাকে। ১৯৭০- এর দশকের আগে পর্যন্ত নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার অধীনে নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর, রানাঘাট, চাকদহ ও কল্যাণীর মতো শহরাঞ্চলেই কেবল আঞ্চলিক ক্রীড়া সংস্থা গঠিত ছিল। কিন্তু জেলা ক্রীড়া সংস্থার সক্রিয়তার ফলে ১৯৮০- এর দশকের মধ্যেই জেলার সমস্ত ব্লকে আঞ্চলিক ক্রীড়া সংস্থা গঠিত হয়। একদিকে যেমন জেলায় প্রচলিত ভলিবল, ক্রিকেট, ফুটবল ও অ্যাথলেটিক্স- এর মতো খেলাধুলা গুলিকে প্রসারের ক্ষেত্রে জেলা ক্রীড়া সংস্থা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে, তেমনি অন্যদিকে ব্যাডমিন্টন ও টেবিল টেনিসের মতো খেলা গুলি যেগুলি তেমনভাবে জেলায় প্রচলিত হতে পারনি সেগুলিও যাতে জেলায় প্রসারিত হতে পারে এবং সেই খেলা গুলিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা আয়োজিত হতে পারে সেই বিষয়েও সচেষ্ট থেকেছে জেলা ক্রীড়া

সংস্থা। এছাড়াও জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে বিভিন্ন খেলাধুলায় জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। মূলত একটি ক্রীড়া সংগঠন হওয়া সত্ত্বেও জেলা ক্রীড়া সংস্থা জেলার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিশেষত জেলার খেলাধুলার ইতিহাস সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে।

জেলার একাধিক খেলোয়াড় ও ক্রীড়া সংগঠক রাজ্য, জাতীয়, এমনকি আন্তর্জাতিক স্তরেও নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর তুলে ধরেছেন। নদীয়া জেলার একাধিক খেলোয়াড় হকি, ভলিবল, ক্রিকেট, ফুটবল ও অ্যাথলেটিক্স- এর মত খেলায় নিজেদের দক্ষতার পরিচয় দিলেও এক্ষেত্রে যারা ধারাবাহিক ভাবে রাজ্য ও জাতীয় স্তরে নিজেদের দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে অথবা আন্তর্জাতিক স্তরে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে একমাত্র তাদের সফলতার বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে গবেষণা সন্দর্ভে। যেকোনো ক্রীড়া সংক্রান্ত কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে ক্রীড়া সংগঠক ও ক্রীড়া পরিচালক অর্থাৎ আম্পায়ারদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। নদীয়া জেলার সৌভাগ্য যে নদীয়া জেলায় একাধিক ক্রীড়া সংগঠকের আবির্ভাব ঘটেছে যাদের দক্ষ পরিচালনায় জেলায় বিভিন্ন খেলাধুলা সংক্রান্ত কার্যাবলী গুলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়েছে এবং একই সঙ্গে খেলাধুলার প্রসারও ঘটেছে। এই ক্রীড়া সংগঠকেরা জেলার বাইরে নিজেদের দক্ষতার পরিচয় দিয়ে রাজ্য ও জাতীয় স্তরে খেলাধুলা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রসিদ্ধ ক্রীড়া সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদে নিযুক্ত হয়েছেন এবং নিজেদের দায়িত্ব সফলতার সঙ্গে পালন করেছেন। জেলার একাধিক ক্রীড়া পরিচালকও রাজ্য, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে নিজেদের দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। জেলার বিশিষ্ট খেলোয়াড় ও ক্রীড়া সংগঠকদের ভূমিকা কে যথার্থ গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ না করে জেলার যথার্থ ক্রীড়া ইতিহাস কখনও রচিত হতে পারেনা। তাই এই গবেষণা সন্দর্ভে জেলার সফল খেলোয়াড় ও ক্রীড়া সংগঠকদের সফলতার বর্ণনা যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে ও বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। সমগ্র নদীয়া জেলায় গড়ে উঠেছে অসংখ্য ক্রীড়া ক্লাব যাদের মাধ্যমে তৃণমূল স্তরে খেলাধুলা সংক্রান্ত কার্যাবলী গুলি পরিচালিত হয়ে থাকে। জেলায় খেলোয়াড়দের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করে থাকে এই ক্রীড়া ক্লাবগুলি। জেলার যে সমস্ত খেলোয়াড়েরা রাজ্য, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে নিজেদের দক্ষতার পরিচয়

দিয়েছে তাদের প্রায় প্রত্যেকেই তাদের খেলোয়ার জীবনের সূচনায় জেলার কোনো না কোনো ক্রীড়া ক্লাবের সাথে যুক্ত থেকেছেন। জেলার ক্রীড়া ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এই সমস্ত ক্রীড়া ক্লাবগুলির যথার্থ ভূমিকা কে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া একান্ত আবশ্যিক। নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক অনুমোদিত যে সমস্ত ক্রীড়া ক্লাবগুলি জেলা স্তরে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সফলতার পরিচয় দিয়েছে এক্ষেত্রে তাদের বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে গবেষণা সন্দর্ভে।

জেলার আর্থ-সমাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে খেলাধুলার গভীর সংযোগ বর্তমান। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা জেলায় প্রচলিত খেলাধুলা গুলির জনপ্রিয়তা ও প্রসারের ক্ষেত্রেও তারতম্য লক্ষ করতে পারি। নদীয়া জেলায় হকি খেলা প্রচলিত থাকলেও সেই খেলা মূলত কৃষ্ণনগর শহর সংলগ্ন অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থেকেছে কখনওই সমগ্র জেলায় প্রসার লাভ করেনি এবং ১৯৮০- এর দশকের পর থেকে এই খেলার জনপ্রিয়তা আরও হ্রাস পায়। জেলায় ফুটবল খেলা প্রথম থেকে প্রচলিত থাকলেও জেলার গ্রামাঞ্চলে এই খেলা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং গ্রামাঞ্চলের নতুন নতুন ক্লাবগুলি এই খেলায় অংশগ্রহণ করতে থাকে। ১৯৯০- এর দশক পর্যন্ত জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন বয়স ভিত্তিক ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ফুটবল দলগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও, ১৯৯০- এর দশকের পর থেকে এই সংখ্যা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়নি বরং একটি স্থবিরতা লক্ষ করা যায়। অপরদিকে ১৯৮০- এর দশকের পর থেকেই জেলায় ক্রিকেট খেলার জনপ্রিয়তা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে, বিশেষত রানাঘাট, চাকদহ, কৃষ্ণনগর ও কল্যানীর মতো শহরাঞ্চল গুলিতে ক্রিকেট খেলার জনপ্রিয়তা ব্যাপক বৃদ্ধি পায় এবং এই সময়ের পর থেকে নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন বয়স ভিত্তিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ক্রিকেট দলের সংখ্যায়ও ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটে। জেলায় ভলিবল খেলা প্রচলিত থাকলেও এক্ষেত্রে আমরা জনপ্রিয়তা ও প্রসারের ক্ষেত্রে স্থবিরতা লক্ষ করতে পারি। যে খেলাটি নদীয়া জেলায় সবথেকে জনপ্রিয় এবং যে খেলাটিতে জেলার খেলোয়াড়রা সব থেকে বেশি সফলতার প্রদর্শন করেছে তা হলো অ্যাথলেটিক্স। ক্রিকেট ও ফুটবল খেলায় যে ব্যয়বহুল ক্রীড়া সরঞ্জাম- এর প্রয়োজন হয় অধিকাংশ অ্যাথলেটিক্স খেলা গুলিতে তার প্রয়োজন হয় না। নদীয়া জেলার অধিকাংশ অঞ্চল

গ্রামাঞ্চল এবং সেই গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী অধিকাংশ মানুষেরাই অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে অনগ্রসর হওয়ার কারণে তারা অন্যান্য খেলার তুলনায় অ্যাথলেটিক্সকেই উপযুক্ত হিসেবে বেছে নিয়েছে। জেলার যে অ্যাথলিটরা রাজ্য, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে সফলতার পরিচয় দিয়েছে তাদের মধ্যে নারী অ্যাথলিটদের সংখ্যা পুরুষ অ্যাথলিটদের তুলনায় অধিক। জেলায় নারী অ্যাথলিটদের এই সফলতা নদীয়া জেলার ইতিহাস কে একটি বিশেষ অনন্যতা দান করেছে।

নদীয়া জেলায় পাশ্চাত্য খেলাধুলাগুলির মধ্যে হকি, ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন ও টেবিল টেনিসের মতো খেলা গুলি প্রচলিত থাকলেও জেলার বিশেষ অঞ্চলে আমরা কোনো বিশেষ খেলার জনপ্রিয়তা অন্য খেলার তুলনায় অধিক লক্ষ করতে পারি। হকি খেলা প্রথম থেকেই জেলার কৃষ্ণনগর শহরাঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। জেলা গ্রামাঞ্চল গুলিতে ফুটবল খেলার জনপ্রিয়তা স্পষ্টই অধিক লক্ষ করা যায় অন্য খেলার তুলনায়। এছাড়া গ্রামাঞ্চল গুলিতে অ্যাথলেটিক্স খেলারও যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লক্ষ করা যায়। শান্তিপুর অঞ্চলে অন্যান্য খেলার তুলনায় ভলিবল খেলার জনপ্রিয়তা স্পষ্টই বেশি লক্ষ করা যায় এবং জেলা ক্রীড়া সংস্থা পরিচালিত বিভিন্ন ভলিবল প্রতিযোগিতায় শান্তিপুর অঞ্চলের ক্রীড়া ক্লাবগুলোর প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। রানাঘাট, চাকদহ ও কল্যাণীর মতো শহরাঞ্চলে অন্যান্য খেলার তুলনায় ক্রিকেট খেলার প্রাধান্য অধিক লক্ষ করা যায়। জেলার নারী অ্যাথলিটদের অসাধারণ সফলতা সত্বেও ভলিবল, ক্রিকেট ও ফুটবলের মতো দলগত খেলায় নারী খেলোয়াড়দের অনুপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। জেলার ক্রীড়া ক্লাব, আঞ্চলিক ক্রীড়া সংস্থা ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাংগঠনিক পদে নারীদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায় না। জেলার মোট জনসংখ্যার একটি বৃহত্তর অংশের মানুষ মুসলিম সম্প্রদায় ভুক্ত হলেও ১৯৮০- এর দশকের আগে পর্যন্ত জেলার সফল খেলোয়াড়দের মধ্যে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষদের উপস্থিতি অধিক সংখ্যায় লক্ষ করা যায়না। ১৯৮০- এর দশকের পর থেকে জেলার সফল খেলোয়াড়দের তালিকায় আমরা মুসলিম সম্প্রদায়ের উপস্থিতি অধিক সংখ্যায় লক্ষ করতে পারি। তবে জেলার ক্রীড়া ক্লাব, আঞ্চলিক ক্রীড়া সংস্থা ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার বিভিন্ন সাংগঠনিক পদে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষদের অনুপস্থিতির হার বর্তমানে চোখে পড়ার মতো।

গবেষণা সন্দর্ভের শেষে এই গবেষণা কার্যের যে সীমাবদ্ধতা সেগুলিও উল্লেখের দাবি রাখে। জেলায় খেলাধুলা প্রসারের ক্ষেত্রে স্কুল ও কলেজ গুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও তাদের অবদান গুলি যথার্থভাবে সংরক্ষিত হয়নি ফলে উপযুক্ত তথ্যসূত্রের অভাবে তাদের অবদানগুলিকে এই গবেষণা কার্যে স্থান দেওয়া সম্ভব হয়নি। প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা কার্য একটি নির্দিষ্ট সময় ও পরিসরের মধ্যে সম্পন্ন করতে হয়। নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন বয়স ভিত্তিক ফুটবল লীগে অংশগ্রহণকারী ক্লাবের সংখ্যা সর্বদা ৫০০- এর উপর থেকেছে, যার মাধ্যমে আমরা অনুমান করতে পারি যে জেলায় কী বিপুল পরিমাণ ক্রীড়া ক্লাবের অস্তিত্ব রয়েছে। কিন্তু গবেষণার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জেলার সমস্ত ক্লাব গুলির তথ্য ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে সংগ্রহ করা সম্ভব নয় এবং গবেষণার নির্দিষ্ট পরিসরে এই সমস্ত ক্লাবগুলোর বর্ণনা তুলে ধরাও সম্ভব নয়। জেলার সফল খেলোয়াড় এবং বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক ও পরিচালকদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু সমস্ত সফল খেলোয়াড়, ক্রীড়া সংগঠক ও পরিচালকদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি কারণ একদিকে যেমন অনেক সফল খেলোয়াড়, ক্রীড়া সংগঠক ও পরিচালকের জীবনাবসান হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে অনেক সফল খেলোয়াড়, ক্রীড়া সংগঠক ও পরিচালকদের স্মৃতি হারিয়ে গেছে বিস্মৃতির অতলে। জেলায় কবাডি, কুস্তি, হাডুডুর মতো দেশীয় খেলাধুলা গুলি প্রচলিত থাকলেও উপযুক্ত তথ্যসূত্রের অভাবে সেগুলির বর্ণনা গবেষণা সন্দর্ভে তুলে ধরা সম্ভব হয়নি, শুধুমাত্র জেলায় প্রচলিত পাশ্চাত্য খেলাধুলাগুলির বর্ণনায় তুলে ধরা হয়েছে। এই যাবতীয় সীমাবদ্ধতার সাথে যুক্ত হয়েছে আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা ও ক্রীড়া ইতিহাস চর্চার কিছু নিজস্ব সীমাবদ্ধতা। আঞ্চলিক ও ক্রীড়া ইতিহাস চর্চা করতে হলে গবেষক কে সরকারি দলিল ও নথিপত্রের অপ্রতুলতাকে মেনে নিয়েই চলতে হয়। প্রথম সারির বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যম পত্রিকা গুলিও জেলার খেলাধুলার খবর তুলে ধরার ক্ষেত্রে বিশেষ আগ্রহ দেখায় না। এক্ষেত্রে আঞ্চলিক সংবাদপত্র, নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা ও জেলার অন্যান্য আঞ্চলিক ক্রীড়া সংস্থার নথিপত্র, জেলার বিশিষ্ট খেলোয়াড় ও ক্রীড়া সংগঠকদের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, জেলার ক্রীড়া ক্লাব গুলির নথিপত্র ও ক্লাব কর্তৃপক্ষের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার প্রভৃতির মাধ্যমে গবেষণার উপযুক্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি প্রথম সারির বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যম সংবাদপত্র গুলিতে যখন জেলার খেলাধুলা সংক্রান্ত কোনো খবর বেরিয়েছে

সেগুলিকেও সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া জেলা সম্পর্কে জানতে ইতিপূর্বে নদীয়া জেলা সম্পর্কে রচিত একাধিক গ্রন্থ ও বিভিন্ন সময়ের আদমশুমারির পরিসংখ্যান কে ব্যবহার করা হয়েছে। উপযুক্ত তথ্যগত সীমাবদ্ধতার কারণে যে সকল বিষয়ের সঠিক সন্ধান দেওয়া সম্ভব নয় সেখানে সমাধানের জন্য গবেষণার আনুমানিক ফলাফলের উপর নির্ভর করে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করে যথা সম্ভব আধুনিক ও শেষ গবেষণার ফলাফল গুলিকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। যাবতীয় সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও স্বাধীনতা উত্তর কালে নদীয়া জেলার খেলাধুলার ইতিহাস জানার ক্ষেত্রে এই গবেষণা সন্দর্ভটি ভবিষ্যৎ গবেষকদের গবেষণার রসদ যোগানোর পাশাপাশি উৎসাহী পাঠকদের উৎসাহ নিবারণ করবে বলে আশা রাখি।

- **টীকা ও সূত্র নির্দেশ:**

১. কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *খেলা যখন ইতিহাস: সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি* (কলকাতা: সেতু প্রকাশনী, ২০১৯), ৯৭।

২. Durgadas Majumdar, *West Bengal District Gazetters: Nadia* (Calcutta: Information and Public Relation Department, 1978), 2.

৩. নিহার রঞ্জন বিশ্বাস, “কৃষ্ণনগরের খেলাধূলা,” *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪; এস. এম. বদরুদ্দীন, “নদিয়ার খেলাধূলা- অতীত ও বর্তমান,” *পশ্চিমবঙ্গ- নদিয়া জেলা সংখ্যা,* (কলকাতা: তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৭৭), ১৭৮।

৪. Jayanta Chatterjee, ed., *Nadia District Sports Association, Amended Constitution Book* (Krishnagar: Nadia District Sports Association, 2017), I-III.

৫. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ,* ১লা আগস্ট, ১৯৭১, ১, ২; ১লা মে, ১৯৭২, ১, ২।

সারণি

১. ১৯৪১ থেকে ২০১১ সাল পযর্ন্ত নদীয়া জেলার জনসংখ্যা পরিবর্তনের পরিসংখ্যান:

সাল	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ জনসংখ্যা	নারী জনসংখ্যা
১৯৪১	৮,৪০,৩০৩	৪,৩১,৯২৩	৪,০৮,৩৮০
১৯৫১	১১,৪৪,৯২৪	৫,৯০,৯৩৬	৫,৫৩,৯৮৮
১৯৬১	১৭,১৩,৩২৪	৮,৭৯,৪৩০	৮,৩৩,৮৯৪
১৯৭১	২২,৩০,২৭০	১১,৪৪,৯৭৭	১০,৮৫,২৯৩
১৯৮১	২৯,৬৪,২৫৩	১৫,২২,৯৩৬	১৪,৪১,৩১৭
১৯৯১	৩৮,৫২,০৯৫	১৯,৮৯,৮৪১	১৮,৬২,২৫৬
২০০১	৪৬,০৪,৮২৭	২৩,৬৬,৮৫৩	২২,৩৭,৯৭৪
২০১১	৫১,৬৭,৬০০	২৬,৫৩,৭৬৮	২৫,১৩,৮৩২

সূত্র: আদমশুমারির পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে গবেষক কতৃক নির্মিত।

২. ১৯৪১ থেকে ২০১১ সাল পযর্ন্ত নদীয়া জেলার নারী জনসংখ্যা পরিবর্তনের পরিসংখ্যান:

সাল	নারী জনসংখ্যা
১৯৪১	৪,০৮,৩৮০
১৯৫১	৫,৫৩,৯৮৮
১৯৬১	৮,৩৩,৮৯৪
১৯৭১	১০,৮৫,২৯৩
১৯৮১	১৪,৪১,৩১৭
১৯৯১	১৮,৬২,২৫৬
২০০১	২২,৩৭,৯৭৪
২০১১	২৫,১৩,৮৩২

সূত্র: আদমশুমারির পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে গবেষক কতৃক নির্মিত।

৩. ১৯৪১ থেকে ২০১১ সাল পযর্ন্ত নদীয়া জেলার মোট জনসংখ্যায় হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের শতকরা সংখ্যা:

সাল	হিন্দু সম্প্রদায়ের শতকরা সংখ্যা	মুসলিম সম্প্রদায়ের শতকরা সংখ্যা
১৯৪১	৪৬.৬৮	৫১.২৫
১৯৫১	৭৭.০৩	২২.৩৬
১৯৬১	৭৪.৯৫	২৪.৩৮
১৯৭১	৭৫.৯০	২৩.৩০
১৯৮১	৭৫.২০	২৪.১০
১৯৯১	৭৪.৩০	২৪.৯০
২০০১	৭৩.৮০	২৫.৪০
২০১১	৭২.২০	২৬.৮০

সূত্র: আদমশুমারির পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে গবেষক কতৃক নির্মিত।

মানচিত্র

১. বিংশ শতকের প্রথমার্ধে অবিভক্ত বাংলার মানচিত্র:

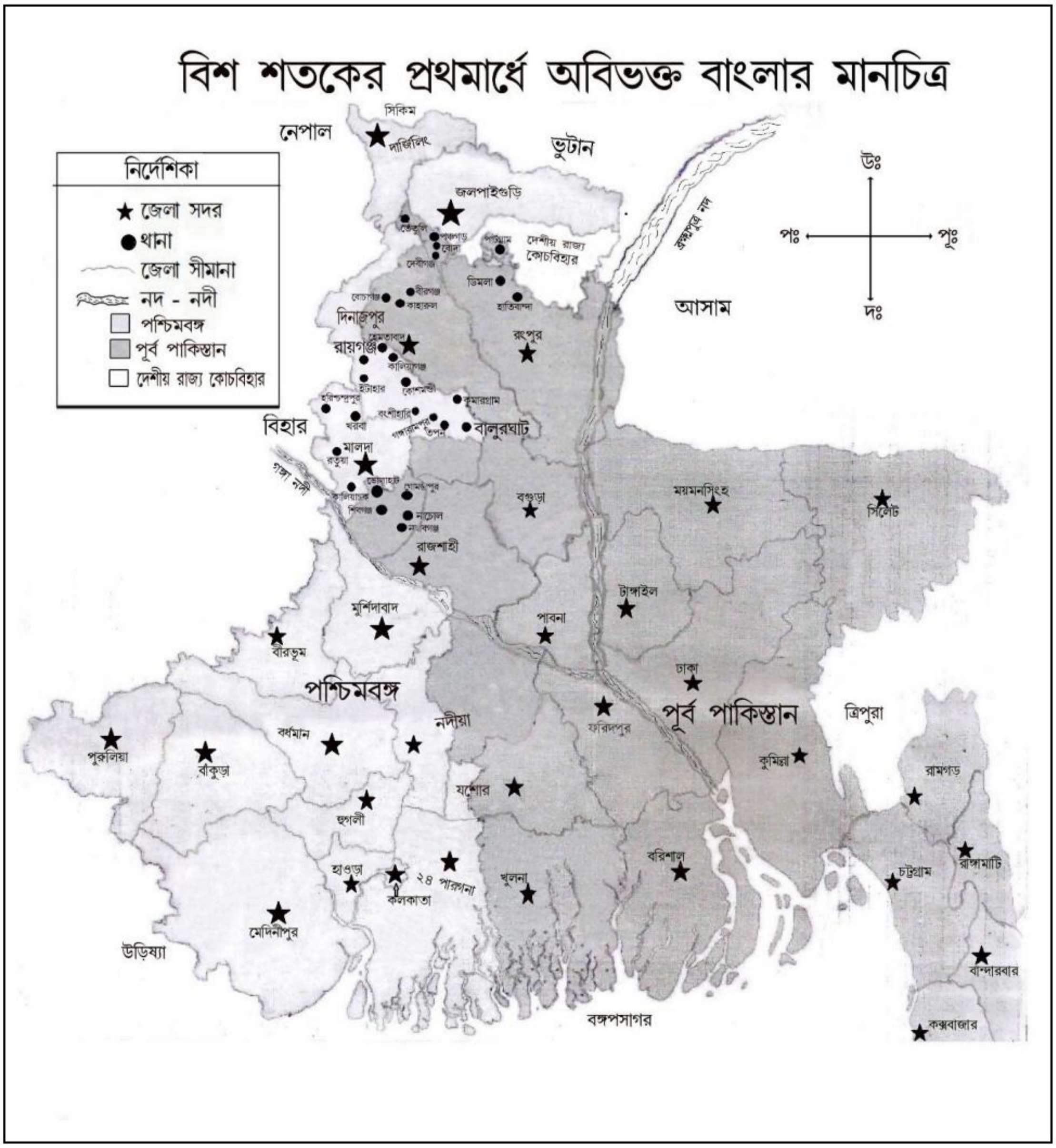

স্কেল অনুসারে অঙ্কিত নয়।

সূত্র: *Bangladesh Political Designed, Compiled, Cartographed,* Vidya Chitr Prakashani, 1- Ansari Road, New Delhi-110002; *পশ্চিমবঙ্গ রাজনৈতিক মানচিত্র,* টিচিং অ্যাপ্লায়েন্স কোম্পানী, কলকাতা- ৭০০০৭৩।

২. ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়ের অবিভক্ত নদীয়া জেলার মানচিত্র:

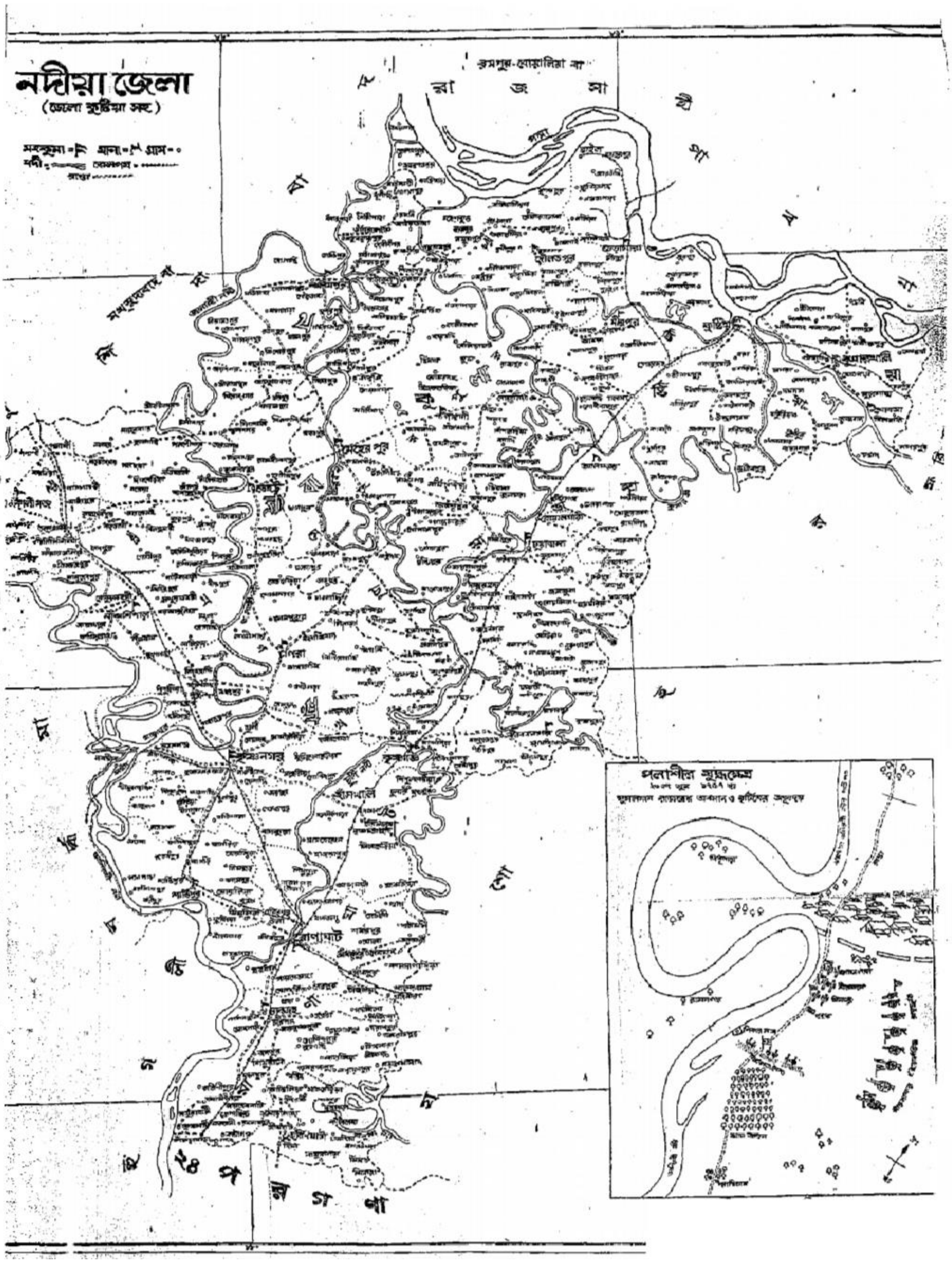

সূত্র: *নদীয়া কাহিনী,* কুমুদনাথ মল্লিক, মোহিত রায় (সম্পাদিত)।

৩. ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ের নদীয়া জেলার মানচিত্র:

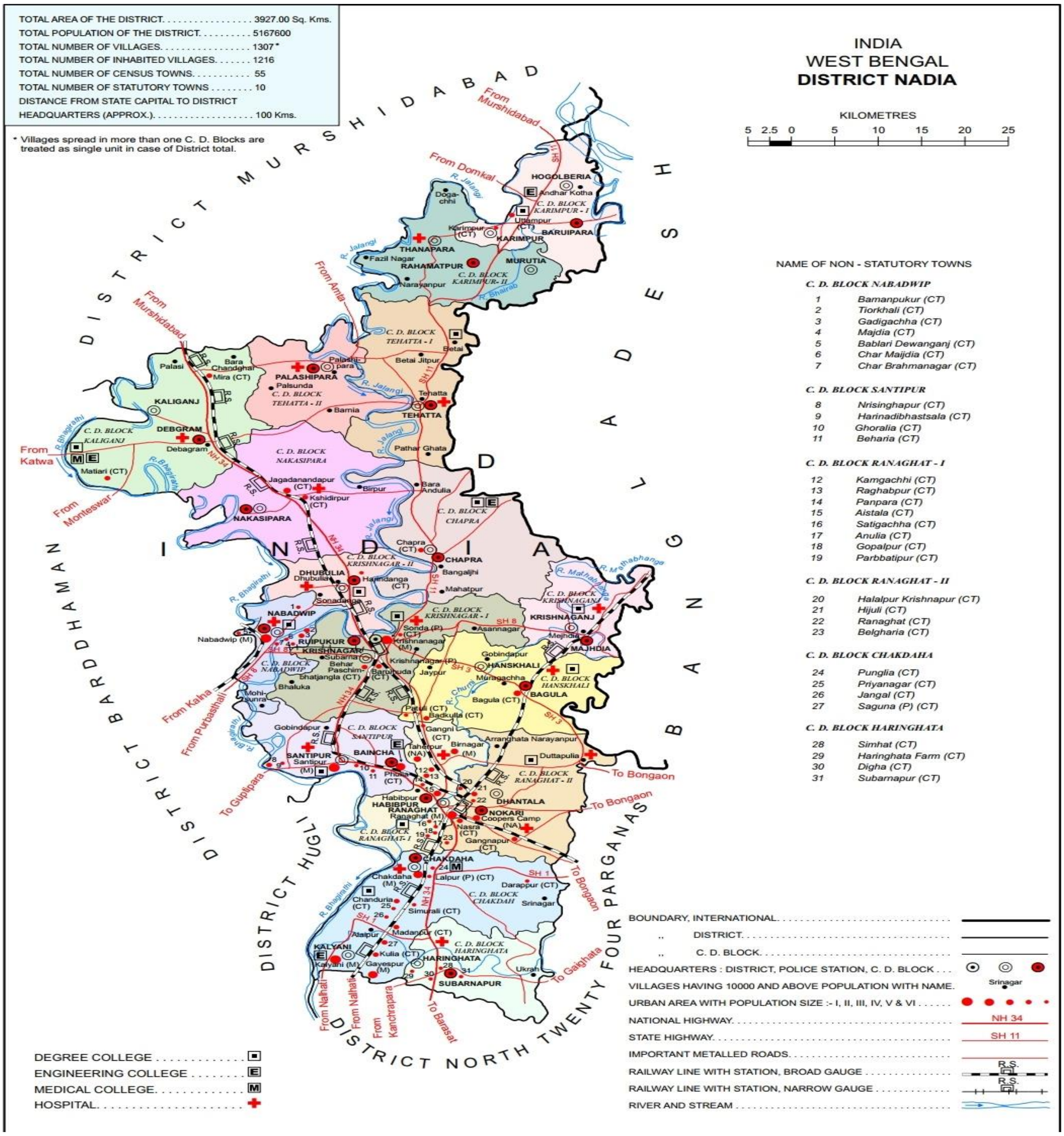

সূত্র: District Census Handbook Nadia, Series- 20, Part XII-A, Director Of Census Operations West Bengal.

সংযোজনী

সংযোজনী: ১. ১৯৬৯ সালে জেলার ক্রীড়া ক্লাব গুলির বার্ষিক অনুমোদন নবীকরণের উদ্দেশ্যে জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি।

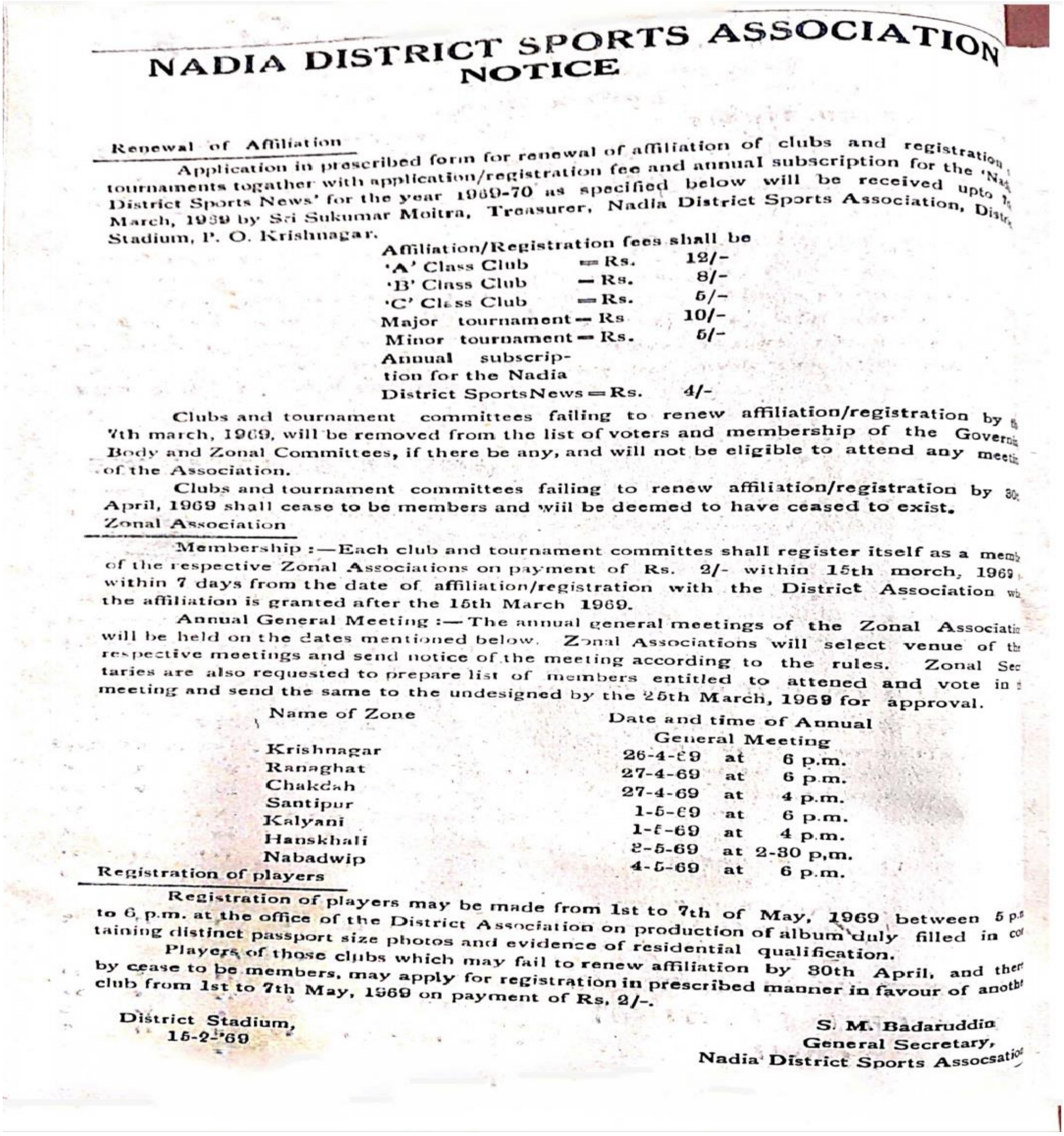

NADIA DISTRICT SPORTS ASSOCIATION
NOTICE

Renewal of Affiliation

Application in prescribed form for renewal of affiliation of clubs and registration tournaments togather with application/registration fee and annual subscription for the 'Nad District Sports News' for the year 1969-70 as specified below will be received upto 7 March, 1969 by Sri Sukumar Moitra, Treasurer, Nadia District Sports Association, Distr Stadium, P. O. Krishnagar.

Affiliation/Registration fees shall be

'A' Class Club	= Rs.	12/-
'B' Class Club	= Rs.	8/-
'C' Class Club	= Rs.	5/-
Major tournament	= Rs	10/-
Minor tournament	= Rs.	5/-
Annual subscription for the Nadia District Sports News	= Rs.	4/-

Clubs and tournament committees failing to renew affiliation/registration by th 7th march, 1969, will be removed from the list of voters and membership of the Governing Body and Zonal Committees, if there be any, and will not be eligible to attend any meeting of the Association.

Clubs and tournament committees failing to renew affiliation/registration by 30 April, 1969 shall cease to be members and will be deemed to have ceased to exist.

Zonal Association

Membership :—Each club and tournament committes shall register itself as a memb of the respective Zonal Associations on payment of Rs. 2/- within 15th morch, 1969 within 7 days from the date of affiliation/registration with the District Association wh the affiliation is granted after the 15th March 1969.

Annual General Meeting :—The annual general meetings of the Zonal Associatio will be held on the dates mentioned below. Zonal Associations will select venue of th respective meetings and send notice of the meeting according to the rules. Zonal Sec taries are also requested to prepare list of members entitled to attened and vote in meeting and send the same to the undesigned by the 25th March, 1969 for approval.

Name of Zone	Date and time of Annual General Meeting
Krishnagar	26-4-69 at 6 p.m.
Ranaghat	27-4-69 at 6 p.m.
Chakdah	27-4-69 at 4 p.m.
Santipur	1-5-69 at 6 p.m.
Kalyani	1-5-69 at 4 p.m.
Hanskhali	2-5-69 at 2-30 p.m.
Nabadwip	4-5-69 at 6 p.m.

Registration of players

Registration of players may be made from 1st to 7th of May, 1969 between 5 p.m. to 6 p.m. at the office of the District Association on production of album duly filled in con taining distinct passport size photos and evidence of residential qualification.

Players of those clubs which may fail to renew affiliation by 30th April, and ther by cease to be members, may apply for registration in prescribed manner in favour of anoth club from 1st to 7th May, 1969 on payment of Rs. 2/-.

District Stadium,
15-2-'69

S. M. Badaruddin
General Secretary,
Nadia District Sports Assocsation

সূত্র: নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার সংরক্ষিত তথ্য ভান্ডার থেকে গবেষক কর্তৃক সংগৃহীত।

সংযোজনী: ২. জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত বাংলাদেশ ফুটবল দল ও নদীয়া জেলা একাদশ-এর মধ্যে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনী ফুটবল খেলার অনুষ্ঠান সূচি সমন্বিত প্রচার পত্র।

প্রদর্শনী ফুটবল খেলা

জয়বাংলা! একটি মাত্র মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে একটা পুরো জাতি নেমেছে মুক্তির সংগ্রামে, একটি সুখের একটি ফুলের জন্য তারা লড়াই করছে, তারা প্রাণ উৎসর্গ করে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে একটি সুখের হাসির জন্য। সে সুখ দেশজননীর—সে সুখ বাঙলা মায়ের। বাঙলার সুখ তারা দেখেছে। বাঙলা দেশের এই মুক্তিযুদ্ধে ভারতবাসী হিসাবে আমরা সমর্থন জানিয়েছি, গর্ববোধ করেছি বাঙালী হিসাবে। তাদের বাঁচার লড়াইকে, মুক্তির যুদ্ধকে সাহায্য করেছি সাধ্যমত। ব্যক্তিগতভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে। মুক্তির এই সংগ্রামকে আরও কিছু সাহায্য দান করবার উদ্দেশ্য নিয়ে নদীয়া জেলা স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশন ব্যবস্থা করছেন এক প্রদর্শনী সাহায্য ফুটবল খেলার। এই খেলায় দুই প্রতিদ্বন্দী দল হচ্ছে

বাংলা দেশ ফুটবল দল
ও
নদীয়া জেলা একাদশ।

আপনারা অনেকেই জানেন, পূর্বতন পাকিস্থানের বহু খেলোয়াড় ও ক্রীড়া সংগঠক বর্ত্তমানে আমাদের দেশে শরণার্থী হয়ে বাস করছেন। এঁদের মধ্যে পাকিস্থান জাতীয় দলের পক্ষে অংশ-গ্রহণকারী খ্যাতনামা খেলোয়াড়েরাও রয়েছেন। এই সব খেলোয়াড় এবং ক্রীড়া সংগঠকেরা মিলে তৈরী করেছেন বাংলাদেশ ক্রীড়া পরিষদ। এই ক্রীড়া পরিষদ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে সারা ভারতবর্ষ ভ্রমণ করে প্রদর্শনী ফুটবল খেলায় অংশগ্রহণ করবার যে পরিকল্পনা স্থির করেছেন সেই পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়নে প্রথম খেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে

আগামী ২৫শে জুলাই.
সময় :— বৈকাল ৪—৩০ মিঃ
স্থান :— কৃষ্ণনগরস্থ জেলা ষ্টেডিয়াম

এই খেলা সাহায্যকারী প্রদর্শনী হিসাবে অনুষ্ঠিত হবে এবং খেলা থেকে লব্ধ সকল অর্থই তুলে দেওয়া হবে স্বাধীন বাঙলাদেশের সরকারের হাতে মুক্তিযুদ্ধের সাহায্যার্থে। সেই জন্য স্থির হয়েছে এইদিনকার প্রদর্শনী খেলার সর্বপ্রকার ফ্রি পাশের সুযোগ বন্ধ থাকবে। এই খেলার প্রবেশ মুল্য ধার্য হয়েছে

প্রতিটিকিট—৫০ পয়সা

বাংলা দেশের মুক্তিযুদ্ধে আরও সাহায্য করুন

সূত্র: নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার সংরক্ষিত তথ্য ভান্ডার থেকে গবেষক কর্তৃক সংগৃহীত।

সংযোজনী: ৩. ১৯৭১ সালের ২৫ শে জুলাই কৃষ্ণনগরে বাংলাদেশ ফুটবল দল ও নদীয়া জেলা একাদশ-এর মধ্যে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনী ফুটবল খেলায় উপস্থিত না থাকার দরুণ তৎকালীন কলিকাতাস্থ বাংলাদেশ মিশনের প্রধান হোসেন আলী কর্তৃক জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে প্রেরণ করা চিঠির প্রতিলিপি।

একখানি চিঠি

গত ২৫শে জুলাই কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ও নদীয়া দলের মধ্যে ফুটবল খেলায় উপস্থিত না হতে পেরে কলিকাতায় বাংলাদেশ মিশনের প্রধান শ্রীহোসেন আলি যে চিঠিটি প্রেরণ করেন তার প্রতিলিপি নীচে দেওয়া হল :—

গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ মিশন
৯ সার্কাস এ্যাভিনিউ
কলিকাতা-১৭

MISSION OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
9 CIRCUS AVENUE
CALCUTTA-17
July 22, 1971.

To the Secretary
Nadia District Sports Association
Krishnagar, Nadia.

Dear Sir,

I am most grateful to you for your kind invitation of July 17 to inaugurate the first exhibition football match between the Nadia District XI and Bangladesh Krira Samity in the District Stadium at Krishnagar to be held on July 25 at 4-15 p.m.

I should indeed have laved to be with you to witness this inaugural match which our boys will be playing with your team, bot regret that on account of prior engagement, I shall be unable to do so.

We owe a special debt of gratitude to the people and authorities of Nadia, particularly of Krishnagar who have been most hospitable and generous to thousands of Bangladesh refugees pouring accross your border. You have given them food and shelter; you have shared in their sorrows and sufferings. Your humanitarian work will be written in the golden pages of history.

Please convey my thanks to the President and other members of the Sports Association for their graciousness in deciding that the proceeds from the fooball match will be donated towards the relief of Bangladesh.

With best wishes,

Your faithfully
Sd/- M Hossain Ali
Head of the Mission.

সূত্র: নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার সংরক্ষিত তথ্য ভান্ডার থেকে গবেষক কর্তৃক সংগৃহীত।

সংযোজনী: ৪. বাংলাদেশের রাজধানীতে নদীয়া জেলা ফুটবল দল আমন্ত্রিত হওয়ার সংবাদ।

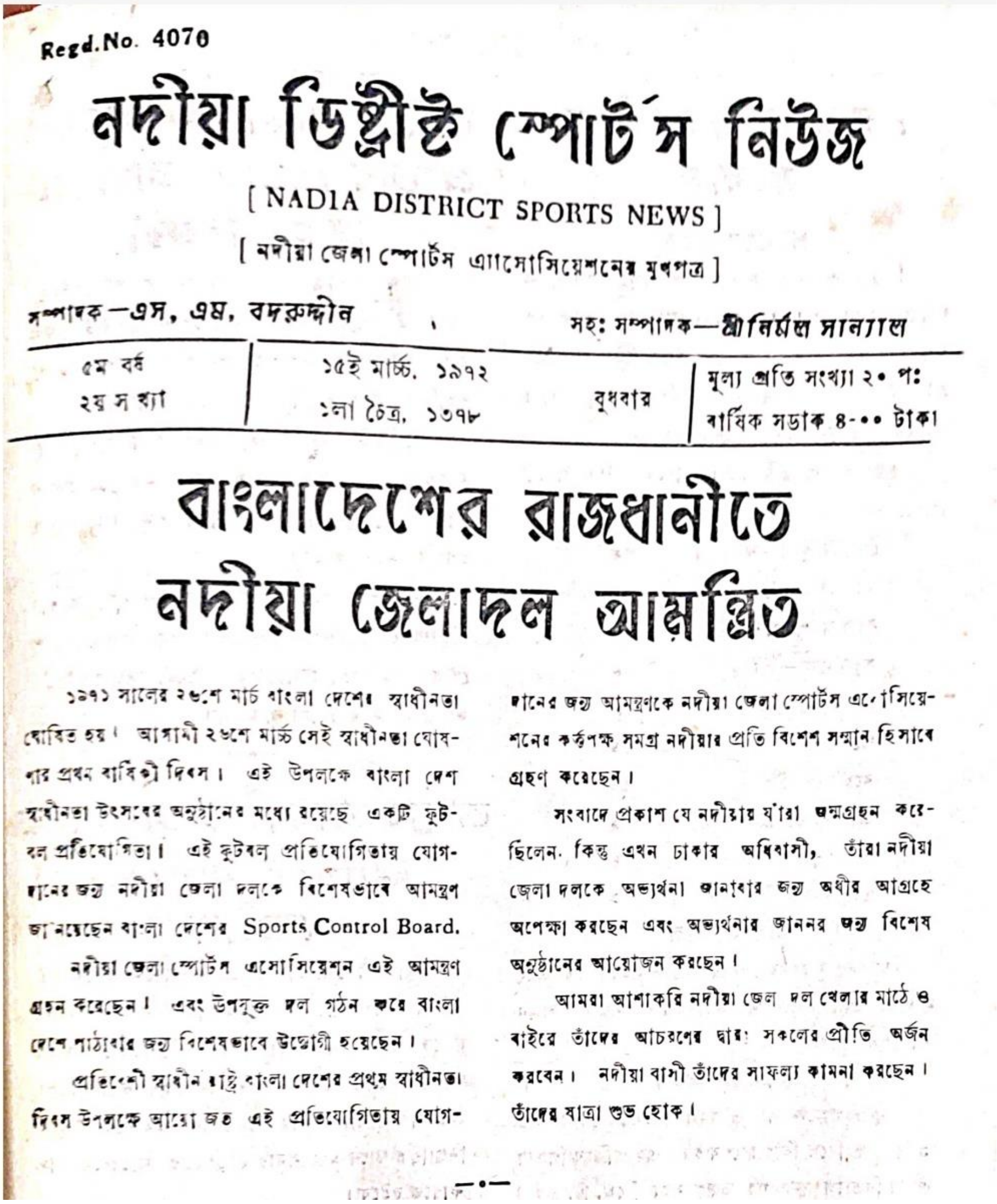

Regd. No. 4070

নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ

[NADIA DISTRICT SPORTS NEWS]

[নদীয়া জেলা স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশনের মুখপত্র]

সম্পাদক—এস, এম, বদরুদ্দীন সহ: সম্পাদক—শ্রীনির্মল সান্যাল

৫ম বর্ষ ২য় সংখ্যা	১৫ই মার্চ্চ, ১৯৭২ ১লা চৈত্র, ১৩৭৮	বুধবার	মূল্য প্রতি সংখ্যা ২০ পঃ বার্ষিক সডাক ৪-০০ টাকা

বাংলাদেশের রাজধানীতে নদীয়া জেলাদল আমন্ত্রিত

১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ বাংলা দেশের স্বাধীনতা ঘোষিত হয়। আগামী ২৬শে মার্চ্চ সেই স্বাধীনতা ঘোষণার প্রথম বার্ষিকী দিবস। এই উপলক্ষে বাংলা দেশ স্বাধীনতা উৎসবের অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে একটি ফুটবল প্রতিযোগিতা। এই ফুটবল প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য নদীয়া জেলা দলকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বাংলা দেশের Sports Control Board.

নদীয়া জেলা স্পোর্টস এসোসিয়েশন এই আমন্ত্রণ গ্রহন করেছেন। এবং উপযুক্ত দল গঠন করে বাংলা দেশে পাঠাবার জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়েছেন।

প্রতিবেশী স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলা দেশের প্রথম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য আমন্ত্রণকে নদীয়া জেলা স্পোর্টস এসোসিয়েশনের কর্তৃপক্ষ সমগ্র নদীয়ার প্রতি বিশেষ সম্মান হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

সংবাদে প্রকাশ যে নদীয়ায় যাঁরা জন্মগ্রহন করেছিলেন. কিন্তু এখন ঢাকার অধিবাসী, তাঁরা নদীয়া জেলা দলকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন এবং অভ্যর্থনার জাননর জন্য বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করছেন।

আমরা আশাকরি নদীয়া জেল দল খেলার মাঠে ও বাইরে তাঁদের আচরণের দ্বারা সকলের প্রীতি অর্জন করবেন। নদীয়া বাসী তাঁদের সাফল্য কামনা করছেন। তাঁদের যাত্রা শুভ হোক।

—•—

সূত্র: নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ, ১৫ই মার্চ, ১৯৭২, পৃ. ১।

সংযোজনী: ৫. ১৯৭২ সালের ২৫শে জুন তারিখে কৃষ্ণনগরস্থ জেলা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ইস্টবেঙ্গল ক্লাব বনাম নদীয়া জেলা একাদশ- প্রদর্শনী খেলার উদ্দেশ্যে নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত প্রচার পত্র।

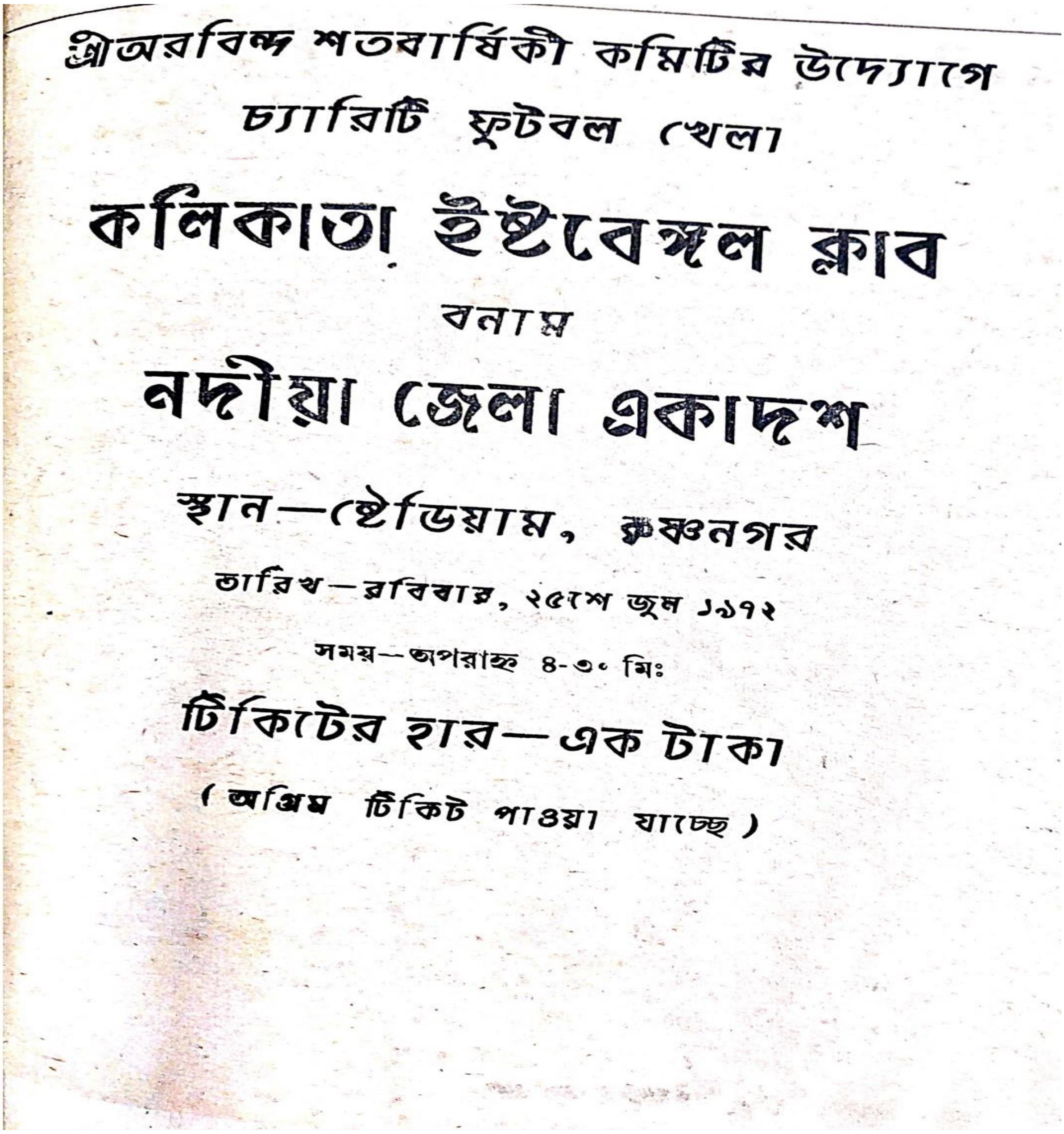

শ্রীঅরবিন্দ শতবার্ষিকী কমিটির উদ্যোগে
চ্যারিটি ফুটবল খেলা
কলিকাতা ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব
বনাম
নদীয়া জেলা একাদশ
স্থান—ষ্টেডিয়াম, কৃষ্ণনগর
তারিখ—রবিবার, ২৫শে জুন ১৯৭২
সময়—অপরাহ্ন ৪-৩০ মিঃ
টিকিটের হার—এক টাকা
(অগ্রিম টিকিট পাওয়া যাচ্ছে)

সূত্র: নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার সংরক্ষিত তথ্য ভান্ডার থেকে গবেষক কর্তৃক সংগৃহীত।

সংযোজনী: ৬. ১৯৭২ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে কৃষ্ণনগরস্থ জেলা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় দল বনাম আই.এফ.এ সম্পাদকের একাদশ- প্রদর্শনী খেলার উদ্দেশ্যে নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত প্রচার পত্র।

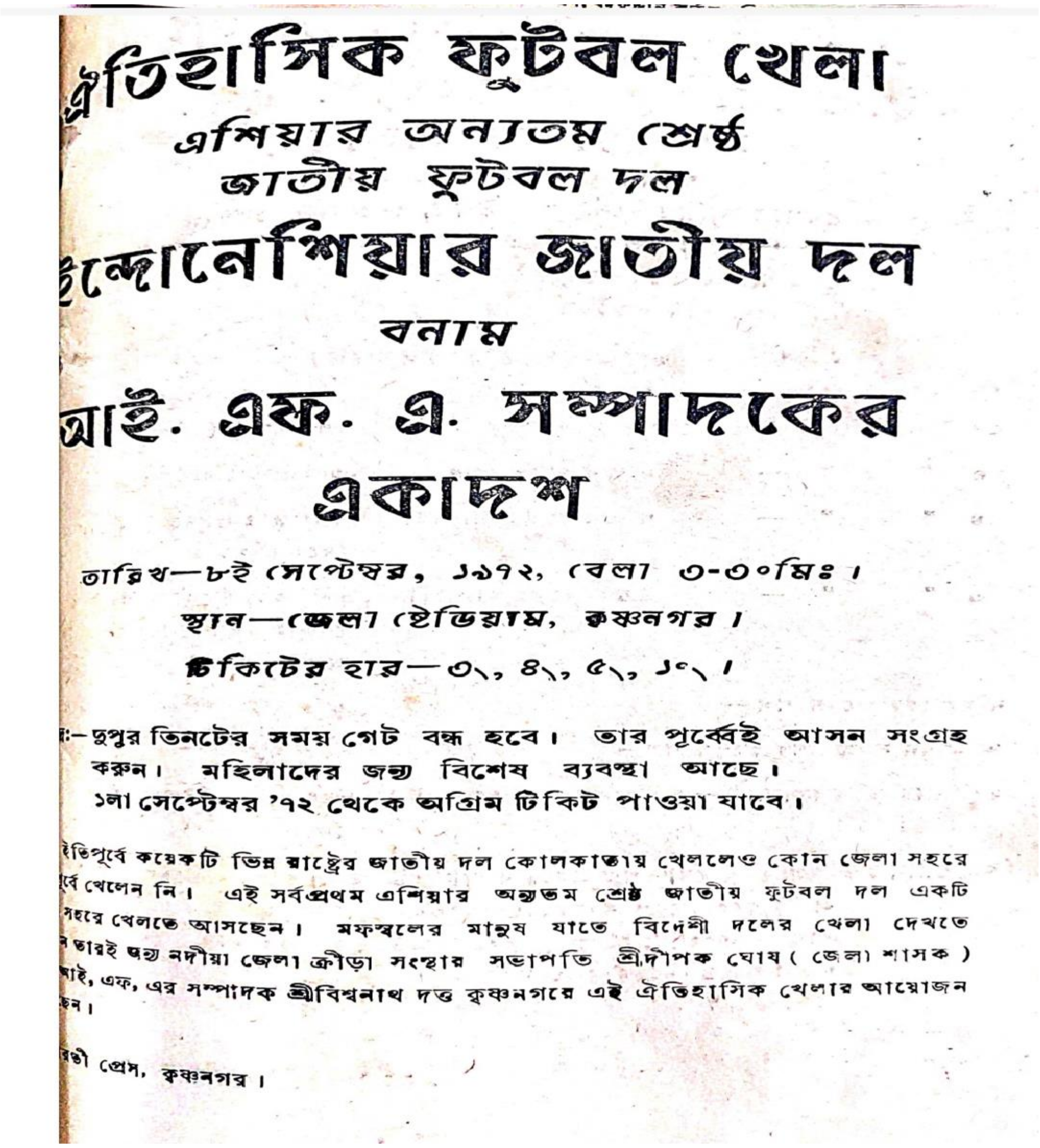
ঐতিহাসিক ফুটবল খেলা

এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ
জাতীয় ফুটবল দল

ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় দল

বনাম

আই. এফ. এ. সম্পাদকের
একাদশ

তারিখ—৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭২, বেলা ৩-৩০মিঃ।
স্থান—জেলা ষ্টেডিয়াম, কৃষ্ণনগর।
টিকিটের হার—৩৲, ৪৲, ৫৲, ১০৲।

:—দুপুর তিনটের সময় গেট বন্ধ হবে। তার পূর্ব্বেই আসন সংগ্রহ করুন। মহিলাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে।
১লা সেপ্টেম্বর '৭২ থেকে অগ্রিম টিকিট পাওয়া যাবে।

ইতিপূর্বে কয়েকটি ভিন্ন রাষ্ট্রের জাতীয় দল কোলকাতায় খেললেও কোন জেলা সহরে র্বে খেলেন নি। এই সর্বপ্রথম এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতীয় ফুটবল দল একটি সহরে খেলতে আসছেন। মফস্বলের মানুষ যাতে বিদেশী দলের খেলা দেখতে তারই জন্য নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি শ্রীদীপক ঘোষ (জেলা শাসক) আই, এফ, এর সম্পাদক শ্রীবিশ্বনাথ দত্ত কৃষ্ণনগরে এই ঐতিহাসিক খেলার আয়োজন ছেন।

রতী প্রেস, কৃষ্ণনগর।

সূত্র: নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার সংরক্ষিত তথ্য ভান্ডার থেকে গবেষক কর্তৃক সংগৃহীত।

সংযোজনী: ৭. নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক স্পোর্টস লাইব্রেরী গড়ে তোলার প্রকাশিত সংবাদ।

Regd. No. C 4070

নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ

[NADIA DISTRICT SPORTS NEWS]

[নদীয়া জেলা স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশনের মুখপত্র]

সম্পাদক—এস. এম. বদরুদ্দীন সহঃ সম্পাদক—শ্রীদেবু গুপ্ত

৫ম বর্ষ	১লা জানুয়ারী, ১৯৭৩	সোমবার	মূল্য প্রতি সংখ্যা ২০ পঃ
১৭শ সংখ্যা	১৭ই পৌষ, ১৩৭৯		বার্ষিক সডাক ৪.০০ টাকা

পশ্চিম বাংলায় প্রথম স্পোর্টস লাইব্রেরী

নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস লাইব্রেরীর

শুভ উদ্বোধন হবে আগামী ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৭৩

শুধুমাত্র খেলাধূলার জন্য লাইব্রেরী—অর্থাৎ স্পোর্টস লাইব্রেরী পশ্চিম বাংলায় একটিও নেই। তাই নদীয়া জেলা স্পোর্টস এ্যাসাসিয়েশন একটি স্পোর্টস লাইব্রেরী গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছেন, এবং এ সম্পর্কে প্রাথমিক ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়েছে, কিছু বই সংগ্রহ করা হয়েছে এবং হচ্ছে। আগামী ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৭৩ বিকেল চারটেয় নদীয়া জেলা ষ্টেডিয়ামে জেলা এসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীদীপক ঘোষ মহাশয়কে (জেলা শাসক) এই লাইব্রেরীর উদ্বোধন করতে অনুরোধ করা হয়েছে।

এই লাইব্রেরীতে সকল রকম খেলাধূলার নিয়মাবলী থাকবে। আর থাকবে খেলাধূলার শিক্ষা বিষয়ক ও বিভিন্ন ধরণের আলোচনার বিষয়ক পুস্তক।

কিন্তু জেলা ক্রীড়া সংস্থার কর্তৃপক্ষের আশা ও পরিকল্পনা আরও ব্যাপক। তাঁরা এই লাইব্রেরীর মাধ্যমে এই জেলার খেলাধূলার ইতিহাসকে ও ধরে রাখতে চান। শুধু এই জেলা নয়, সমগ্র পশ্চিম বাংলার খেলাধূলার ইতিহাসের উপাদান ও থাকবে এই লাইব্রেরীতে, তাই পশ্চিম বাংলার সকল রকম সংস্থা, জেলা সংস্থা এবং ক্রীড়ানুরাগী ব্যক্তির কাছে নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার আবেদন তাঁরা যেন মুক্ত হস্তে বিভিন্ন বই, পুস্তিকা- বিবরণী, স্মারক গ্রন্থ ইত্যাদি দিয়ে এই পরিকল্পনাকে সার্থক রূপ দান করেন। যে সকল বিষয় পুস্তক প্রভৃতি সাদরে গৃহীত হবে তার তালিকা আমরা দিলাম।

বিভিন্ন খেলাধূলার নিয়মাবলী

বিভিন্ন খেলাধূলার কোচিং সংক্রান্ত পুস্তক

বিভিন্ন খেলাধূলার উপর লিখিত বিভিন্ন ধরণের আলোচনা বা সমালোচনা পুস্তক

নদীয়া জেলার অতীত ও বর্তমান গঠনতন্ত্র ও নিময়াবলী

নদীয়া জেলার বিগত সকল বৎসরের বার্ষিক বিবরণী (Annual Report) ও হিসেবের বিবরণী।

নদীয়া জেলার অতীতের খেলাধূলার ফিক্সচার ও প্রোগ্রাম।

জোনাল এ্যাসোসিয়েশনগুলিরও অনুরূপ সকল বার্ষিক বিবরণী হিসাবের বিবরণী এবং ফিক্সচার এই লাইব্রেরীতে রাখা হবে।

আই, এফ, এ,; সি এ, বি,; বি এইচ এ ; প্রভৃতি সকল রাজ্য ও অন্যান্য সকল জেলা সংস্থার অনুরূপ বার্ষিক বিবরণী ও ফিক্সচার, স্মারক গ্রন্থ প্রভৃতি রাখা হবে।

আমাদের আশা এই যে, আমরা যদি অতীতের সকল বিবরণী সংগ্রহ করতে পারি এবং এখন থেকে নিয়মিত ভাবে সকল তথ্য সংরক্ষণ করতে পারি, তবে ভবিষ্যৎ কালের ক্রীড়ানুরাগী এই লাইব্রেরীকে একটি রিসার্চ সেন্টার হিসাবে গণ্য ও ব্যবহার করতে পারবেন। আমরা সকলের সহযোগিতা প্রার্থনা করছি।

সূত্র: নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ, ১লা জানুয়ারী, ১৯৭৩, পৃ. ১।

সংযোজনী: ৮. পশ্চিমবঙ্গের প্রথম জেলা ক্রীড়া সংস্থা হিসাবে নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা আয়োজন করার প্রকাশিত সংবাদ।

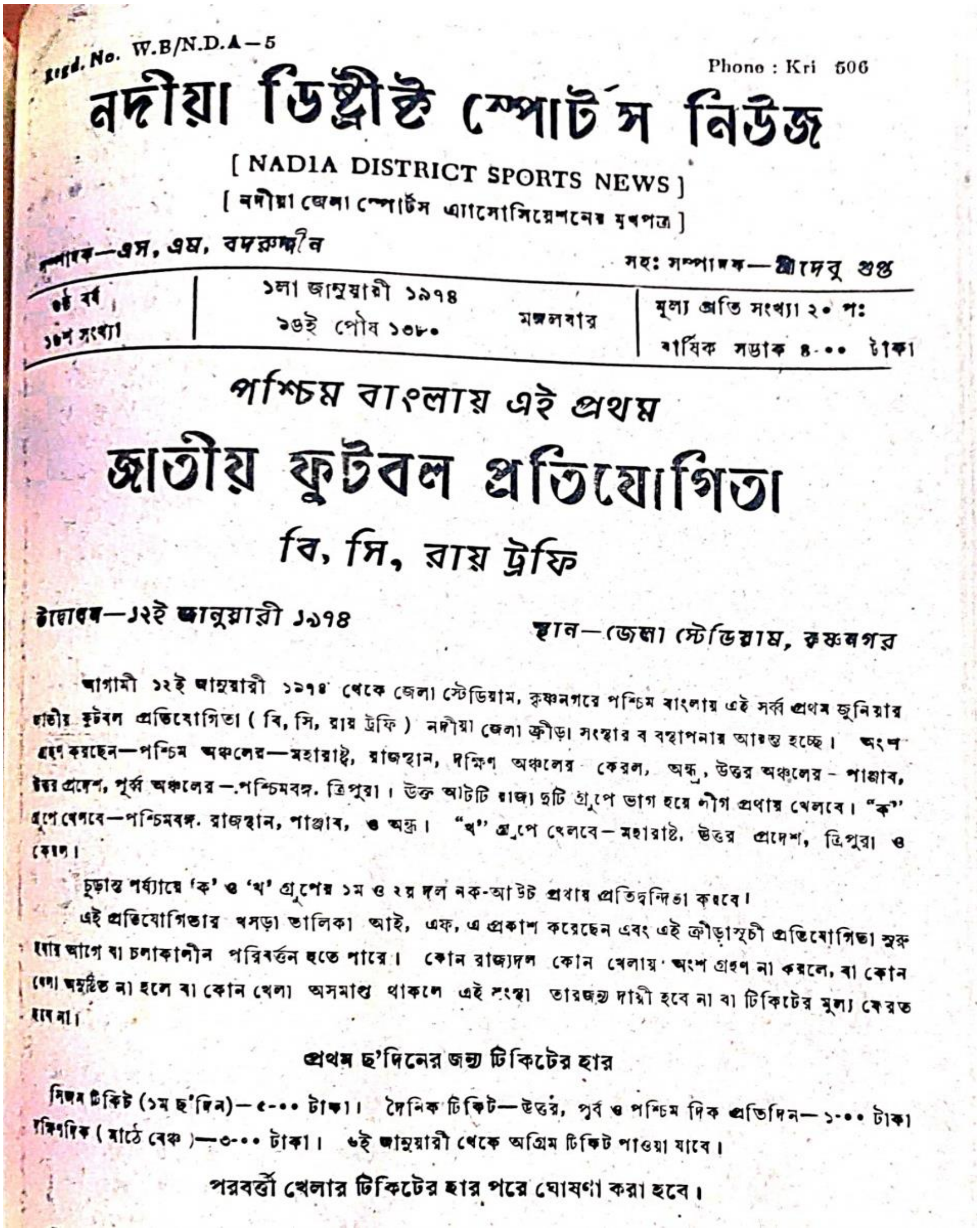

Regd. No. W.B/N.D.A—5

Phone : Kri 506

নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ

[NADIA DISTRICT SPORTS NEWS]

[নদীয়া জেলা স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশনের মুখপত্র]

সম্পাদক—এস, এম, বদরুদ্দীন

সহ: সম্পাদক—শ্রীদেবু গুপ্ত

৩ষ্ঠ বর্ষ ১০ম সংখ্যা	১লা জানুয়ারী ১৯৭৪ ১৬ই পৌষ ১৩৮০	মঙ্গলবার	মূল্য প্রতি সংখ্যা ২০ পঃ বার্ষিক সডাক ৪.০০ টাকা

পশ্চিম বাংলায় এই প্রথম

জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা

বি, সি, রায় ট্রফি

তারিখ—১২ই জানুয়ারী ১৯৭৪

স্থান—জেলা স্টেডিয়াম, কৃষ্ণনগর

আগামী ১২ই জানুয়ারী ১৯৭৪ থেকে জেলা স্টেডিয়াম, কৃষ্ণনগরে পশ্চিম বাংলায় এই সর্ব্ব প্রথম জুনিয়ার জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা (বি, সি, রায় ট্রফি) নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় আরম্ভ হচ্ছে। অংশ গ্রহণ করছেন—পশ্চিম অঞ্চলের—মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, দক্ষিণ অঞ্চলের কেরল, অন্ধ্র, উত্তর অঞ্চলের - পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, পূর্ব্ব অঞ্চলের —.পশ্চিমবঙ্গ. ত্রিপুরা। উক্ত আটটি রাজ্য দুটি গ্রুপে ভাগ হয়ে লীগ প্রথায় খেলবে। "ক" গ্রুপে খেলবে—পশ্চিমবঙ্গ. রাজস্থান, পাঞ্জাব, ও অন্ধ্র। "খ" গ্রুপে খেলবে—মহারাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশ, ত্রিপুরা ও কেরল।

চূড়ান্ত পর্য্যায়ে 'ক' ও 'খ' গ্রুপের ১ম ও ২য় দল নক-আউট প্রথায় প্রতিদ্বন্দিতা করবে।

এই প্রতিযোগিতার খসড়া তালিকা আই, এফ, এ প্রকাশ করেছেন এবং এই ক্রীড়াসূচী প্রতিযোগিতা সুরু হবার আগে বা চলাকালীন পরিবর্ত্তন হতে পারে। কোন রাজ্যদল কোন খেলায় অংশ গ্রহণ না করলে, বা কোন খেলা অনুষ্ঠিত না হলে বা কোন খেলা অসমাপ্ত থাকলে এই সংস্থা তারজন্য দায়ী হবে না বা টিকিটের মূল্য ফেরত হবে না।

প্রথম ছ'দিনের জন্য টিকিটের হার

সিজন টিকিট (১ম ছ'দিন)—৫.০০ টাকা। দৈনিক টিকিট—উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম দিক প্রতিদিন—১.০০ টাকা দক্ষিণদিক (মাঠে বেঞ্চ)—৩.০০ টাকা। ৬ই জানুয়ারী থেকে অগ্রিম টিকিট পাওয়া যাবে।

পরবর্ত্তী খেলার টিকিটের হার পরে ঘোষণা করা হবে।

সূত্র: নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ, ১লা জানুয়ারী, ১৯৭৪, পৃ. ১।

সংযোজনী: ৯. N.I.S হকি প্রশিক্ষক ইন্দ্রজিৎ সিং কর্তৃক রচিত কৃষ্ণনগরের হকি খেলা বিষয়ক প্রতিবেদন।

HOCKEY IN KRISHNAGAR

Indrojit Singh
N. I. S. Hockey Coach

Hockey is a game in which India have got a good reputation in the world. It can be called Indian's National Game. But it is a pity that it is loosing its popularity among the masses. There are so many factors which are responsible for this. But I won't like to discuss them here. But at the same time I will say that we should not allow this game to became unpopular. Otherwise India will be totally written off from the sports world map

In West Bengal, the game of Hockey is not very popular, though it is said that it was Bengal where the first National Hockey Championsaip was held. The game is mainly played in the city of Calcutta and in some districts or sub-divisonal headquarters. Krishnagar is one of them. I came to this town in 1969 for the first time for organising a hockey coaching camp. The response for hockey coaching was very heartening. I had to discard some boys as it was becoming very crowdy and in all 58 boys were trained. I can proudly say that out of that group, one boy was chosen for junior India team and another two or three played for Bengal in the Junior National Hockey Championship and most of the boys are playing in Calcutta Hockey League for various clubs. At that time there were 11 teams playing in the league. Some schools and Colleges were also taking active part. But to my surprise, now in 1976, Schools and Colleges are not having any teams at all and the number of hockey playing clubs have goen down to 6 only. It may also be mentioned here that in the prssent coaching camp, all the 46 boys are school boys and in my privious camps also most of the boys were from schools. Still schools are not having any teams at all. Grounds are being wasted during the hockey season. The schools are the nurseries in every sphere of life, not only in sports, so if they are neglected in this way, the future of the country will surely be doomed. This is the only reason that Nadia, though having potential in hockey is not particioating in the Inter-district school championship in hockey. My earnest request to the school authorities is just to look into the matter and try to organise an Inter-school league just as a start.

সূত্র: নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ, ১লা মে, ১৯৭৬, পৃ. ২।

সংযোজনী: ১০. ১৯৭৭ সালের কৃষ্ণনগরস্থ নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার অধীনস্থ জেলা স্টেডিয়ামের চিত্র।

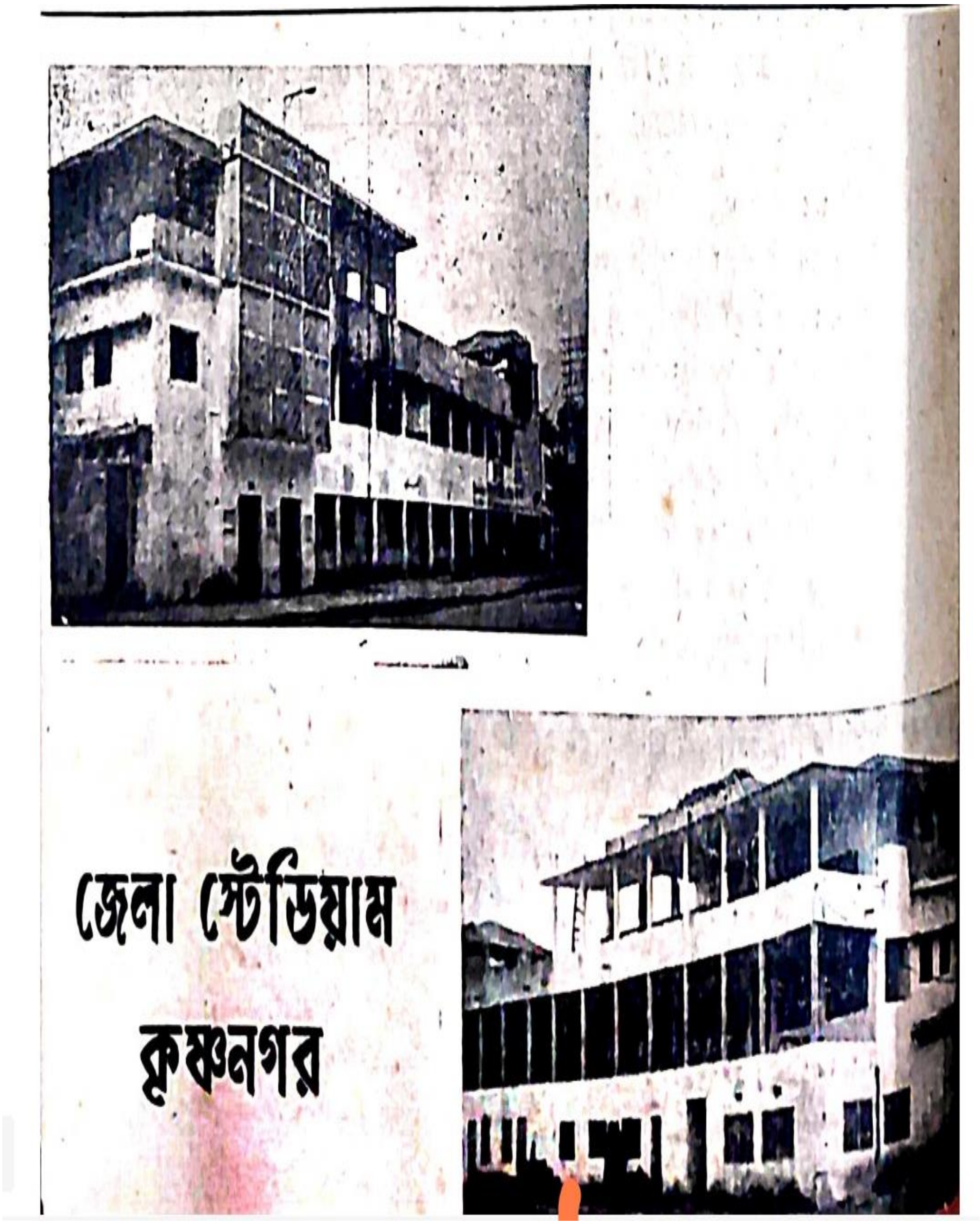

সূত্র: নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার সংরক্ষিত তথ্য ভান্ডার থেকে গবেষক কর্তৃক সংগৃহীত।

সংযোজনী: ১১. প্রথম আন্তঃজেলা সাব-জুনিয়র ফুটবল প্রতিযোগিতা (১৯৭৭) বিজয়ী নদীয়া সাব-জুনিয়র ফুটবল দলের চিত্র।

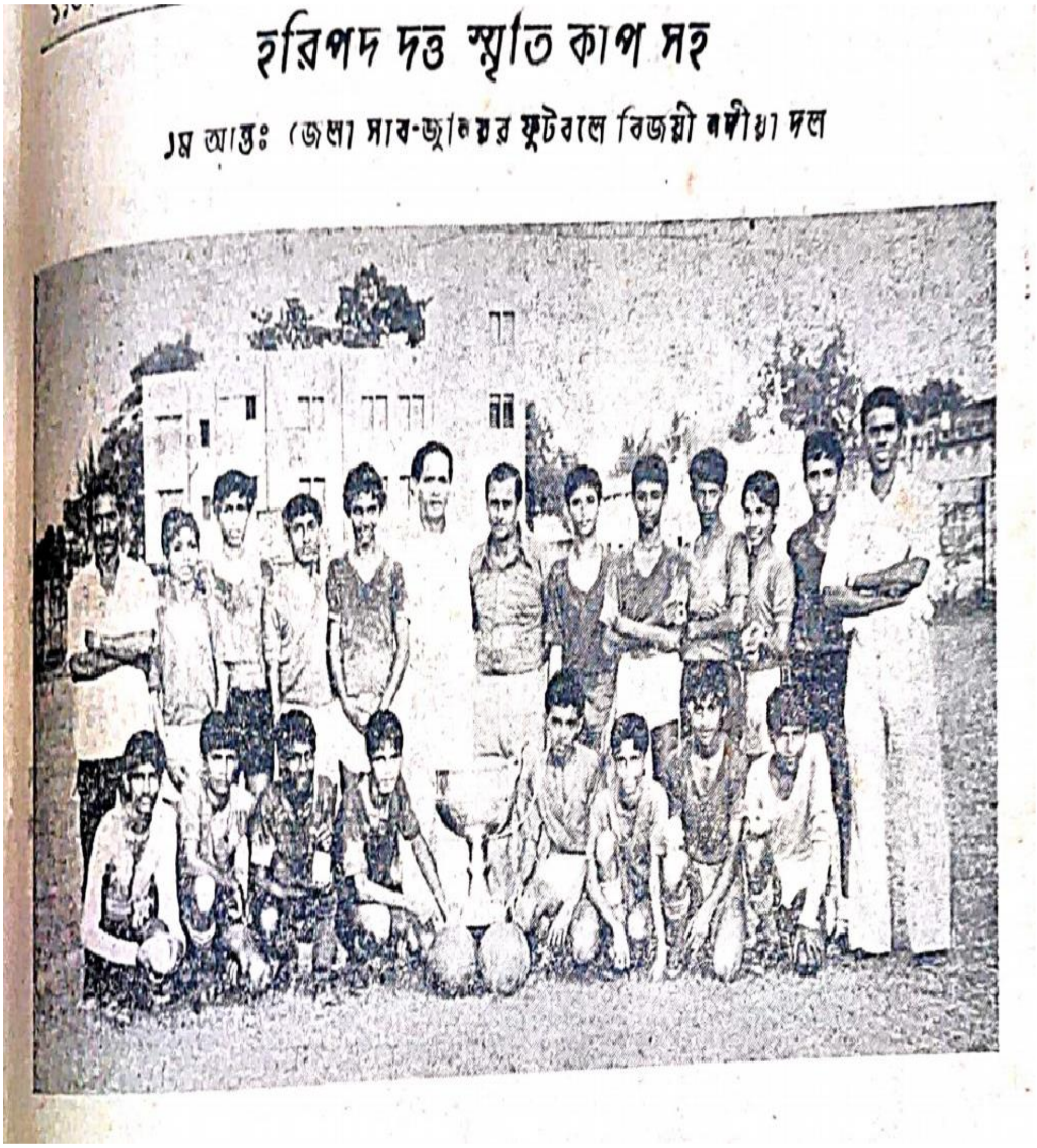
হরিপদ দত্ত স্মৃতি কাপ সহ

১ম আন্তঃ জেলা সাব-জুনিয়র ফুটবলে বিজয়ী নদীয়া দল

সূত্র: নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ, ১৫ই অক্টোবর, ১৯৭৭, পৃ. ১।

সংযোজনী: ১২. ১৯৭৮ সালে কৃষ্ণনগরে নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় গ্রামীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণের চিত্র।

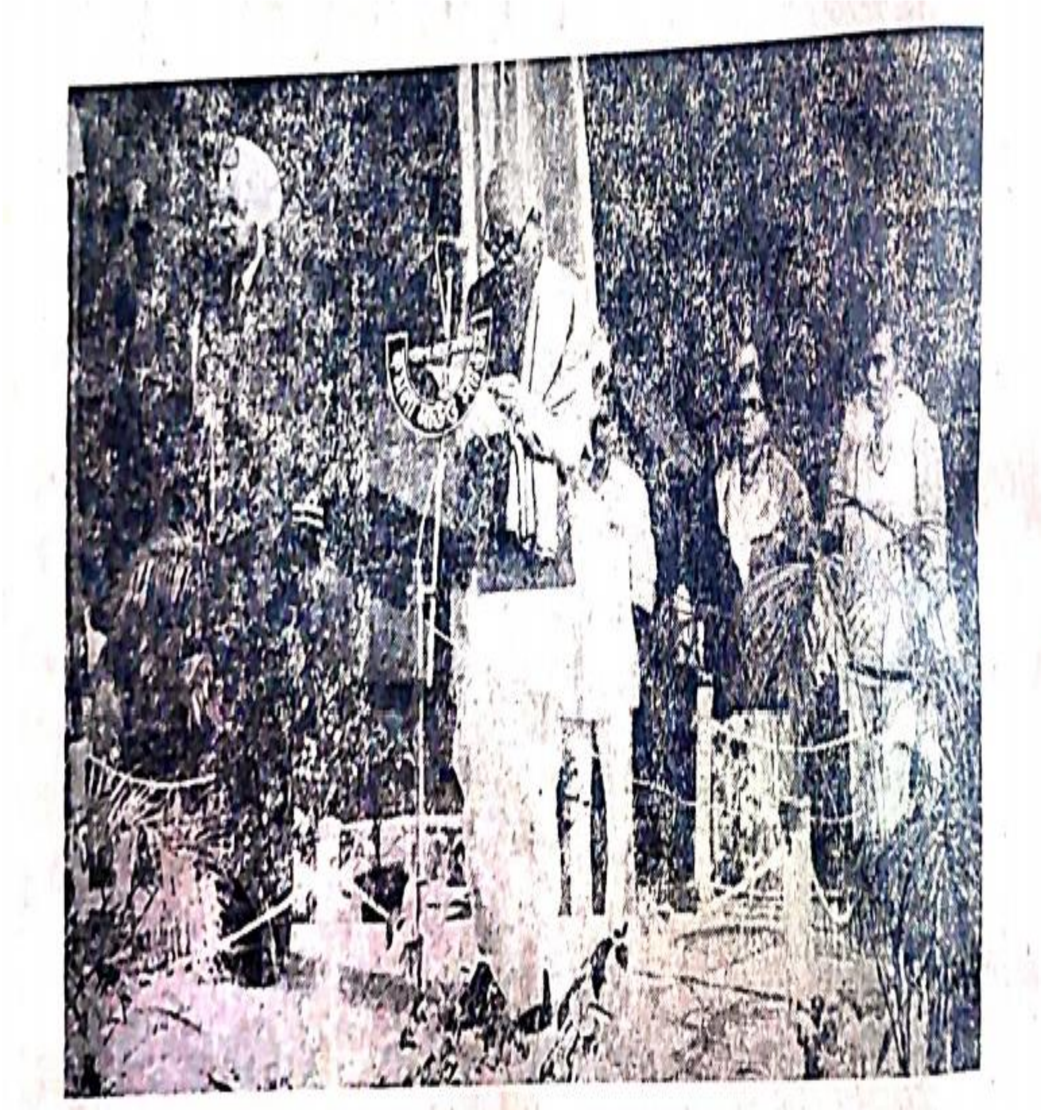

সূত্র: নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ, ১লা মার্চ, ১৯৭৮, পৃ. ২।

সংযোজনী: ১৩. ১৯৭৮ সালে কৃষ্ণনগরে নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় গ্রামীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণের চিত্র।

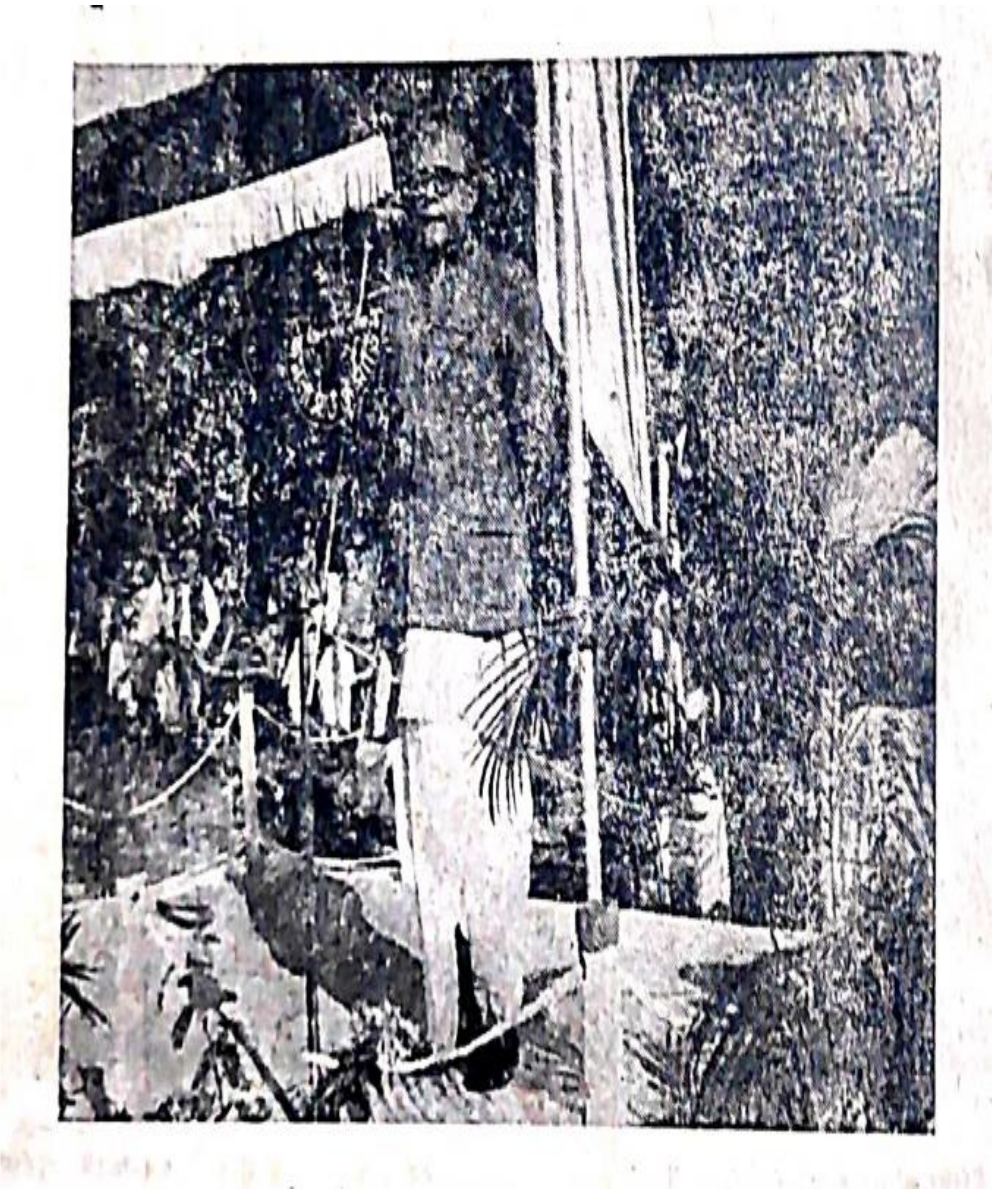

সূত্র: নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ, ১লা মার্চ, ১৯৭৮, পৃ. ৪।

সংযোজনী: ১৪. ১৯৮১ সালের নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার অধীনস্থ ক্লাবের খেলোয়াড়দের নিবন্ধীকরণ বা রেজিস্ট্রেশন ফর্ম।

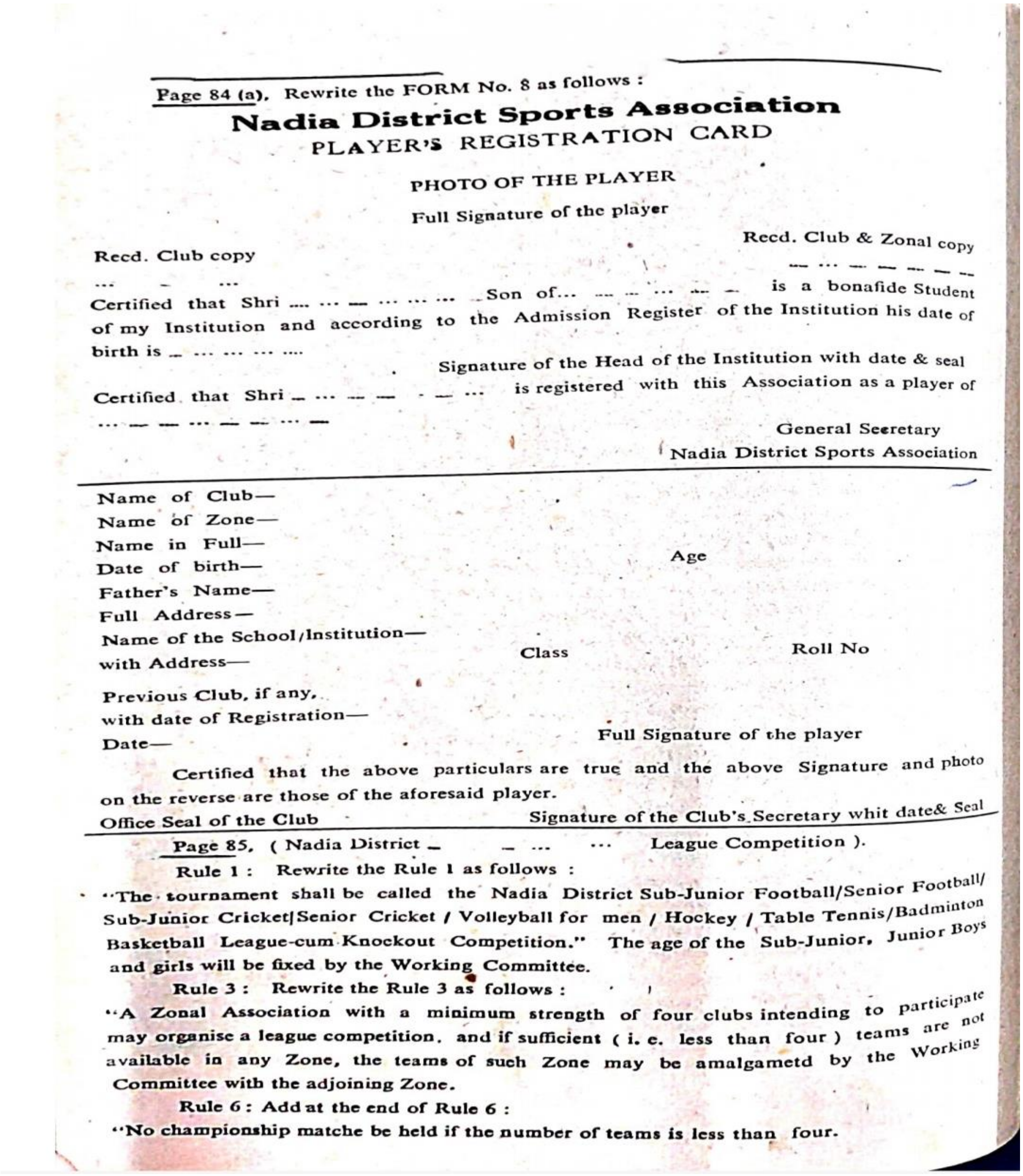

Page 84 (a). Rewrite the FORM No. 8 as follows :

Nadia District Sports Association

PLAYER'S REGISTRATION CARD

PHOTO OF THE PLAYER

Full Signature of the player

Recd. Club copy

Recd. Club & Zonal copy

Certified that Shri ... ... Son of... ... ... is a bonafide Student of my Institution and according to the Admission Register of the Institution his date of birth is ... ...

Signature of the Head of the Institution with date & seal

Certified that Shri ... ... is registered with this Association as a player of ... ...

General Secretary
Nadia District Sports Association

Name of Club—
Name of Zone—
Name in Full—
Date of birth— Age
Father's Name—
Full Address—
Name of the School/Institution—
with Address— Class Roll No

Previous Club, if any,
with date of Registration—
Date— Full Signature of the player

Certified that the above particulars are true and the above Signature and photo on the reverse are those of the aforesaid player.

Office Seal of the Club Signature of the Club's Secretary whit date& Seal

Page 85. (Nadia District ... ... League Competition).

Rule 1 : Rewrite the Rule 1 as follows :

"The tournament shall be called the Nadia District Sub-Junior Football/Senior Football/ Sub-Junior Cricket|Senior Cricket / Volleyball for men / Hockey / Table Tennis/Badminton Basketball League-cum Knockout Competition." The age of the Sub-Junior, Junior Boys and girls will be fixed by the Working Committee.

Rule 3 : Rewrite the Rule 3 as follows :

"A Zonal Association with a minimum strength of four clubs intending to participate may organise a league competition, and if sufficient (i. e. less than four) teams are not available in any Zone, the teams of such Zone may be amalgametd by the Working Committee with the adjoining Zone.

Rule 6 : Add at the end of Rule 6 :

"No championship matche be held if the number of teams is less than four.

সূত্র: নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার সংরক্ষিত তথ্য ভান্ডার থেকে গবেষক কর্তৃক সংগৃহীত।

সংযোজনী: ১৫. কৃষ্ণনগরস্থ জেলা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত প্রথম রঞ্জি ট্রফি ম্যাচের প্রকাশিত সংবাদ।

Postal Regd. No. W. B./NDA—59
Registered with the Registrar of News Papers (Registered No. RN 16691/68)   Phone : Kri-504

নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ

[NADIA DISTRICT SPORTS NEWS]

[নদীয়া জেলা স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশনের মুখপত্র]

সম্পাদক—গোবিন্দ প্রসাদ দত্ত   [পাক্ষিক পত্রিকা]   সহ: সম্পাদক—নির্মল সান্যাল

১৪শ বর্ষ ১৯শ সংখ্যা | ১লা জানুয়ারী ১৯৮২ ১৬ই পৌষ ১৩৮৮ | শুক্রবার | মূল্য প্রতি সংখ্যা—২০ পয়সা বার্ষিক সডাক ৪-০০ টাকা

জেলা ষ্টেডিয়ামে রঞ্জি ট্রফি ম্যাচ সমাপ্ত
বাংলা ইনিংসে জয়ী

গত ১৮ই এবং ১৯শে ডিসেম্বর তারিখে জেলা ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বহু আলোচিত ও প্রত্যাশিত রঞ্জি ট্রফির বাঙলা বনাম আসামের খেলা। দীর্ঘ ছয়মাসের প্রস্তুতি ও নিরলস পরিশ্রমের পর এই খেলাটি সফলভাবে ও উচ্চশ্রেণীর মান বজায় রেখে সুসম্পন্ন করতে পেরে নদীয়া জেলা স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি ব্যক্তি খুশী ও সুখী।

১৮ তারিখে সকাল ঠিক সাড়ে নটায় খেলা শুরু হয়। খেলা শুরু হবার পূর্বে মাঠে উভয় দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন মাননীয় মন্ত্রী শ্রীঅমৃতেন্দু মুখোপাধ্যায় ও কৃষ্ণনগর পৌরসভার মাননীয় পৌরপিতা শ্রীসুহৃদ চট্টোপাধ্যায়। খেলোয়াড়দের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ঘটিয়ে দেন সংস্থার সভাপতি শ্রীসুবিমল দত্ত, জেলাশাসক নদীয়া, সহঃসভাপতিদ্বয় শ্রীবিপি সিং, পুলিশপ্রধান নদীয়া ও শ্রীশঙ্করীচরণ চট্টোপাধ্যায় এবং জেলা সংস্থার সাধারণ সম্পাদক শ্রীগোবিন্দ প্রসাদ দত্ত। পরিচয়ের পালা সাঙ্গ হবার পর খেলোয়াড়রা পরস্পরের মধ্যে পুষ্পস্তবক বিনিময়ে করেন এবং গ্যালারীর দর্শকদের উদ্দেশ্যে আন্তরিক উষ্ণ অভিনন্দনসহ সেগুলি গ্যালারীতে ছুঁড়ে দেন।

টসে আসামদল জয়ী হয় এবং বাঙলাকে ব্যাট করতে পাঠায়। সুন্দর পিচে এবং মনোরম আবহাওয়ার মধ্যে শুরু হয় কলকাতার বাইরে পশ্চিমবঙ্গের মফঃস্বল কোন শহরে অনুষ্ঠিত রঞ্জি ট্রফির এই ঐতিহাসিক ম্যাচটি। দলের ৩১ রাণের মাথায় বাঙলার প্রথম উইকেট পড়ে। প্রণব রায় ৭রানে এল, বি. ডব্লিউ হন। এরপর প্রণব নন্দী (৮১) রাজা বেঙ্কট (৪০) ও পলাশ নন্দী (৩৫) সকলেই ভাল ব্যাট করেন। নবাগত প্রারম্ভিক ব্যাট ফারাস তুল্লাও (১২) সুন্দর খেলেছেন। জীবনের প্রথম রঞ্জি ট্রফি খেলতে নেমে রাজেশ ... দুর্ভাগ্যবশতঃ রাণ-আউট হয়ে যাওয়ায় সকলেই বাথিত। বাঙলার প্রথম ইনিংস ২৯০ রাণে শেষ হয়। আসামের নব কানওয়ার সারা ইনিংস ধরে প্রশংসনীয়ভাবে বল করে তিনটি উইকেট দখল করেন। অন্যান্য বোলারদের মধ্যে কে দাশ তিনটি, মুন্না কাকতি ২টি এবং নাগেশ সিং ১টি উইকেট পান।

দিনের শেষে আসাম ২ উইকেটে ৩২ রাণ করে। আলোকাভাবের জন্য প্রথমদিন পাঁচমিনিট পূর্বে খেলা শেষ হয়।

সূত্র: নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ, ১লা জানুয়ারী, ১৯৮২, পৃ. ১।

সংযোজনী: ১৬. কৃষ্ণনগরস্থ জেলা স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড একাদশ বনাম নদীয়া জেলা একাদশ প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলার প্রকাশিত সংবাদ।

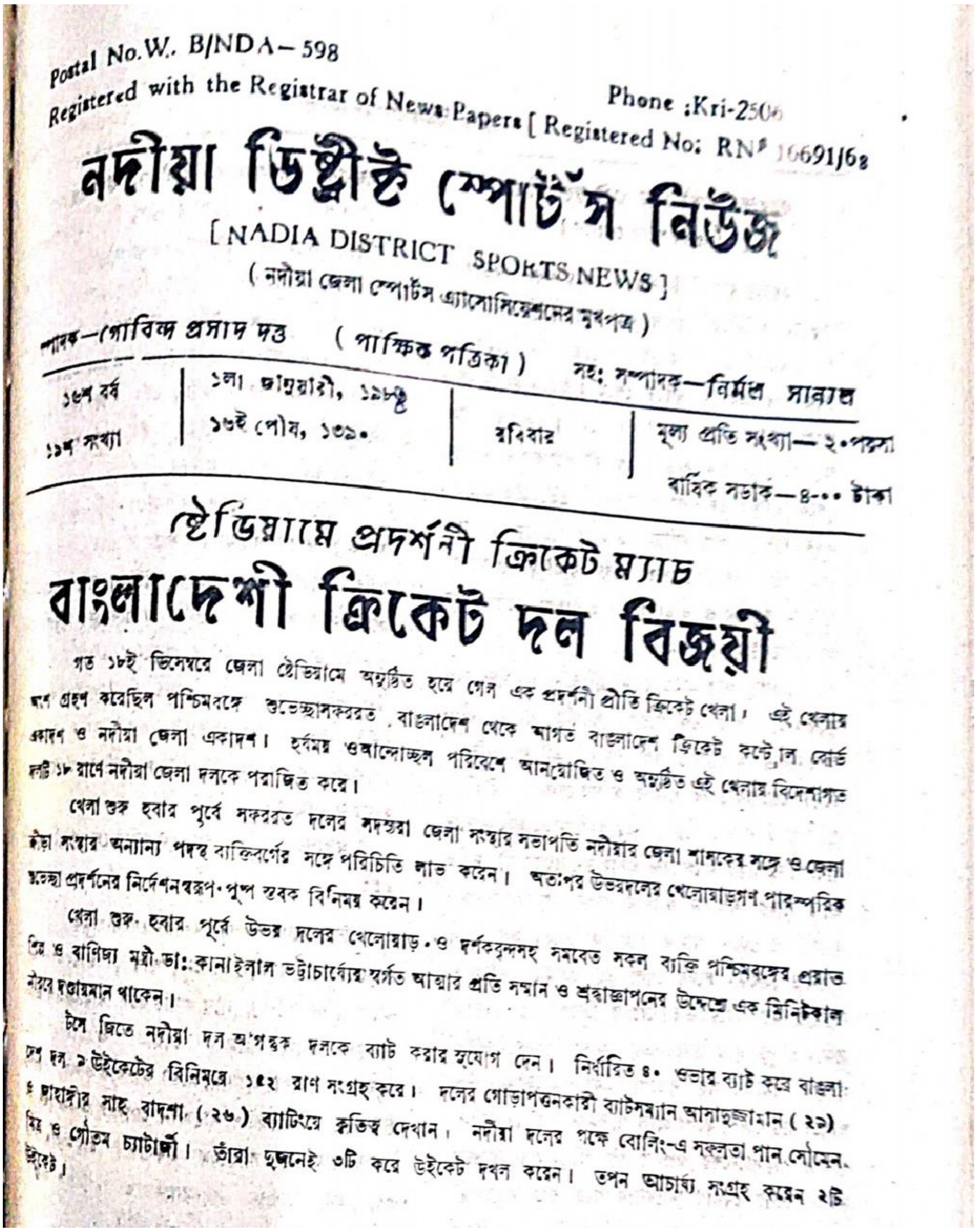

Postal No.W. B/NDA—598
Registered with the Registrar of News Papers [Registered No: RN 16691/64 Phone :Kri-2506

নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ
[NADIA DISTRICT SPORTS NEWS]
(নদীয়া জেলা স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশনের মুখপত্র)

সম্পাদক—গোবিন্দ প্রসাদ দত্ত (পাক্ষিক পত্রিকা) সহঃ সম্পাদক—নির্মল সান্যাল

১৬শ বর্ষ	১লা জানুয়ারী, ১৯৮৪		
১১শ সংখ্যা	১৬ই পৌষ, ১৩৯০	রবিবার	মূল্য প্রতি সংখ্যা—২০ পয়সা
			বার্ষিক সডাক—৪.০০ টাকা

স্টেডিয়ামে প্রদর্শনী ক্রিকেট ম্যাচ

বাংলাদেশী ক্রিকেট দল বিজয়ী

গত ১৮ই ডিসেম্বর জেলা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল এক প্রদর্শনী প্রীতি ক্রিকেট খেলা। এই খেলায় অংশ গ্রহণ করেছিল পশ্চিমবঙ্গে শুভেচ্ছাসফররত বাংলাদেশ থেকে আগত বাংলাদেশ ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড একাদশ ও নদীয়া জেলা একাদশ। হর্ষময় ও আনন্দোচ্ছল পরিবেশে আয়োজিত ও অনুষ্ঠিত এই খেলায় বিদেশাগত দলটি ১৮ রানে নদীয়া জেলা দলকে পরাজিত করে।

খেলা শুরু হবার পূর্বে সফররত দলের সদস্যরা জেলা সংস্থার সভাপতি নদীয়ার জেলা শাসকের সঙ্গে ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার অন্যান্য পদস্থ ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে পরিচিতি লাভ করেন। অতঃপর উভয়দলের খেলোয়াড়গণ পারস্পরিক শুভেচ্ছা প্রদর্শনের নির্দেশনস্বরূপ পুষ্প স্তবক বিনিময় করেন।

খেলা শুরু হবার পূর্বে উভয় দলের খেলোয়াড় ও দর্শকবৃন্দসহ সমবেত সকল ব্যক্তি পশ্চিমবঙ্গের প্রয়াত শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী ডাঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য্যের স্বর্গত আত্মার প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে এক মিনিটকাল নীরবে দণ্ডায়মান থাকেন।

টসে জিতে নদীয়া দল অভ্যাগত দলকে ব্যাট করার সুযোগ দেন। নির্ধারিত ৪০ ওভার ব্যাট করে বাংলাদেশ দল ৯ উইকেটের বিনিময়ে ১৫২ রাণ সংগ্রহ করে। দলের গোড়াপত্তনকারী ব্যাটসম্যান আসাদুজ্জামান (২৯) ও জাহাঙ্গীর শাহ বাদশা (২৬) ব্যাটিংয়ে কৃতিত্ব দেখান। নদীয়া দলের পক্ষে বোলিং-এ সফলতা পান সৌমেন মিত্র ও গৌতম চ্যাটার্জী। তাঁরা দুজনেই ৩টি করে উইকেট দখল করেন। তপন আচার্য্য সংগ্রহ করেন ২টি উইকেট।

সূত্র: নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ, ১লা জানুয়ারী, ১৯৮৪, পৃ. ১।

সংযোজনী: ১৭. আন্তঃজেলা ভলিবল প্রতিযোগিতায় প্রথমবারের মতো নদীয়া জেলা দলের বিজয়ের প্রকাশিত সংবাদ।

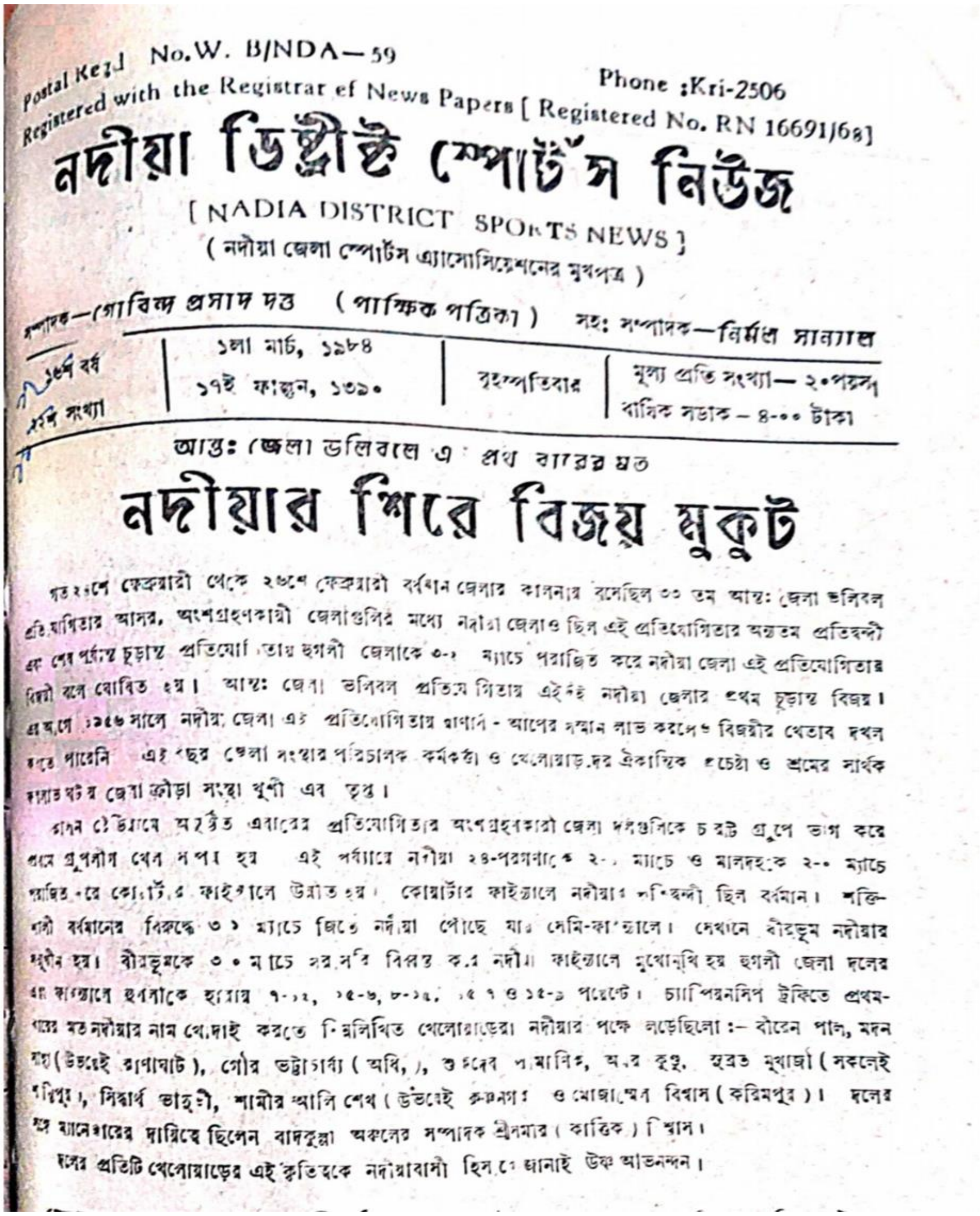

Postal Regd No. W. B/NDA—59
Registered with the Registrar of News Papers [Registered No. RN 16691/68]
Phone : Kri-2506

নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ

[NADIA DISTRICT SPORTS NEWS]

(নদীয়া জেলা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের মুখপত্র)

সম্পাদক—গোবিন্দ প্রসাদ দত্ত (পাক্ষিক পত্রিকা) সহঃ সম্পাদক—নির্মল সান্যাল

১৬শ বর্ষ | ১লা মার্চ, ১৯৮৪ | বৃহস্পতিবার | মূল্য প্রতি সংখ্যা— ২০পয়সা
২৪শ সংখ্যা | ১৭ই ফাল্গুন, ১৩৯০ | | বার্ষিক সডাক – ৪·০০ টাকা

আন্তঃ জেলা ভলিবলে এ প্রথ বারের মত

নদীয়ার শিরে বিজয় মুকুট

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২৬শে ফেব্রুয়ারী বর্ধমান জেলার কালনায় বসেছিল ৩৩ তম আন্তঃ জেলা ভলিবল প্রতিযোগিতার আসর, অংশগ্রহণকারী জেলাগুলির মধ্যে নদীয়া জেলাও ছিল এই প্রতিযোগিতার অন্যতম প্রতিদ্বন্দী এবং শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় হুগলী জেলাকে ৩-১ ম্যাচে পরাজিত করে নদীয়া জেলা এই প্রতিযোগিতার বিজয়ী বলে ঘোষিত হয়। আন্তঃ জেলা ভলিবল প্রতিযোগিতায় এই নদীয়া জেলার প্রথম চূড়ান্ত বিজয়। এর আগে ১৯৫৬ সালে নদীয়া জেলা এই প্রতিযোগিতায় রানার্স - আপের সম্মান লাভ করলেও বিজয়ীর খেতাব দখল করতে পারেনি। এই বছর জেলা সংস্থার পরিচালক কর্মকর্তা ও খেলোয়াড়দের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও শ্রমের সার্থক রূপায়নের জেলা ক্রীড়া সংস্থা খুশী এবং তৃপ্ত।

নক আউট ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত এবারের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী জেলা দলগুলিকে চারটি গ্রুপে ভাগ করে প্রথমে গ্রুপলীগ খেলা সম্পন্ন হয়। এই পর্যায়ে নদীয়া ২৪-পরগনাকে ২-০ ম্যাচে ও মালদহকে ২-০ ম্যাচে পরাজিত করে কোয়ার্টার ফাইনালে উন্নীত হয়। কোয়ার্টার ফাইনালে নদীয়ার প্রতিদ্বন্দী ছিল বর্ধমান। শক্তিশালী বর্ধমানের বিরুদ্ধে ৩-১ ম্যাচে জিতে নদীয়া পৌঁছে যায় সেমি-ফাইনালে। সেখানে বীরভূম নদীয়ার প্রতিদ্বন্দী হয়। বীরভূমকে ৩-০ ম্যাচে পরাজিত করে নদীয়া ফাইনালে মুখোমুখি হয় হুগলী জেলা দলের এবং ফাইনালে হুগলীকে হারায় ৭-১২, ১৫-৬, ৮-১৫, ১৫-৭ ও ১৫-৯ পয়েন্টে। চ্যাম্পিয়নশিপ ট্রফিতে প্রথমবারের মত নদীয়ার নাম খোদাই করতে নিম্নলিখিত খেলোয়াড়েরা নদীয়ার পক্ষে লড়েছিলো :- বীরেন পাল, মদন সাহা (উভয়েই রাণাঘাট), গৌর ভট্টাচার্য্য (অধি,), শুভদেব প্রামানিক, অমর কুণ্ডু, সুব্রত মুখার্জী (সকলেই শান্তিপুর), সিদ্ধার্থ ভাদুড়ী, শামীম আলি শেখ (উভয়েই কৃষ্ণনগর) ও মোজাম্মেল বিশ্বাস (করিমপুর)। দলের ম্যানেজারের দায়িত্বে ছিলেন বাদকুল্লা অঞ্চলের সম্পাদক শ্রীনমার (কার্তিক) বিশ্বাস।

দলের প্রতিটি খেলোয়াড়ের এই কৃতিত্বকে নদীয়াবাসী হিসেবে জানাই উষ্ণ অভিনন্দন।

সূত্র: নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ, ১লা মার্চ, ১৯৮৪, পৃ. ১।

সংযোজনী: ১৮. ১৯৮৪ সালের মরশুমে নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত সিনিয়র ফুটবল লীগে ৫০০-এর অধিক ক্লাব অংশগ্রহণ করে।

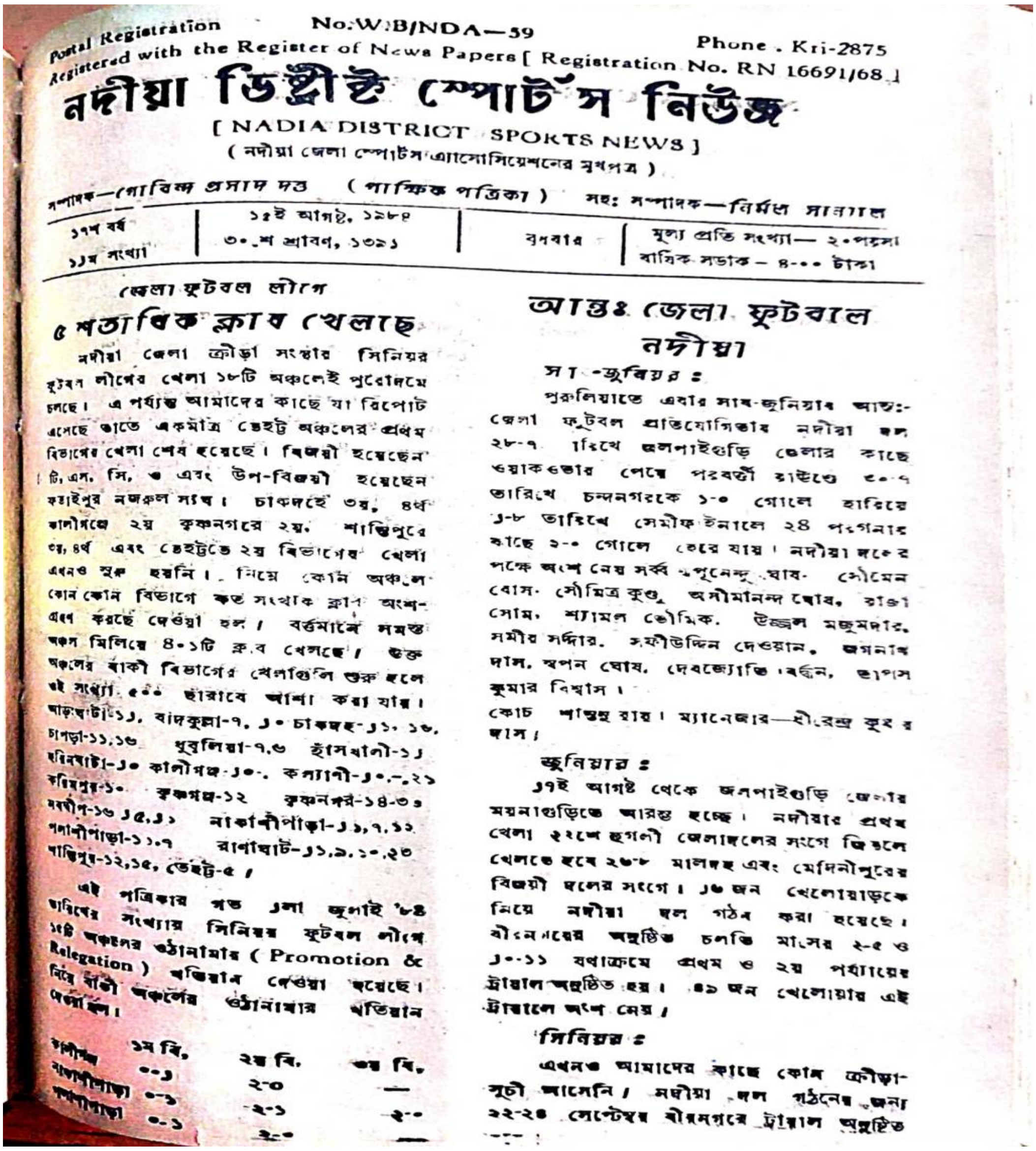

Postal Registration No. W.B/NDA—59
Registered with the Register of News Papers [Registration No. RN 16691/68]
Phone . Kri-2875

নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ

[NADIA DISTRICT SPORTS NEWS]
(নদীয়া জেলা স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশনের মুখপত্র)

সম্পাদক—গোবিন্দ প্রসাদ দত্ত (পাক্ষিক পত্রিকা) সহ: সম্পাদক—নির্মল সান্যাল

১৭শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা | ১৫ই আগষ্ট, ১৯৮৪, ৩০শে শ্রাবণ, ১৩৯১ | বুধবার | মূল্য প্রতি সংখ্যা— ২০পয়সা, বার্ষিক সডাক – ৪-০০ টাকা

জেলা ফুটবল লীগে

৫ শতাধিক ক্লাব খেলছে

নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার সিনিয়র ফুটবল লীগের খেলা ১৮টি অঞ্চলেই পুরোদমে চলছে। এ পর্য্যন্ত আমাদের কাছে যা রিপোর্ট এসেছে তাতে একমাত্র তেহট্ট অঞ্চলের প্রথম বিভাগের খেলা শেষ হয়েছে। বিজয়ী হয়েছেন টি, এস, সি, ও এবং উপ-বিজয়ী হয়েছেন ফতাইপুর নজরুল সংঘ। চাকদহে ৩য়, ৪র্থ কালীগঞ্জে ২য় কৃষ্ণনগরে ২য়, শান্তিপুরে ৩য়, ৪র্থ এবং তেহট্টতে ২য় বিভাগের খেলা এখনও সুরু হয়নি। নিম্নে কোন অঞ্চলে কোন কোন বিভাগে কত সংখ্যক ক্লাব অংশগ্রহণ করছে দেওয়া হল। বর্তমানে সমস্ত অঞ্চল মিলিয়ে ৪০১টি ক্লাব খেলছে। উক্ত অঞ্চলের বাকী বিভাগের খেলাগুলি শুরু হলে এই সংখ্যা ৫০০ ছাড়াবে আশা করা যায়। আড়ংঘাটা-১১, বাদকুল্লা-৭, ১০ চাকদহ-১১, ১৬, চাপড়া-১১, ১৬ ধুবুলিয়া-৭, ৬ হাঁসখালী-১১ হরিণঘাটা-১০ কালীগঞ্জ-১০-, কল্যাণী-১০, -, ২১ করিমপুর-১০ কৃষ্ণগঞ্জ-১২ কৃষ্ণনগর-১৪-৩১ নবদ্বীপ-১৬ ১৫, ১১ নাকাশীপাড়া-১১, ৭, ১১ পলাশীপাড়া-১১, ৭ রাণাঘাট-১১, ৯, ১০, ২৩ শান্তিপুর-১২, ১৫, তেহট্ট-৫।

এই পত্রিকার গত ১লা জুলাই '৮৪ তারিখের সংখ্যায় সিনিয়র ফুটবল লীগে ১৫টি অঞ্চলের ওঠানামার (Promotion & Relegation) খতিয়ান দেওয়া হয়েছে। নিম্নে বাকী অঞ্চলের ওঠানামার খতিয়ান দেওয়া হল।

	১ম বি.	২য় বি.	৩য় বি.
কালীগঞ্জ	০-১	২-০	—
নাকাশীপাড়া	০-১	২-১	২-০
পলাশীপাড়া	০-১	২-০	—

আন্তঃ জেলা ফুটবলে নদীয়া

সাব-জুনিয়র:

পুরুলিয়াতে এবার সাব-জুনিয়ার আন্তঃ-জেলা ফুটবল প্রতিযোগিতার নদীয়া দল ২৮-৭ তারিখে জলপাইগুড়ি জেলার কাছে ওয়াকওভার পেয়ে পরবর্তী রাউণ্ডে ৩০-৭ তারিখে চন্দননগরকে ১-০ গোলে হারিয়ে ১-৮ তারিখে সেমীফাইনালে ২৪ পরগনার কাছে ২-০ গোলে হেরে যায়। নদীয়া দলের পক্ষে অংশ নেয় সর্ব্ব শুভেন্দু ঘোষ, সৌমেন বোস, সৌমিত্র কুণ্ড, অসীমানন্দ ঘোষ, রাজা সোম, শ্যামল ভৌমিক, উজ্জল মজুমদার, সমীর সর্দ্দার, রফীউদ্দিন দেওয়ান, জগন্নাথ দাস, স্বপন ঘোষ, দেবজ্যোতি বর্দ্ধন, তাপস কুমার বিশ্বাস।
কোচ শান্তনু রায়। ম্যানেজার—হীরেন্দ্র কুমার দাস।

জুনিয়ার:

১৭ই আগষ্ট থেকে জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়িতে আরম্ভ হচ্ছে। নদীয়ার প্রথম খেলা ২২শে হুগলী জেলাদলের সংগে দ্বিতলে খেলতে হবে ২৩-৮ মালদহ এবং মেদিনীপুরের বিজয়ী দলের সংগে। ১৬ জন খেলোয়াড়কে নিয়ে নদীয়া দল গঠন করা হয়েছে। বীরনগরের অনুষ্ঠিত চলতি মাসের ২-৫ ও ১০-১১ যথাক্রমে প্রথম ও ২য় পর্য্যায়ের ট্রায়াল অনুষ্ঠিত হয়। ৪১ জন খেলোয়ার এই ট্রায়ালে অংশ নেয়।

সিনিয়র:

এখনও আমাদের কাছে কোন ক্রীড়াসূচী আসেনি। নদীয়া দল গঠনের জন্য ২২-২৩ সেপ্টেম্বর বীরনগরে ট্রায়াল অনুষ্ঠিত [illegible]

সূত্র: নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ, ১৫ই আগস্ট, ১৯৮৪, পৃ. ১।

সংযোজনী: ১৯. নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় নদীয়ার পল্লী মাঠে (তেহট্টে) আই.এফ.এ শীল্ড প্রতিযোগিতার খেলা আয়োজিত করার প্রকাশিত সংবাদ।

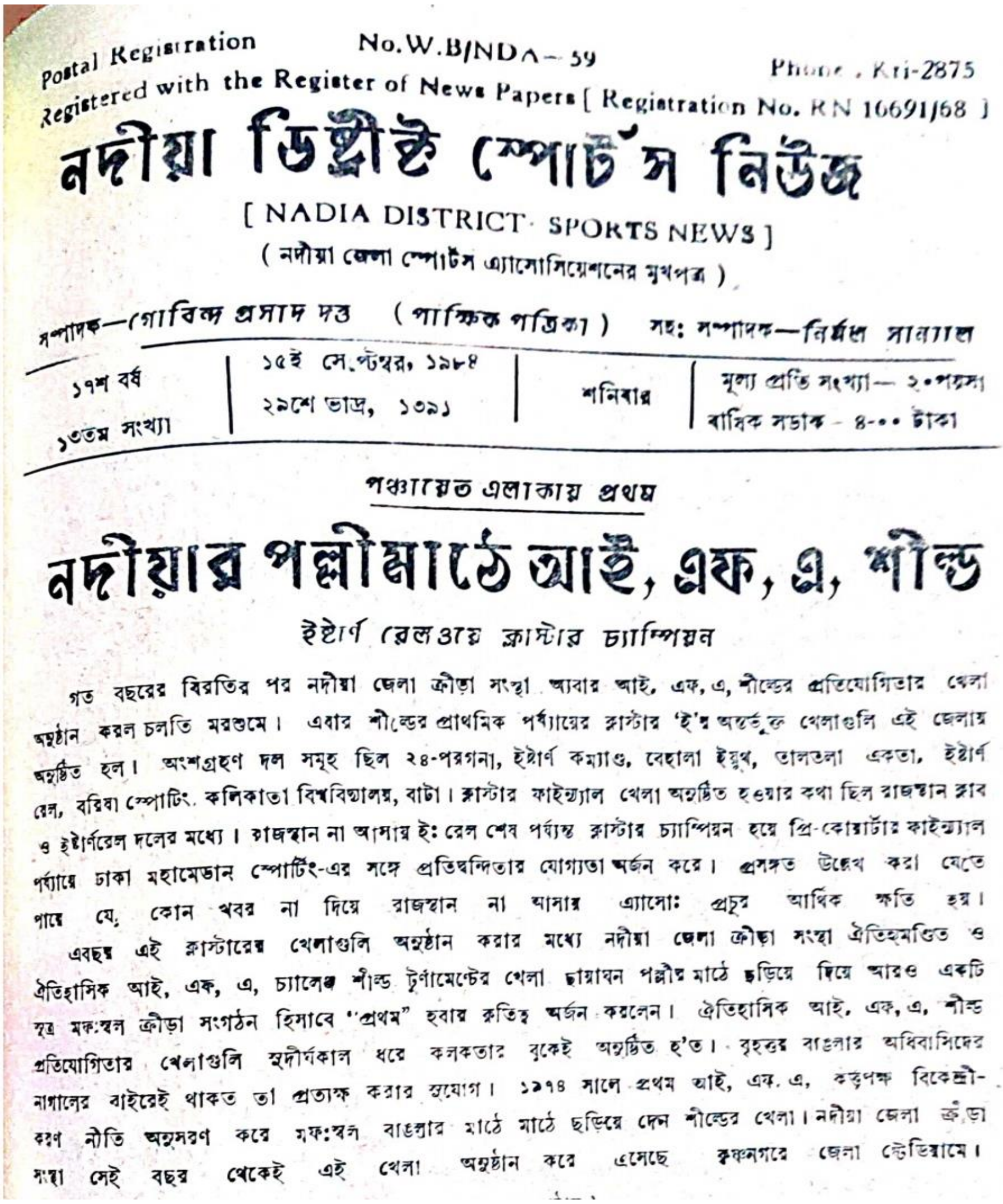

Postal Registration No. W.B/NDA – 59

Phone, Kri-2875

Registered with the Register of News Papers [Registration No. RN 16691/68]

নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ

[NADIA DISTRICT SPORTS NEWS]

(নদীয়া জেলা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের মুখপত্র)

সম্পাদক—গোবিন্দ প্রসাদ দত্ত (পাক্ষিক পত্রিকা) সহঃ সম্পাদক—নির্মল সান্যাল

১৭শ বর্ষ ১৩তম সংখ্যা	১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪ ২৯শে ভাদ্র, ১৩৯১	শনিবার	মূল্য প্রতি সংখ্যা— ২০পয়সা বার্ষিক সডাক - ৪-০০ টাকা

পঞ্চায়েত এলাকায় প্রথম

নদীয়ার পল্লীমাঠে আই, এফ, এ, শীল্ড

ইষ্টার্ণ রেলওয়ে ক্লাস্টার চ্যাম্পিয়ন

গত বছরের বিরতির পর নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা আবার আই, এফ, এ, শীল্ডের প্রতিযোগিতার খেলা অনুষ্ঠান করল চলতি মরশুমে। এবার শীল্ডের প্রাথমিক পর্য্যায়ের ক্লাস্টার 'ই'র অন্তর্ভুক্ত খেলাগুলি এই জেলায় অনুষ্ঠিত হল। অংশগ্রহণ দল সমূহ ছিল ২৪-পরগনা, ইষ্টার্ণ কম্যাণ্ড, বেহালা ইয়ুথ, তালতলা একতা, ইষ্টার্ণ রেল, বরিষা স্পোর্টিং, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বাটা। ক্লাস্টার ফাইন্যাল খেলা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল রাজস্থান ক্লাব ও ইষ্টার্ণরেল দলের মধ্যে। রাজস্থান না আসায় ইঃ রেল শেষ পর্য্যন্ত ক্লাস্টার চ্যাম্পিয়ন হয়ে প্রি-কোয়ার্টার ফাইন্যাল পর্য্যায়ে ঢাকা মহামেডান স্পোর্টিং-এর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার যোগ্যতা অর্জন করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কোন খবর না দিয়ে রাজস্থান না আসায় এ্যাসোঃ প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হয়।

এবছর এই ক্লাস্টারের খেলাগুলি অনুষ্ঠান করার মধ্যে নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা ঐতিহ্যমণ্ডিত ও ঐতিহাসিক আই, এফ, এ, চ্যালেঞ্জ শীল্ড টুর্ণামেন্টের খেলা চাপড়া পল্লীর মাঠে ছড়িয়ে দিয়ে আরও একটি সূত্র মফঃস্বল ক্রীড়া সংগঠন হিসাবে "প্রথম" হবার কৃতিত্ব অর্জন করলেন। ঐতিহাসিক আই, এফ, এ, শীল্ড প্রতিযোগিতার খেলাগুলি সুদীর্ঘকাল ধরে কলকাতার বুকেই অনুষ্ঠিত হ'ত। বৃহত্তর বাংলার অধিবাসিদের নাগালের বাইরেই থাকত তা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ। ১৯৭৪ সালে প্রথম আই, এফ, এ, কর্তৃপক্ষ বিকেন্দ্রীকরণ নীতি অনুসরণ করে মফঃস্বল বাংলার মাঠে মাঠে ছড়িয়ে দেন শীল্ডের খেলা। নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা সেই বছর থেকেই এই খেলা অনুষ্ঠান করে এসেছে কৃষ্ণনগরে জেলা ষ্টেডিয়ামে।

সূত্র: নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ, ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪, পৃ. ১।

সংযোজনী: ২০. নদীয়া জেলার ক্রীড়া সংস্থার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র।

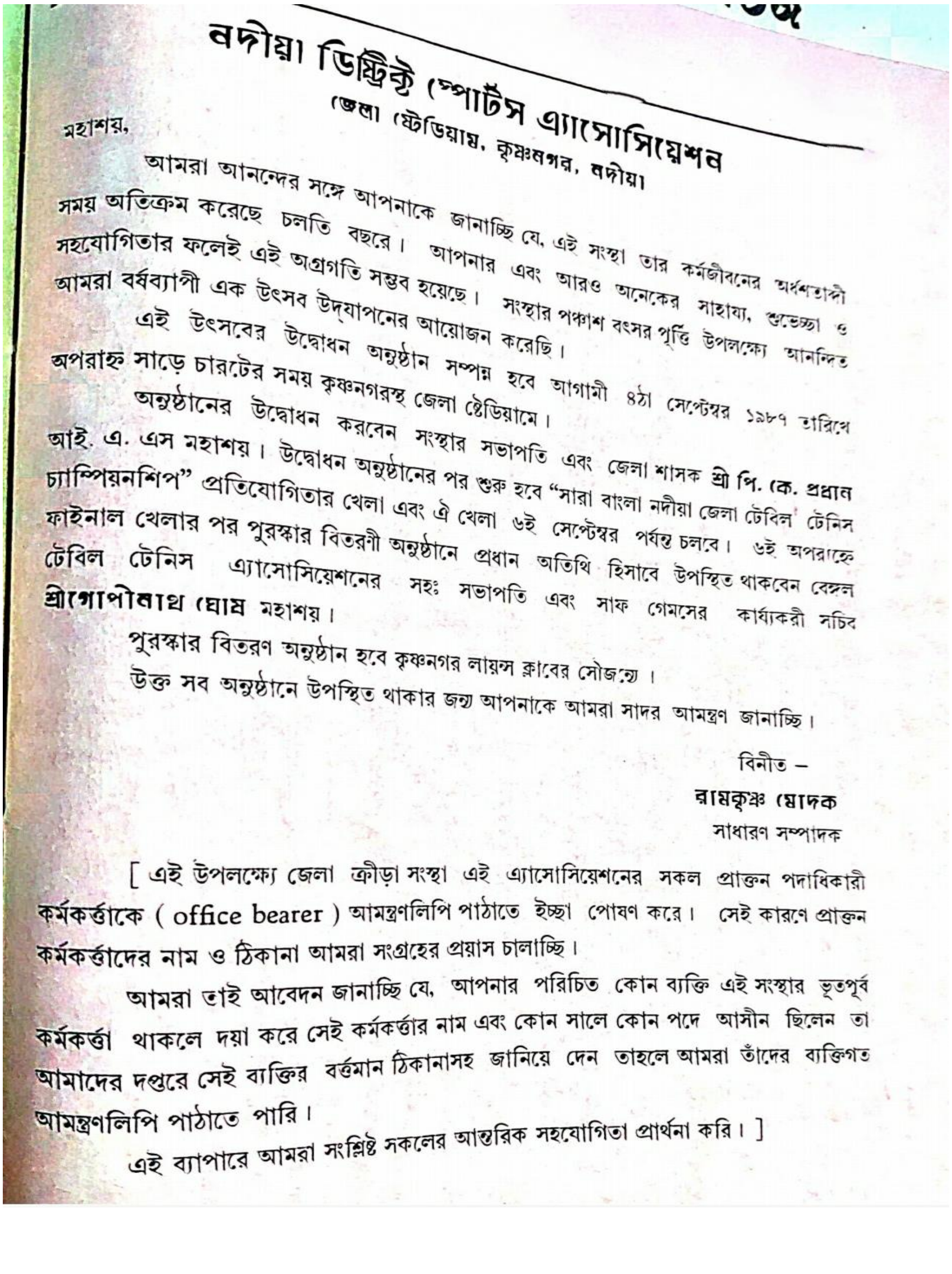

নদীয়া ডিষ্ট্রিক্ট স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশন
জেলা ষ্টেডিয়াম, কৃষ্ণনগর, নদীয়া

মহাশয়,

আমরা আনন্দের সঙ্গে আপনাকে জানাচ্ছি যে, এই সংস্থা তার কর্মজীবনের অর্ধশতাব্দী সময় অতিক্রম করেছে চলতি বছরে। আপনার এবং আরও অনেকের সাহায্য, শুভেচ্ছা ও সহযোগিতার ফলেই এই অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। সংস্থার পঞ্চাশ বৎসর পূর্ত্তি উপলক্ষ্যে আনন্দিত আমরা বর্ষব্যাপী এক উৎসব উদ্‌যাপনের আয়োজন করেছি।

এই উৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে আগামী ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৮৭ তারিখে অপরাহ্ন সাড়ে চারটের সময় কৃষ্ণনগরস্থ জেলা ষ্টেডিয়ামে।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন সংস্থার সভাপতি এবং জেলা শাসক **শ্রী পি. কে. প্রধান** আই. এ. এস মহাশয়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানের পর শুরু হবে "সারা বাংলা নদীয়া জেলা টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ" প্রতিযোগিতার খেলা এবং ঐ খেলা ৬ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে। ৬ই অপরাহ্নে ফাইনাল খেলার পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন বেঙ্গল টেবিল টেনিস এ্যাসোসিয়েশনের সহঃ সভাপতি এবং সাফ গেমসের কার্য্যকরী সচিব **শ্রীগোপীনাথ ঘোষ** মহাশয়।

পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান হবে কৃষ্ণনগর লায়ন্স ক্লাবের সৌজন্যে।

উক্ত সব অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আপনাকে আমরা সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

বিনীত –
রামকৃষ্ণ মোদক
সাধারণ সম্পাদক

[এই উপলক্ষ্যে জেলা ক্রীড়া সংস্থা এই এ্যাসোসিয়েশনের সকল প্রাক্তন পদাধিকারী কর্মকর্ত্তাকে (office bearer) আমন্ত্রণলিপি পাঠাতে ইচ্ছা পোষণ করে। সেই কারণে প্রাক্তন কর্মকর্ত্তাদের নাম ও ঠিকানা আমরা সংগ্রহের প্রয়াস চালাচ্ছি।

আমরা তাই আবেদন জানাচ্ছি যে, আপনার পরিচিত কোন ব্যক্তি এই সংস্থার ভূতপূর্ব কর্মকর্ত্তা থাকলে দয়া করে সেই কর্মকর্ত্তার নাম এবং কোন সালে কোন পদে আসীন ছিলেন তা আমাদের দপ্তরে সেই ব্যক্তির বর্ত্তমান ঠিকানাসহ জানিয়ে দেন তাহলে আমরা তাঁদের ব্যক্তিগত আমন্ত্রণলিপি পাঠাতে পারি।

এই ব্যাপারে আমরা সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক সহযোগিতা প্রার্থনা করি।]

সূত্র: নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার সংরক্ষিত তথ্য ভান্ডার থেকে গবেষক কর্তৃক সংগৃহীত।

সংযোজনী: ২১. নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় কৃষ্ণনগরস্থ জেলা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত রাজ্য জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতার প্রকাশিত সংবাদ।

Postal Registration No.W.B/NDA—59 Phone . Kri-287: 16

Registered with the Registrar of NewsPapers [Registration No. RN 166918

নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ

[NADIA DISTRICT SPORTS NEWS]

(নদীয়া জেলা স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশনের মুখপত্র)

সম্পাদক —গোবিন্দ প্রসাদ দত্ত (পাক্ষিক পত্রিকা) সহঃ সম্পাদক—নির্মল সান্যাল

১৩শ বর্ষ ১ম সংখ্যা	১লা মার্চ, ১৯৯০ ১৬ই ফাল্গুন, ১৩৯৬	বৃহস্পতিবার	মূল্য প্রতি সংখ্যা—১.০০ বার্ষিক সডাক—১৫.০০ টাক

নদীয়া ডিষ্ট্রিক্ট স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশনের ব্যাবস্থাপনায়

কৃষ্ণনগরে রাজ্য জুনিয়র এ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নসিপ সম্পন্ন

পশ্চিমবঙ্গ এ্যামেচার এ্যাথলেটিক এ্যাসোসিয়েশনের-এর উদ্যোগে এবং নদীয়া ডিষ্ট্রিক্ট স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় পূর্বঘোষণা অনুযায়ী গত ১৬ই, ১৭ই এবং ১৮ই ফেব্রুয়ারী কৃষ্ণনগর সরকারী কলেজ ময়দান এবং জেলা স্টেডিয়ামে সুষ্ঠু এবং সাফল্যমণ্ডিতভাবে সম্পন্ন হয়ে গেল রাজ্য জুনিয়র এ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নসিপের প্রতিযোগিতা।

এ্যামেচার এথলেটিক এ্যাসোসিয়েশন এই বছরই প্রথমবারের মতো জুনিয়র বিভাগের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পৃথকভাবে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা নিলেন। ইতিপূর্বে সিনিয়র ও জুনিয়র বিভাগের প্রতিযোগিতা একত্রেই অনুষ্ঠিত হয়ে এসেছে।

এই প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন ক্লাব ও জেলা মিলিয়ে মোট ২৫টি দলের পক্ষে পাঁচশতাধিক প্রতিযোগী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সামিল হয়। বালক বিভাগে অনধিক ১৯ বৎসর ও অনধিক ১৬ বৎসর বয়স্ক এবং বালিকা বিভাগে অনূর্ধ ১৮ বৎসর ও অনূর্ধ ১৫ বৎসর বয়স্ক মোট এই চারটি বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনুষ্ঠিত হয়।

(শেষাংশ ৩য় পৃষ্ঠায়)

সূত্র: নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ, ১লা মার্চ, ১৯৯০, পৃ. ১।

সংযোজনী: ২২. নবদ্বীপে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচে নদীয়া জেলা একাদশের কাছে ইস্টবেঙ্গল দলের হারের প্রকাশিত সংবাদ।

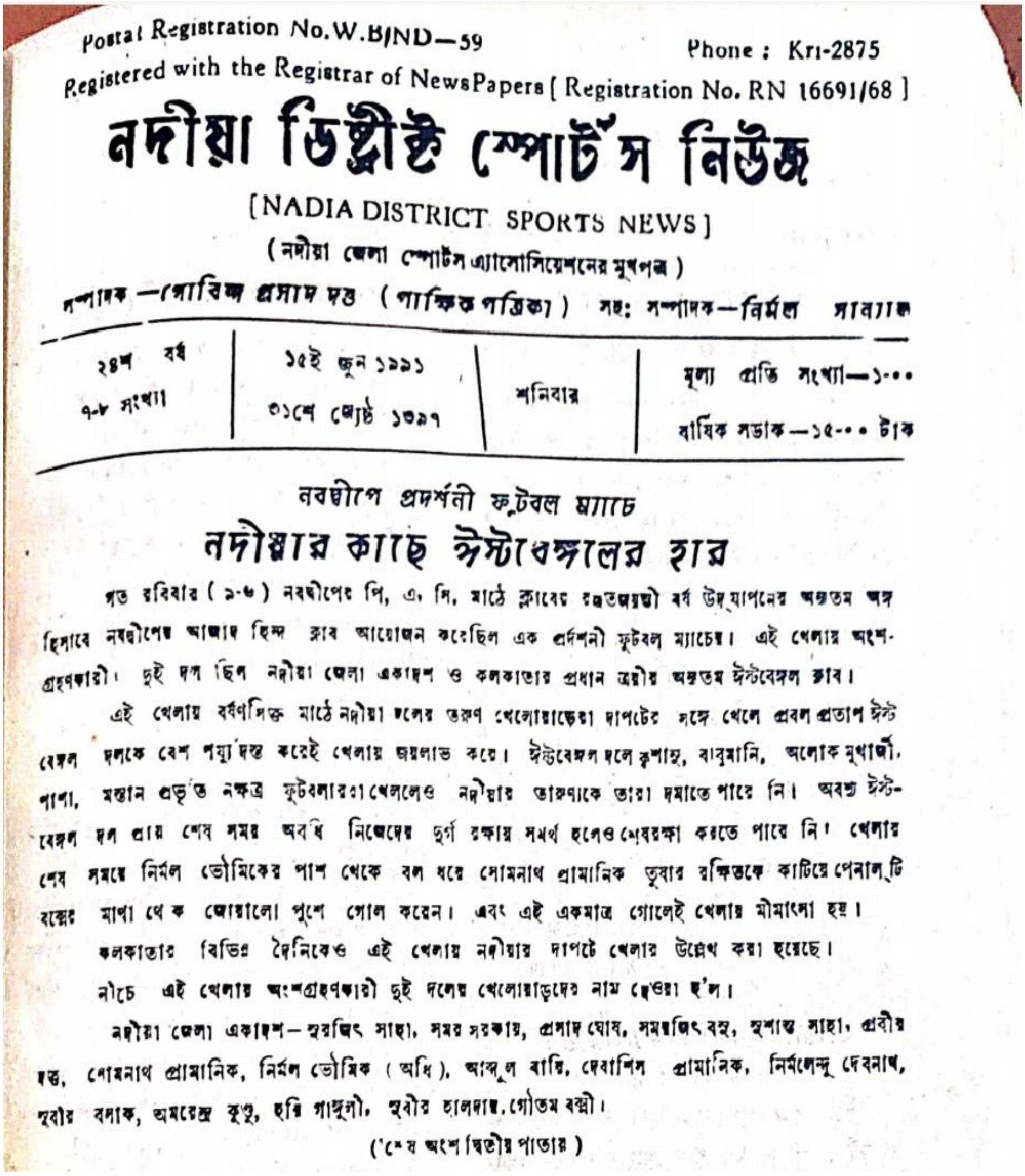

Postal Registration No. W.B/ND—59 Phone : Kri-2875

Registered with the Registrar of NewsPapers [Registration No. RN 16691/68]

নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ

[NADIA DISTRICT SPORTS NEWS]

(নদীয়া জেলা স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশনের মুখপত্র)

সম্পাদক—গোবিন্দ প্রসাদ দত্ত (পাক্ষিক পত্রিকা) সহ: সম্পাদক—নির্মল সান্যাল

২৪শ বর্ষ ৭-৮ সংখ্যা	১৫ই জুন ১৯৯১ ৩১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৭	শনিবার	মূল্য প্রতি সংখ্যা—১.০০ বার্ষিক সডাক—১৫.০০ টাকা

নবদ্বীপে প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচে

নদীয়ার কাছে ঈস্টবেঙ্গলের হার

গত রবিবার (৯-৬) নবদ্বীপের পি, এ, সি, মাঠে ক্লাবের রজতজয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপনের অন্যতম অঙ্গ হিসাবে নবদ্বীপের আজাদ হিন্দ ক্লাব আয়োজন করেছিল এক প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচের। এই খেলায় অংশগ্রহণকারী দুই দল ছিল নদীয়া জেলা একাদশ ও কলকাতার প্রধান তিনটির অন্যতম ঈস্টবেঙ্গল ক্লাব।

এই খেলায় বর্ষণসিক্ত মাঠে নদীয়া দলের তরুণ খেলোয়াড়েরা দাপটের সঙ্গে খেলে প্রবল প্রতাপ ঈস্ট বেঙ্গল দলকে বেশ পর্যুদস্ত করেই খেলায় জয়লাভ করে। ঈস্টবেঙ্গল দলে কৃশানু, বাবুমানি, অলোক মুখার্জী, পাপা, মস্তান প্রভৃতি নক্ষত্র ফুটবলাররা খেললেও নদীয়ার তারুণ্যকে তারা দমাতে পারে নি। অবশ্য ঈস্ট-বেঙ্গল দল প্রায় শেষ সময় অবধি নিজেদের দুর্গ রক্ষায় সমর্থ হলেও শেষরক্ষা করতে পারে নি। খেলার শেষ সময়ে নির্মল ভৌমিকের পাশ থেকে বল ধরে সোমনাথ প্রামানিক তুষার রক্ষিতকে কাটিয়ে পেনাল্টি বক্সের মাথা থেকে জোরালো শুটে গোল করেন। এবং এই একমাত্র গোলেই খেলার মীমাংসা হয়।

কলকাতার বিভিন্ন দৈনিকেও এই খেলায় নদীয়ার দাপটে খেলার উল্লেখ করা হয়েছে।

নীচে এই খেলায় অংশগ্রহণকারী দুই দলের খেলোয়াড়দের নাম দেওয়া হ'ল।

নদীয়া জেলা একাদশ—সুরজিৎ সাহা, সমর সরকার, প্রসাদ ঘোষ, সমরজিৎ বসু, সুশান্ত সাহা, প্রবীর দত্ত, সোমনাথ প্রামানিক, নির্মল ভৌমিক (অধি), আব্দুল বারি, দেবাশিস প্রামানিক, নির্মলেন্দু দেবনাথ, সুবীর বসাক, অমরেন্দ্র কুণ্ডু, হরি গাঙ্গুলী, সুবীর হালদার, গৌতম বক্সী।

(শেষ অংশ দ্বিতীয় পাতায়)

সূত্র: নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ, ১৫ই জুন, ১৯৯১, পৃ. ১।

সংযোজনী: ২৩. নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় জেলায় প্রথম সাব-জুনিয়র ক্রিকেট লীগ সূচনার বিজ্ঞপ্তি।

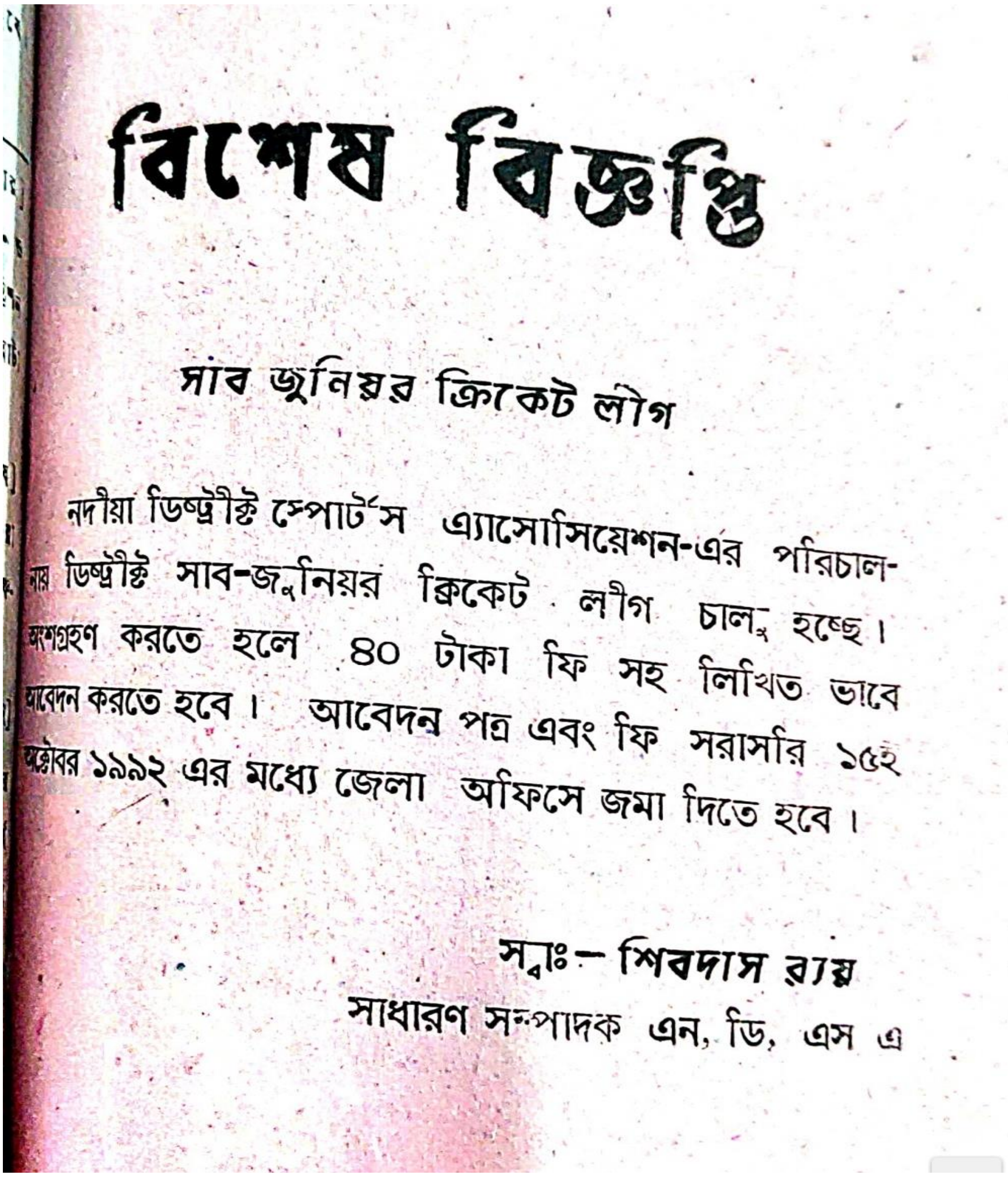

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সাব জুনিয়র ক্রিকেট লীগ

নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশন-এর পরিচালনায় ডিষ্ট্রীক্ট সাব-জুনিয়র ক্রিকেট লীগ চালু হচ্ছে। অংশগ্রহণ করতে হলে ৪০ টাকা ফি সহ লিখিত ভাবে আবেদন করতে হবে। আবেদন পত্র এবং ফি সরাসরি ১৫ই অক্টোবর ১৯৯২ এর মধ্যে জেলা অফিসে জমা দিতে হবে।

স্বাঃ— শিবদাস রায়
সাধারণ সম্পাদক এন, ডি, এস এ

সূত্র: নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার সংরক্ষিত তথ্য ভান্ডার থেকে গবেষক কর্তৃক সংগৃহীত।

সংযোজনী: ২৪. কৃষ্ণনগরস্থ জেলা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত আসাম বনাম বাংলা দলের রঞ্জি ট্রফি খেলার উদ্দেশ্যে নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত প্রচার পত্র।

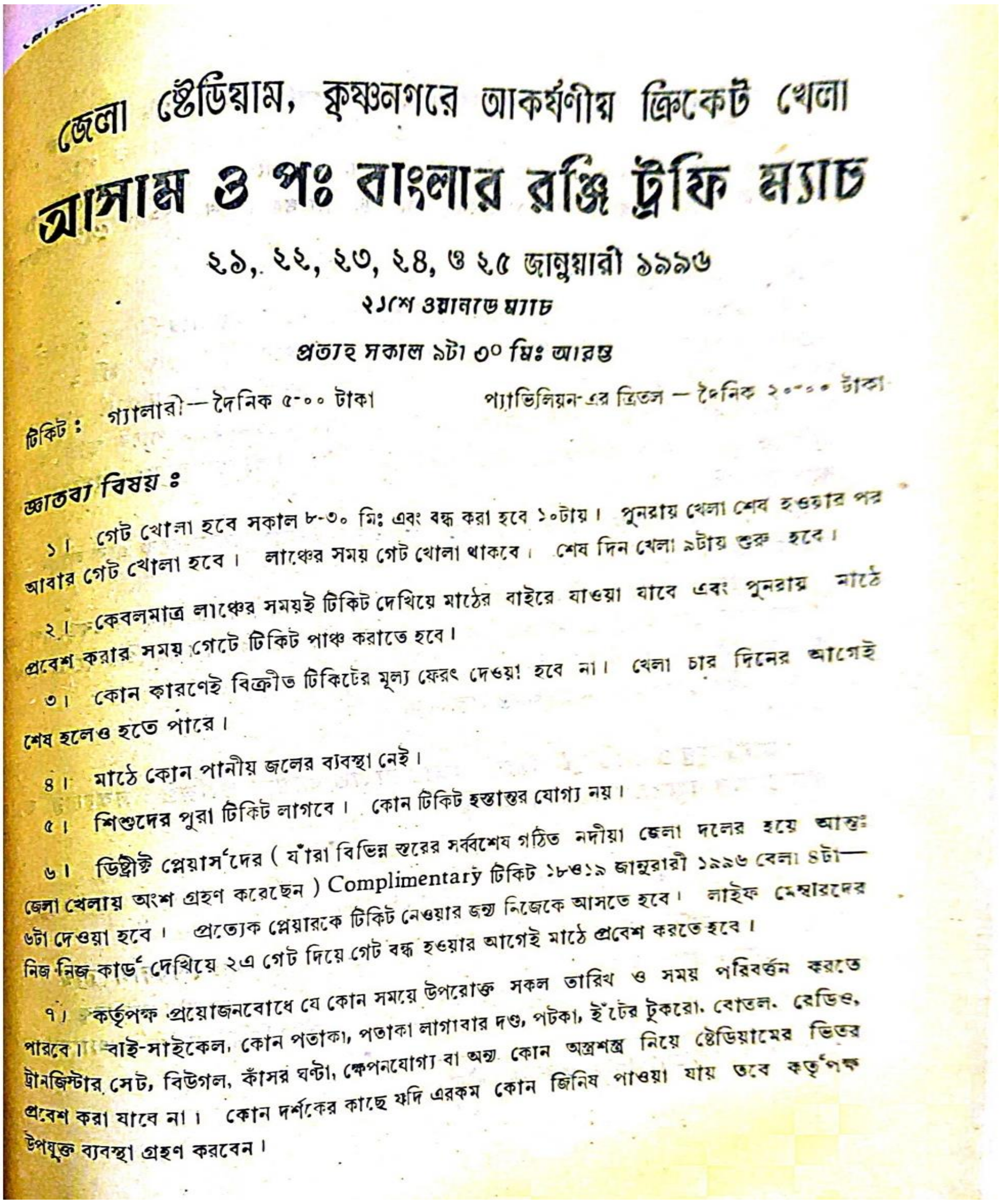

জেলা ষ্টেডিয়াম, কৃষ্ণনগরে আকর্ষণীয় ক্রিকেট খেলা

আসাম ও পঃ বাংলার রঞ্জি ট্রফি ম্যাচ

২১, ২২, ২৩, ২৪, ও ২৫ জানুয়ারী ১৯৯৬

২১শে ওয়ানডে ম্যাচ

প্রত্যহ সকাল ৯টা ৩০ মিঃ আরম্ভ

টিকিট : গ্যালারী— দৈনিক ৫-০০ টাকা প্যাভিলিয়ন-এর ভিতর — দৈনিক ২০-০০ টাকা

জ্ঞাতব্য বিষয় :

১। গেট খোলা হবে সকাল ৮-৩০ মিঃ এবং বন্ধ করা হবে ১০টায়। পুনরায় খেলা শেষ হওয়ার পর আবার গেট খোলা হবে। লাঞ্চের সময় গেট খোলা থাকবে। শেষ দিন খেলা ৯টায় শুরু হবে।

২। কেবলমাত্র লাঞ্চের সময়ই টিকিট দেখিয়ে মাঠের বাইরে যাওয়া যাবে এবং পুনরায় মাঠে প্রবেশ করার সময় গেটে টিকিট পাঞ্চ করাতে হবে।

৩। কোন কারণেই বিক্রীত টিকিটের মূল্য ফেরৎ দেওয়া হবে না। খেলা চার দিনের আগেই শেষ হলেও হতে পারে।

৪। মাঠে কোন পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই।

৫। শিশুদের পুরা টিকিট লাগবে। কোন টিকিট হস্তান্তর যোগ্য নয়।

৬। ডিষ্ট্রীক্ট প্লেয়ার্সদের (যাঁরা বিভিন্ন স্তরের সর্ব্বশেষ গঠিত নদীয়া জেলা দলের হয়ে আন্তঃ জেলা খেলায় অংশ গ্রহণ করেছেন) Complimentary টিকিট ১৮ও১৯ জানুয়ারী ১৯৯৬ বেলা ৪টা— ৬টা দেওয়া হবে। প্রত্যেক প্লেয়ারকে টিকিট নেওয়ার জন্য নিজেকে আসতে হবে। লাইফ মেম্বারদের নিজ নিজ কার্ড দেখিয়ে ২এ গেট দিয়ে গেট বন্ধ হওয়ার আগেই মাঠে প্রবেশ করতে হবে।

৭। কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে যে কোন সময়ে উপরোক্ত সকল তারিখ ও সময় পরিবর্তন করতে পারবে। বাই-সাইকেল, কোন পতাকা, পতাকা লাগাবার দণ্ড, পটকা, ইঁটের টুকরো, বোতল, রেডিও, ট্রানজিস্টার সেট, বিউগল, কাঁসর ঘন্টা, ক্ষেপনযোগ্য বা অন্য কোন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ষ্টেডিয়ামের ভিতর প্রবেশ করা যাবে না। কোন দর্শকের কাছে যদি এরকম কোন জিনিষ পাওয়া যায় তবে কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

সূত্র: নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার সংরক্ষিত তথ্য ভান্ডার থেকে গবেষক কর্তৃক সংগৃহীত।

সংযোজনী: ২৫. ব্যাংকক এশিয়ান গেমসে জোড়া সোনার পদক লাভকারী নদীয়ার অধিবাসী জ্যোতির্ময়ী শিকদার- কে অভিনন্দন জানিয়ে প্রকাশিত সংবাদ।

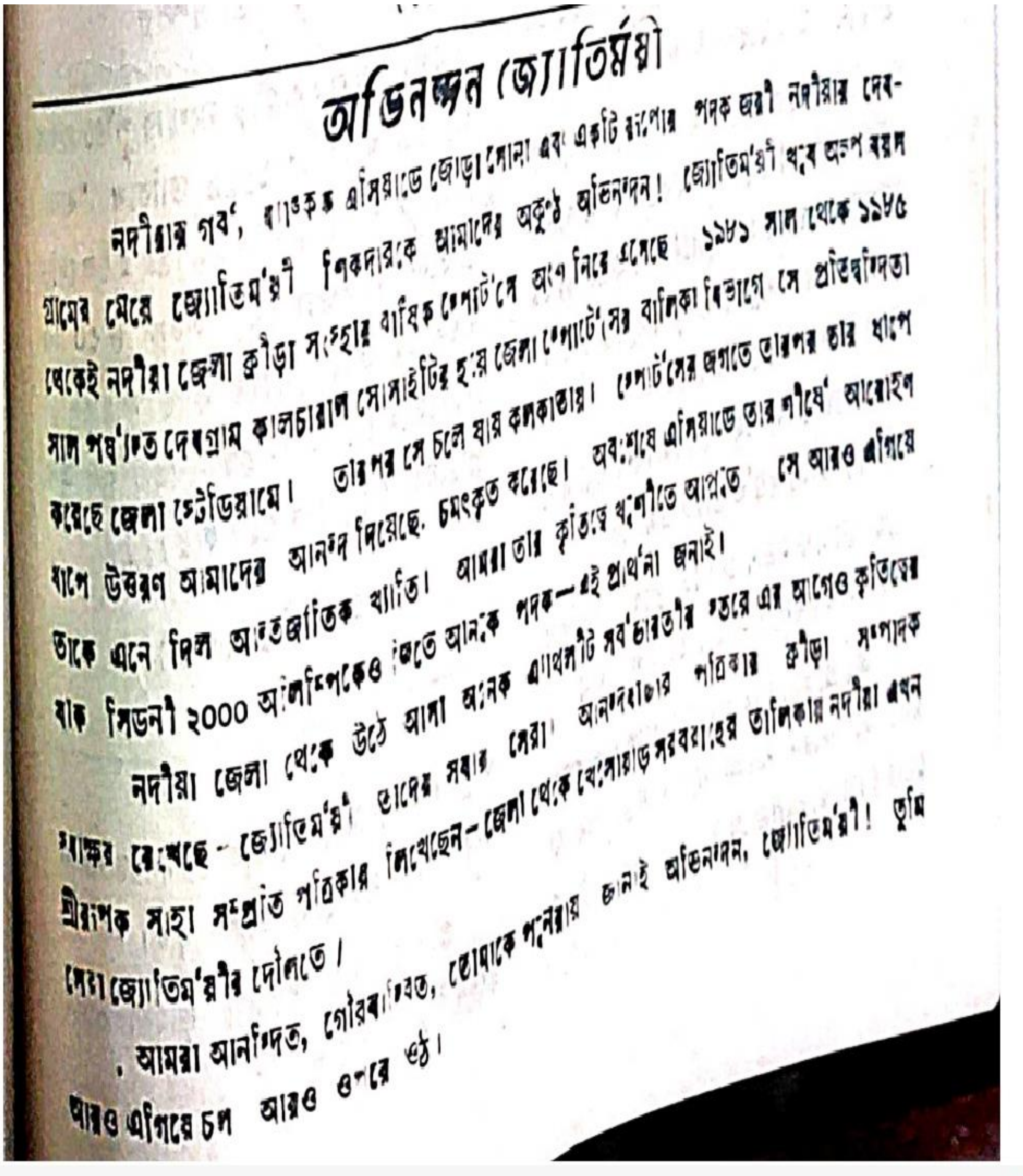

অভিনন্দন জ্যোতির্ময়ী

নদীয়ার গর্ব, ব্যাংকক এশিয়াডে জোড়া সোনা এবং একটি রূপোর পদক জয়ী নদীয়ার দেবগ্রামের মেয়ে জ্যোতির্ময়ী শিকদারকে আমাদের অকুণ্ঠ অভিনন্দন! জ্যোতির্ময়ী খুব অল্প বয়স থেকেই নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার বার্ষিক স্পোর্টসে অংশ নিয়ে এসেছে। ১৯৮১ সাল থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত দেবগ্রাম কালচারাল সোসাইটির হয়ে জেলা স্পোর্টসের বালিকা বিভাগে সে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে জেলা স্টেডিয়ামে। তারপর সে চলে যায় কলকাতায়। স্পোর্টসের জগতে তারপর তার ধাপে ধাপে উত্তরণ আমাদের আনন্দ দিয়েছে, চমৎকৃত করেছে। অবশেষে এশিয়াডে তার শীর্ষে আরোহণ তাকে এনে দিল আন্তর্জাতিক খ্যাতি। আমরা তার কৃতিত্বে খুশীতে আপ্লুত। সে আরও এগিয়ে যাক সিডনী 2000 অলিম্পিকেও জিতে আনুক পদক—এই প্রার্থনা জানাই।

নদীয়া জেলা থেকে উঠে আসা অনেক অ্যাথলিট সর্বভারতীয় স্তরে এর আগেও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে - জ্যোতির্ময়ী তাদের সবার সেরা। আনন্দবাজার পত্রিকার ক্রীড়া সংবাদিক শ্রীরূপক সাহা সম্প্রতি পত্রিকায় লিখেছেন—জেলা থেকে সোনা সরবরাহের তালিকায় নদীয়া এখন সেরা জ্যোতির্ময়ীর দৌলতে।

আমরা আনন্দিত, গৌরবান্বিত, তোমাকে পুনরায় জানাই অভিনন্দন, জ্যোতির্ময়ী! তুমি আরও এগিয়ে চল আরও ওপরে ওঠ।

সূত্র: নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ, ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৯৯, পৃ. ১।

সংযোজনী: ২৬. কৃষ্ণনগরস্থ জেলা স্টেডিয়ামের নব সংযোজনের দ্বারোদঘাটন অনুষ্ঠানের চিত্র।

সূত্র: নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ, ১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০০৩, পৃ. ১।

সংযোজনী: ২৭. নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক প্রচারিত ফুটসল-এর নিয়মাবলী।

৩

ফুটসল (FUTSAL)-এর নিয়মাবলী (সংক্ষেপিত)

বড় মাঠে আয়োজিত মূল ফুটবল-এর আইনের সাথে ছোট্ট মাঠে অনুষ্ঠেয় 'ফুটসল' নামক খেলাটির কয়েকটি মাত্র ক্ষেত্রে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। অফসাইড বিহীন ফুটসল অত্যন্ত গতিময় ও উত্তেজক ফুটবল। 'ফাইভ-এ -সাইড' খেলা, তাছাড়া সাতজন পরিবর্ত খেলোয়াড় থাকে। যত খুশি, যতবার খুশি খেলোয়াড় পরিবর্তন (সাব্‌স্টিটিউট) করা যায়। খালি পা নয়, তেমনি ফুটবল-বুটও নয়। দলের সবাইকে প্রতিনিয়ত ওঠানামা করতে হয়। অথচ গা- জোয়ারি এবং ফাউল প্রবণ ফুটবল খেলা এখানে নিষিদ্ধ। ফুটবল আইনের তুলনামূলক বিচারে ফুটসালের যেখানে বিশেষ ফারাক কেবল সেগুলি এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করা হল। বাকি অংশে তেমন কোনও বড়সড় পার্থক্য নেই, তাই সেগুলির উল্লেখ করা হল না। চলতি টি ভি এস-ফুটবল প্রতিযোগিতায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিয়মকানুনে সামান্য পরিবর্তন আনা হয়েছে সবার সুবিধার্থে।
দ্রষ্টব্য : অনিবার্য কারণ ঘটলে আই.এফ.এ এই আইন- কানুনে সামান্য রদবদল আনতে পারে।

আইন ১ : দ্য পিচ (খেলার মাঠ) (ছবি চারের পাতায়)
ফিফা প্রকাশিত 'ফুটসল' আইন বিষয়ক বইয়ে সন্নিবেশিত মাঠের চিত্রে নির্দেশিত পদ্ধতিতে বিভিন্ন দাগ-চিহ্ন সম্বলিত সমতল ও নরম মাঠ তৈরি করতে হয়। প্রথমে ইন্ডোর স্টেডিয়ামে খেলা হলেও, এখন সাধারণ ঘাস-মাটির মাঠে (ন্যাচারাল টার্ফ ও সয়েল) ফুটসলের প্রচলন বেড়েছে এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বিভিন্ন ধাঁচের ফুটসল প্রতিযোগিতার চাহিদা মেটাতে মাঠের মাপ ছোট-বড় হতে পারে। মাঠের প্রস্তাবিত চৌহদ্দি :
দৈর্ঘ্য : ২৫ মিটার থেকে ৪২ মিটার, প্রস্থ : ১৭ মিটার থেকে ২২ মিটার
দ্রষ্টব্য : কাম্য মাঠের বাহ্যিক আয়তন - দৈর্ঘ্য ৪০ মিঃ এবং প্রস্থ ২০ মিঃ। মাঠের সব ধরনের লাইন সহ গোলপোস্টের চওড়া এবং গভীরতা হবে ৮ সেন্টিমিটার ।

আইন ২ : দ্য বল
প্রচলিত ফুটবলের তুলনায় ফুটসলে বলের মাজজোখ ইত্যাদি এক সাইজ ছোট বা কম হয়ে থাকে। তবে প্রচলিত 'বল' দিয়েও এবারে প্রতিযোগিতায় খেলা যেতে পারে।

আইন ৩ : দ্য নাম্বার অব প্লেয়ার্স (প্লেয়ার সংখ্যা)
প্রতি দলের প্লেয়ার্স লিস্টে, একজন গোলরক্ষকসহ মোট ৫ জন প্লেয়ার এবং অতিরিক্ত তালিকায় সর্বাধিক ৭ জন অর্থাৎ মোট ১২ জন ফুটবলার থাকতে পারবে। একজন কোচ সহ মোট ৩ জনের নাম 'টিম অফিসিয়াল' তালিকায় নথিভুক্ত করা যাবে। 'সাবস্টিটিউট বেঞ্চে' বদলী খেলোয়াড় এবং ক্লাবকর্তা নিয়ে কখনই ১০ জনের বেশি থাকতে পারবে না।
কোনও ম্যাচে একটি দল যতবার ইচ্ছে খেলোয়াড় পরিবর্তন (ফ্লাইং সাবস্টিটিউশন) করতে পারে। তবে গোলরক্ষককে কেবল খেলা বন্ধ থাকা কালেই বদল করা যাবে। খেলার মধ্যে একজন খেলোয়াড় পরিবর্তকারী হিসাবে মাঠে নেমে একবার খেলায় অংশ নেওয়ার পরেও পুনরায় পরিবর্ত খেলোয়াড় হিসাবে খেলায় অংশ নিতে পারবেন। অর্থাৎ একজন প্লেয়ার মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে এসে ফের পরিবর্ত হিসাবে মাঠে এক বা একাধিবার একটি খেলায় অংশ নিতে পারেন। পরিবর্তিত খেলোয়াড়টি মাঠে তখনই প্রবেশের অনুমতি পাবেন, যখন অংশ নেওয়া খেলোয়াড়টি নিয়মানুযায়ী পরিবর্তন এলাকার (সাবস্টিটিউশন জোন বা এরিয়ার) মধ্য দিয়ে মাঠের বাইরে সম্পূর্ণরূপে চলে যাবেন। তারপর, সাবস্টিটিউট (পরিবর্তিত খেলোয়াড়টি) পরিবর্তন এলাকার নির্দিষ্ট স্থান দিয়েই মাঠে প্রবেশ করবেন। খেলা চালু বা বন্ধ থাকা, যে কোন অবস্থায়ই সাবস্টিটিউশন চলতে পারবে।
দ্রষ্টব্য :- নিয়মের লঙ্ঘন ঘটা সতর্কীকরণ যোগ্য (হলুদ কার্ড) অপরাধ বলে বিবেচিত হবে যদি-
ক) মাঠের ভিতর ম্যাচে অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড় নিয়মানুযায়ী সম্পূর্ণরূপে মাঠের বাইরে চলে যাওয়ার আগেই পরিবর্তিত খেলোয়াড় মাঠে প্রবেশ করেন।
খ) সাবস্টিটিউট অথবা প্লেয়ার, সাবস্টিটিউট জোনের (পরিবর্তন এলাকার) সুনির্দিষ্ট স্থান ব্যতিরেকে মাঠের মধ্যে প্রবেশ করেন অথবা অন্য স্থান দিয়ে অথবা মাঠের বাইরে চলে গিয়ে থাকেন।
শাস্তি :– বিপক্ষ দল ইনডিরেক্ট ফ্রিকিক্ নিয়ে গেম ফের শুরু করবে (যেখানে বল ছিল তার অবস্থান অনুযায়ী)।

আইন ৪ : দ্য প্লেয়ার্স ইক্যুইপমেন্ট (খেলোয়াড়দের সাজ-সরঞ্জাম)
প্রতিটি অংশগ্রহণকারী দলের নিজস্ব জার্সি, শর্টস, সিনগার্ড, সকস্ ইত্যাদি ব্যবহার বাধ্যতামূলক। খালি পায়ে খেলায় অংশ নেওয়া নিষিদ্ধ। তেমনি স্টাডযুক্ত বুট জাতীয় জুতোও নিষিদ্ধ। রবার সোলযুক্ত কাপড়ের কেডস্, জগিং সু অথবা ঐ জাতীয় নরম সোল যুক্ত জুতো ব্যবহার করা যাবে।

আইন ৫ : দ্য রেফারি (প্রধান ম্যাচ পরিচালক)
প্রধান ও দ্বিতীয় রেফারী একই সঙ্গে বা আলাদাভাবে সংকেত দিতে পারেন। রেফারি (প্রধান) ও দ্বিতীয় রেফারি উভয়ে যদি একই সঙ্গে একটি ফাউলের সংকেত দেন (বাঁশি বাজান) এবং দুই জনের মধ্যে মত-পার্থক্য দেখা দেয় তবে ফার্স্ট বা প্রধান পরিচালক রেফারির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
রেফারি এবং দ্বিতীয় রেফারি উভয়েই 'কশান' অথবা 'সেন্ড অফ্' অর্থাৎ কোনও প্লেয়ারকে সতর্কীকরণ বা বহিষ্করণ করার (হলুদ বা লাল কার্ড দেখিয়ে) অধিকারী। কিন্তু মত পার্থক্য দেখা দিলে, রেফারির নেওয়া সিদ্ধান্তই বহাল থাকবে।

আইন ৬ : দ্য সেকেন্ড রেফারি (দ্বিতীয় পরিচালক)
মাঠের যে প্রান্ত (টাচ লাইন) আগলে রেফারি ম্যাচ পরিচালনা করবেন তার বিপরীত দিক থেকে দ্বিতীয় রেফারি (অনেকটা ফুটবলের সহকারী রেফারির মতো দায়িত্ব সম্পন্ন অথচ তুলনামূলকভাবে বেশি ক্ষমতার অধিকারী) খেলা চালাবেন এবং আইন অনুসারে ম্যাচ নিয়ন্ত্রণ করতে (প্রধম) রেফারিকে সাহায্য করবেন। উভয় রেফারিই বাঁশি ব্যবহার করতে পারবেন। সাবস্টিটিউশন বা খেলোয়াড় পরিবর্তন প্রক্রিয়া নিয়মমাফিক হচ্ছে কিনা দেখার দায়িত্ব মূলত দ্বিতীয় রেফারির।

আইন ৭ : দ্য টাইমকিপার অ্যান্ড দ্য থার্ড রেফারি (সময়রক্ষক এবং তৃতীয় রেফারি)
সময়রক্ষকের বিশেষ কর্তব্য হচ্ছে, মাঠের বাইরে দুই সাবস্টিটিউশন বেঞ্চের মাঝে বসে স্টপ ওয়াচ-এর সাহায্যে রেফারিকে সময় সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সজাগ করে দেওয়া। তৃতীয় রেফারি টাইমকিপারের সহায়ক রূপে কাজ করবেন। কোনও রেফারি অসুস্থ হলে তৃতীয় রেফারি তাঁর দায়িত্ব পালন করবেন। এই প্রতিযোগিতায় টাইমকিপার এবং তৃতীয় রেফারি নিয়োগ করা বাধ্যতামূলক নয়।

আইন ৮ : দ্য ডিউরেশন অব দ্য ম্যাচ (খেলার মোট স্থিতিকাল বা বয়সসীমা)
খেলা সাময়িক বন্ধ থাকা অবস্থায়, টাইমকিপার / রেফারির নির্দেশ অনুযায়ী প্রতি অর্ধে, প্রত্যেক দল একবার করে এক মিনিটের জন্য 'টাইম আউট' পাবে, সংশ্লিষ্ট দলের কোচ / অফিসিয়ালের আবেদনক্রমে। প্রথমার্ধে কোনও দল টাইম আউটের অনুরোধ না জানালে, দ্বিতীয় পর্বে ঐ দল কেবল একবারই সেই সুযোগ পাবে। রেফারি 'টাইম-আউট' মঞ্জুর করলে, উভয় দলের সব প্লেয়ার মাঠের ভিতরে অবশ্যই থাকবেন। আবার দলীয় কোচ (এবং অফিসিয়াল) মাঠে না প্রবেশ করে টাচ লাইন (পার্শ্ব রেখা) পর্যন্ত এগিয়ে এসে খেলোয়াড়দের নির্দেশাবলী দিতে পারবেন।
দ্রষ্টব্য : টি ভি এস ফুটসল প্রতিযোগিতায় কোনও ম্যাচ অমীমাংসিতভাবে শেষ হলে সরাসরি 'কিক্‌স ফ্রম দ্য পেনাল্টি মার্ক' (চলতি কথায় টাই- ব্রেকার) প্রথায় ম্যাচের চূড়ান্ত ফয়সালা হবে। অতিরিক্ত সময়ের খেলা হবে না। প্রাথমিক পর্বের ম্যাচগুলি প্রতি অর্ধ ১০ মিনিট ব্যাপী হবে। মাঝে থাকবে ৫ মিনিটের বিরতি (১০-৫-১০)।

আইন ৯ : দ্য স্টার্ট অ্যান্ড রিস্টার্ট অব প্লে (খেলা আরম্ভ বা পুনরারম্ভ)
সাধারণ আইনের মতো। কিক অফ্ থেকে সরাসরি (ডিরেক্টলি) বিপক্ষ গোলে শট নিয়ে গোল করা যায়।

আইন ১০ : দ্য বল ইন অ্যান্ড আউট অব প্লে
মূল আইনের অনুরূপ ।(ব্যতিক্রম- ইন্ডোর ফুটসলে, খেলতে খেলতে হঠাৎ 'পিচ'-র অনেক উপরে অবস্থিত আচ্ছাদনে অর্থাৎ ছাদের তলায়, বল আকস্মিকভাবে লাগলে খেলা বন্ধ হবে। কাছাকাছি টাচলাইন (পার্শ্বরেখা) থেকে প্রতিপক্ষ কিক-ইন পাবে।)

আইন ১১ : দ্য মেথড অব স্কোরিং (গোল হবার পদ্ধতি)
মূল ফুটবল আইনের অনুরূপ।

আইন ১২: ফাউলস অ্যান্ড মিসকন্ডাক্ট
মূল ফুটবল আইনের ১০ (দশ) টি চিহ্নিত ফাউল আরও বেশী কড়াকড়ি ভাবে ফুটসলে প্রযোজ্য। ধাক্কা- ধাক্কির ফুটবল বেআইনি। যেমন - প্রতিপক্ষকে চার্জ করা, এমনকি সোলডার চার্জ (কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে শারীরিক মৃদু সংঘাত) বেআইনি। এছাড়া, কেবলমাত্র নিজের পেনাল্টি এরিয়ায় বিনা বিপজ্জনক ভঙ্গিতে গোলকিপার ছাড়া আর কারোর মাটিতে ঝাঁপিয়ে এবং পা বাড়িয়ে বলের নাগাল পাবার চেষ্টা করা অর্থাৎ স্লাইডিং ট্যাকল বা ছড়্ড়া মারা আইন বিরুদ্ধ কাজ। তা ডিরেক্ট ফ্রিকিক অফেন্স। মোট ঐ দশ ধরনের ফাউলই সম্মিলিতভাবে 'অ্যাকুমুলেটেড ফাউল' নামে নির্দিষ্ট। এগুলো কোনও দলের করা ফাউলের সংখ্যা তালিকায় জমতে জমতে যখনই ৫ বার করা হয়েছে বলে নথিভুক্ত হবে (প্রতি অর্ধের জন্য পৃথক হিসাব) তখনই রেফারি মাথার উপর হাত তুলে এবং পাঁচ আঙ্গুল ছড়িয়ে ৫(পাঁচ) বার ফাউলের সতর্কবাণী পাঠাবেন। কারণ, ষষ্ঠ ফাউল থেকে পরবর্তী প্রতিবার অ্যাকুমুলেটেড ফাউলের জন্য রেফারি দ্বিতীয় পেনাল্টি মার্ক (গোললাইন থেকে ১০ মিটার দূরে) থেকে বিনা বাধায় ডিরেক্ট ফ্রিকিক করার নির্দেশ দেবেন।
গোলকিপারের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নিয়মভঙ্গের চারটি কারণে রেফারি বিপক্ষ দলের অনুকূলে ইনডিরেক্ট ফ্রি-কিকের নির্দেশ দেবেন :
ক) নিজের করায়ত্বে থাকা বলটি গোলকিপার পেনাল্টি এরিয়া থেকে গড়িয়ে বা ছুঁড়ে 'রিলিজ' করার পর নিজদলের কারোর থেকে ফেরত পাওয়ার পরে তা 'রিসিভ' করলে-
ব্যতিক্রম : বল প্রতিপক্ষকে ইতিমধ্যে স্পর্শ করলে আবার বলে হাত ছোঁয়াতে পারবেন। অন্যথায়, নিজ দলের একজন খেলোয়াড় হাফওয়ে লাইন (মাঠের - মধ্যরেখা) অতিক্রম করে বিপক্ষ অর্দ্ধ থেকে বল গোলকিপারের কাছে পাঠালে গোলকিপার বল রিসিভ করতে পারবেন (তবে হাত ছাড়া দেহের যে কোনও অংশ দিয়ে।)
খ) নিজ দলের কারোর ' ডেলিবারেট কিক' (ব্যাক-পাস নামে পরিচিত) থেকে পাওয়া বল হাত দিয়ে ছুঁলে বা নিয়ন্ত্রণ করলে
গ) নিজ দলের কারোর (টিম মেট) 'কিক্ -ইন' থেকে সরাসরি বলে হাত লাগল (নিজের পেনাল্টি এরিয়ায়)-
ঘ) গেম চালু থাকার সময় হাত অথবা পা দিয়ে বল স্পর্শ করলে বা নিয়ন্ত্রণে আনার পরে ৪ (চার) সেকেন্ডের বেশী সময় কাটালে (তবে গোলকিপার বিপক্ষ অর্ধে পৌঁছে পা দিয়ে যতক্ষণ খুশি বল আয়ত্তের রাখতে পারবেন।)

বহিষ্করণ :-
রেফারি 'লাল কার্ড' দেখালে, বহিষ্কৃত (সেন্ট -অফ্) প্লেয়ার মাঠের বাইরে (প্লেয়ার্স ড্রেসিং বা চেঞ্জিং রুমে) চলে যাবেন। দুই মিনিটে বাদে দলীয় সাবস্টিটিউট বেঞ্চে অবস্থানকারী যে কোনও একজন বদলী খেলোয়াড় (রিপ্লেসমেন্ট প্লেয়ার) পিচে (মাঠে) ঢুকতে পারবেন। টাইমকিপার অথবা রেফারির নির্দেশ অনুসারে - ঐ পূর্বোক্ত দুই মিনিট অতিক্রান্ত হবার আগেই যদি একটি গোল (স্কোর) হয় তবে নিচের সর্তসাপেক্ষে, লালকার্ড দেখা বহিষ্কৃত প্লেয়ারের টিম একজন পরিবর্ত খেলোয়াড় (সাবস্টিটিউট) মাঠে নামাতে পারবেন। এই ক্ষেত্রে, দুই মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই, আগেই বদলি খেলোয়াড় পাওয়া যাবে।

সর্তাবলী :
ক) একটি দলে পাঁচজন এবং অপর পক্ষে চারজন খেলোয়াড়। এমন অবস্থায় বেশি সংখ্যক প্লেয়ারের দল গোল দিলেই (যেমন, ১ মিনিটের মাথায়), চার প্লেয়ারযুক্ত টিম সঙ্গেসঙ্গে একর্জনকে মাঠে পাঠিয়ে পাঁচজন (৫-৫) করার সুযোগ পাবে।
খ) উভয় দল ৪ জন বনাম ৪ জন খেলতে থাকলে এবং দুই মিনিটের আগেই কোন গোল হলেও প্লেয়ার সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকবে।
গ) ৫ বনাম ৩, অথবা ৪ এর বিরুদ্ধে ৩ অবস্থায়, বেশী সংখ্যক প্লেয়ারের দল গোল দিলে, দুই মিনিট অতিক্রান্ত হবার আগেই কম সংখ্যক প্লেয়ার সমন্বিত দল একজন প্লেয়ার বাড়িয়ে নিতে পারবে।
ঘ) উভয় দলেই ৩ জন করে খেলছে এমন অবস্থান দু'মিনিট শেষ হবার পূর্বে কোনও দলে [illegible] গোল স্কোর করা হলেও প্লেয়ার সংখ্যায় কোন পরিবর্তন হবে না।
ঙ) উল্লিখিত সর্ব ক্ষেত্রেই কমসংখ্যক প্লেয়ার নিয়ে খেলতে থাকা টিম দু'মিনিট ফুরোনর আ[illegible] গোল দিলেও কিন্তু একজন বদলি প্লেয়ার নামাবার সুযোগ পাবে না।

আইন ১৩ : ফ্রি কিক্‌স্
বিশেষ দ্রষ্টব্য : ডিরেক্ট ফ্রি কিক অফেন্স সহ অ্যাকুমুলেটেড ফ্রিকিক নির্দেশ করতে রেফারি এক হাত সামনের দিকে আনুভূমিকভাবে বাড়িয়ে কোন্ দিকে কিকটি নিতে হবে তার নির্দেশ দেবেন। অপর হাতের তর্জনী (ইনডেক্স ফিঙ্গার) মাটির দিকে রেখে 'টেবল অফিসিয়াল' দের বোঝাবেন যে ফাউলটির হিসাব 'অ্যাকুমুলেটেড' তালিকায় রাখতে (জুড়তে) হবে।

—এর পর চতুর্থ পাতায়

সূত্র: নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ, ১৫ই এপ্রিল, ২০০৫, পৃ. ১।

সংযোজনী: ২৮. রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় ২০০৬ সালে নদীয়ার অধিবাসী দেবশ্রী মজুমদারের সেরা অ্যাথলিট নির্বাচিত হওয়ার প্রকাশিত সংবাদ।

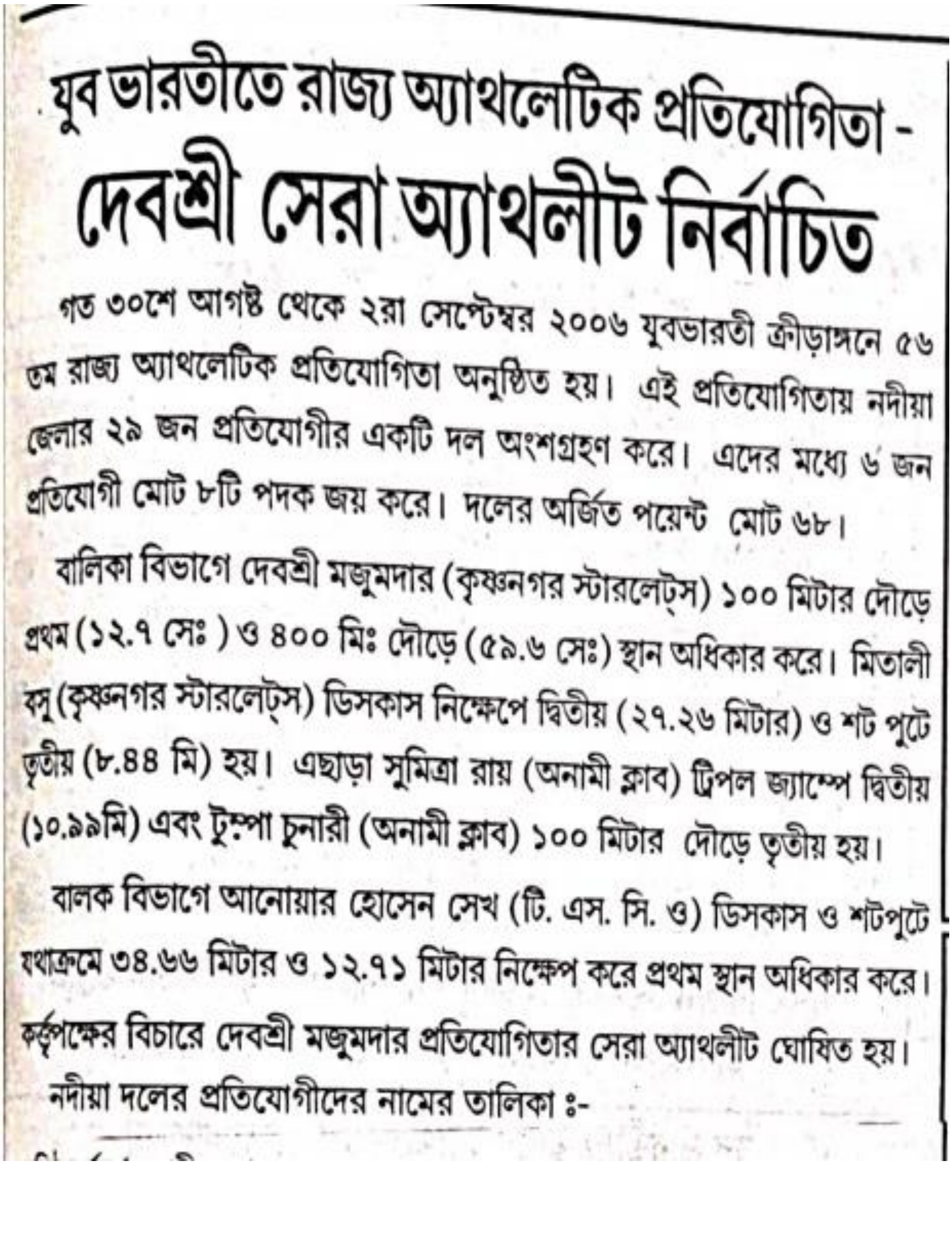

যুব ভারতীতে রাজ্য অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতা -
দেবশ্রী সেরা অ্যাথলীট নির্বাচিত

গত ৩০শে আগষ্ট থেকে ২রা সেপ্টেম্বর ২০০৬ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ৫৬ তম রাজ্য অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় নদীয়া জেলার ২৯ জন প্রতিযোগীর একটি দল অংশগ্রহণ করে। এদের মধ্যে ৬ জন প্রতিযোগী মোট ৮টি পদক জয় করে। দলের অর্জিত পয়েন্ট মোট ৬৮।

বালিকা বিভাগে দেবশ্রী মজুমদার (কৃষ্ণনগর স্টারলেট্স) ১০০ মিটার দৌড়ে প্রথম (১২.৭ সেঃ) ও ৪০০ মিঃ দৌড়ে (৫৯.৬ সেঃ) স্থান অধিকার করে। মিতালী বসু (কৃষ্ণনগর স্টারলেট্স) ডিসকাস নিক্ষেপে দ্বিতীয় (২৭.২৬ মিটার) ও শট পুটে তৃতীয় (৮.৪৪ মি) হয়। এছাড়া সুমিত্রা রায় (অনামী ক্লাব) ট্রিপল জ্যাম্পে দ্বিতীয় (১০.৯৯মি) এবং টুম্পা চুনারী (অনামী ক্লাব) ১০০ মিটার দৌড়ে তৃতীয় হয়।

বালক বিভাগে আনোয়ার হোসেন সেখ (টি. এস. সি. ও) ডিসকাস ও শটপুটে যথাক্রমে ৩৪.৬৬ মিটার ও ১২.৭১ মিটার নিক্ষেপ করে প্রথম স্থান অধিকার করে। কর্তৃপক্ষের বিচারে দেবশ্রী মজুমদার প্রতিযোগিতার সেরা অ্যাথলীট ঘোষিত হয়।

নদীয়া দলের প্রতিযোগীদের নামের তালিকা ঃ-

সূত্র: নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ, ১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০০৬, পৃ. ১।

সংযোজনী: ২৯. কৃষ্ণনগরস্থ জেলা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার প্রকাশিত সংবাদ, যেখানে বাংলাদেশ জাতীয় দল ও সি.এ.বি একাদশ পরস্পরের সম্মুখীন হয়।

ক্লাব ও টুর্নামেন্টের জন্য ৩০ টাকা

বাংলাদেশ জাতীয় দল – সি. এ. বি. খেলা অমীমাংসীত

প্রতীক্ষার অবসানে স্টেডিয়ামে সফল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট

বেশ কিছুদিনের উৎসুক ও আগ্রহাকুল প্রতীক্ষার অবসানে সুষ্ঠভাবেই শুরু ও সম্পন্ন হল বাংলাদেশ জাতীয় দল বনাম সি. এ. বি. একাদশ (অনূর্দ্ধ - ১৭) এর ক্রিকেট খেলা। সর্ববিধ আনুষ্ঠানিকতা মেনেই ২রা জুন সকাল সাড়ে ন'টায় খেলা শুরু হয়। খেলার শুরুতে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে উভয় দলের খেলোয়াড়দের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়।

সি. এ. বি. সভাপতি শ্রী প্রসূন মুখার্জীর হাতে স্মারক উপহার তুলে দিচ্ছেন জেলা সংস্থার সভাপতি শ্রী ওঙ্কার সিং মীনা

খেলার দ্বিতীয় দিনে স্টেডিয়ামে উপস্থিত হন সি. এ. বি.-র মাননীয় সভাপতি শ্রী প্রসূন মুখার্জী, আই. পি. এস. মহোদয়।

টস - এ বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক আন্‌জুম আহমেদ জার্সি জেতে ও ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু ৭৩ ওভার ১ বলে ২১৬ রান করে তাদের ইনিংস শেষ হয়ে যায়। মোবারক ইসলাম অর্পণ ৩৬

এর পর ২য় পাতায়

সূত্র: নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ, ১৫ই জুন, ২০০৭, পৃ. ১।

সংযোজনী: ৩০. কৃষ্ণনগরস্থ জেলা স্টেডিয়ামে ২০০৭ সালে অনুষ্ঠিত ইস্টবেঙ্গল বনাম নদীয়া জেলা একাদশ দলের প্রদর্শনী ফুটবল খেলার চিত্র।

ইষ্টবেঙ্গল বনাম নদীয়া জেলা দল প্রদর্শনী ফুটবল

জেলা স্টেডিয়ামে ফুটবল প্রেমীদের প্লাবন

অভূতপূর্ব উৎসবমুখর পরিবেশে কৃষ্ণনগরের জেলা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হল ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব বনাম নদীয়া জেলা দলের খেলা। সুদীর্ঘকাল পর স্টেডিয়ামে তিন প্রধান দলের একটি খেলা অনুষ্ঠিত হওয়ায় সারা জেলাতেই প্রভূত উন্মদনার সৃষ্টি হয় এবং ২৭শে জুলাই খেলা শুরু হবার অনেক আগে থেকেই ক্রীড়ামোদীরা গ্যালারী ভরিয়ে দিয়ে সমস্ত পরিবেশটিকেই বর্ণময় করে তোলেন। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে খেলা শুরুর পর স্টেডিয়ামের পূর্ব প্রান্তের গেট খুলে দিতে হয় এবং স্টেডিয়ামের পূর্ব প্রান্তের মাঠ সম্পূর্ণ ভরে যায়। খেলা দেখার আগ্রহ এমনই ছিল যে প্রবল বৃষ্টিপাতও দর্শকদের আদৌ বিচলিত করতে পারে নি এবং প্রশংসা করতেই হয় যে তাঁরা পুরো খেলাটাই অত্যন্ত সযত্নে শৃঙ্খলা বজায় রেখেই দেখেন।

ম্যাচের সময় দর্শকভরা জেলা স্টেডিয়াম মাঠের দৃশ্য।

সূত্র: নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ, ১৫ই আগষ্ট, ২০০৭, পৃ. ১।

সংযোজনী: ৩১. ২০০৯ সালের নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার অধীনস্থ ক্লাবের খেলোয়াড়দের নিবন্ধীকরণ বা রেজিস্ট্রেশনের আবেদনপত্র।

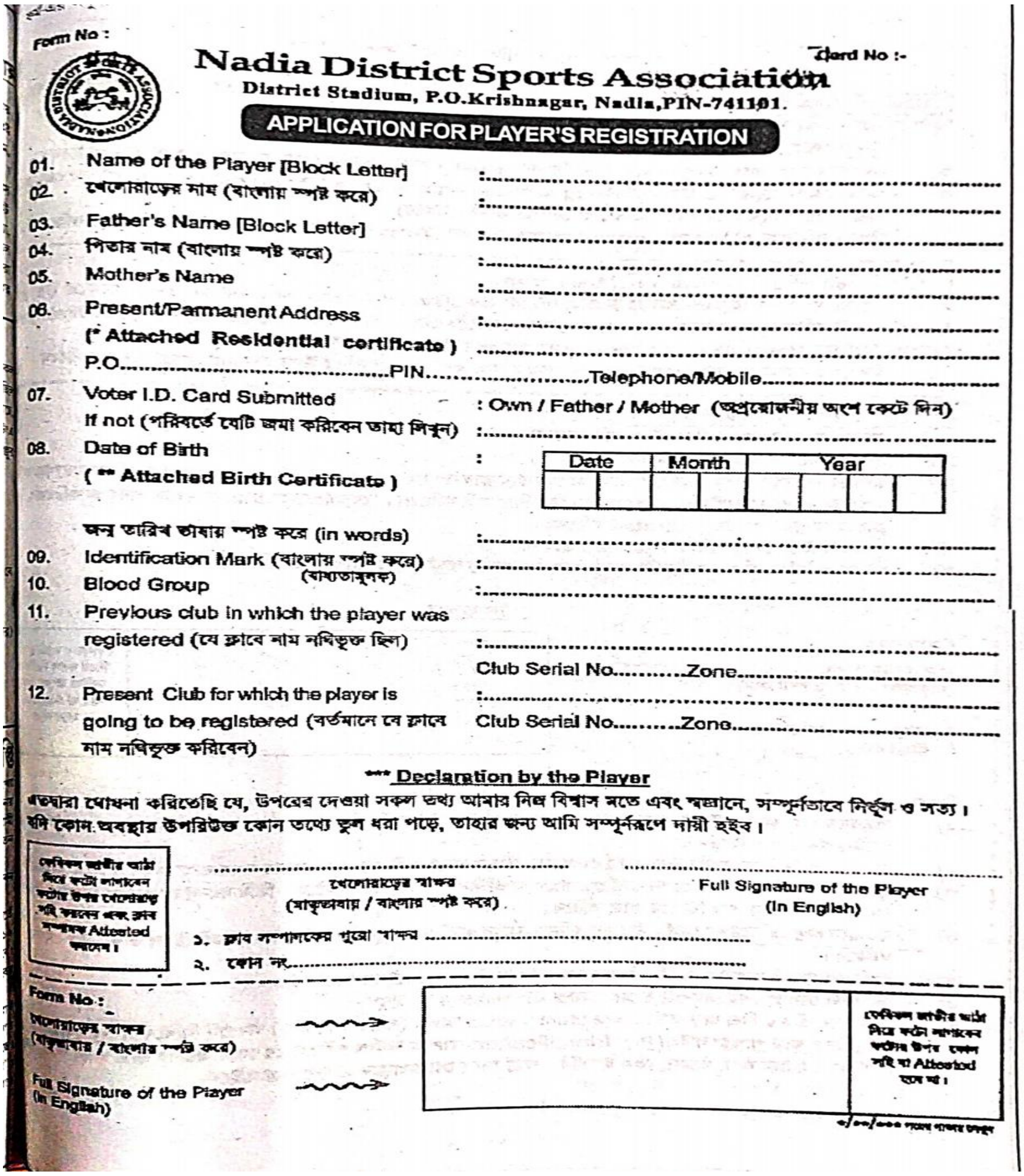

Form No :

Card No :-

Nadia District Sports Association

District Stadium, P.O.Krishnagar, Nadia,PIN-741101.

APPLICATION FOR PLAYER'S REGISTRATION

01. Name of the Player [Block Letter] :..
02. খেলোয়াড়ের নাম (বাংলায় স্পষ্ট করে) :..
03. Father's Name [Block Letter] :..
04. পিতার নাম (বাংলায় স্পষ্ট করে) :..
05. Mother's Name :..
06. Present/Parmanent Address :..
(* Attached Residential certificate) ....
P.O.........................PIN....................Telephone/Mobile....................
07. Voter I.D. Card Submitted : Own / Father / Mother (অপ্রয়োজনীয় অংশ কেটে দিন)
If not (পরিবর্তে যেটি জমা করিবেন তাহা লিখুন) :..
08. Date of Birth :
(** Attached Birth Certificate)

Date		Month		Year			

জন্ম তারিখ ভাষায় স্পষ্ট করে (in words) :..
09. Identification Mark (বাংলায় স্পষ্ট করে) (বাধ্যতামূলক) :..
10. Blood Group :..
11. Previous club in which the player was registered (যে ক্লাবে নাম নথিভুক্ত ছিল) :..
Club Serial No..........Zone....................
12. Present Club for which the player is going to be registered (বর্তমানে যে ক্লাবে নাম নথিভুক্ত করিবেন) :..
Club Serial No..........Zone....................

*** Declaration by the Player

এতদ্দারা ঘোষনা করিতেছি যে, উপরের দেওয়া সকল তথ্য আমার নিজ বিশ্বাস মতে এবং স্বজ্ঞানে, সম্পূর্ণভাবে নির্ভুল ও সত্য। যদি কোন অবস্থায় উপরিউক্ত কোন তথ্যে ভুল ধরা পড়ে, তাহার জন্য আমি সম্পূর্ণরূপে দায়ী হইব।

রেঙিন জাতীয় আঁটা দিয়ে ফটো লাগাবেন ফটোর উপর খেলোয়াড় সই করবেন এবং ক্লাব সম্পাদক Attested করবেন।

.... খেলোয়াড়ের স্বাক্ষর (মাতৃভাষায় / বাংলায় স্পষ্ট করে)

.... Full Signature of the Player (In English)

১. ক্লাব সম্পাদকের পুরো স্বাক্ষর ....
২. ফোন নং..

Form No :

খেলোয়াড়ের স্বাক্ষর (মাতৃভাষায় / বাংলায় স্পষ্ট করে) →

Full Signature of the Player (In English) →

রঙিন জাতীয় আঁটা দিয়ে ফটো লাগাবেন ফটোর উপর কোন সই বা Attested হবে না।

সূত্র: নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার সংরক্ষিত তথ্য ভান্ডার থেকে গবেষক কর্তৃক সংগৃহীত।

সংযোজনী: ৩২. সি.এ.বি পরিচালিত মহিলাদের আন্তঃজেলা ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় নদীয়ার মহিলা ক্রিকেট দলের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার প্রকাশিত সংবাদ।

মহিলাদের ক্রিকেটে নদীয়ার মেয়েরা বাংলার সেরা

সি এ বি পরিচালিত মহিলাদের আন্তঃজেলা ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল নদীয়ার মেয়েরা। গত ২৪শে মার্চ কোচবিহার স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ফাইনালে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর গতবারের চ্যাম্পিয়ন উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা দলকে নয় রানে হারিয়ে এই টুর্নামেন্টে প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব অর্জন করলো নদীয়া জেলার মহিলা ক্রিকেট দল। এদিন নদীয়ার মেয়েরা প্রথমে ব্যাট করে নির্ধারিত চল্লিশ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে মাত্র ১২৫ রান করতে সমর্থ হয়। রূপা দত্তের অপরাজিত ৪৮ লান উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বিপক্ষ দল ২১টি ওয়াইড বল করে। এরপর জবাবে উত্তর চব্বিশ পরগণা ব্যাট করতে নেমে মাত্র ৩৭.৪ ওভারেই ১১৬ রানে তাদের ইনিংশ শেষ হয়ে যায়। মৌলী মণ্ডল (২৬ রানে ২ উইকেট), মিতা পাল (২০ রানে ২ উইকেট) এবং অম্বিকা গুহ (২৮ রানে ২ উইকেট) ভাল বল করে। এছাড়া দু'জন রান আউট হয়। আগের দিন সেমিফাইনালে নদীয়ার খেলা ছিল হুগলী জেলা দলের সাথে। ঐ দিন নদীয়া প্রথমে ব্যাট করে ৪০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ১৭৪ করে। এদিনও রূপা দত্ত অনবদ্য ৬২ রান (অপরাজিত) করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে হুগলীর ইনিংশ ৬ উইকেটে ১৪৯ রানে শেষ হয়ে যায়। পম্পা সরকার ২৭ রানে ৩ উইকেট ও অম্বিকা গুহ ১৯ রানে ২ উইকেট দখল করে। নদীয়া ২৫ রানে জয়ী হয়ে ফাইনালে ওঠে। উল্লেখ্য দু'দিনই নদীয়া টসে পরাজিত হয়। জেলা দলের এই সাফল্যের পিছনে দুই কোচের, জেলার অভিজিৎ চৌধুরী এবং সি এ বি প্রেরিত মৌমিতা চক্রবর্তীর অবদান উল্লেখযোগ্য। সচিব জয়ন্ত চ্যাটার্জি সমগ্র জেলা দলকে উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানিয়েছেন।

এর আগে গ্রুপ লীগের পর্বের খেলাগুলি হয় বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে। প্রথম খেলা ছিল হাওড়ার বিরুদ্ধে। টসে জিতে নদীয়া প্রথমে ব্যাট করে মিতা পালের ৩৭ রানের সুবাদে মাত্র ৩১.৩ ওভারে ১০৪ রান করে। জবাবে হাওড়ার ইনিংস ৩৫ ওভারেই মাত্র ৭৫ রানে শেষ হয়ে যায়। সুস্মিতা গাঙ্গুলী (১৩ রানে ৩ উইকেট) ও মিতা পাল (১৭ রানে ২ উইকেট) ভাল বল করে। এদিন নদীয়ার মেয়েরা ২৯ রানে জয়ী হয়। দ্বিতীয় খেলা ছিল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সাথে। এদিনও টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করে নদীয়া মেয়েরা ৮ উইকেটে ১৫৭ রান করে। এদিনও মিতা পাল (৪৭ রানে, অপরাজিত), রূপা দত্ত (৩৪ রান) ভাল ব্যাট করে। এর ব্যাট করতে নেমে বিপক্ষ দলের ইনিংস ৩৭ ওভারে ১০৯ রানে শেষ হয়ে যায়। পম্পা সরকার ২৪ রানে ২ উইকেট দখল করে। এদিন নদীয়ার মেয়েরা ফিল্ডিংয়ে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করে এবং বিপক্ষ দলের পাঁচ জনকে রান আউট করে। এরমধ্যে মিতা পাল একাই তিনজনকে আউট করে। এই ম্যাচে নদীয়া ৪৮ রানে জয়ী হয়। গ্রুপের শেষ খেলা ছিল আয়োজক বাঁকুড়ার বিপক্ষে। তারা টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করে ১৪.৪ ওভারে মাত্র ২৯ রান করে। সুস্মিতা গাঙ্গুলী হাট্রিক করে। এছাড়া পম্পা সরকার ৩টি ও রিয়া গোস্বামী ২টি উইকেট নেয়। এরপর নদীয়া মাত্র ২ উইকেট হারিয়ে ৫ ওভারেই জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে এবং ৮ উইকেটে জয়ী হয়ে সেমিফাইনালে উন্নীত হয়।

জেলা দলের অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়বৃন্দ : মিতা পাল, ঝুম্পা মণ্ডল (অধিনায়ক), অর্পিতা বিশ্বাস, রিয়া গোস্বামী, মৌলি মণ্ডল, সায়নী দাস, ইতি সরকার, পম্পা সরকার, সুস্মিতা গাঙ্গুলী, বর্ণালী তাম্বুলী, রূপা দত্ত, পায়েল ঘোষ, কুমিয়া খাতুন ও অম্বিকা গুহ।

কোচ :— অভিজিৎ চৌধুরী ও মৌমিতা চক্রবর্তী।

ম্যানেজার কানাই প্রামাণিক।

সূত্র: নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ, ১লা এপ্রিল, ২০১৭, পৃ. ১।

সংযোজনী: ৩৩. চাকদহের নবীন সংঘ ক্লাবের পরপর দু'বছর নদীয়া জেলার ক্লাব ক্রিকেটে ত্রিমুকুট জয়ের প্রকাশিত সংবাদ।

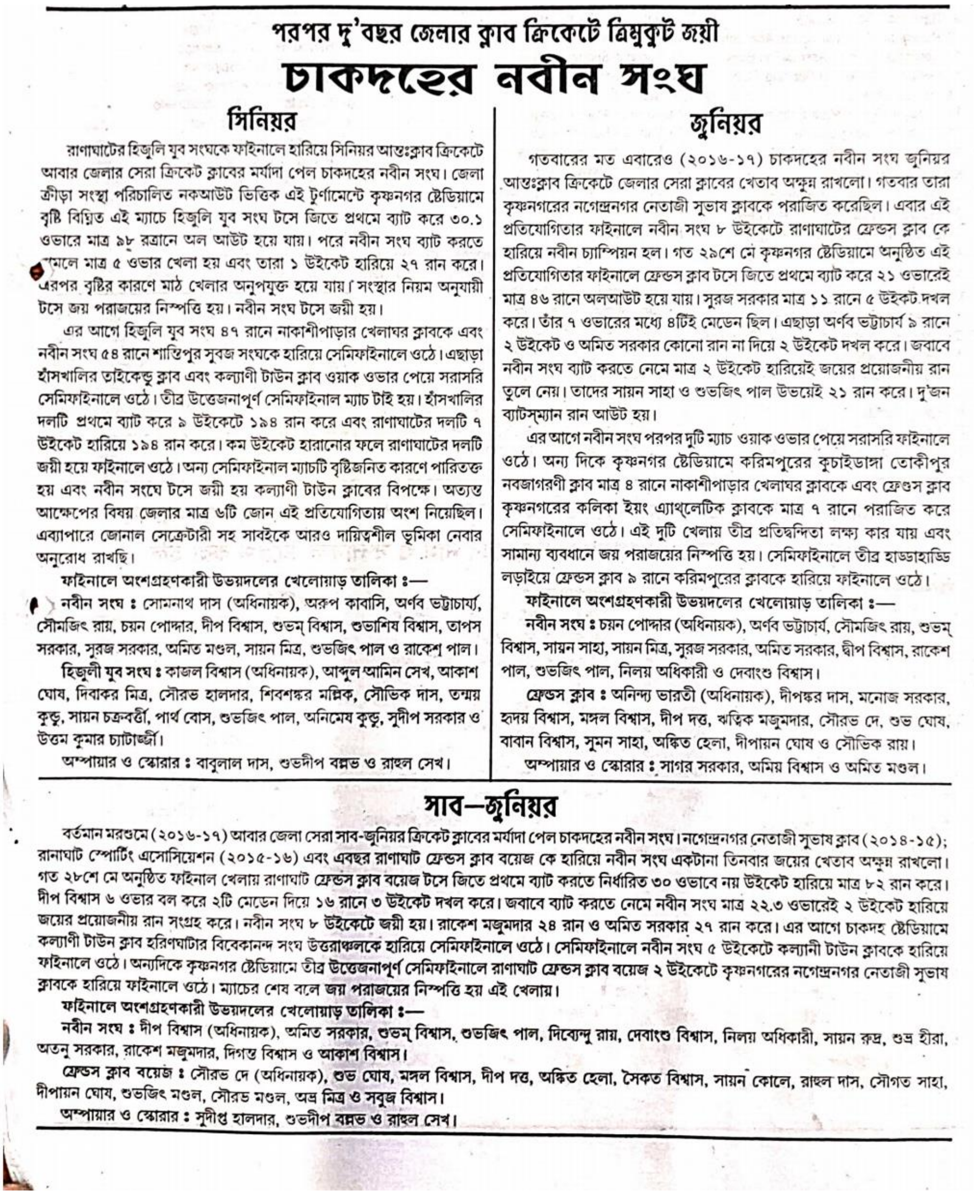

পরপর দু'বছর জেলার ক্লাব ক্রিকেটে ত্রিমুকুট জয়ী

চাকদহের নবীন সংঘ

সিনিয়র

রাণাঘাটের হিজুলি যুব সংঘকে ফাইনালে হারিয়ে সিনিয়র আন্তঃক্লাব ক্রিকেটে আবার জেলার সেরা ক্রিকেট ক্লাবের মর্যাদা পেল চাকদহের নবীন সংঘ। জেলা ক্রীড়া সংস্থা পরিচালিত নকআউট ভিত্তিক এই টুর্ণামেন্টে কৃষ্ণনগর ষ্টেডিয়ামে বৃষ্টি বিঘ্নিত এই ম্যাচে হিজুলি যুব সংঘ টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করে ৩০.১ ওভারে মাত্র ৯৮ রত্রানে অল আউট হয়ে যায়। পরে নবীন সংঘ ব্যাট করতে নামলে মাত্র ৫ ওভার খেলা হয় এবং তারা ১ উইকেট হারিয়ে ২৭ রান করে। এরপর বৃষ্টির কারণে মাঠ খেলার অনুপযুক্ত হয়ে যায়। সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী টসে জয় পরাজয়ের নিস্পত্তি হয়। নবীন সংঘ টসে জয়ী হয়।

এর আগে হিজুলি যুব সংঘ ৪৭ রানে নাকাশীপাড়ার খেলাঘর ক্লাবকে এবং নবীন সংঘ ৫৪ রানে শান্তিপুর সুবজ সংঘকে হারিয়ে সেমিফাইনালে ওঠে। এছাড়া হাঁসখালির তাইকেন্ডু ক্লাব এবং কল্যাণী টাউন ক্লাব ওয়াক ওভার পেয়ে সরাসরি সেমিফাইনালে ওঠে। তীব্র উত্তেজনাপূর্ণ সেমিফাইনাল ম্যাচ টাই হয়। হাঁসখালির দলটি প্রথমে ব্যাট করে ৯ উইকেটে ১৯৪ রান করে এবং রাণাঘাটের দলটি ৭ উইকেট হারিয়ে ১৯৪ রান করে। কম উইকেট হারানোর ফলে রাণাঘাটের দলটি জয়ী হয়ে ফাইনালে ওঠে। অন্য সেমিফাইনাল ম্যাচটি বৃষ্টিজনিত কারণে পারিত্যক্ত হয় এবং নবীন সংঘে টসে জয়ী হয় কল্যাণী টাউন ক্লাবের বিপক্ষে। অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় জেলার মাত্র ৬টি জোন এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল। এব্যাপারে জোনাল সেক্রেটারী সহ সাবইকে আরও দায়িত্বশীল ভূমিকা নেবার অনুরোধ রাখছি।

ফাইনালে অংশগ্রহণকারী উভয়দলের খেলোয়াড় তালিকা ঃ—

নবীন সংঘ ঃ সোমনাথ দাস (অধিনায়ক), অরুপ কাবাসি, অর্ণব ভট্টাচার্য্য, সৌমজিৎ রায়, চয়ন পোদ্দার, দীপ বিশ্বাস, শুভম্ বিশ্বাস, শুভাশিষ বিশ্বাস, তাপস সরকার, সুরজ সরকার, অমিত মণ্ডল, সায়ন মিত্র, শুভজিৎ পাল ও রাকেশ্ পাল।

হিজুলী যুব সংঘ ঃ কাজল বিশ্বাস (অধিনায়ক), আব্দুল আমিন সেখ, আকাশ ঘোষ, দিবাকর মিত্র, সৌরভ হালদার, শিবশঙ্কর মল্লিক, সৌভিক দাস, তন্ময় কুন্ডু, সায়ন চক্রবর্ত্তী, পার্থ বোস, শুভজিৎ পাল, অনিমেষ কুন্ডু, সুদীপ সরকার ও উত্তম কুমার চ্যাটার্জ্জী।

অম্পায়ার ও স্কোরার ঃ বাবুলাল দাস, শুভদীপ বল্লভ ও রাহুল সেখ।

জুনিয়র

গতবারের মত এবারেও (২০১৬-১৭) চাকদহের নবীন সংঘ জুনিয়র আন্তঃক্লাব ক্রিকেটে জেলার সেরা ক্লাবের খেতাব অক্ষুন্ন রাখলো। গতবার তারা কৃষ্ণনগরের নগেন্দ্রনগর নেতাজী সুভাষ ক্লাবকে পরাজিত করেছিল। এবার এই প্রতিযোগিতার ফাইনালে নবীন সংঘ ৮ উইকেটে রাণাঘাটের ফ্রেন্ডস ক্লাব কে হারিয়ে নবীন চ্যাম্পিয়ন হল। গত ২৯শে মে কৃষ্ণনগর ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতার ফাইনালে ফ্রেন্ডস ক্লাব টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করে ২১ ওভারেই মাত্র ৪৬ রানে অলআউট হয়ে যায়। সুরজ সরকার মাত্র ১১ রানে ৫ উইকট দখল করে। তাঁর ৭ ওভারের মধ্যে ৪টিই মেডেন ছিল। এছাড়া অর্ণব ভট্টাচার্য ৯ রানে ২ উইকেট ও অমিত সরকার কোনো রান না দিয়ে ২ উইকেট দখল করে। জবাবে নবীন সংঘ ব্যাট করতে নেমে মাত্র ২ উইকেট হারিয়েই জয়ের প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। তাদের সায়ন সাহা ও শুভজিৎ পাল উভয়েই ২১ রান করে। দু'জন ব্যাটস্ম্যান রান আউট হয়।

এর আগে নবীন সংঘ পরপর দুটি ম্যাচ ওয়াক ওভার পেয়ে সরাসরি ফাইনালে ওঠে। অন্য দিকে কৃষ্ণনগর ষ্টেডিয়ামে করিমপুরের কুচাইডাঙ্গা তোকীপুর নবজাগরণী ক্লাব মাত্র ৪ রানে নাকাশীপাড়ার খেলাঘর ক্লাবকে এবং ফ্রেণ্ডস ক্লাব কৃষ্ণনগরের কলিকা ইয়ং এ্যাথ্লেটিক ক্লাবকে মাত্র ৭ রানে পরাজিত করে সেমিফাইনালে ওঠে। এই দুটি খেলায় তীব্র প্রতিদ্বন্দিতা লক্ষ্য কার যায় এবং সামান্য ব্যবধানে জয় পরাজয়ের নিস্পত্তি হয়। সেমিফাইনালে তীব্র হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে ফ্রেন্ডস ক্লাব ৯ রানে করিমপুরের ক্লাবকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে।

ফাইনালে অংশগ্রহণকারী উভয়দলের খেলোয়াড় তালিকা ঃ—

নবীন সংঘ ঃ চয়ন পোদ্দার (অধিনায়ক), অর্ণব ভট্টাচার্য, সৌমজিৎ রায়, শুভম্ বিশ্বাস, সায়ন সাহা, সায়ন মিত্র, সুরজ সরকার, অমিত সরকার, দ্বীপ বিশ্বাস, রাকেশ পাল, শুভজিৎ পাল, নিলয় অধিকারী ও দেবাংশু বিশ্বাস।

ফ্রেন্ডস ক্লাব ঃ অনিন্দ্য ভারতী (অধিনায়ক), দীপঙ্কর দাস, মনোজ সরকার, হৃদয় বিশ্বাস, মঙ্গল বিশ্বাস, দীপ দত্ত, ঋত্বিক মজুমদার, সৌরভ দে, শুভ ঘোষ, বাবান বিশ্বাস, সুমন সাহা, অঙ্কিত হেলা, দীপায়ন ঘোষ ও সৌভিক রায়।

অম্পায়ার ও স্কোরার ঃ সাগর সরকার, অমিয় বিশ্বাস ও অমিত মণ্ডল।

সাব—জুনিয়র

বর্তমান মরশুমে (২০১৬-১৭) আবার জেলা সেরা সাব-জুনিয়র ক্রিকেট ক্লাবের মর্যাদা পেল চাকদহের নবীন সংঘ। নগেন্দ্রনগর নেতাজী সুভাষ ক্লাব (২০১৪-১৫); রানাঘাট স্পোর্টিং এসোসিয়েশন (২০১৫-১৬) এবং এবছর রাণাঘাট ফ্রেন্ডস ক্লাব বয়েজ কে হারিয়ে নবীন সংঘ একটানা তিনবার জয়ের খেতাব অক্ষুন্ন রাখলো। গত ২৮শে মে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় রাণাঘাট ফ্রেন্ডস ক্লাব বয়েজ টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নির্ধারিত ৩০ ওভাবে নয় উইকেট হারিয়ে মাত্র ৮২ রান করে। দীপ বিশ্বাস ৬ ওভার বল করে ২টি মেডেন দিয়ে ১৬ রানে ৩ উইকেট দখল করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে নবীন সংঘ মাত্র ২২.৩ ওভারেই ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে। নবীন সংঘ ৮ উইকেটে জয়ী হয়। রাকেশ মজুমদার ২৪ রান ও অমিত সরকার ২৭ রান করে। এর আগে চাকদহ ষ্টেডিয়ামে কল্যাণী টাউন ক্লাব হরিণঘাটার বিবেকানন্দ সংঘ উত্তরাঞ্চলকে হারিয়ে সেমিফাইনালে ওঠে। সেমিফাইনালে নবীন সংঘ ৫ উইকেটে কল্যানী টাউন ক্লাবকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে। অন্যদিকে কৃষ্ণনগর ষ্টেডিয়ামে তীব্র উত্তেজনাপূর্ণ সেমিফাইনালে রাণাঘাট ফ্রেন্ডস ক্লাব বয়েজ ২ উইকেটে কৃষ্ণনগরের নগেন্দ্রনগর নেতাজী সুভাষ ক্লাবকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে। ম্যাচের শেষ বলে জয় পরাজয়ের নিস্পত্তি হয় এই খেলায়।

ফাইনালে অংশগ্রহণকারী উভয়দলের খেলোয়াড় তালিকা ঃ—

নবীন সংঘ ঃ দীপ বিশ্বাস (অধিনায়ক), অমিত সরকার, শুভম্ বিশ্বাস, শুভজিৎ পাল, দিব্যেন্দু রায়, দেবাংশু বিশ্বাস, নিলয় অধিকারী, সায়ন রুদ্র, শুভ্র হীরা, অতনু সরকার, রাকেশ মজুমদার, দিগন্ত বিশ্বাস ও আকাশ বিশ্বাস।

ফ্রেন্ডস ক্লাব বয়েজ ঃ সৌরভ দে (অধিনায়ক), শুভ ঘোষ, মঙ্গল বিশ্বাস, দীপ দত্ত, অঙ্কিত হেলা, সৈকত বিশ্বাস, সায়ন কোলে, রাহুল দাস, সৌগত সাহা, দীপায়ন ঘোষ, শুভজিৎ মণ্ডল, সৌরভ মণ্ডল, অভ্র মিত্র ও সবুজ বিশ্বাস।

অম্পায়ার ও স্কোরার ঃ সুদীপ্ত হালদার, শুভদীপ বল্লভ ও রাহুল সেখ।

সূত্র: নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ, ১৫ই জুন, ২০১৭, পৃ. ১।

৩৪. চাকদহ নবীন সংঘ ক্লাবের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানের প্রচার পত্র।

সূত্র: গবেষক কর্তৃক সংগৃহীত।

৩৫. শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগার ক্লাবের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত প্রচার পত্রিকা।

শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগার

কৃষ্ণনগর, নদীয়া

জন্মশতবর্ষ

সবিনয় নিবেদন,

শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগার প্রতিষ্ঠার ৭৫-তম বর্ষ উদ্‌যাপন এবং দেবপ্রসাদ চক্রবর্তীর জন্মশতবর্ষ পালনে আমরা ব্রতী হয়েছি। আগামী ২৮ — ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮ তিনদিন ব্যাপী নানারকম উৎসব ও সমাবেশ, প্রাক্তন ও বর্তমানের পুনর্মিলন এবং নবাগতদের অংশগ্রহণে খেলাধূলায়, গানে ও নাটকে মুখরিত হয়ে উঠবে আমাদের প্রিয় শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগারের পরিপার্শ্ব। আপনি সবান্ধবে আমন্ত্রিত।

বিনত

৩ ডিসেম্বর ২০১৮ কৃষ্ণনগর

শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগার পরিবার

২৮ ডিসেম্বর ২০১৮:	সকাল ৮টায় শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগারে উৎসবের সূচনা সকাল ৮.১৫ মিনিটে পাঠাগার মাঠ থেকে পদযাত্রা সকাল ৯.৩০ মিনিটে হরিজনপল্লিতে অনুষ্ঠান বিকেল ৪.৩০ মিনিটে প্রাক্তনদের সম্মাননা, জন্মশতবর্ষে দেবপ্রসাদ চক্রবর্তীর শ্রদ্ধাস্মরণ অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুনর্মিলন উৎসব
২৯ ডিসেম্বর ২০১৮:	সকাল ৭টায় পাঠাগার মাঠ থেকে রোডরেস সকাল ১০টা—বিকেল ৪.৩০মিনিট পর্যন্ত পাঠাগারে কর্মশালা: *এসো লিখি আনন্দে,* পরিচালনায় ড. অর্ণা শীল সন্ধে ৫টায় বক্তৃতা, বিষয়: *বিশ শতকের দুই মহামনা:* *সারদা ও নিবেদিতা,* বক্তা: শিশির রায় *স্মারকগ্রন্থ, বর্তিকা ও পায়ে পায়ে পঁচাত্তর শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগার* গ্রন্থ প্রকাশ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
৩০ ডিসেম্বর ২০১৮:	সকাল ১০টা — দুপুর ১২টা পর্যন্ত পাঠাগারে কর্মশালা সকাল ১০টায় ইউনাইটেড রেড স্টারস্ ক্লাব (নগেন্দ্রনগর) মাঠে প্রাক্তনদের ক্রিকেট খেলা বিকেল ৫টা রবীন্দ্রভবন: উদ্বোধন ও সংবর্ধনা সঙ্গীতানুষ্ঠান: *সকাল-সন্ধে রাগের সন্ধানে,* কথা-সুর-পরিচালনা টুনাই দেবাশিস্ গঙ্গোপাধ্যায় নাটক: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *রাজা*

সুসজ্জিত পাঠাগার ভবন ও প্রাঙ্গণে তিনদিনই থাকবে চিত্র ও স্মারক প্রদর্শনী

(রবীন্দ্রভবনের জন্য পৃথক আমন্ত্রণপত্র সংগ্রহ করুন)

সূত্র: গবেষক কর্তৃক সংগৃহীত।

৩৬. শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগার ক্লাবের ৮০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত প্রচার পত্রিকা।

শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগার
কৃষ্ণনগর | নদীয়া
১৯৪৪-২০২৩

৮০ আলো

প্রতিষ্ঠার ৮০-তম বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে
অনুরাগী ও উৎসাহীদের প্রতি আহ্বান

সবিনয় নিবেদন,

কৃষ্ণনগরের নগেন্দ্রনগর পল্লিতে সমাজ-সংস্কৃতি মনস্ক কয়েকজন ব্যক্তির সহায়তায় চারণকবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের মূখ্য উদ্‌যোগে ১৩৫১ (১৯৪৪) সালে শুভ অক্ষয় তৃতীয়ায় যাত্রা শুরু করে শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগার।

অচিরে পরিবর্ধিত কার্যক্রমে নগেন্দ্রনগর সন্নিহিত অনুন্নত, অশিক্ষিত ও অসহায় চর্মকারবৃত্তির হরিজনদের স্বনির্ভর জীবন-জীবিকার লক্ষ্যে স্থাপিত হয় শ্রীরামকৃষ্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয় – সর্বাঙ্গীণ দায়িত্ব নেন মাস্টারমশাই, দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী। বর্তমানে পল্লিবাসী উচ্চতর পঠনপাঠনের মাধ্যমে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত। হরিজন পল্লিটি আজ ৮০ বছর পর আর পাঁচটা পল্লির মতোই স্বাভাবিক ও স্বয়ম্ভর এবং এই পল্লির সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগারের যোগাযোগও অটুট।

গ্রন্থাগার হিসাবে শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগার আজ এই জেলার অন্যতম ঐতিহ্যশালী গ্রন্থাগার – এর পুস্তক সংখ্যা প্রায় ৮০০০ এবং একই সঙ্গে এটি দুষ্প্রাপ্য পত্র-পত্রিকায় সমৃদ্ধ। পাঠাগারের সাংস্কৃতিক দল শহরে সুপ্রতিষ্ঠিত, ক্রীড়া বিভাগটি নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার 'এ' পর্যায়ের ক্লাব। শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগার পরিচালিত জেলা ক্রীড়া সংস্থার অনুমোদিত ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ৩৭ বছর অতিক্রান্ত। অ্যাথলেটিকস্ দলের অনেকেই জেলা, রাজ্য দলের অন্তর্ভুক্ত – সম্প্রতি পাঠাগারের রেজওয়ানা মল্লিক হেনা দেশের হয়ে তাসখন্দে এশিয়ান যুব অ্যাথলেটিকস্ মিটে ৪০০ মিটার দৌড়ে নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছে।

সম্প্রতি ২০২৩ সালে এই প্রতিষ্ঠান পৌঁছেছে প্রতিষ্ঠার ৮০-তম বর্ষে। কার্যনির্বাহক সমিতির সিদ্ধান্ত অনুসারে আগামী ২৯-৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ তিনদিনব্যাপী নানারকম উৎসব ও সমাবেশে, প্রাক্তন ও বর্তমানের পুনর্মিলনে এবং নবাগতদের অংশগ্রহণে খেলাধূলা ও গানে মুখরিত হয়ে উঠবে আমাদের প্রিয় শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগারের পরিপার্শ্ব। এই কর্মকাণ্ড রূপায়ণের জন্য শহরের মরমি ও দরদি ব্যক্তিবৃন্দ এবং সর্বত্র বসবাসকারী পাঠাগার-পরিবারের সকলের সক্রিয় সহযোগ ও বদান্যতার প্রত্যাশী আমরা। সমগ্র অনুষ্ঠানের সহযোগী হিসাবে আপনারা সাধ্যমত অর্থসাহায্য করবেন। যথাযথ পরামর্শ দেবেন এবং আমাদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে তিনদিনের সামগ্রিক অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন ও পাঠাগারের সমুজ্জ্বল ভবিষ্যযাত্রাকে পূর্ণতা দান করবেন। সবশেষে পাঠাগার কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যবর্গের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

বিনত

শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগার	**চন্দন সরকার**	**রামকৃষ্ণ দে**
বি ডি মুখার্জী রোড	সম্পাদক	সভাপতি
কৃষ্ণনগর, নদীয়া	৭০০১৯৬৬৩৪৫	৮২৫০৫৭৩৩৮৪
৭৪১১০১		

অনলাইন/চেক পাঠানোর নির্দেশিকা

Name : Shree Ramkrishna Pathagar
A/c. No. : 11256015287
IFSC : SBIN0000122
Bank : State Bank of India
Branch : Krishnanagar

সূত্র: গবেষক কর্তৃক সংগৃহীত।

৩৭. হালালপুর বিবেকানন্দ সংস্কৃত সংঘ ক্লাবের জয়লাভ করা কিছু পুরস্কারের চিত্র।

সূত্র: গবেষক কর্তৃক সংগৃহীত।

৩৮. খেলোয়ারদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য গবেষক কর্তৃক নির্মিত প্রশ্নমালা।

- **ক্রীড়াবিদের নাম-**
- **খেলাধুলার ক্ষেত্র-**

প্রশ্নমালা

1. এই ক্রীড়া ক্ষেত্রকেই কেনো বেছে নিলেন?
2. খেলাধুলা সম্পর্কে কেনো এত উৎসাহী?
3. কোন বয়সে খেলাধুলা শুরু করেন?
4. ক্রীড়া ক্ষেত্রে আপনার প্রথম প্রশিক্ষণের সূচনা কিভাবে ঘটে?
5. এমন কোন ক্রীড়াবিদ যাকে আপনি রোল মডেল হিসেবে দেখেন এবং কেন?
6. ক্রীড়াবিদ হিসেবে আপনার প্রধান শক্তি গুলি বা সামর্থ্য কি?
7. ক্রীড়াবিদ হিসেবে ক্রীড়া সংক্রান্ত দায়িত্ব এবং অন্যান্য বাইরের কার্যক্রম এর মধ্যে কিভাবে ভারসাম্য রক্ষা করতেন?
8. ক্রীড়াবিদ হিসাবে আপনার খেলাধুলা জীবনের দৈনন্দিন রুটিন বা প্রাত্যহিক প্রশিক্ষণের দিনলিপি কেমন ছিল?
9. খেলাধুলার বাইরে অবসর বিনোদনের জন্য কি করতেন?
10. প্রশিক্ষণের সময় কি ধরনের খাদ্য গ্রহণ করতেন বা পুষ্টি পরিকল্পনা কেমন ছিল এবং এক্ষেত্রে কোন সমস্যা বা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছেন জীবনে?
11. ক্রীড়া ক্ষেত্রে আপনার প্রধান প্রাপ্তি বা উল্লেখযোগ্য সাফল্য গুলি কী কী?
12. ক্রীড়াবিদ হিসেবে কী ধরনের প্রতিবন্ধকতা বা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন?
13. এই সংশ্লিষ্ট ক্রীড়া ক্ষেত্রে বর্তমান সময়ের ক্রীড়াবিদরা কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয় বা আপনার সংশ্লিষ্ট ক্রীড়া ক্ষেত্রে বর্তমানেও কী ধরনের সমস্যা বিদ্যমান?
14. খেলোয়াড় জীবনে কোন অপ্রাপ্তি বা যা অর্জন করতে চাইতেন কিন্তু সম্ভব হয়নি?
15. কোন সময় খেলাধুলায় ইতি টানেন এবং এর কারণ?
16. খেলোয়াড় জীবনের পর কি ধরনের কার্যকর্মের সঙ্গে সংযুক্ত/ কি ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে চাইতেন?

17. খেলোয়াড় জীবনে প্রশাসনের তরফ থেকে বা সরকারের তরফ থেকে কি ধরনের সহযোগিতা লাভ করেছেন? সরকারি সহযোগিতা কি যথার্থ? যথার্থ না হলে আর কি ধরনের সহযোগিতা কাম্য বলে আপনি মনে করেন?
18. খেলোয়াড় জীবনে পরিবার ও অন্যান্য দের কাছ থেকে কি ধরনের সহযোগিতা লাভ করেছেন?
19. খেলোয়ার হিসেবে ব্যর্থতা, সমালোচনা, মানসিক চাপ কিভাবে সামলেছেন?
20. খেলাধুলাকে কি পেশা হিসেবে বেছে নেওয়া কতটা কঠিন ছিল?
21. অন্য পেশা গ্রহণের চেয়ে খেলাধুলাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ কতটা কঠিন?
22. জেলার কোন ক্লাবে প্রথম প্রশিক্ষণ বা খেলাধুলা শুরু করেন?
23. জেলায় খেলাধুলার ক্ষেত্রে কি ধরনের সহযোগিতা ও পরিকাঠামো পেয়েছেন?
24. জেলায় ক্রীড়া ক্ষেত্রে কি ধরনের পরিকাঠামো গত সীমাবদ্ধতা রয়েছে আপনার নির্দিষ্ট খেলাধুলায়?
25. আপনার সফলতা বসবাসকারী অঞ্চলে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে? অন্যেরা কি আপনার সফলতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আপনার খেলা বা অন্য কোন খেলায় অংশগ্রহণ করেছে?

সূত্র: গবেষক কর্তৃক নির্মিত।

৩৯. ক্লাব কর্তৃপক্ষের সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য গবেষক কর্তৃক নির্মিত প্রশ্নমালা।

ক্লাবের নাম-

ক্লাবের ঠিকানা-

প্রশ্নমালা

1. ক্লাবটি কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
2. প্রতিষ্ঠার সঙ্গে কারা যুক্ত বা প্রতিষ্ঠার সংক্রান্ত কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা থাকলে তার বর্ণনা।
3. কি কি ধরনের শিরা কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত ক্লাব?
4. ক্লাবের নিজস্ব মাঠ আছে?
5. ক্লাবে নিজস্ব ভবন আছে?
6. ক্লাবের তরফ থেকে কি ধরনের ক্রীড়া প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়?
7. ক্লাবের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে কি কি সমস্যা রয়েছে?
8. ক্লাবের আর্থিক কাজকর্ম কিভাবে পরিচালিত হয়? সরকারি সাহায্য/ বেসরকারি সাহায্য/ ক্লাবের সদস্যদের সাহায্য।
9. ক্লাবের সদস্য/ সদস্য সংখ্যা/ সদস্যদের কার্যাবলী/ সদস্য হওয়ার কোন বিশেষ নিয়মাবলী/ সদস্যবৃদ্ধি করার কোন বিশেষ পন্থা।
10. খেলাধুলার প্রসারে ক্লাবের কোন বিশেষ পরিকল্পনা বা কর্মসূচি।
11. খেলাধুলার বাইরে ক্লাব আর কি ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত?
12. কোন কোন নতুন খেলাধুলায় ক্লাব সম্প্রসারণ ঘটাতে চাই?
13. খেলাধুলায় ক্লাব এর উল্লেখযোগ্য সাফল্য কি কি?
14. ক্লাবের উল্লেখযোগ্য খেলোয়াড় যারা জেলা/ রাজ্য/ জাতীয়/ আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন।

15. আঞ্চলিক ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পর্কে মতামত/ সহযোগিতা ও সমস্যা থাকলে তার বর্ণনা।
16. এলাকায় ক্লাবের ক্রীড়া কর্মসূচি কি ধরনের প্রভাব ফেলেছে?
17. ক্লাবের খেলোয়াড়রা কি ধরনের রাজ্য সামাজিক পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত? অতীতে কি ধরনের পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল বর্তমানে কোন পরিবর্তন ঘটেছে কিনা।
18. খেলোয়াড়দের মানসিক স্বাস্থ্য ও পুষ্টিগুণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ/ মতামত দেওয়ার ক্ষেত্রে ক্লাবের ভূমিকা।
19. ক্লাবের ভবিষ্যৎ অগ্রগতি সংক্রান্ত পরিকল্পনা।

সূত্র: গবেষক কর্তৃক নির্মিত।

৪০. ক্ষেত্রসমীক্ষার চিত্রাবলী।

কৃষ্ণনগর টাউন ক্লাব, কৃষ্ণনগর।

শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগার, কৃষ্ণনগর।

অনামী ক্লাব, বাদকুল্লা।

অজয় স্মৃতি অ্যাথলেটিক ক্লাব, কৃষ্ণগঞ্জ।

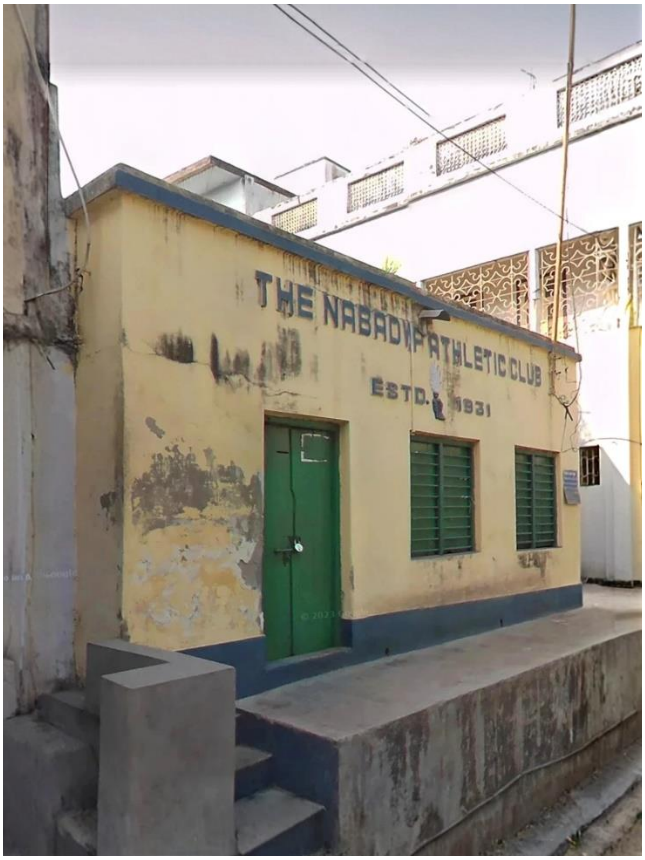

নবদ্বীপ অ্যাথলেটিক ক্লাব,
নবদ্বীপ।

অমর ভারতী ক্লাব, নবদ্বীপ।

নদীয়া ক্লাব, নবদ্বীপ।

সবুজ সংঘ, শান্তিপুর।

রানাঘাট টাউন ক্লাব,
রানাঘাট।

রানাঘাট স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন,
রানাঘাট।

হ্যাপি ক্লাব, রানাঘাট।

হালালপুর বিবেকানন্দ সংস্কৃত সংঘ, রানাঘাট।

নবীন সংঘ, চাকদহ।

কল্যাণী টাউন ক্লাব, কল্যাণী।

সূত্র: গবেষক কর্তৃক সংগৃহীত।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

➢ প্রাথমিক উপাদন (PRIMARY SOURCES):

• ARCHIVAL RECORDS:

General Report on Public Instruction in Bengal for 1890-91, in General (Edn.), November 1891, Proceeding No. 1-4, File-6R-3.

General Report on Public Instruction in Bengal for 1892-93, in General (Edn.), November 1893, Proceeding No. 1-5, File-8R-4.

General Report on Public Instruction in Bengal for 1893-94, in General (Edn.), December 1894, Proceeding No. 1-9, File-8R-10.

General Report on Public Instruction in Bengal for 1894-95, in General (Edn.), November 1895, Proceeding No. 17-20, File-8R-2.

• GAZETTERS:

A Statistical Account of Bengal: Districts of Nadiya and Jessor, by Hunter, W.W., Vol-II, London: Trubner & Co., 1875.

Bengal District Gazetters: Nadia, by Garrett, J.H.E., Calcutta: The Bengal Secretariat Book Depot., 1910.

West Bengal District Gazetters: Nadia, by Majumdar, Durgadas, Calcutta: Information and Public Relation Department, 1978.

Bengal District Gazetters: Nadia, by Garrett, J.H.E., Kolkata: West Bengal Government Press, 2001, (Reprint).

• CENSUS REPORT:

Census 1951 West Bengal District Handbooks Nadia, by Mitra, Ashok, Superintendent of Census Operations, West Bengal, 1953.

Census 1961 West Bengal District Handbooks Nadia, by Ray, B., Superintendent of Census Operations, West Bengal, 1967.

District Census Handbook Nadia 1971, Part X-C, Director of Census Operations, West Bengal, Government Printing West Bengal, Kolkata, 1971.

District Census Handbook Nadia, Series 22, Part X-A & B, Ghosh B., Directorate of Census Operations, West Bengal, 1973.

District Statistical Handbook Nadia, Bureau of Applied Economics and Statistics, Government of West Bengal, 2004.

District Census Handbook Nadia 2011, Series 20, Part XII-A, Directorate of Census Operations, West Bengal, 2011.

District Census Handbook Nadia 2011, Series 20, Part XII-B, Directorate of Census Operations, West Bengal, 2011.

- **OTHER GOVERNMENTAL PUBLICATION:**

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার। *বাঙ্গালীর সংস্কৃতি*। ষষ্ঠ সংস্করণ। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমীর তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০২০।

নদিয়া। কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০৩।

পশ্চিমবঙ্গ: নদিয়া জেলা সংখ্যা। কলকাতা: তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯৭।

পশ্চিমবঙ্গ: বামফ্রন্ট সরকারের দুই দশক। কলকাতা: তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯৭।

পশ্চিমবঙ্গ: স্বাধীনতা সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা। কলকাতা: তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯৭।

বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয়কুমার, ও সুধীর রঞ্জন দাস, সম্পা। *নদিয়া জেলার পুরাকীর্তি*। দ্বিতীয় সংস্করণ। সংকলন ও গ্রন্থনা মোহিত রায়, কলকাতা: পূর্ত বিভাগ, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৭৫।

মিত্র, কাজল, সম্পা। *সার্ধ্য শতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ*। কৃষ্ণনগর: কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরি, ২০০৭।

সিংহ মহাপাত্র, অশোক, ও অপূর্ব কুন্ডু, সম্পা। *নদীয়া জেলা গ্রন্থাগার সুবর্ণজয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ (১৯৯৫-২০০৫)*। কৃষ্ণনগর: নদীয়া জেলা গ্রন্থাগার, ২০১০।

A Summary of The Changes In The Jurisdiction of Districts in Bengal 1757-1916, by Bahadur, R.M.C., Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1918.

Biswas, Kumud Ranjan. *Rivers of Bengal: A Compilation*. Kolkata: West Bengal Higher Education Department, Government of West Bengal, 2002.

Chakraborty Chintaharan, and Ghosh Pareshnath, eds., *Krishnanagar College Centenary Commemoration Volume*. Krishnanagar: 1948.

Chanda, A.K. *Ninth Quinquennial Review on the Progress of Education in Bengal for the year 1932 to 1937*. Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot., 1939.

Education Department, Government of West Bengal, Physical Education and Youth Welfare Scheme. Calcutta: West Bengal Government Press, 1952.

• PUBLICATION OF SEMI-OFFICIAL:

Annual Report Nadia District Sport Association.

Annual Report of Zonal Sport Association.

Constitution Book Of Nadia District Sport Association, 1948, 1952, 1955, 1967, 1994, 2001, 2017.

Athletic Federation of India, Final Results of Various Athletic Championship.

• NON GOVERNMENT PUBLICATIONS:

দত্ত, ভোলানাথ, সম্পা। *কৃষ্ণনগর পৌরসভা শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ (১৮৫৪- ১৯৬৪)*। কৃষ্ণনগর: নদীয়া জেলা নাগরিক পরিষদ, ১৯৬৫।

নদীয়া: স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ। কৃষ্ণনগর: কৃষ্ণনগর নাগরিক পরিষদ, জেলা তথ্য অফিস, ১৯৭৩।

স্বাধীনতা সংগ্রামে নদীয়া। কৃষ্ণনগর: নদীয়া জেলা নাগরিক পরিষদ, সার্কিট হাউস, ১৯৭৩।

- **PUBLICATION OF PRIVATE INSTITUTIONS AND CLUBS.**

- **NEWS PAPERS:**

- **English Language:**

1. *Amritabazar Patrika.*
2. *India Today.*
3. *Sports Now.*
4. *The Hindu.*
5. *The Statesman.*
6. *The Telegraph*
7. *The Times of India.*

- **Bengali Language:**

1. *আনন্দবাজার পত্রিকা*।
2. *কৃষ্ণনগর সমাচার*।
3. *ক্রীড়া জগত*।
4. *ক্রীড়া প্রসঙ্গ*।
5. *খেলার সাথী*।
6. *দেশ পত্রিকা*।

7. *দৈনিক বসুমতি*।

8. *নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট স্পোর্টস নিউজ/* নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস নিউজ।

9. *নদিয়া দর্পণ*।

10. *নদীয়া প্রকাশ*।

11. *রানাঘাট বার্তা*।

- **ক্ষেত্র সমীক্ষা (FIELD SURVEY):**

  - **সাক্ষাৎকার:**

১. নির্মলেন্দু দেবনাথ, ফুটবলার, কৃষ্ণনগর, ১২.০১.২০২৩।

২. অসীমানন্দ ঘোষ, ফুটবলার, কৃষ্ণনগর, ১২.০১.২০২৩।

৩. সমরজিৎ সরকার, ফুটবলার, কৃষ্ণনগর, ১২.০৪.২০২৩।

৪. নির্মাল্য ঘোষ, ক্রিকেটার, কৃষ্ণনগর, ১৭.০১.২০১৩।

৫. পম্পা সরকার, ক্রিকেটার, কৃষ্ণনগর, ১৭.০১.২০২৩।

৬. সুশোভন সরকার, অ্যাথলিট, কৃষ্ণনগর, ২০.০১.২০২৩।

৭. সোমা বিশ্বাস, অ্যাথলিট, কৃষ্ণনগর, ২০.০১.২০২৩।

৮. ফিরোজা খাতুন, অ্যাথলিট, কৃষ্ণনগর, ২১.০১.২০২৩।

৯. জুলফিকার হক মন্ডল, অ্যাথলিট, কৃষ্ণনগর, ২৩.০১.২০২৩।

১০. সারথি বর্মন, অ্যাথলিট, কৃষ্ণনগর, ২৩.০১.২০২৩।

১১. ইমচাঁদ শেখ, অ্যাথলিট, কৃষ্ণনগর, ২৯.০১.২০২৩।

১২. সবিতা মন্ডল, অ্যাথলিট, কৃষ্ণনগর, ২৯.০১.২০২৩।

১৩. তেজাব বিশ্বাস, অ্যাথলিট, কৃষ্ণনগর, ১৪.০২.২০২৩।

১৪. সাবের আলী মন্ডল, অ্যাথলিট, কৃষ্ণনগর, ১৪.০২.২০২৩।

১৫. রুপা দত্ত, ক্রিকেটার, বাদকুল্লা, ১৮.০২.২০২৩।

১৬. বুদ্ধদেব মন্ডল, অ্যাথলিট, বাদকুল্লা, ১৮.০২.২০২৩।

১৭. কিশোরী মন্ডল, অ্যাথলিট, বাদকুল্লা, ২৪.০২.২০২৩।

১১. ইমচাঁদ শেখ, অ্যাথলিট, কৃষ্ণনগর, ২৯.০১.২০২৩।

১২. সবিতা মন্ডল, অ্যাথলিট, কৃষ্ণনগর, ২৯.০১.২০২৩।

১৩. তেজাব বিশ্বাস, অ্যাথলিট, কৃষ্ণনগর, ১৪.০২.২০২৩।

১৪. সাবের আলী মন্ডল, অ্যাথলিট, কৃষ্ণনগর, ১৪.০২.২০২৩।

১৫. রুপা দত্ত, ক্রিকেটার, বাদকুল্লা, ১৮.০২.২০২৩।

১৬. বুদ্ধদেব মন্ডল, অ্যাথলিট, বাদকুল্লা, ১৮.০২.২০২৩।

১৭. কিশোরী মন্ডল, অ্যাথলিট, বাদকুল্লা, ২৪.০২.২০২৩।

১৮. বাচ্চু দুর্লভ, অ্যাথলিট, বাদকুল্লা, ২৪.০২.২০২৩।

১৯. টুম্পা চুনারী, অ্যাথলিট, বাদকুল্লা, ০৭.০৩.২০২৩।

২০. সাবিনা খাতুন, অ্যাথলিট, বাদকুল্লা, ০৭.০৩.২০২৩।

২১. মনোজ সিং, অ্যাথলিট, বাদকুল্লা, ০৮.০৩.২০২৩।

২২. শুভাশিস ঘোষ, অ্যাথলিট, বাদকুল্লা, ১১.০৩.২০২৩।

২৩. সুমিত্রা বিশ্বাস, অ্যাথলিট, বাদকুল্লা, ১৭.০৩.২০২৩।

২৪. সাধারণ সম্পাদক, অনামী ক্লাব, ২৫.০৩.২০২৩।

২৫. সাধারণ সম্পাদক, অজয় সংঘ ক্লাব, ২৫.০৩.২০২৩।

২৬. সমীর কুমার দা, সাধারণ সম্পাদক, বাদকুল্লা আঞ্চলিক ক্রীড়া সংস্থা, ২৭.০৩,২০২৩।

২৭. অজয় শিকদার, ফুটবলার, শান্তিপুর, ১৫.০৪.২০২৩।

২৮. সুবীর বসাক, ফুটবলার, শান্তিপুর, ১৫.০৪.২০২৩।

২৯. শান্তনু দেবনাথ, ভলিবল খেলোয়াড়, শান্তিপুর, ১৭.০৪.২০২৩।

৩০. তুষার কুন্ডু, ভলিবল খেলোয়াড়, শান্তিপুর, ১৮.০৪.২০২৩।

৩১. সাধারণ সম্পাদক, সূত্রাগড় ক্লাব, ২৯.০৪.২০২৩।

৩২. অয়ন গুপ্ত, ক্রিকেটার, রানাঘাট, ১০.০৫.২০২৩।

৩৩. অনিতা দাস, অ্যাথলিট, রানাঘাট, ১১.০৫.২০২৩।

৩৪. নিশিত ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক, রানাঘাট আঞ্চলিক ক্রীড়া সংস্থা, ১২.০৫.২০২৩।

৩৫. সাধারণ সম্পাদক, রানাঘাট টাউন ক্লাব, ১৫.০৫.২০২৩।

৩৬. সায়ন ঘোষ, ক্রিকেটার, চাকদহ, ২১.০৬.২০২৩।

৩৭. অম্বিকা গুহ, ক্রিকেটার, চাকদহ, ২২.০৬.২০২৩।

৩৮. সুমিতা ভৌমিক, অ্যাথলিট, চাকদহ, ২৭.০৬.২০২৩।

৩৯. সাধারণ সম্পাদক, চাকদহ নবীন সংঘ ক্লাব, ২৭.০৬.২০২৩।

৪০. জগন্নাথ দাস, ফুটবলার, হরিণঘাটা, ১০.০৭.২০২৩।

৪১. সাধারণ সম্পাদক, কল্যাণী টাউন ক্লাব, ১১.০৭.২০২৩।

৪২. শ্যামল ভৌমিক, ফুটবলার, নবদ্বীপ, ২৯.০৭.২০২৩।

৪৩. আদিত্য বিশ্বাস, অ্যাথলিট, তেহট্ট, ১৪.০৮.২০২৩।

৪৪. প্রিয়াঙ্কা বালা, ক্রিকেটার, তেহট্ট, ১৪.০৮.২০২৩।

৪৫. শংকর বিশ্বাস, অ্যাথলিট, পলাশীপাড়া, ২০.০৮.২০২৩।

৪৬. সাধারণ সম্পাদক, জুনিয়র ইস্টবেঙ্গল ক্লাব, নাকাশিপাড়া, ৩০.০৮.২০২৩।

৪৭. সাধারণ সম্পাদক, ধুবুলিয়া ইউথ সোসাইটি, ধুবুলিয়া, ০৭.০৯.২০২৩।

৪৮. রীনা দাস, অ্যাথলিট, দেবগ্রাম, ১৪.০৯.২০২৩।

৪৯. শিল্পী ঢালি, অ্যাথলিট, দত্তফুলিয়া, ২৮.০৯.২০২৩।

৫০. সাধারণ সম্পাদক, দত্তফুলিয়া ইয়ং ম্যান সাসোসিয়েশন ক্লাব, দত্তফুলিয়া, ২৮.০৯.২০২৩।

৫১. সাধারণ সম্পাদক, হালালপুর বিবেকানন্দ স্মৃতি সংঘ, রানাঘাট, ০৮.১০.২০২৩।

৫২. সাধারণ সম্পাদক, কৃষ্ণনগর টাউন ক্লাব কৃষ্ণনগর, ১৩.১০.২০২৩।

৫৩. সাধারণ সম্পাদক, কৃষ্ণনগর তরুণ সংঘ ক্লাব, কৃষ্ণনগর, ১৪.১০.২০২৩।

৫৪. সাধারণ সম্পাদক, হিরোজ ক্লাব, কৃষ্ণনগর, ১৬.১০.২০২৩।

৫৫. সাধারণ সম্পাদক, কৃষ্ণনগর অ্যাথলেটিক্স ক্লাব, ২০.১০.২০২৩।

৫৬. জয়ন্ত বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক, নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা, কৃষ্ণনগর, ১১.১১.২০২৩।

৫৭. সমীর কুমার বিশ্বাস, উপ-সভাপতি, নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা, ১৬.১১.২০২৩।

৫৮. সাধারণ সম্পাদক, নবীন সংঘ ক্লাব, চাকদহ, ০৯.১২.২০২৩।

৫৯. দেবশ্রী মজুমদার, অ্যাথলিট, কলকাতা, ০৫.০১.২০২৪।

৬০. ক্লাব কর্তৃপক্ষের সাক্ষাৎকার, শান্তিপুর স্পোর্টিং ইউনিয়ন, ২৪.০১.২০২৪।

৬১. ক্লাব কর্তৃপক্ষের সাক্ষাৎকার, সবুজ সংঘ ক্লাব, ২৪.০১.২০২৪।

৬২. ক্লাব কর্তৃপক্ষের সাক্ষাৎকার, রানাঘাটের তরুণ সংঘ ক্লাব, ২৯.০১.২০২৪।

➢ গৌণ উপাদন (SECONDARY SOURCES):

• English Books:

Agarwal, D.P., and D.K. Chakrabarti. *Essays in Indian Protohistory*. Delhi: B.R. Publishing Corporation, 1979.

Allan, J. *Catalogue of the Coins of Gupta Dynasties and of Sasanika Kings of Gauda*. London: British Museum, 1914.

Alter, Joseph S. *The Wrestler's Body: Identity and Ideology in North India*. Berkeley: University Of California Press, 1992.

Arbena, Joseph L., ed. *Sports and Society in Latin America: Diffusion, Dependency, and the Rise of Mass Culture*. New York: Greenwood Press, 1988.

Armstrong, Gary, and Richards Giulianotti, eds. *Fear and Loating in World Football*. Oxford: Berg, 2001.

Appadurai, Arjun. *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization, Public World*. Vol. I. London: University of Minnesota Press, 2005.

Bale, John. *Sports Geography*. London: Routledge, 2003.

Bale, John, & Mike Cronin, eds. *Sport and Postcolonialism*. Oxford: Berg, 2003.

Bandyopadhyay, Kausik. *Scoring off the Field: Football Culture in Bengal 1911 to 1980*. New Delhi: Routledge, 2011.

Bandyopadhyay, Kausik. *Playing for Freedom: A Historic Sports Victory*. New Delhi: Standard Publisher, 2008.

Bandyopadhyay, Kausik. *Sport, Culture, Nation: Perspectives from Indian Football and South Asian Cricket*. New Delhi: Sage, 2015.

Barbazon, Tara. *Playing on the Periphery: Sport, Identity and Memory*. London: Routledge, 2006.

Barua, B.M. *Barhut: Aspects of Life and Art*. Book-III. Calcutta: Indian Research Institute Publications, 1937.

Basham, A.L. *The Wonder That was India: A Survey of the Culture of the Indian Sub-Continent Before the Coming of the Muslims*. New York: Grove Press, 1959.

Bass, Gary J. *The Blood Telegram: Nixon, Kissinger, and a Forgotten Genocide*. New York: Alfred A. Knopf, 2013.

Beal, S. *Chinese Accounts of India: Hiuen Tsiang*. Vol. II. Calcutta: Susil Gupta India Limited, 1958.

Beal, S. *The Romantic Legend of Sakya Buddha*. London: Trubner and Co., 1875.

Blunt, Edward Arthur Henry. *The ICS: The Indian Civil Service*. London: Faber & Faber, 1937.

Bolchmann, H., trans. *The Ain-I-Akbari*. Calcutta: Asiatic Society of Bengal, 1927.

Bose, Mihir. *The Magic of Indian Cricket: Cricket and Society in India*. London: Routledge, 2006.

Bose, Sarmila. *Dead Reckoning: Memories of the 1971 Bangladesh War*. London: Oxford University Press, 2011.

Breckenridge, Carol A., ed. *Consuming Modernity: Public Culture in a South Asian World*. London: University of Minnesota Press, 1998.

Burke, Peter. *Varieties of Cultural History*. New York: Cornell University Press, 1997.

Caillois, Roger. *Man, Play and Games*. Translated by Meyer Barash. Chicago: University of Illinois Press, 2001.

Cashman, Richard. *Patrons, Players and the Crowd*. Calcutta: Orient Longman, 1979.

Cashmore, Ellis. *Making Sense of Sports*. London: Routledge, 2010.

Chakladar, H.C. *Social Life in Ancient India*. Calcutta: Greater India Society, 1929.

Chakraborty, Subhas Ranjan, Shantanu Chakrabarti, and Kingshuk Chatterjee. eds. *The Politics of Sports in South Asia*. London: Routledge, 2010.

Chakrabarty, Prafulla K. *The Marginal Men: The Refugees and the Left Political Syndrome in West Bengal*. Calcutta: Lumiere Books, 1990.

Chandra, Bipan, Mridula Mukherjee, and Aditya Mukherjee. *India Since Independence*. New Delhi: Penguin Books, 2008.

Charles, Allen. *Plain Tales from the Raj*. London: Andre Deutsch, 1975.

Chatterjee, Partha. *Nationalist Thought and The Colonial World: A Derivative Discourse*. London: Zed Books, 1993.

Coakley, Jay, and Eric Dunning, eds. *Handbook of Sports Studies*. London: Sage Publication, 2000.

Cowell, E.B., and F.W. Thomas, trans. *Harsacarita*. London: Royal Asiatic Society, 1897.

Crego, Robert. *Sports and Games of the 18th and 19th Centuries*. London: Greenwood Press, 2003.

Cronin, Mike, and David Mayall. *Sporting Nationalism: Identity, Ethnicity, Immigration and Assimilation*. London: Frank Cass publishers, 1998.

Darby, Paul, Martin Johnes, and Gavin Mellor, eds. *Soccer and Disaster*. London: Routledge, 2005.

Das, A.C. *Rig Vedic Culture*. Calcutta: R. Cambray & Co., 1925.

Das, Suprita. *Free Hit: The Story of Women's Cricket in India*. Noida: Harper Sport, 2019.

Das, Vena. *Structure and Cognition: Aspects of Hindu Caste and Ritual*. Delhi: Oxford University Press, 1987.

Datta, B., and R. Labhaya, eds. *Ramayana of Valmiki*. Lahore: 1931.

DeMellow, Melville. *Reaching for Excellence: The Glory and Decay of Sport in India*. New Delhi: Kalyani Publishers, 1979.

Deshpande, S.H. *Physical Education in Ancient India*. Delhi: Bharatiya Vidya Prakashan, 1992.

Dimeo, Paul, and James Mills, eds. *Soccer in South Asia: Empire, Nation and Diaspora*. London: Routledge, 2013.

Diwedi, H.P. *Prachin Bharat Ke Kalatmaka Vinod*. Bombay: Rajkamal Prakashan, 1952.

Dowlah, Caf. *The Bangladesh Liberation War, the Sheikh Mujib Regime and Contemporary Controversies*. Lanham: Lexington Books, 2016.

Dunning, Eric. *Sports Matters: Sociological Study of Sports, Violence and Civilization*. London: Routledge, 1999.

Dunning, Eric, Dominic Malcolm, and Ivan Waddington, eds. *Sport Histories: Figurational Studies of the Development of Modern Sports*. London: Routledge, 2004.

Elias, Norbert, and Eric Dunning, eds. *Quest for Excitement: Sports and Leisure in the Civilising Process*. Oxford: Blackwell, 1986.

Fairservis, W.A. *The Roots of Ancient India*. London: George Allen & Unwin Ltd., 1971.

Finn Gerry, P.T., and Richard Giulianotti, eds. *Football Culture: Local Contests, Global Visions*. London: Frank Cass, 2005.

Gibbons, Tom, and Dominic Malcom, eds. *Sports and English National Identity in a 'Disunited Kingdom'*. London: Routledge, 2017.

Giulianotti, Richard. *Sport and Modern Social Theorists*. New York: Palgrave Macmillan, 2004.

Guha, Ramachandra. *A Corner of a Foreign Field: The Indian history of a British Sport*. New Delhi: Penguin Books, 2014.

Guha, Ramachandra. *India After Gandhi: The History of the World's Largest Democracy*. New Delhi: Macmillan, 2016.

Guttmann, Allen. *Women's Sports: A History*. New York: Columbia University Press, 1991.

Guttmann, Allen. *From Ritual to Record: The Nature of Modern Sports*. New York: Columbia University Press, 1978.

Guttmann, Allen. *Games and Empires: Modern Sports and Cultural Imperialism*. New York: Colombia University Press, 1994.

Hargreaves, John. *Sports, Power and Culture: A Social and Historical Analysis of Popular Sports in Britain*. Cambridge: Polity Press, 1986.

Hargreaves, Jennifer. *Sporting Females: Critical Issues in the History and Sociology of Women's Sports*. London: Routledge, 1994.

Hobsbawm, Eric, and Terence Ranger, eds. *The Invention of Tradition*. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

Huizinga, John. *Homo Ludens: A Study of Play Element in Culture*. London: Routledge & Kegan Paul Ltd., 1960.

Hultzsch, E. *Corpus Inscriptionum Indicarcum: Inscriptions of Asoka*. Vol.I. Oxford: Clarendon Press, 1925.

Holt, Richard. *Sport and the British: A Modern History*. Oxford: Oxford University Press, 1994.

Hong, Fan, and J.A. Mangan, eds. *Soccer, Women, Sexual Liberation: Kicking off a New Era*. London: Frank Cass, 2005.

Hong, Fan, and Lu Zhouxiang, eds. *The Routledge Handbook of Sport in Asia*. London: Routledge, 2021.

Hurlock, E.B. *Child Development*. New York: McGraw Hill Book Company, 1942.

Jain, R., ed. *Ancient India as Described by Megasthenes and Arrian*. New Delhi: Today and Tomorrow's Printers and Publishers, 1972.

Jarvie, Grant. *Sports, Culture and Society: An Introduction*. London: Routledge, 2006.

Kala, S.C. *Terracotta Figurines from Kausambi*. Allahabad: The Municipal Museum, 1950.

Kale, M.R. *Raghuvamsa of Kalidasa*. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Ltd., 1969.

Kapadia, Novy. *Barefoots to Boots: The Many Lives of Indian Football*. New Delhi: Penguin books, 2017.

Law, B.C. *India as Described in Early Texts of Buddhism and Jainism*. London: Luzac and Co., 1941.

Longman, C.J., and H.W. Walrond. *Archery*. London: Longmans Green & Co., 1894.

Macdonell, A.A. *History of Sanskrit Literature*. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Ltd., 1958.

Majumdar, Boria, and Kausik Bandyopadhyay. *A Social History of Indian Football: Striving to Score*. London: Routledge, 2006.

Majumdar, Boria, and J.A. Mangan, eds. *Cricketing Cultures in Conflict: World Cup 2003*. London: Routledge, 2004.

Majumdar, Boria. *Lost Histories of Indian Cricket: Battles of the Pitch*. London: Routledge, 2005.

Majumdar, Boria, ed. *Indian Cricket throughout the Ages: Reader*. New Delhi: Oxford University Press, 2005.

Majumdar, Nani Gopal. *Inscription in Bengal*. Rajshahi Bangladesh: The Varendra Research Society, 1929.

Majumdar, R.C. *Classical Accounts of India*. Calcutta: Firma K.L.M Private Ltd., 1960.

Majumder, Debashis. *The History of the Football Clubs in Calcutta,1847 – 85: Bengali Identities Since Partition*. Kolkata: Readers Service, 2012.

Mangan, J.A., ed. *A Sport- Loving Society: Victorian and Edwardin Middle-Class England at Play*. London: Routledge, 2006.

Mangan, J.A., and Andrew Ritchie, eds. *Ethnicity, Sports and Identity: Struggles for Status*. London: Routledge, 2005.

Mangan, J.A., ed. *The Cultural Bond: Sports, Empire, Society*. London: Frank Cass Publishers, 1992.

Mangan, J.A., and Fan Hong, eds. *Sport in Asian Society: Past and Present*. London: Frank Cass Publishers, 2003.

Mangan, J.A., ed. *Militarism, Sport, Europe: World Without Weapons*. London: Frank Cass Publishers, 2003.

Mangan, J.A., ed. *The Imperial Curriculum: Racial Images and Education in the British Colonial Experience*. London: Routledge, 2003.

Mangan, J.A. *The Games Ethic and Imperialism: Aspects of the Diffusion of an Ideal*. London: Frank Cass, 1986.

Mangan, J.A., ed. *Benefits bestowed?: Education and British Imperialism*. Vol.107. London: Routledge, 2012.

Marwick, Arthur. *The Nature of History*. Houndmills: Macmillan, 1989.

Marwick, Arthur. *The New Nature of History: Knowledge Evidence, Language*. Houndmills: Palgrave, 2001.

Mason, Tony, and Eliza Riedi. *Sport and the Military: The British Armed Forces 1880-1960*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

McComb, David. G. *Sports in World History*. London: Routledge, 2004.

McComb, David. G. *Sports: An Illustrated History*. New York: Oxford University Press, 1998.

Mills, James H., ed. *Subaltern Sports: Politics and Sports in South Asia*. London: Anthem Press, 2005.

Mills, James H., and Satadru Sen, eds. *Confronting The Body: The Politics of Physicality in Colonial and Post-Colonial India*. London: Anthem Press, 2004.

Mishra, V.B. *From the Vedas to Manu Samhita*. Delhi: Sterling, 1982.

Mitra, Soumen. *In Search of an Identity: History of Football in Colonial Calcutta*. Kolkata: Dasgupta and Co., 2006.

Mujumdar, D.C., ed. *Encyclopaedia of Indian Physical Culture*. Baroda: Good Companions, 1950.

Muller, Max, trans. *Rig-Veda- Sanhita*. London: Trubner and Co., 1869.

Nandy, Ashis. *The Tao of Cricket: On Games of Destiny and Destiny of Games*. New Delhi: Oxford University Press, 2000.

Nath, Nirmal. *History of Indian Football*. Kolkata: Reader Service, 2011.

Nauright, John, and David K. Wiggins, eds. *Routledge Handbook of Sport, Race and Ethnicity*. London: Routledge, 2017.

Orwell, George. *Burmese Days*. London: Penguin, 1989.

Pant, G.N. *Indian Archery*. Delhi: Agam Kala Prakashan, 1978.

Puri, B.N. *India in the Time of Patanjali*. Bombay: Bharatiya Vidya Bhavan, 1968.

Raghavan, Srinath. *1971: A Global History of the Creation of Bangladesh*. Cambridge: Harvard University Press, 2013.

Rapson, E.J., ed. *The Cambridge History of India*. Vol. I. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

Ratna, Aarti, and Samaya Farooq Samie, eds. *Race, Gender and Sport: The Politics of Ethnic 'Other' Girls and Women*. London: Routledge, 2018.

Ridding, C.M., trans. *The Kadambari of Bana*. New Delhi: Oriental Books Reprint Corporation, 1974.

Rodrigues, Mario. *Batting for the Empire: A Political Biography of Ranjitsinhji*. New Delhi: Penguin Book, 2003.

Ross, James. S., ed. *Groundwork of Educational Psychology*. London: George G. Harrap and Co. Ltd., 1935.

Ryburn, W.M. *Introduction to Educational Psychology*. London: Oxford University Press, 1959.

Saikia, Yasmin. *Women, War and the Making of Bangladesh: Remembering 1971*. New Delhi: Oxford University Press, 2011.

Saletore, B.N. *Life in the Gupta Age*. Bombay: The Popular Book Depot., 1943.

Sandesara, B.J., and R.N. Mehta, eds. *Mallapurana*. Baroda: Oriental Institute, 1964.

Sarma, V., ed. *Katyayana-Srauta Sutra*. Varanasi: Oriental Library Publication, 1930.

Sen, Ronojoy. *Nation at Play: A History of Sports in India*. New York: Columbia University Press, 2015.

Sen, Satadru. *Migrant Races: Empire, Identity and the K.S. Ranjit Sinji*. Manchester: Manchester University Press, 2004.

Sengupta, Debjani. *The Partition of Bengal: Fragile Borders and New Identities*. London: Cambridge University Press, 2016.

Sewell, Robert. *A Forgotten Empire (Vijayanagar): A Contribution of the History of India*. London: Swan Sonnenschein, 1900.

Shamasastry, R. *Kautilya's Arthasastra*. Mysore: Mysore Printing and Publishing House, 1961.

Shastri, A. Mitra. *India as seen in the Brhatsamhita of Varahamihira*. Delhi: Motilal Banarsidass Publisers, 1960.

Shastri, Haraprasad. *School History of India*. Calcutta: Calcutta Sanskrit Press Depository, 1899.

Sinha, Mrinalini. *Colonial Masculinity: The 'Manly Englishman' and the 'Effeminate Bengali' in the Late Nineteenth Century*. Manchester: Manchester University Press, 1995.

Smith, Adrian, and Dilwyn Porter, eds. *Sports and National Identity in the Post-war World*. London: Routledge, 2017.

Sreedharan, E. *A Manual of Historical Research Methodology*. Kerala: Oriental Black Swan, 2017.

Srivastava, A.L. *Life in Sanchi Sculpture*. New Delhi: Abhinav Publication, 1983.

Subramaniam, K. *Mahabharata*. Bombay: Bhartiya Vidya Bhavan, 1983.

Tawncy, C.H. *Somadevas Kathasarit Sagar*. Banaras: Varanasi Motilal Banarasidas, 1968.

Thackston, Wheeler M., trans. *The Baburname: Memories of Babur, Prince and Emperor*. Washington D.C: Simithsonian Institution, 1996.

Tomlinson, Alan, and Christopher Young, eds. *National Identity and Global Sports Events: Culture, Politics and Spectacle in the Olympics and the Football World Cup*. Albany: State University of New York Press, 2006.

Tomlinson, Alan, Christopher Young, and Richard Holt, eds. *Sports and the Transformation of Modern Europe: States, Media and Market 1905 – 2010*. London: Routledge, 2011.

Tomilson, John. *Cultural Imperialism*. London: Continuum, 1991.

Van Buitenen, J.A.B., trans. *The Mahabharata*. Chicago: University of Chicago Press, 1973.

Vertinsky, Patricia, and Sherry Mckay, eds. *Disciplining Bodies in the Gymnasium: Memory, Monument and Modernism*. London: Routledge, 2004.

Wakankar, V.S., and R.R. Brooks. *Stone Age Paintings in India*. Bombay: D.B. Taraporewala Sons Co., 1976.

Whitney, W.D., trans. *Atharva-Veda-Samhita*. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Ltd., 1971.

Wilson, H.H., trans. *Rig-Veda Sanhita*. Delhi: Nag Publishers, 1977.

Walvin, James. *Football and the Decline of Britain*. London: The Macmillan Press, 1990.

Younghusband, George John. *Polo in India*. London: W.H. Allen, 1890.

- **Bengali Books:**

অধিকারী, অমল। *নদীয়া জেলা ও কিছু তথ্য*। রানাঘাট: স্বনির্ভর, ২০১৩।

আজাদ, সালাম। *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান*। অনুবাদক আশীষ কুমার চক্রবর্তী। দিল্লী: ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ২০১০।

ইসলাম, এস. এম. তাজিরুল। *ফিরে দেখা নদিয়া*। প্রথম খন্ড। বহরমপুর: শিল্পনগরী প্রকাশনী, ২০১০।

ইসলাম, এস. এম. তাজিরুল। *ফিরে দেখা নদিয়া*। দ্বিতীয় খন্ড। বহরমপুর: শিল্পনগরী প্রকাশনী, ২০১৮।

ইসলাম, সিরাজুল, সম্পা:। *বাংলাদেশের ইতিহাস*। ঢাকা: ইডেন পেস, ১৯৭১।

ইসলাম, সিরাজুল, সম্পা:। *বাংলার ইতিহাস: ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৪।

উমর, বদরুদ্দীন। *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*। কলকাতা: আনন্দধারা প্রকাশন, ১৯৭১।

কর্মকার, সুপ্রতিম। *নদীয়ার নদী ও জলাভূমির কথা*। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা: জে. এন. চক্রবর্তী, ২০১১।

কর্মকার, সুপ্রতিম। *কৃত্তিবাসের ফুলিয়া*। কলকাতা: জে. এন. চক্রবর্তী, ২০১৩।

করিম, আব্দুল। *বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৭৭।

কুন্ডু, গৌরাঙ্গচন্দ্র। *নবদ্বীপের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত*। নবদ্বীপ: নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ।

গঙ্গোপাধ্যায়, দিলীপকুমার। *ভারত ইতিহাসের সন্ধানে*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: সাহিত্যলোক, ২০১৭।

গঙ্গোপাধ্যায়, দিলীপকুমার। *ভারত ইতিহাসের সন্ধানে*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: সাহিত্যলোক, ২০১৭।

গুপ্ত, অমিতাভ। *পূর্ব পাকিস্তান*। কলকাতা: আনন্দধারা প্রকাশন, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ।

গোস্বামী, প্রদ্যোৎ কুমার। *নবদ্বীপের সমাজ ও সংস্কৃতি*। নবদ্বীপ: নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ, ২০০৬।

গোস্বামী, প্রদ্যোৎ কুমার। *নদীয়ার গৌরব*। প্রথম খন্ড। সুমতি পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১০।

ঘোষ, নিতাই। *কল্যাণী: সেকাল ও একাল*। কল্যাণী: কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯০।

ঘোষ, নিতাই। *ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে নদীয়া*। কলকাতা: বসু মুদ্রণ, ২০০৮।

ঘোষ, সেমন্তী, সম্পা:। *দেশভাগ স্মৃতি আর স্তব্ধতা*। কলকাতা: গাঙচিল, ২০১১।

চক্রবর্তী, অলোককুমার। *মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*। কলকাতা: মিত্রম, ২০১৫।

চক্রবর্তী, নরহরি। *নবদ্বীপ পরিক্রমা পদ্ধতি*। সম্পাদনায় নগেন্দ্রনাথ বসু। কলিকাতা: সাহিত্য পরিষদ মন্দির, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ।

চক্রবর্তী, নরহরি। *ভক্তি রত্নাকর*। দ্বিতীয় সংস্করণ। বহরমপুর: জানকীনাথ সাহা প্রিন্টার্স, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ।

চক্রবর্তী, ড. পবিত্র। *চাকদহ: ইতিহাস ও সংস্কৃতি*। চাকদহ: নবপত্র প্রকাশনী, ১৯৯৪।

চক্রবর্তী, বরুণকুমার, সম্পা:। *বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতিকোষ*। কলকাতা: অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ১৯৯৫।

চট্টোপাধ্যায়, অসীম। *গ্রামবাংলার ইতিকথা*। কলকাতা: সুবর্ণরেখা, ১৯৮৪।

চট্টোপাধ্যায়, গৌরীপদ। *দক্ষিণ- পশ্চিম বাংলার ইতিহাস*। দ্বিতীয় খন্ড। মেদিনীপুর: কাকলী প্রকাশনী, ১৯৮৭।

চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্র। *বাঙালির ধর্ম ও সমাজ*। কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৯।

চৌধুরী, যজ্ঞেশ্বর। *শ্রীচৈতন্যদেব ও সমকালীন নবদ্বীপ*। নবদ্বীপ: নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ, ২০০৪।

চৌধুরী, যজ্ঞেশ্বর। সম্পা:। *আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চায় নদীয়া*। নবদ্বীপ: নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ, ২০০৭।

চৌধুরী, কমল, সংগ্রহ ও সম্পা:। *নদিয়ার ইতিহাস*। প্রথম পর্ব। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১২।

চৌধুরী, কমল, সংগ্রহ ও সম্পা:। *নদিয়ার ইতিহাস*। দ্বিতীয় পর্ব। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১২।

ঝা, শক্তিনাথ। *বৈষ্ণব, বাউল ফকিরাদির নদীয়া কাহিনী*। কৃষ্ণনগর: মুদ্রা প্রকাশন, ২০২০।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *রবীন্দ্র রচনাবলী*। তৃতীয় খন্ড। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, ১৪১০ বঙ্গাব্দ ।

দত্ত, অশোককুমার। *শান্তিপুরের লোকসংস্কৃতি পরিচয়*। শান্তিপুর: শান্তিপুর লোকসংস্কৃতি পরিষদ, ২০০০।

দত্ত, সঞ্জিত, ও গৌতম ধনী, সম্পা:। *কৃষ্ণনগর সহায়িকা ও একনজরে নদীয়া*। কলকাতা: মডেল পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৯।

দাস, ক্ষুদিরাম। *বৈষ্ণব-রস-প্রকাশ*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১৮।

দাস, বৃন্দাবন। *চৈতন্য ভাগবত*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮৩।

দাস, নগেন্দ্রনাথ। *নবদ্বীপ কাহিনী বা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও গোপাল ভাঁড়*। কলিকাতা: তবুওপ্রয়াস, ১৩৩ বঙ্গাব্দ।

দে, সরকার শুভেন্দু। *নদীয়ার কথা*। কলকাতা: পান্ডুলিপি, ২০১৫।

নন্দী, শ্রীহরিদাস। *আদিম নদিয়ার কথা*। কলিকাতা: শ্রীভাগবত প্রেস, ২০১৫।

নাগ, কল্যানী। *শান্তিপুর প্রসঙ্গ*। প্রথম খন্ড। শান্তিপুর: সুতারগড় বেনেপাড়, ১৪৯৮ বঙ্গাব্দ।

নাথ, পূর্ণেন্দুনাথ। *শান্তিপুর: সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাস*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ।

পিন্টু, জাকারিয়া। *মুক্তিযুদ্ধে ফুটবল*। ঢাকা: মেলা প্রকাশনী, ২০০৬।

পান্ডে, শুভলক্ষী। *ষাট-সত্তরে নদীয়া: নকশালবাড়ির নির্মাণ*। কলকাতা: রিডার্স সার্ভিস, ২০০০।

বন্দ্যোপাধ্যায়, কৌশিক। *খেলা যখন ইতিহাস: সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি*। কলকাতা: সেতু প্রকাশনী, ২০১৯।

বন্দ্যোপাধ্যায়, কৌশিক। *১৯১১: বাঙালির ঐতিহাসিক ফুটবল যুদ্ধ*। কলকাতা: সেতু প্রকাশনী, ২০১১।

বন্দ্যোপাধ্যায়, তাপস। *উনিশ শতকে রানাঘাট*। কলকাতা: সাহিত্যশ্রী, ১৯৯৫।

বন্দ্যোপাধ্যায়, তাপস। *ইতিহাসের আলোকে নদীয়া ও নদীয়ার লোকসংস্কৃতি*। কলকাতা: তমোরি প্রকাশনী, ১৯৯৬।

বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস। *বাঙ্গালার ইতিহাস*। প্রথম খন্ড। ঢাকা: বইপত্র, ২০১৩।

বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস। *বাঙ্গালার ইতিহাস*। দ্বিতীয় খন্ড। ঢাকা: বইপত্র, ২০১৩।

বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ। *বিক্ষুব্ধ বাংলা: পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী রাজনীতি*। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা: রেডিক্যাল ইম্প্রেশন, ২০১৪।

বসু, কালীপ্রসাদ। *ক্ষুব্ধ নদীয়ার রুদ্র কৃষ্ণনগর*। কৃষ্ণনগর: রানিবীথি, ১৯৬৬।

বাগল, যোগেশচন্দ্র। *হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত*। কলকাতা: মৈত্রেয়ী, ১৯৪৫।

বিশ্বাস, কুমারেশ। *নদীয়ার ইতিবৃত্ত ও সংস্কৃতি*। কলকাতা: এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৮।

বিশ্বাস, সুজিত। *তাঁত শিল্পের বিবর্তনে নদীয়া জেলা (১৯৪৭- ২০০০)* । কলকাতা: অরুণা, ২০০৯।

বিশ্বাস, সুজিত। *পায়রাডাঙ্গা: নানা প্রসঙ্গ*। চাকদহ: চরভূমি, ২০০৮।

বিশ্বাস, সুজিত। *বাদকুল্লা পরিচয়*। কলকাতা: করুণা, ১৯৯৭।

ভট্টাচার্য, অমিতাভ। *চৈতন্যদেবের সমসাময়িক বাংলাদেশের ভৌগলিক পরিচয়*। কলকাতা: সারস্বত লাইব্রেরী, ২০০২।

ভট্টাচার্য, মলয়শংকর। *নদিয়ার ইতিহাসের ছিন্নপত্র*। কলকাতা: ২০০৩।

ভট্টাচার্য, রত্না, ও শক্তিপদ ভট্টাচার্য । *পায়ে পায়ে নদিয়া*। কলকাতা: পরশপাথর প্রকাশন, ১৪২০ বঙ্গাব্দ।

ভৌমিক, দেবাশিষ। *নদীয়ার ভাষা*। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা: পুনশ্চ, ২০১২।

মজুমদার, রমেশচন্দ্র। *বাংলাদেশের ইতিহাস*। প্রথম খন্ড। ঢাকা: জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ।

মজুমদার, বোরিয়া। *শতশিল্পে আলোকিত ভারতের ক্রীড়া ইতিহাস*। কলকাতা: দীপ প্রকাশন, ২০১৮।

মজুমদার, বোরিয়া। *ঈশ্বর একাদশ ও শতকোটি ভারতীয়: ভারতীয় ক্রিকেটের অজানা কাহিনী*। কলকাতা: দীপ প্রকাশন, ২০১৮।

মজুমদার, বোরিয়া, ও নলিন মেহতা। *একশো কোটি মানুষের স্বপ্ন ভারতবর্ষ আর অলিম্পিক*। কলকাতা: দীপ প্রকাশন, ২০২০।

মজুমদার, সত্যেন্দ্রলাল। *শ্রীচৈতন্য জন্মস্থান বিতর্ক, তার ত্রুটি ও সমাধান*। নবদ্বীপ: নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ, ১৯৯৫।

মন্ডল, গুরুপদ। *বৃহত্তর আকাইপুরের ইতিকথা*। রানাঘাট: উৎসবভূমি, নদীয়া, ২০০৬।

মন্ডল, মৃত্যুঞ্জয়। *নবদ্বীপের প্রাচীন ইতিহাস*। নবদ্বীপ: নবদ্বীপ সাহিত্য সমাজ, ২০১০।

মন্ডল, মৃত্যুঞ্জয়। *নবদ্বীপের ইতিবৃত্ত*। নবদ্বীপ: নবদ্বীপ সাহিত্য সমাজ, ২০১৩।

মন্ডল, মৃত্যুঞ্জয়, সম্পা:। *নদীয়া চর্চা*। কলকাতা: অমর ভারতী, ২০১৪।

মন্ডল, মৃত্যুঞ্জয়, সম্পা:। *নদীয়ার ইতিহাস চর্চা*। কলকাতা: অমর ভারতী, ২০১৬।

মন্ডল, মৃত্যুঞ্জয়, সম্পা:। *নদীয়ার সংস্কৃতি চর্চা*। কলকাতা: অমর ভারতী, ২০১৮।

মন্ডল, শ্যামাপদ। *নদীয়ার লোককথা*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ।

মন্ডল, ড.শ্যামাপ্রসাদ। *হরিণঘাটার ইতিকথা*। কলকাতা: দীনবন্ধু-বিভুতি সাহিত্য সংসদ, ১৯৯৭।

মল্লিক, কুমুদনাথ। *নদীয়া কাহিনী*। রাণাঘাট: ১৩১৭ বঙ্গাব্দ।

মিত্র, সলিল। *নদীয়ার গৌরব কাহিনী*। কলকাতা: কল্পনা প্রকাশনী, ১৯৮৫।

মুখোপাধ্যায়, রাজীবলোচন। *মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিএ*। শ্রীরামপুর: শ্রীরামপুর মিশন, ১৮৫৭।

মুস্তৌফী, সৃজননাথ মিত্র। *উলা বা বীরনগর*। কলিকাতা: বেলা পিন্টিং ওয়াকস, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ।

মোদক, কার্তিক। *১৮ই আগস্ট নদিয়ার স্বাধীনতা*। রানাঘাট: ২০১২।

রত্নাগর, শিরিন। *হরপ্পা সভ্যতার সন্ধানে*। কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৪।

রাঢ়ী, কান্তিচন্দ্র। *নবদ্বীপ মহিমা*। নবদ্বীপ: নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ।

রাঢ়ী, কান্তিচন্দ্র। *নবদ্বীপ তত্ত্ব*। সম্পাদনায় শান্তিরঞ্জন দেব। নবদ্বীপ: পুরাতত্ত্ব পরিষদ, ২০১৮।

রায়, অনিরুদ্ধ। *মধ্যযুগের ভারতীয় শহর*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৮।

রায়, অনিরুদ্ধ। *মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাস*। কলকাতা: ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, ২০১৮।

রায়, কার্তিকেয়চন্দ্র। *ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত*। সম্পাদনায় মোহিত রায়। কলিকাতা: মঞ্জুষা, ১৯৮৬।

রায় গুণাকার, ভারতচন্দ্র। *অন্নদামঙ্গল*। প্রথম ভাগ। সম্পাদনায় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস। কলিকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ।

রায়, নীহাররঞ্জন। *বাঙালির ইতিহাস (আদিপর্ব)* । পঞ্চম সংস্করণ। কলকাতা: দে'জ পাবলিশার্স, ১৪১২ বঙ্গাব্দ।

রায়, মোহিত। *শিবনিবাস*। মাজদিয়া: কৃষি সাহিত্য প্রকাশন, ১৯৮৪।

রায়, মোহিত। *নদীয়া স্থাননাম*। কলকাতা: অমর ভারতী, ১৯৮৫।

রায়, মোহিত। *নদীয়া উনিশ শতক*। কলকাতা: অমর ভারতী, ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ।

রায়, মোহিত। *নদীয়ার সামাজ চিত্র*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৯০।

রায়, মোহিত। *সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে নদীয়ার লোকসংস্কৃতি*। কলকাতা: গণমন প্রকাশন, ১৯৯৩।

রায়, মোহিত। *নদিয়ার সেকালের বিদ্যাসমাজের কথা ও কাহিনী*। কলকাতা: জে. এন. চক্রবর্তী এন্ড কোং, ১৯৯৪।

রায়, শচীন। *গাংনাপুরের উপকথা*। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা: মান্না পাবলিকেশন, ২০১১।

রায় (মন্ডল), শিবানী। *আদিবাসী ভাষা ও সংস্কৃতি: প্রসঙ্গ নদীয়া জেলা*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০০২।

রায়, সুশীল। *শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন*। কলকাতা: লক্ষী প্রিন্টারস, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ।

সরকার, শুভেন্দু দে। *নদীয়ার কথা*। কলকাতা: পান্ডুলিপি, ২০১৫।

সরকার, শৈবাল। সম্পা:। *মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও সমকাল*। কৃষ্ণনগর: মুদ্রা, ২০১৯।

সান্যাল, অবন্তীকুমার, ও অশোক ভট্টাচার্য, সম্পা:। *চৈতন্যদেব ইতিহাস ও অবদান*। কলকাতা: সারস্বত লাইব্রেরি, ২০০২।

হোসেন, মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর। *অবিভক্ত নদীয়া জেলা ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতি (১৭৮৬- ১৯৪৭)*। দ্বিতীয় সংস্করণ। ঢাকা: গতিধারা, ২০১৫।

• ARTICLES:

▪ In English:

Alavi, Seema. ‘‘Of Badshahs. White Sahibs and Black Natives.’’ *The Hindu*, May 2, 1999.

Appadurai, Arjun. ‘‘Playing with Modernity: The Decolonization of Indian Cricket.’’ In *Consuming Modernity: Public Culture in South Asian World*, edited by C.A. Breckenridge, 23-48. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1995.

Arbena, Joseph L. “Sports and the Study of Latin American history: An Overview.” *Journal of Sport History* 13, no. 2 (Summer 1986): 87-96.

Bairner, Alan. ‘‘Sport, Nationalism and Globalization: Relevance, Impact, Consequences.” *Hitotsubashi Journal of Arts and Sciences* 49 (2008): 43-53.

Bakshi, Sahil. “Jhulan Goswami bags 250th ODI wicket, becomes first woman cricketer on planet to achieve feat.” *Sports Now* (March 16, 2022), https://www.timesnownews.com/sports/cricket/jhulan-goswami-bag-250th-odi-wicket-becomes-first-womens-cricketer-on-planet-to-achieve-feat-article-90252288.

Bandopadhyay, Kausik. ‘‘History of Modern Sport: The Indian Context.” *Karatoya: North Bengal Journal of History* I (2007): 9-19.

Bandyopadhyay, Kausik. ‘‘Race, Nation and Sport: Footballing Nationalism in Colonial Calcutta.” *Soccer and Society*, no. 1 (2003): 1-19.

Besiner, Niko, and Susan Brownell. ‘‘Sport, Modernity, and the Body.” *Annual Review of Anthropology* 41 (2012): 443-459.

Brijnath, Rohit. “Asian Games: Some individuals sparkle while other Indians fail.” *India Today* (December 28, 1998), https://www.indiatoday.in/magazine/sport/story/19981228-asian-games-some-individuals-sparkle-while-other-indians-fail-827730-1998-12-27.

Cabral, Amilcar. ‘‘National Liberation and Culture.” *The Journal of Pan African Studies* 3, no. 5 (December 2009): e-Document.

Dimeo, Paul. ‘‘Football and Politics in Bengal: Colonialism, Nationalism, Communalism.” In *Soccer in South Asia: Empire, Nation, Diaspora*, edited by Paul Dimeo and James Mills, 57-74. London: Frank Cass, 2001.

Dimeo, Paul. ‘‘Colonial Bodies, Colonial Sport: ‘Martial’ Punjabis, ‘Effeminate’ Bengalis and the Development of Indian Football.” *The International Journal of the History of Sport*, no. 1 (March 2007): 72-90.

Giulianotti, Richard, and Roland Robertson. ‘‘The globalization of football: a study in the glocalization of the ‘serious life’’.” *The British Journal of Sociology* 55, issue 4 (2004): 545-568.

Guha, Ramachandra. ‘‘Cricket and Politics in Colonial India.” *Past and Present*, no. 161 (November 1998): 155-190.

Guha, Ramachandra. ‘‘The Serpent in the Garden.” (June 1, 2013): Available at espncricinfo.com.

“Jhulan Goswami becomes the leading wicket-taker in Women’s ODIs,” *The Times of India* (May 9, 2017), https://timesofindia.indiantimes.com/sports/cricket/news/jhulan-goswami-becomes-the-leading-wicket-taker-in-womens-odis./articleshow/58594182.cms.

"Jyotirmoyee Sikdar presented with prestigious Rajiv Gandhi Khel Ratan Award," *India Today* (February 1, 2013), https://www.indiatoday.in/magazine/signposts/story/19990913-jyotimoyee-sikdar-presented-with-prestigious-rajiv-gandhi-khel-ratna-award-824221-1990-09-12.(Updated-February 1,2013).

Kapadia, Novy. ''The Story of Indian Football, 1889 to 2000.'' In *Soccer in South Asia: Empire, Nation, Diaspora*, edited by Paul Dimeo and James Mills, 17-40. London: Frank Cass, 2002.

Kar, Subharata. ''Indigenous Physical Culture of Bengal During the British Regime.'' *Language in India* 13 (June 2013): 458-472.

Kaufman, Jason. ''Cross-National Cultural Diffusion: The Global Spread of Cricket.'' *American Sociological Review* 70 (February 2005): 82-110.

Kidambi, Prashant. ''Hero, Celebrity and Icon: Sachin Tendulkar and Indian Public Culture.'' In *The Cambridge Companion to Cricket*, edited by Anthony Bateman and Jeffrey Hill, 187-202. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

Majumdar, Boria. ''The Vernacular in Sports History.'' *Economic and Political Weekly* XXXVII, no. 29 (20th July 2002): 3069-3075.

Majumdar, Boria. ''Politics and Leisure in Colonial India- Lagaan: Invocaion of Lost History.'' *Culture, Sport, Society*, no. 2 (2002): 22-36.

Majumdar, Boria. ''Forwards and Backwards: Women's Soccer in Twentieth Century India.'' In *Soccer, Women, Sexual Liberation: Kicking of a New Era*, edited by Fan Hong and J.A. Mangan, 80-94. London: Frank Cass, 2003.

Mangan, J.A. ''Eton in India: The Careful creation of Oriental Englishmen.'' In *The Games Ethics and Imperialism: Aspects of the Diffusion of an Ideal*, edited by J.A Mangan, 122-141. London: Frank Cass, 1998.

Mangan, J.A. ‘‘Imperial Origins, Christian Manliness, Moral Imperatives and the Pre-Sri Lankan Playing Fields- ‘Beginnings’ and ‘Consolidation.’’ In *Sports in Asian Society: Past and Present*, edited by Fan Hong and J.A. Mangan, 1-49. London: Frank Cass, 2003.

Mangan, J.A. ‘‘Soccer as Moral Training: Missionary Intentions and Imperial Legacies.’’ In *Soccer in South Asia: Empire, Nation, Diaspora*, edited by Paul Dimeo and James Mills, 41-56. London: Frank Cass, 2002.

Mason, Tony. ‘‘Football on the Maidan: Cultural Imperialism in Calcutta.’’ In *The Cultural Bond: Sport, Empire, Society*, edited by J.A. Mangan, 85-96. London: Frank Cass, 1992.

Mills, James. ‘‘Football in Goa: Sport, Politics and the Portuguese in India.’’ In *Soccer in South Asia: Empire, Nation, Diaspora*, edited by Paul Dimeo and James Mills, 75-88. London: Frank Cass, 2001.

Mustafa, Fahad. ‘‘Cricket and globalization: global process and the imperial game.’’ *Journal of Global History* 8 (2013): 318-341.

Naha, Souvik. ‘‘Gender, Power, and Cricket Spectators in Calcutta, 1960s- 1990s.’’ *The Historical Journal* 65, issue 3 (June 2022): 1-23.

Pearson, M.N. ‘‘Recreation in Mughal India.’’ *British Journal of Sports History* I, no. 3 (1984): 335-350.

Sen, Satadru. ‘‘Enduring Colonialism in cricket: from Ranjitsinhji to the Cronje affair.’’ *Contemporary South Asia* 10, issue 2 (2001): 237-249.

Stoddart, Brian. ‘‘Sport, Cultural Imperialism and Colonial Response in the British Empire.’’ *Comparative Studies in Society and History* 30, issue 4 (Octber 1988): 649-673.

▪ In Bengali:

আচার্য, অচিরাংশু। "কৃষ্ণচন্দ্র ও জমিদারি: একটি অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ।" *মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও সমকাল,* সম্পাদনায় শৈবাল সরকার, কৃষ্ণনগর: মুদ্রা, ২০১৯।

চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ। "উন্মাদনা ও পণ্যায়ন'- প্রসঙ্গ বিংশ শতকের ভারতীয় ক্রিকেট।" *ইতিহাস অনুসন্ধান-* ২১, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০০৭।

চট্টোপাধ্যায়, রামানুজ। "বৃহত্তর রানাঘাট: সেকাল থেকে একাল।" রানাঘাট: জাতক, ১৯৯৭।

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার। "কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা: অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার এক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র।" *মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও সমকাল,* সম্পাদনায় শৈবাল সরকার, কৃষ্ণনগর: মুদ্রা, ২০১৯।

চ্যাটার্জি, অমিতাভ। " "ফুটবলের সামাজিকীকরণ": প্রসঙ্গ বিংশ শতকের বাংলা সিনেমা।" *ইতিহাস অনুসন্ধান-* ২৩, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০০৯।

দাস, অজিত। "নদিয়ার সাহিত্য সাধনা: প্রবণতা ও প্রেক্ষিত।" *পশ্চিমবঙ্গ- নদিয়া জেলা সংখ্যা,* কলকাতা: তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯৭।

"নাটকীয় ভাবে অলিম্পিক্সে সুযোগ পেয়ে নতুন জুতোর খোঁজে দেবশ্রী," *আনন্দবাজার পত্রিকা* (১৭ই জুলাই, ২০১৬), https://www.anandabazar.com/sports/debashree-majumdar-qualified-for-rio-olympics-1.436619.

পাল, সুব্রত। "কৃষ্ণনগর রাজবাড়ি।" *মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও সমকাল,* সম্পাদনায় শৈবাল সরকার, কৃষ্ণনগর: মুদ্রা, ২০১৯।

বদরুদ্দীন, এস.এম.। "নদিয়ার খেলাধুলা- অতীত ও বর্তমান।" *পশ্চিমবঙ্গ- নদিয়া জেলা সংখ্যা,* কলকাতা: তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯৭।

বন্দোপাধ্যায়, কৌশিক। “বাঙালির ফুটবলে ঘটি- বাঙাল: ক্রীড়া ক্ষেত্রে একটি সামাজিক দ্বন্দ্ব।” *ইতিহাস অনুসন্ধান ২০,* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০০৬।

বন্দ্যোপাধ্যায়, কৌশিক। “ভারতীয় ক্রিকেট দলের পাকিস্তান শুভেচ্ছা সফর, ২০০৪: ক্রিকেট, কূটনীতি ও রাজনীতি।” *ইতিহাস অনুসন্ধান- ২১,* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০০৭।

বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবাশিস। “বারোদোল মেলা, অন্নপূর্ণাপুজা এবং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র।” *মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও সমকাল,* সম্পাদনায় শৈবাল সরকার, কৃষ্ণনগর: মুদ্রা, ২০১৯।

বিশ্বাস, অলোক কুমার। “নদীয়ার বিবর্তন।” *ইতিহাস অনুসন্ধান- ২৭,* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০১৩।

মজুমদার, সত্যেন্দ্রনাথ। “নবদ্বীপ ও নদীয়া নামের উৎপত্তি ও প্রাচীনত্ব।” *নদীয়া চর্চা,* সম্পাদনায় মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল, কলকাতা: অমর ভারতী, ২০১৪।

মুখোপাধ্যায়, অমৃতেন্দু। “কৃষক আন্দোলনে নদিয়া জেলা।” *পশ্চিমবঙ্গ- নদিয়া জেলা সংখ্যা,* কলকাতা: তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯৭।

রায়, শুভ্রাংশু। “গোয়ার মহিলা ফুটবল: ঐতিহ্য বনাম সংস্কার।” *ইতিহাস অনুসন্ধান- ২১,* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০০৭।

রায়, মোহিত। “ইতিহাসের রূপরেখায় নদিয়া ও নদিয়ার পুরাকীর্তি।” *পশ্চিমবঙ্গ- নদিয়া জেলা সংখ্যা,* কলকাতা: তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯৭।

রায়চৌধুরী, পার্শ্বনাথ। “নদীয়া জেলার সাহিত্য ও সাহিত্যিক।” *নদিয়া জেলা গ্রন্থাগার সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ স্মারকগ্রন্থ ১৯৯৫-২০০৫,* সম্পাদনায় অশোকসিংহ মহাপাত্র ও অপূর্ব কুন্ডু, কৃষ্ণনগর: ২০১০।

সুফী, সালেক। “মুক্তিযুদ্ধের ফুটবল ফ্রন্ট।” খেলার কথা কথার খেলা, সম্পাদনায় ইকরামউজ্জামান ও অন্যান্য, ঢাকা: ১৯৯৩।

সিংহ রায়, সমীরেন্দ্রনাথ। "নদীয়ার লোকসংস্কৃতি।" *দেশ,* সাহিত্য সংখ্যা, কলকাতা: ১৩৭২ বঙ্গাব্দ।

হালদার, সুস্মিত। "ভুবনেশ্বরে সোনা দেবশ্রীর: প্রমাণ করব, জেদ মেয়ের।" *আনন্দবাজার পত্রিকা* (১২ই জুলাই, ২০১৭), https://www.anandabazar.com/sports/women-athlete-debashree-majumdar-brings-gold-medal-at-home-1.641161.

➢ PhD THESIS:

• In English:

Bandyopadhyay, Kausik. "Football in Bengali Culture and Society: A Study in the Social History of Football in Bengal 1911- 1980." PhD thesis, University of Calcutta, 2008.

Bhattacharya, Suparna. "Women of Bengal in Sports 1905- 1985." PhD thesis, Jadavpur University, 2007.

Chatterjee, Amitava. "Evolution of Sporting Culture in Colonial Bengal." PhD thesis, University of Calcutta, 2014.

Majumder, Debashis. "Rolling the Ball: History of Physical Culture in Bengali Football (1858- 1990)." PhD thesis, Jadavpur University, 2016.

Naha, Souvik. "Cricket, Public Culture and Mediated Identities in Calcutta, 1934 to 1999." PhD thesis, ETH Zurich, 2016.

Sharma, Pratima. "Sport and Pastimes in Ancient India (from Pre-historic times to circa 650 A.D.)." PhD thesis, Punjab University, 1993.

• In Bengali:

আলম, জিয়াউল। "শরীর চর্চার আলোকে বাংলার লোকক্রীড়ার সন্ধান।" পিএইচ.ডি গবেষণা সন্দর্ভ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২।